ওঁ

# পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

১১শ ভাগ। } বৈশাখ ১৩১৪ সাল। { ১ম সংখ্যা।

## আমাদের একাদশ বৎসর।

আমরা আমাদের একাদশ বৎসরের প্রথমে গত বৎসরের কর্ম্মসমূহ ভগবচ্চরণে সমর্পণ করিলাম। ওঁ।

একাদশ সংখ্যাটি রুদ্রদেবগণের সংখ্যা; আমরা এই একাদশ বর্ষের প্রথমে রুদ্রদেবগণের চরণে নমস্কার করিয়া কর্ম্ম আরম্ভ করিব। রুদ্রদেবগণ আমাদের মঙ্গল করুন। রুদ্র দেবগণের মধ্যে যিনি শঙ্কররূপে শঙ্করী-সহ হিমালয়ের কৈলাস-শিখরে বাস করিতেছেন আমরা সেই যোগেশ্বরের চরণে প্রণাম করি। উপনিষদে কথিত আছে হৈমবতী উমা দেবগণকে পরাবিদ্যা দান করিয়াছিলেন, আমরা পরাবিদ্যা লাভে সেই শঙ্করী চরণে প্রণত হইলাম। মা শঙ্করী! আমাদের শঙ্করী জানেন, তিনি আমাদের মা; তাঁহার এই জ্ঞানই শঙ্করীকে "মা" বলিয়া চিনিয়াছেন, তিনিই পরাবিদ্যা

যিনি শঙ্করীকে "মা" বলিয়া ডাকিতে শিখিয়াছেন, তিনিই পরাভক্তি লাভ করিয়াছেন।'

শঙ্কর আছেন এবং শঙ্করী আছেন ও তাঁহারা কৈলাস শিখরে বাস করেন. এই কথাগুলি মিথ্যা বা রূপক কথা নহে; হিন্দু মাত্রেই এই কথা-গুলি দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিতেন; কিন্তু কালক্রমে হিন্দু সন্তানগণের ঐ বিশ্বাস ক্রমে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। তাই "শঙ্করী যে আমাদের মা" ইহা আমরা ভুলিয়া যাইতেছি; এবং আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাবের অসদ্ভাব হইতেছে।

বহু পূর্ব্বে এক সময়ে হিমালয় প্রদেশের রাজার এক পরমাসুন্দরী কন্যা জন্মিয়াছিলেন। সেই সময়ে একজন মহাযোগী হিমালয়ে যোগারূঢ় হইয়া থাকিতেন। হিমভূধর রাজের সেই কন্যার নাম "উমা"। উমা। বালিকা অবস্থাতে সেই মহাযোগীর সেবা "শুশ্রূষা" করিতেন। ক্রমে উমার যৌবন দেখা দিল। একদিন উমা পদ্মমালা গাঁথিয়া যোগীবরের হাতে দিলেন, যোগী উমা মুখের বিম্বফলাধরোষ্ঠে দৃষ্টিপাত করিলেন; মুখখানি বড় সুন্দর দেখিলেন, নবীনা যুবতী কিঞ্চিৎ নতশিরা হইয়া দাঁড়াইলেন। মদন, বাণ নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু যোগীবর ক্ষুভিত চিত্তকে তখনই শান্ত করিয়া ললাট বহ্নি যোগে মদনকে ভস্ম করিলেন, —এবং একেবারে সেই স্থান ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন। উমা সেই যোগীবরের প্রেমে উন্মাদিনী হইলেন। রাজবালা সমস্ত বিষয় স্পৃহা ত্যাগ করিয়া সেই যোগীবরকে পতিরূপে পাইবার জন্য ঘোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। বল্কলধারিণী প্রেমোন্মত্তা সুন্দরীর সেই তপস্যাতে অন্তর্জগৎ কাঁপিয়া উঠিল। সেই কম্পন সেই যোগীবরের হৃদয় স্পর্শ করিয়া, তাঁহাকে আকর্ষণ করিল। যোগীবর প্রেম-ময়ীর কাছে উপস্থিত হইলেন; ভক্তির জয় হইল; উমা সেই যোগীবরের বামোরুবাসিনী হইলেন। এই উমা হৈমবতী মানবের মঙ্গল সাধন উদ্দেশে আপন স্বামীকে মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করিতেন; ও তাঁহার যে উত্তর পাইতেন ...ন কথা তন্ত্রশাস্ত্র বলিয়া কথিত আছে। এই যে গল্পটী বলিলাম ...শ্বাস করিবার কোন কথাই নাই; বহুকাল হইতে এই গল্প ...; এবং তন্ত্র বিদ্যা বলিয়া একটি বিদ্যাও বহুকাল হইতে ...রিতেছেন। তবে ঐ গল্পটি—আমরা কোন কারণেই

অবিশ্বাস করিতে পারি না। তন্ত্রের আদি গুরু একজন অবশ্য ছিলেন; তিনিই যে উমাপতি, এই প্রাচীন কিম্বদন্তী সত্য বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

অনেকে বলিতে পারেন যে তন্ত্র শাস্ত্রের যে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ আছে যদিও সেই সকল গ্রন্থেই শিব বক্তা ও উমা শ্রোতা রূপে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থ সকলের রচনা ও তত্ত্বলিখিত আচার সকলের ভিন্নতা দেখিয়া তন্ত্রগুলি যে একজন লোকের উক্তি ইহা বিশ্বাস হয় না। একথা আমরা সত্য বলিয়া মানি। বাস্তবিক ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্রগ্রন্থ গুলি একজন লোকের লেখা নহে। সকল গ্রন্থগুলির মধ্যে যেটুকু মুখ্যবিদ্যা, উহাই শিবের শাম্ভবী বিদ্যা বা তন্ত্রবিদ্যা। ইউক্লিড নামে একজন জ্যামিতি বিদ্যার আদিগুরু; তার পর টড্‌হণ্টরের ইউক্লিড, প্ল্যাটের ইউক্লিড প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক যেমন ভিন্ন ভিন্ন লোকে করিয়াছেন; তন্ত্র শাস্ত্রও সেইরূপ। ইউ-ক্লিডের বিদ্যার বর্ত্তমান ফলে যে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ আছে, সকল গ্রন্থগুলিতেই ইউক্লিডের মূল প্রতিজ্ঞাগুলি বজায় রাখা হইয়াছে। সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্রগ্রন্থগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সকল গুলির মধ্যেই যে জপ যজ্ঞের বিধি ও প্রক্রিয়া কথিত আছে, উহা সর্ব্বত্রই একরূপ, এবং যে আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব ও শিবতত্ত্বের কথা আছে, উহাও সকল গ্রন্থেই একরূপ। সকল তন্ত্র গ্রন্থেরই যে গুলি মুখ্যকথা, সেই বিদ্যাই তন্ত্রবিদ্যা। সেই তন্ত্রবিদ্যার আদিগুরু একজন ছিলেন, ইহা চিরন্তন কথা, ইহা আমরা না মানিব কেন? সেই আদি গুরুকে যদি মানিলাম, তবে তাহার উমা সম্মিলনের প্রাচীন কথাই বা না মানিব কেন? সেই উমা আমাদের মা। কেমন করিয়া তিনি আমাদের মা হইলেন তাহা এইবারে বলিতেছি।

সাংখ্য দর্শনের চতুর্বিংশতি তত্ত্বের কথা সকল তন্ত্র শাস্ত্রের মধ্যেই আছে। সেই চতুর্বিংশতি তত্ত্বের উৎপত্তি সম্বন্ধে সাংখ্যশাস্ত্রে যাহা কথিত আছে তাহা এই:—প্রকৃতি হইতে বুদ্ধিতত্ত্বের উৎপত্তি, বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে অহংকার তত্ত্বের জন্ম, এবং এই অহংকার তত্ত্ব হইতে অপর তত্ত্ব সকল উদ্ভূত হয়। সাংখ্য দর্শনের এই কথা গুলির প্রকৃত উপলব্ধির নামই তত্ত্বজ্ঞান। আমি করি—আমি ভাবি,—এই যে আমি—কর্ত্তা পদার্থ—ইহার নাম অহংকার। আমার এই স্থূল দেহ নাশ হইলেও, আমার এই অহংকারের নাশ হয় না,

সুতরাং এই স্থূলদেহের জননী অহংকারের জননী নহে। সাংখ্য দর্শন বলেন, বুদ্ধিতত্ত্বই অহংকার তত্ত্বের জননী এবং এই বুদ্ধিতত্ত্ব এক ও মহান। মহাদেবী উমা যোগ অবলম্বন এই বুদ্ধিতত্ত্বে লীনা; তাই তিনি জানেন যে তিনিই সকল জীবের জননী। কারণ সকল ভিন্ন ভিন্ন জীবই একটী একটী অহংকার অণু আশ্রয়ে পৃথক পৃথক জীবরূপে আপনাদিগকে বুঝিয়া থাকে। আমি একটী অহংকার তত্ত্বের অণু এই জ্ঞানটি জন্মাইলে, বুদ্ধিযোগযুক্তা উমা যে আমাদের সকলের জননী, এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়।

অন্তর্দৃষ্টি গ্রাহ্য একটি বিশ্বব্যাপী জ্যোতি আছে উহার নাম বুদ্ধিতত্ত্ব; যিনি আপনার লিঙ্গ শরীর এই বিশ্বব্যাপী জ্যোতির শরীরে ভাসমান দেখিতে পান, তিনি বুদ্ধিতত্ত্বে যুক্ত। যিনি এই বুদ্ধিতত্ত্বে যুক্ত, তিনি এই বিশ্বব্যাপী জ্যোতিকেই আপনার দেহ স্বরূপ দেখিয়া থাকেন; এবং যাবতীয় জীবের হৃদয় পুণ্ডরীক মধ্যস্থ অহংকার বিন্দু গুলিকে আপনার সন্তান স্বরূপ দেখিয়া এক মহা করুণাভাবে ভাবিত হইয়া থাকেন। মহাযোগীর চিত্ত স্বরূপিণী মহাযোগিনী উমা—এই বুদ্ধিতত্ত্বে যুক্তা; তাই তিনি জানেন যে সমস্ত জীবই তাঁহার সন্তান: তাই তাঁহাকে যে মা বলিয়া ডাকে, তিনি তাহাকে করুণা দান করেন।

মহাদেবী উমা—পুরাকালে ছিলেন এবং শঙ্করের সহিত তাঁহার মিলন সম্বন্ধীয় কিম্বদন্তী সত্য হইলেও, এখন যে তাঁহারা হিমালয়ে বাস করেন এ কথা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি? এই প্রশ্ন হয় ত অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। আমাদের দর্শন শাস্ত্র হইতে ইহার উত্তর পাইব। লিঙ্গ শরীর কল্পান্ত স্থায়ী। হর পার্ব্বতী উভয়ে একত্র মিলিত হইয়া, জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গরূপে উচ্চ কৈলাস শৃঙ্গে বাস করিতেছেন। তাঁহারা মানবের মঙ্গল জন্য, মানবগণকে পথ দেখাইবার জন্য ভূর্লোক ছাড়িয়া যান নাই; এইটুকু তাঁহাদের মহা করুণা। মহাদেব মহাদেবীর সহিত মিলিত হইয়া সিদ্ধ পুরুষ ও মহর্ষিগণ বেষ্টিত হইয়া হিমালয়ে বাস করিতেছেন। এই বিদ্যাটুকু আমরা ভুলিয়া যাইতেছিলাম, তাই তাঁহাদেরই ইচ্ছাতে রুষিয়া হইতে একটী স্ত্রীলোক এবং আমেরিকা হইতে একটী পুরুষ এই ভারতবর্ষে আসিয়া এই বিদ্যা পুনঃ স্থাপন জন্য আমাদের পরাবিদ্যার্থী

সমিতি স্থাপন করিয়া, উভয়েরই এক্ষণে দেহত্যাগান্তে সেই হিমালয়ে চলিয়া গিয়াছেন। দেহত্যাগান্তে স্বর্গে যাওয়া দেবযান পন্থা; দেহ ত্যাগান্তে হিমালয়ে মহেশের পার্শ্বে যাওয়াই মহাযান পন্থা বা মহাপ্রস্থান! ইহাই আমাদের—পন্থা—পত্রিকার একাদশ বর্ষের প্রারম্ভে প্রথম কথা।

ভ্রাতৃগণ! মননৌকাকে ভক্তিরজ্জুর দ্বারা হিমালয়ের উচ্চশৃঙ্গে বাঁধি ফেলি চল; প্রলয়েও নৌকা ডুবিবে না। ওঁতৎসৎ।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

---

# আমাদের নূতন বৎসর।

আজ আমাদের পন্থা একাদশ বৎসরে পদার্পণ করিল। আশা করি এই বৎসরে তাহার বৈদিক দীক্ষা বা "সাবিত্রী" বিদ্যা লাভ ঘটিবে।

যখন পন্থা শিশু ছিল, তখন তাহার জন্য অনেক 'খেলনার' আবশ্যক ছিল। শিশু প্রথমে বিভিন্ন প্রকারের খেলনার দ্বারা অল্পে অল্পে জগৎ বুঝিতে পারে। সেই জন্যই প্রথম প্রথম অনেক "অলৌকিক ঘটনাবলী" প্রভৃতি গল্পাদির প্রাধান্য পন্থায় পরিলক্ষিত হইত।

পন্থা ও তাহার গ্রাহকগণ একই বস্তুর বিভিন্ন ভাব। পন্থা, গ্রাহকগণের উন্নতির সহিত উন্নত হইতেছে। গ্রাহকগণের মনের কথা প্রকাশ করে বলিয়াই—পন্থার অস্তিত্ব। সুতরাং পন্থার বয়োবৃদ্ধি ও জ্ঞানবৃদ্ধি গ্রাহকগণের জ্ঞানবৃদ্ধির ফল মাত্র।

পন্থা শৈশবাবস্থা অতিক্রম করিয়া সপ্তম বৎসরে গুরুগৃহে গমন করে; এবং "অনন্তরামের" নিকট পরাবিদ্যার "ক" "খ" শিখিতে আরম্ভ করে। এইরূপে ব্যক্ত ও কথঞ্চিৎ মায়িক ভাবে সে পরাবিদ্যার মূল ভাব গুলি অভ্যস্ত করিয়াছে। পরে হীরেন্দ্র বাবুর নিকট পন্থা দর্শন শিখিয়াছে।

এক্ষণে শুভ একাদশ বৎসরে, তাহার সাবিত্রী দীক্ষা। এই দীক্ষা দ্বারা পন্থা জগন্মাতাকে নূতন ভাবে দেখিতে শিখিবে। এতদিন গল্প উপদেশ—"অনন্তরামের উপদেশ" ও "পৌরাণিক কথার" ভিতর দিয়া শিশু পন্থা জগতের বাহ্য সপ্তব্যাহৃতী বা সপ্ত লোক বিভক্ত প্রকট মহাভাব

গুলি বুঝিতে পারিয়াছে। এক্ষণে তাহাকে, এই বিভিন্ন ভাব গুলিকে গায়িত্রী বিদ্যার দ্বারা একত্রীত করিয়া, তাঁহাদের পরস্পর বিরোধী ক্ষুদ্র ভাবগুলিকে মহাবিদ্যার সাহায্যে অনুস্যূত করিয়া, প্রকৃত বিদ্যালাভ* করিতে হইবে। এখন আর সূক্ষ্ম প্রভৃতি জগতে কেবল খেলা করিলে চলিবে না।

এই মহাবিদ্যা মহা সমন্বয়কারিণী শক্তি। সমন্বয় করিতে গেলে ব্যক্ত ও প্রকট ভাবের মোহ ত্যাগ করিতে হয়। ব্যক্তের মোহ ত্যাগ না করিলে, প্রকৃত বিদ্যা প্রকাশিত হন না। সেইজন্য, এইবার ব্যক্ত সপ্ত লোকের মায়া ও তাহাদের নাম রূপাদি ত্যাগ করিয়া সবিতার সদা স্বপ্রকাশ একরস বা পরমাজ্যোতির শরণাগতি আবশ্যক। আর খেলনার আস্বাদ করিলে চলিবে না,—আর বহির্মুখী হইয়া উচ্চতর সত্ত্বার মোহে ভাসিয়া গেলে চলিবে না। আর চৈতন্যের অতিরিক্ত বা প্রতিদ্বন্দ্বি ও প্রকাশকভাবে বিশিষ্ট বস্তু, ও এমন কি বিশিষ্ট গুরু ও ভগবদ্ভাবে, ডুবিয়া থাকিলে চলিবে না।

এক্ষণে বুঝিতে হইবে যে সবিতার বরণীয় ভর্গরূপা পরাবিদ্যা বাহিরের জ্যোতি নহেন। তাঁহাকে এইবার আমাদের ধী বা বুদ্ধিশক্তির ভিতর দিয়া প্রকটিতা একীকরণ-শক্তি বলিয়া দেখিতে হইবে।

কিন্তু পন্থার বড় বিপদ। যে ভাবগুলির সাহায্যে তাহার উন্নতি, এক্ষণে সেই বাহিরের ভাব বা সত্ত্বা ত্যাগ করিতে হইবে। আর সেই মহাবিদ্যাকে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ জগতের বিশিষ্ট বিদ্যা ও শক্তির সহিত মিলাইয়া দেখিলে চলিবে না। এইবার বুঝিতে হইবে যে, বিদ্যা ও অবিদ্যার প্রকাশ বস্তুর বাহিরের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। যতক্ষণ বাহিরের সত্ত্বার উপর থাকি ততক্ষণ আমরা বিদ্যা ও অবিদ্যার বশ। এক্ষণে বুঝিতে হইবে যে—

সর্ব্বস্য চাহংহৃদি সন্নিবিষ্টো-
মত্ত জ্ঞান স্মৃতি অপোহনঞ্চ।

এইবার বুঝিতে হইবে যে যিনি আমাদের ধীকে প্রেরণ করেন—তিনি নাম, রূপ এবং ব্যক্ত ভাবের অতীত। সমস্ত বিশিষ্ট বিদ্যা বা জ্ঞান তাঁহারই ভেদ মাত্র। তিনি কেবল বাহিরের পদার্থ নহেন।

লোকে, জীবনী ও মনন শক্তিকে আপনার বলিয়া জানে। তাহা হইলে, সমস্ত শক্তির মূলাধার আদ্যা শক্তিকে বাহিরের বলিয়া দেখিলে, সে দৃষ্টি ভ্রমদুষ্ট হইয়া যায়। উপনিষদে আছে যে দানবেরা, একে একে ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতি দুষ্ট করিল। দেবতারা ঐ ঐ ভাব সকল আশ্রয় করিলে, দানবেরা ঐ সকলকে কলুষিত করিল। কেবল মুখ্য প্রাণকে দুষ্ট করিতে পারিল না। মুখ্য প্রাণই আত্মার প্রজ্ঞাশক্তি। যাহা প্রজ্ঞা, তাহাই প্রাণ। এই প্রজ্ঞা বা প্রাণই আমাদের উমা মা। যে যে ভাব, অভিব্যক্তি বা ইন্দ্রিয়ে ভেদ জ্ঞানের লেশ মাত্র আছে, তাহাই দানবের দ্বারা দুষ্ট; তাহাই মায়িক এবং ভ্রম সঙ্কুল। অহংকারই ভ্রমের বা ভেদের মূল। মন প্রভৃতি অহঙ্কার প্রসূত। অহংকারই একসত্তাকে—ভিতরে জীব ও বাহিরে জগত এবং মধ্যে বিশিষ্ট ইন্দ্রিয় ও জ্ঞান শক্তিরূপে প্রকাশিত করে। সুতরাং যে বিদ্যায় বাহিরের জ্ঞান থাকে, যাহাতে একত্ব ভাব প্রকট হয় না—যাহার গতি পরম একতার দিকে নয়, সেই সমস্তই মায়া দানব দ্বারা কলুষিত। ধীমান ব্যক্তিগণ তাহাতে ভ্রমন করেন না। সাবিত্রী দীক্ষা অর্থে অহংকারের অতিরিক্ত একরস উপলব্ধি। তখন আর অহংকর্ত্তা জ্ঞান থাকিবে না। ক্ষুদ্র অহং কর্ত্তা জ্ঞানের ফল বাহ্য সংসার দৃষ্টি। এই কর্ত্তাজ্ঞান দূর হইলে, বাহ্য জগতের স্বাতন্ত্র দূর হইবে। এই বিরোধীভাব দূর হইলেই, একত্ব জ্ঞান বা মহাবিদ্যার আবির্ভাব হইবে।

এমন কি গুরু ও ভগবানকে, আর বাহিরের বস্তু বলিলে চলিবে না। এইবার গুরু আমাদের হৃদয়ে "আমাদের আমির" মধ্যে প্রবেশ করিবেন। এইবার ভগবান্ কেবল ধর্ম্মার্থকামের প্রদাতা ভাব ত্যাগ করিয়া "হৃদয়েশ্বর" রূপে দেখা দিবেন। হৃদয়ের ধনকে বাহিরে রাখিয়া—ভগবান গুরু ও মহামায়াকে মদ্বিপরীত মদতিরিক্ত সত্বা বলিয়া ভাবিলে কি সুখ হয়।

ভগবান, গুরু ও দেবীকে আপন কর; কেবল পোষাকী করিও না। তিনের সমন্বয়ে আপনাকে দেখ, এবং আপনাতে তিন ভাব প্রকটিত কর। তবেই ভ্রাতৃভাব—তবেই একতা—তবেই জ্ঞান। নচেৎ সাবিত্রী দীক্ষা হইল না।

পন্থা পরাবিদ্যা সমিতির প্রতিভ। পরাবিদ্যা সমিতিকে এইবার ব্যবহা-

বিক ভাব বা 'কূল' ত্যাগ কবিয়া—জাতি, কুল ও মান ত্যাগ করিয়া—প্রকৃত পথে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে। অনেকে মনে কবেন যে ব্যক্তিগত ভাবই আমাদের মূলভাব। অনেকে এই বা অন্য প্রকাব, স্থূল বা সূক্ষ্ম, ক্ষুদ্র বা মহৎ ব্যক্তিত্বের উপব পবাবিদ্যা সমিতিকে স্থাপন কবিতে যান। যে বিদ্যা ও ধর্ম্ম, এমন কি ব্যাসদেবও এক সময় বুঝিতে না পারিয়া ব্যাসকাশী স্থাপন কবেন—সেই বিদ্যা কেবল সমষ্টিভাবেরই দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে। ভগবান বলেন—

মদ্ভক্তা যত্র কীর্ত্তয়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি ভারতঃ।

ভগবান সমষ্টিভাবে স্বরূপে প্রকাশিত। তাহার কারণ ব্যক্তিগত ভাব মাত্রই অহংকার দুষ্ট। এইজন্য বৌদ্ধেরা "নমো সংঘায়" বলে। এই জন্যই তান্ত্রিক "চক্র," চৈতন্যদেবের "নিজজন" এবং খ্রীষ্টিয়ান Mysteries এর সৃষ্টি। সকল ব্যক্তভাবের কারণভূতা দেবীকে বা একত্বকে ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্ত জীবে আস্থা করে—সে ভ্রান্ত হইবেই হইবে; সে দানব দুষ্ট।

অতএব সাবিত্রী দীক্ষায় প্রধান গতি—সমষ্টিভূত ভ্রাতৃভাবে প্রকটিত ও অহংকার বা ব্যক্তভাবের অতীত, মহা বিদ্যার উপলব্ধি ও তাহাতে অবস্থিতি। সেই পরম একত্বে ব্যক্তভাবের পরিসমাপ্তি। ব্যক্ত ভাব বাস্তব নহে, উহা এই মহাভাব প্রকাশের জন্য।

যোগমায়ার করুণায় পন্থা ও পরাবিদ্যাসমিতির সাবিত্রী দীক্ষা সার্থক হউক! যেন উভয়ে একত্ববাচক অদ্বয় জ্ঞান বা মহাভাবময়ী পরাভক্তি লাভ করিয়া ব্যক্তকে অব্যক্তে সংযোজিত করিতে পারে। ওঁ শান্তি।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়।

---

# কাল।

( ১ )

যঃ সৃজ্যশক্তিমুরুধোচ্ছ্বসয়ন্ স্বশক্ত্যা
পুংসোঽভ্রমায় দিবি ধাবতি ভূতভেদঃ। শ্রীভাগবৎ ।৩।১১।১৪।

• যিনি সৃজ্যশক্তি বা সৃষ্টি বিষয়ের অনুসন্ধানরূপা শক্তিকে নিজ কালরূপ শক্তির

দ্বারা অনন্ত ভাবে প্রকট করিয়া পুরুষের অভ্রমের, বা মিথ্যাভূত বিশিষ্ট জ্ঞানের নাশ দ্বারা নিত্য সত্য জ্ঞান উৎপাদনের জন্য স্বর্গে ধাবমান। অর্থাৎ যিনি কাল শক্তি দ্বারা স্বীয় চৈতন্যের একাংশভূত বিশ্বভাব অনন্ত সংস্থানরূপে (Series) ব্যক্ত করিয়া,পুনরায় তদ্দ্বারা প্রকটিত মহান্ একত্ব বাচক ভাবের দ্বারা জীবের মিথ্যাভূত নাম-রূপাত্মক জগৎ জ্ঞান নিরাশ করেন, সেই মহাভূত বা একমাত্র সত্ত্বা দেবকে নমস্কার করি।

দেখিতে দেখিতে আর একটী সংবৎসর অতীতের গর্ভে লীন হইল। মানবের কত আশা, কত ভরসা, কত সুখ, কত দুঃখ, কত শোক, কত মোহ এই সঙ্গে ব্যক্ত স্থান হইতে অব্যক্ত মিলিতে চলিল। কাল! তোমার প্রতাপ কে সহ্য করিতে পারে? এই জন্যই বুঝি সাংখ্যাচার্য্য কালকে নমস্কার করিয়া গ্রন্থারম্ভ করেন। আমরাও সেই মত মহাকালকে নমস্কার করি।

এক্ষণে কাল অর্থে আমরা কি বুঝি এবং কালকে নমস্কার করি কেন? কাল কি? সাধারণতঃ কাল অর্থে ব্যক্ত ও মূর্ত্তভাবের ধ্বংসকারী শক্তি মাত্র বুঝায়। যথা—"কালঃক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুঃ।" "কালোহং জগদ্ভক্ষকঃ"। ভগবান্ বলিয়াছেন "কালোঽস্মি জগৎসংক্ষয়ে প্রবৃত্তঃ"। এই ত গেল এক কথা।

আবার যখন পুরাণ দেখি, তখন বুঝিতে পারি যে কালই ভগবানের প্রথম অভিব্যক্তি। এই শক্তিকে শ্রীমদ্ভাগবত "কালবৃত্ত্যাঃ" শব্দে ইঙ্গিত করিয়াছেন। এ অর্থে কাল "ভগবানের বিক্রম"।

আবার যখন প্রতীচ্য দর্শন খুলি, তখন দেখিতে পাই যে, যেমন দিক্ (Space) জ্ঞানে বাহিরের বস্তু সকল প্রকাশিত ও সমন্বিত, তদ্রূপ মনোরাজ্যে কালও বস্তুর বিশেষ ভাবের প্রকাশক ও সমন্বয়কারী অপূর্ব্ব শক্তি।

কাল সম্বন্ধে যে বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয় তাহার কারণ কি, বুঝিতে গেলে, কাল কি বুঝিতে হইবে। "কলয়তি ইতি কালঃ" যদ্দ্বারা কলন কার্য্য—যদ্দ্বারা বিভিন্ন বস্তু বা ভাব একীকৃত—হয় তাহাকে কাল বলা যায়। অপর পক্ষে যদ্দ্বারা এক বস্তুকে বাস্তবিক বিভিন্ন না করিয়া যেন বিভৃত করা যায়, তাহাকেও কাল বলা যায়। এক ধাতুর এই দুই প্রকারই অর্থ হইতে পারে।

একই বস্তু কি প্রকারে প্রকাশ ও বিনাশ করিতে পারে, তাহা আপাততঃ দুরূহ হইলেও বাস্তবিক পক্ষে কল্পনার অতীত নহে। এই তথ্য হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রের মূল ভিত্তি। জীবনী শক্তিই একমাত্র বস্তু; ও সেই শক্তি দ্বারাই উপাধির প্রকাশ বা বিনাশ সাধিত হয়। সূর্য্যদেবের কিরণমালা রোগাদি বিনাশ করে; আবার সেই রশ্মিজালের শক্তি হইতেই মহামারীর কারণভূত অনু ( Microbes ) সকল জন্মিতে পারে। জীবের শক্তিই দেহ ধারণের কারণ; এবং যখন এই শক্তি পুনরায় বহির্মুখী ভাব ত্যাগ করতঃ স্বস্থানে যাইতে প্রবৃত্ত হয়, তখনই দেহের পতন হয়। প্রকাশ বা প্রবৃত্তি, এবং বিনাশ বা নিবৃত্তি—একই শক্তির ভাবান্তর মাত্র।

আমরা কালের প্রকাশ ভাব প্রথমে আলোচনা করিব। ভাগবতে আছে—

"এবং কালোঽপ্যনুমিতঃ সৌক্ষ্ম্যে স্থৌল্যে চ সত্তম।
সংস্থানভুক্ত্যা ভগবানব্যক্তো ব্যক্তভুগ্ বিভুঃ॥"
স কালঃ পরমাণুর্বৈ যো ভুঙ্‌ক্তে পরমাণুতাম্।
সতোঽবিশেষভুগ্ যস্তু স কালঃ পরমো মহান্॥৩।১১।২—৩॥

অর্থাৎ "স্বয়ং অব্যক্ত ভগবান্—অথচ বিভু এবং ব্যক্তভুক্, সংস্থান ভোগের জন্য সূক্ষ্মে ও স্থূলে কালরূপে অনুমিত হন। যে কাল পরমাণু-ভোগ করে তাহা সূক্ষ্ম বা "পরমাণুকাল" এবং যে কাল অবিশেষ অবস্থা ভোগ করে তাঁহাকে পরম মহান্ বলা হয়।" আমরা প্রথমে এই শ্লোক দুইটীর মর্ম্মোদঘাটনে চেষ্টা করিব। প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামী কাল যে ভগবানের শক্তি ইহা কোথা হইতে আনিলেন তাহা বলা যায় না। সত্য বটে ভাগবতের অন্যাংশে কালকে "কালবৃত্তি" ও "ভগবানের বিক্রম" বলিয়া অভিহিত করা হয়। কিন্তু এ স্থলে সে অর্থ না গ্রহণ করিলেও ক্ষতি না হইয়া, বরং ভাল হইতে পারে।

এক্ষণে মোটামুটি ভাবে শ্লোকের অর্থ করিলে কি বুঝা যায়, তাহা দেখা যাউক। প্রথমতঃ ইহা বুঝা যায় যে, ব্যক্ত নামরূপ প্রপঞ্চের অতীত ভগবান্ স্বরূপতঃ অব্যক্ত। যখন তিনি বিভু বা প্রকাশিত হন, তখন তাঁহাকে ব্যক্তভুক্ বলা যায়। ব্যক্তভুক্ শব্দের দুইটী অর্থ। একভাবে দেখিলে যাহার দ্বারা ব্যক্ত ভাব সকল ভুক্ত ( Assimilated ) অর্থাৎ

একত্রে পরিণত হয়, তাহাকে ব্যক্তভুক্ বলা যাইতে পারে। অন্যার্থে ব্যক্তভুক্ শব্দে ব্যক্ত পদার্থের ভিতর দিয়া অনুস্যূত ও তদ্দ্বারা অভিব্যক্ত বা প্রকটিত মহত্তর ভাবও বুঝাইতে পারে। শেষোক্ত অর্থটী একেবারে অসঙ্গত নহে। কারণ উদ্ধৃত শ্লোকের আর একটী শব্দও এই ভাবটী প্রকাশ করিতেছে। "সংস্থান ভুক্তা" শব্দটীর অর্থ কি? সাধারণতঃ "সংস্থান" শব্দে ভাষ্যকারগণ ব্যাপ্তি অর্থ লইয়া থাকেন। কিন্তু সংস্থান শব্দের আর একটী অর্থ সমষ্টি। ইংরেজীতে যাহাকে Series বলে, তাহাও সংস্থান শব্দ বাচ্য। যদ্দ্বারা একই ব্রহ্ম বিভিন্নরূপে প্রকটিত হয় এবং এই ব্যক্ত ভাবের সংস্থান দ্বারা অপেক্ষাকৃত মহত্তর একতা ভাবকে প্রকটিত করে তাহাই Series বা "সংস্থান" শব্দবাচ্য। মনে করুন একটী সংস্থান এইরূপে আছে; ক = খ + গ + ঘ + ‥ ‥‥ এক্ষণে "ক"কে ব্যক্ত ভাবে দেখিলে অন্যান্য বস্তু হইতে ভেদভাবে অতিরিক্ত বিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়। "ক" "খ" নহে; 'খ' "গ" নহে॥ কিন্তু সংস্থানটীর দিকে চাহিলে আমরা আর একটী ভাব বুঝিতে পারি। "ক" "খ" "গ" প্রভৃতি ভাব গুলিকে সংযোগ করিয়া, তাহাদের মধ্যে সদা অনুস্যূত হইয়া তাহাদের সমষ্টি ভাবের মধ্যে ইঙ্গিতে প্রকটিত একত্ব জ্ঞানকে "ক" বলিয়া জানিতে পারি। এ ভাবে ভেদ নাই; এ ভাবের গতি মহান ব্যক্তাতিরিক্ত একত্বের দিকে।

এক্ষণে প্রথম শ্লোকটির স্থূল ভাবার্থ গ্রহণে বুঝা যায় যে সূক্ষ্ম ও স্থূল কাল পরমাণুর সূক্ষ্মতা ও স্থূলতা নিবন্ধন অভিব্যক্ত হয়। অর্থাৎ কালের পরিমাণ পরমাণুর ব্যাপ্তির উপর নির্ভর করে। এ কথাটী যে কতদূর সত্য তাহা প্রতীচ্য জড়বিজ্ঞান দিন দিন প্রমাণিত করিতেছে। যে তথ্যটীর অবিষ্কার করিতে ইউরোপ খণ্ডের এতদিন লাগিয়াছে, সেই তথ্যটী যে আর্য্য ঋষিগণের নিকট সুপরিচিত ছিল, তাহা এই শ্লোকই প্রতিপাদন করিতেছে। আধুনিক বিজ্ঞানাভিমানী ব্যক্তিগণ পুরাণাদি শাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা না করিয়া, তাহা শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করিলে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তাঁহারা নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার এবং পুরাতন তথ্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই।

ইংরেজী বিজ্ঞান শাস্ত্রে শক্তির প্রকাশ বা কার্য্যকে Work বলে

এই কার্য্যের পরিমাণ বস্তুর density বা ঘনত্ব এবং Time বা সময়ের উপর নির্ভর করে। তাহা হইলেই বুঝা গেল যে কালের পরিমাণ ও বস্তুর ঘনত্ব বা সূক্ষ্মত্ব ও তাহার কার্য্য বা প্রকাশ ভাবের নির্ভর করে। বস্তু সূক্ষ্ম হইলে এবং কার্য্য বা সংস্থান একই থাকিলে, কাজে কাজেই সময়ের জ্ঞান বা পরিমাণ বাড়িয়া যায়।

মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে দেখা যায় যে স্বপ্নাবস্থায় উদ্ভাসিত ঘটনাবলী যে, কালে প্রকাশিত হয়, তাহার পরিমাণ অন্য প্রকার। স্থূল এক সেকেণ্ডে যতটুকু কার্য্য করা যায় তাহা হইতে আমাদের কালের স্থূল মাত্রা বা unit জ্ঞান জন্মে। আবার দেখা যায় যে স্বপ্নাবস্থায় সময়ের মাত্রা অন্য প্রকার। স্থূল এক সেকেণ্ড সময়ের মধ্যে স্বপ্নজীবনের দশ বৎসর-ব্যাপী ঘটনাবলী ও সংঘটিত হইতে পারে এরূপ ঘটনা বিরল নহে।

অতএব বুঝা যায় যে সংস্থান ভোগ বা কার্য্যই কাল জ্ঞানকে, পরিমিত বা লক্ষিত করে। সেই জন্য দুঃখের নিশি যেন কখনও পোহাইবে না, বলিয়া বোধ হয়। দুঃখ চৈতন্যের উপর গুরুভার দেয়, বলিয়াই এইরূপ বোধ হয়।

আর একভাবে এই বিষয়টী দেখা যাউক। মনোমধ্যে এক মুহূর্ত্তে যে সংকল্প উদয় হয়, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে গেলে অনেক সময়েই এক জীবনও পর্য্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয় না। পুনর্জন্মতত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায় যে এক মুহূর্ত্তের চিন্তা বহু জন্মেও স্থূল কার্য্যরূপে প্রকাশিত হইতে পারে না। তাহার কারণ কি? মনোরাজ্য সূক্ষ্মতর উপাদানে গঠিত। বিশেষে সংকল্প মাত্রেই কার্য্য হয়। সুতরাং সেই আত্ম-সংকল্পে মনোময় সংস্থান ভোগের দ্বারা অনুমিত কালও সূক্ষ্মমাত্রাক্রান্ত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু সেই সংকল্পকে জড় জগতে প্রকাশ করিতে গেলে প্রথমত বস্তুর গুরুত্ব বা চৈতন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব বেশী পরিমাণে অতিক্রম করিতে হয়। সেই জন্য Bible আছে "By taking thought you cannot add an inch to your stature" তুমি চিন্তা করিলে ও তোমার স্থূল শরীরকে এক ইঞ্চি পরিমাণে বর্দ্ধিত করিতে পার না। কোন স্থূল বস্তু লইয়া কার্য্য করিতে গেলে, প্রথমতঃ তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা Inertia ভাব অতিক্রম করিতে হয়। এবং সেইজন্য তৎপরিমাণে শক্তি ত্যাগ করিতে

হয়। এই শক্তি ও জড় এই দুই ভাবদ্বারা আমাদের সময়ের জ্ঞান নিয়মিত হয়। অর্থাৎ শক্তি একভাবে থাকিলে সময়-জ্ঞান বস্তুর জড়ত্ব ও ঘনত্বের উপর নির্ভর করে। একটী চিন্তাকে কার্য্যে পরিণত করিতে গেলে সময় জ্ঞান বড় হইয়া দাঁড়ায়, এবং আমরা মনে করি যে কার্য্যটী করিতে গেলে যেন আমাদের এক বৎসর লাগিল। এই জন্যই শাস্ত্রে আছে যে ব্রহ্মার একদিনে মানবের বা চৈতন্যের, স্থূলাবস্থার পরিমাণে বহুলক্ষ বৎসর ব্যাপিয়া যায়। "সংস্থান ভোগ" শব্দে কার্য্য ভাব প্রকাশ হইলে সময়ের মাত্রা বড় হয়। আবার কার্য্যভাব ত্যাগ করিয়া ভাবাংশে অবস্থান করিলে সময়ের মাত্রা ছোট হইয়া যায়। তাহার কারণ এই যে, কার্য্যে চৈতন্য ও জড়ের যেরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা লক্ষিত হয়, কিন্তু ভাবে তাহা নহে। এক খণ্ড প্রস্তরের সহিত যতই যুঝি না, কেন তাহার বিরোধী ভাবটী যায় না। কিন্তু প্রস্তর "জ্ঞানে" আর বিরোধী ভাব নাই। জ্ঞানের এইটিই মহতী শক্তি। জ্ঞানে আত্ম ও অনাত্ম ভাব যত শীঘ্র একীকৃত হয়, কর্ম্মে তদ্রূপ হয় না; এমন কি সমস্ত কর্ম্মের পরিশেষ এবং গতিই জ্ঞান। একটী বস্তু কি তাহা বুঝিতে পারি না বলিয়াই আমরা নানা ভাবে, নানা অবস্থায় তাহার প্রতি ক্রিয়াশক্তির প্রয়োগ করি। এরূপ নানা প্রকার কর্ম্ম দ্বারা অল্পে অল্পে জ্ঞান লাভ হয়। সে যাহা হউক এক্ষণে বুঝা গেল যে বস্তুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভাবটী যতই বাড়িয়া যায়, ততই তাহার ক্রিয়ার সংস্থান বা series বাড়িয়া যায়। এই সংস্থানের ভিতর দিয়া অভিব্যক্ত ভাবটীর নাম কাল। সুতরাং সংস্থানটী স্থূল হইলে বা কেবল স্থূল বস্তু দ্বারা পরিলক্ষিত হইলে, কালের মাত্রাও স্থূল হইয়া যায়। Dynamics শাস্ত্রে কালের যে সামান্য ভাব প্রকাশিত আছে, হিন্দু শাস্ত্রে সেই ভাবের যে কত উপরে উঠিতে পারিয়াছে, তাহা এই দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। কিন্তু ইহা আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে কাল কি পদার্থ তাহা বুঝা গেল না। কেবল তাহার ভাবমাত্র বস্তুর সংস্থান ভোগে অনুমিত হয়।

কালের আর একটী ভাব আছে। সেই ভাবটীকে ভাগবত "ব্যক্ত ভুক্" শব্দে ইঙ্গিত করিয়াছে। সাধারণতঃ এই শব্দে ব্যক্ত বা প্রকৃষ্ট ভাবে প্রকট ( objective ) সুতরাং অন্যান্য পদার্থের সহিত ভেদ ভাবে ব্যবস্থিত, বস্তুর

ভেদাত্মক স্বাতন্ত্র ভাবের (Separative objectivity) লয়কারী শক্তি বুঝায়। যাহা কিছু মূর্ত্ত ও নামরূপের ভেদাত্মক ভাবে প্রকাশিত, তাহা কালের প্রভাবে পুনরায় অব্যক্তে লীন হয়। সেই জন্য গীতা বলেন—'অব্যক্তাদিনী ভূতানি ব্যক্ত মধ্যানি ভারত, অব্যক্তা নিধনান্যেব'—ভূত সকলের আদিতে অব্যক্ত বা অপ্রকাশ ভাব, মধ্যে ব্যক্ত, এবং শেষে পুনরায় আবার অব্যক্ত ভাব। এই ভাবে অর্থ করিলে কাল অর্থে বুঝা গেল যে কাল অব্যক্ত ভগবানের শক্তি বিশেষ, এবং উহা ব্যক্ত মূর্ত্ত ভাবের ধ্বংশ বা লয়কারী শক্তি বিশেষ। এ কাল স্থূল ও সূক্ষ্ম পরমাণু ভোগ, বা স্থূল ও সূক্ষ্ম পরমাণু অতি-ক্রম করিতে গেলে প্রকাশিত হয়। আমরা দেখিয়াছি যে এই ভাবে গূঢ় বৈজ্ঞানিক রহস্য নিহিত আছে। তবে জড় বিজ্ঞান স্থূলের অতীত পরমাণু দেখিতে পায় না। সুতরাং জড় বিজ্ঞানে সূক্ষ্ম কালের কথাই নাই। যাঁহারা সূক্ষ্ম ভাবে অবস্থান করিতে পারেন, তাঁহারা কালের এই ভাব দেখিতে পান।

এই ভাবে দেখিলে কালের সংকলন শক্তি বড় ভয়ঙ্করী বলিয়া দেখায়। কিন্তু "কলন" শব্দে আর একটী ভাব উপলক্ষিত হয়। ব্যষ্টি অর্থ ব্যতীত সমষ্টিভাবে দেখিলে কাল শব্দে এক রহস্যময় অভিনব শক্তি বুঝায়। মনে করুন একটী সংস্থান বা Series আছে। উহার রূপ এই প্রকার :—

অ = ক + খ + গ + ঘ + ...... ।

এক্ষণে স্থূল ভাবে বুঝিতে গেলে ক, খ, গ, প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্ত ভাব গুলির সমষ্টিই "অ"। সেই সমষ্টিটী আমরা একেবারে বুঝিতে পারিনা বলিয়া, প্রথমে 'ক' তৎপরে তাহাতে 'খ' যোগ করিয়া, তৎপরে তাহাতে 'গ' যোগ করিয়া এইরূপ ভাবে অল্পে অল্পে যথাসাধ্য বিশেষ ভাবগুলি যোগ করিয়া 'অ'এর মূল্য ও মান নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করি। ক হইতে 'খ'এ যাইতে গেলে যে সময় লাগে, তাহাই 'সংস্থানভুক্তা' কাল শব্দবাচ্য। কাল যে কি তাহা আমরা জানি না। তবে একটি বিশিষ্ট ব্যক্ত ভাবের পর, আর একটি বিশিষ্ট ব্যক্তভাব উদয় হইলে—এই দুইএর মধ্যস্থিত ব্যবধান জ্ঞানটী স্থূলজগতে Space বা দিক রূপে, এবং অন্তর্জগতে Time বা কালরূপে প্রতীত হয়। সুতরাং সংস্থান বা Series না থাকিলে কালের অনুমান হয় না। এই ভাবে দেখিলে "ব্যক্ত-ভুক" শব্দে ব্যক্তকে ভোগ বা ব্যাপ্তি করিয়া ঐ ব্যক্তকে অবিশেষ ভাবে সংহ-

নানে যে ভাব প্রকটিত হয়, তাহাই আমাদের কাল জ্ঞান। এ ভাবে দেখিলে, কাল আর ধ্বংসকারী শক্তি নহে। পরন্তু যদ্দ্বারা আমরা বিশিষ্ট ব্যক্ত ভাবের বিশিষ্টতা জ্ঞান উপলব্ধি করিতে পারি, সেই প্রকাশক ভাবকে কাল বলে। কাল স্বয়ং অব্যক্ত অর্থাৎ তাহার স্বরূপ কি তাহা আমরা জানি না। কিন্তু উহা বিশিষ্ট ব্যক্ত ভাবকে প্রকাশ করিয়া ও বিশিষ্ট ব্যক্ত ভাবকে প্রকাশের স্থান প্রদান করিয়া, সেই বিশিষ্টতার মধ্যে অনুস্যূত হইয়া আপনিও প্রকাশিত হয়। এই কালজ্ঞান না থাকিলে এক মুহূর্ত্তের সহিত অন্য মুহূর্ত্তের কোন সম্বন্ধ থাকিত না। সুতরাং প্রত্যেক মুহূর্ত্তে প্রকটিত ভাবগুলি পরস্পর বিশ্লিষ্ট হইয়া থাকিত, এবং সমষ্টি ও abstract বা অবিশেষ জ্ঞান কখনই জন্মিত না। এই ভাবে দেখিতে শিখিলে আর কালের প্রতাপে ভয় হয় না। কালকে আর প্রতিকূল শক্তি বলিয়া না দেখিয়া, মানব চৈতন্যের পরম হিতসাধক একীকরণ শক্তি বলিয়া দেখা যায়। আমি যে ভাবেই থাকি না কেন, কাল আমার বিচ্ছিন্ন ভাব গুলিকে একীকৃত করিয়া দেয়, এবং তদ্দ্বারা আমার মহত্তর অস্তিত্ব অনুভূত হয়। "আমি যে এক" এই জ্ঞানটী কালের প্রকাশক ও একীকরণ শক্তি দ্বারাই প্রতীত হইতে পারে। এই সংহনন শক্তি প্রকাশ হইতে গেলে ব্যক্ত বা মূর্ত্ত ভাবের লয় আবশ্যক। এই ভাবটী দেখিতে গেলে বিশিষ্ট ভাব সকলের মোহ ত্যাগ করিতে হইবে; বুঝিতে হইবে যে বিশিষ্ট ভাবের উপরে মহত্তর কোন এক ভাব আছে। বিশিষ্টতা আমার সাময়িক প্রকাশ মাত্র। উহাতে আমার সম্পূর্ণ অস্তিত্বের প্রকাশ হইতে পারে না। তাহা হইলেই কালকে আর ভয় করিতে হইবে না।

কিন্তু এই ভাবেও কালের স্বরূপ বুঝা গেল না। কাল যে স্বয়ং অব্যক্ত ভগবান, তাহা বুঝা গেল না। আমরা মুখে, ভগবানকে "মহাকাল" ও তাঁহার পরাশক্তিকে "মহাকালী" বলিয়া অভিহিত করি। যতক্ষণ আমরা ক্ষণিক জ্ঞানে আবদ্ধ, ততক্ষণ এই শক্তি প্রলয়ঙ্করী রূপে আমাদের হৃদয়ে দেখা দেন; কাজেই আমরা ভয়ে শিহরিয়া উঠি। যখন ক্ষণিক বিজ্ঞান বা ক্ষণিক মূর্ত্তভাব সকলে আমাদের বিশিষ্টতা স্থাপন করিতে না যাই,—যখন আমরা বুঝিতে পারি যে জীবের বিশিষ্টতা ব্যক্ত ভাবের উপর নির্ভর করে না, পরন্তু ঐ ভাব সকল কি এক অদ্ভুত প্রকারে জীবের সহিত সংবদ্ধ, এবং ঐ ব্যক্তভাব

গুলি জীবের দ্বারাই অনুপ্রাণীত ও নিয়ন্ত্রিত, তখন ব্যক্ত ভাবের ক্ষয় বা বৃদ্ধিতে জীবের কিছু যায় আসে না। এক কথায় 'বস্তুর" উপর অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য স্থাপন না করিয়া, বস্তু বা ভাব এবং আমার সহিত যে সম্বন্ধ আছে তাহার উপর অস্তিত্ব স্থাপন করিলে, আমার "আমি জ্ঞান" আর পরিচ্ছিন্ন বস্তুর উপর থাকে না। তখন "আমি" বিশিষ্ট ভাবের সমন্বয়কারী শক্তি ও জ্ঞানের উপর স্থাপিত হয়। "তখন আমি" কে ব্যক্তভুক বা ব্যক্তভোগে আবদ্ধ হইয়া, ব্যক্ত সংস্থান দ্বারা প্রকাশিত ও প্রত্যেক ব্যক্ত ভাবকে ধারণ করিয়া অবস্থিত এক প্রকার মহত্তত্ব ব্যক্ত ভুক্ চৈতন্যরূপে দেখা যায়। আমার আমি ব্যক্তাতীত না হইলে বিভিন্নজীবনে প্রকটিত বিশিষ্ট ব্যক্ত Personality বা অহংকার ভাবে কৃত পরস্পর বিরোধী ভাবগুলি যোগ করিতে পারিতাম না। কালই আমার মহত্তত্ব 'আমির'ত্ব প্রকাশিত অথচ সংযোগকারী শক্তি।

ইহার উপরে আর একটী ভাব আছে। সে ভাবটী বুঝিতে পারিলে কাল যে ভগবান তাহা বুঝিতে পারা যায়। একটি দৃষ্টান্ত লইয়া প্রথমে বিবেচনা করা যাউক। একই জীবনে 'আমি সুখী' 'আমি দুঃখী' 'আমি পাপী' 'আমি পুণ্যাত্মা' প্রভৃতি আপাততঃ বিরুদ্ধ ভাবাত্মক ব্যক্ত অবস্থা গুলি একীকৃত করিতে গেলে পাপ ও পুণ্য, সুখ ও দুঃখের অতীত মহত্তত্ব অস্তিত্ব প্রকাশিত হয়। যতক্ষণ আমরা এই বিশিষ্ট ভাব গুলিকে চৈতন্যের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক করিয়া রাখি ততক্ষণ আমরা ক্ষুদ্র। প্রায়ই মানব এই ভাব গুলিকে পৃথক করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। পাপী যখন ধর্ম্ম জীবন অবলম্বন করে, তখন সাধ্যমত অতীত পাপের জীবনকে যবনিকার অন্তরালে রাখিতে প্রয়াস করে। এমন কি বিদ্বান ব্যক্তিও এ সংসারে প্রকাশিত কীট পতঙ্গাদি অবস্থা গুলিকে আত্মার অতিরিক্ত ভাবে দেখিতে চেষ্টা করে। কীট জীবনতত্ত্ব অন্বেষণকারী বৈজ্ঞানিক স্বপ্নেও ভাবেন না যে, কীট ভাবটীও তাঁহারই ভাব। সুতরাং সে জিজ্ঞাসা বা চর্চ্চার ফলে যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহা জীবের ভিতর পূর্ণরূপে প্রবেশ করিতে করিতে পারে না; কেবল তাহার পোষাকরূপে ব্যবহৃত হয়। এই বিরুদ্ধ ভাবগুলিকে যোগ করিতে গেলে, কেবল 'দেশ' 'জাতি' 'গুণ' প্রভৃতি ভাবের সাহায্য লইলে চলিবেনা। দুইটী পদার্থ যোগ করিতে গেলে আমরা তাহাদের সমাস্তাংশ লইয়া যোগ করি। যে অংশে দুইটী

বস্তু এক ভাবাপন্ন, কেবল সেই অংশ লইয়াই যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ প্রভৃতি কার্য্যগুলি সাধিত হয়। মানব যত জ্ঞানে ক্রমোন্নতি লাভ করিতে থাকে, ততই তাহার বুদ্ধি অবয়বাদি সামান্যাংশ পরিত্যাগ করিয়া উত্তরোত্তর সমান ক্রিয়া, সমান জাতি, সমান স্বভাব প্রভৃতি ভাবগুলি দেখিতে শিখে।

কালের দ্বারা যে সংযোগ ক্রিয়া সাধিত হয়, তাহাতে নিশ্চয় কোন না কোন সামান্য ভাব আছে। তাহা না থাকিলে যোগ বা কলন কার্য্য সাধিত হইতে পারিত না। এই সামান্য ভাবটী কি? ভাগবতে বলে স্বয়ং অব্যক্ত ভগবানই এই সামান্যভাব। কালের সংযোগ ক্রিয়া বিশেষ রূপে দেখিতে গেলে বুঝা যায় যে ক্ষিতি হইতে অহংকার পর্য্যন্ত ব্যক্ত প্রাকৃতিক ভাবগুলি এই সংযোগ ব্যাপারে ডুবিয়া যায়। কালের সংযোগ শক্তির প্রতাপে মানব ও কি দেবতা ও পরমাণু, এমন কি ব্যক্ত ঈশ্বর ও জগত,—একীকৃত হয়। অর্থাৎ কাল যে সামান্যাংশ লইয়া ব্যক্তভাব সকলকে সমন্বয় করে তাহাতে প্রাকৃতিক গন্ধ নাই, তাহাতে প্রকাশ নাই। তাহাতে চিৎ ও জড়ের প্রভেদ নাই। শক্তি ও শক্তিমানের, বিদ্যা ও অবিদ্যার, জীব ও শিবের, বিশিষ্টতা ভাব অতিক্রম করিয়া যে মহত্তর আত্মা বিরাজমান আছেন সেই আত্ম-ভাবই কালের সামান্যাংশ। এক কথায় আত্মার অপ্রাকৃত ভাবই কালের যোগিনী শক্তি। সুতরাং কালই যে ভগবানের স্বরূপ ভাব,— ক্ষুদ্র চৈতন্যের ধ্বংসকারী মহান্ধকাররূপী যে ভগবানের প্রকৃতরূপ তাহা কথঞ্চিৎ বুঝা গেল।

ক্ষুদ্রকাল যেমন ব্যক্ত সংস্থান দ্বারা অনুমিত হয়, সেইরূপ সেই মহাকাল আত্মাকে জানিতে গেলে কোন পথে চলিতে হইবে? ব্যক্ত ভাব যতই উচ্চ হউক না কেন তদ্বারা আত্মার স্বরূপ সত্ত্বা অনুমিত হইতে পারে না। এই মহা বিশ্বধ্বংসকারিনী, ব্যক্ত ভাবের লয়কারিনী মহাশক্তিই ভগবানকে বুঝাইতে পারেন। এই মহা সংযোগ-শক্তিই সেই অপ্রাকৃত "ভীষণ ভীষণানাং" অথচ সমস্ত কাম ও জ্ঞানের পরিসমাপ্তি রূপ মদনমোহনকে দেখাইতে পারেন। সেই জন্যই গায়ত্রীর আরাধনা আবশ্যক। সেই জন্যই বোধ হয় ব্রজবালাগণ মহাকালীর শরণাগতি লাভে, সেই মহাশক্তির দ্বারা

বিরজার পারেস্থিত শ্যামসুন্দর মদনমোহনকে লাভ করিবার জন্য বলিয়াছিলেন—

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ॥

কিন্তু এই মহাকালীর আবাহন করিতে গেলে, তাহার পূর্ব্বে বাহিরের বিশিষ্টতা ত ত্যাগ করিতে হইবে, এমন কি ভিতরের বিশিষ্টতা বা জীবোপাধির মূলে যে "পশ্যন্তী বাক্" বা কালা-শক্তি আছে, যে বিশিষ্টতাকে আমরা Monad নামে অভিহিত করি—তাহাকেও সাদরে প্রেমময়ের প্রেমের উদ্দেশে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। আত্মার পরম ভাব কালের দ্বারা বুঝা যায় বলিয়াই, প্রজাপতির অন্য নাম "সম্বৎসর" ও পিতৃগণের অন্যনাম 'ঋতু,'। ভগবানের ব্যক্ত বিদ্যা ও অবিদ্যা ভাবের অন্য নাম উত্তরায়ণ ও 'দক্ষিণায়ন'। অতএব এই বৎসরের প্রারম্ভে আমরা সাধ্য মত প্রথমে কালের ব্যক্তভাব সামঞ্জস্যকারী শক্তি বা মায়িকভাব বুঝিতে চেষ্টা করিব। তৎপরে সেই কালের গায়িত্র্যাখ্য শক্তির সাহায্যে আত্মনিবেদন করিতে শিখিয়া কলাতীত পরমাত্মার ভাব যাহাতে হৃদয়ে কথঞ্চিৎ প্রকাশ হয়, সেই জন্য সেই ভাবে মহাকালীর আবাহন করিব। যেন তিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরণা করুন। তন্নোধীয়ো প্রচোদয়াৎ ওঁ।

( ক্রমশঃ ) স্বপ্নশীলস্য।

---

# চৈতন্যকথা।

## তত্ত্বমসি।

শঙ্করাচার্য্য যে অদ্বৈবাদ স্থাপন করিয়াছেন, তাহার মূল মন্ত্র তত্ত্বমসি। উপনিষদের তত্ত্ববাচক বাক্যগুলিকে শঙ্করাচার্য্য দুই ভাগে বিভাগ করিয়াছেন;—অবান্তর বাক্য ও মহাবাক্য। কেবল জীবতত্ত্ব বাচক কিম্বা কেবল ঈশ্বরতত্ত্ব বাচক যে বাক্য তাহা অবান্তর বা Subord'nate বাক্য। জীব ও ঈশ্বরের একত্ব বাচক যে বাক্য, তাহাই মহাবাক্য। মহাবাক্যের মধ্যে তত্ত্বমসি প্রধান।

শঙ্করাচার্য্য বলেন 'ত্বং' পদ জীব বাচক এবং 'তৎ' পদ ঈশ্বর বাচক। ঈশ্বর ও জীবে উপাধিগত ভেদ। জীবের ব্যষ্টি উপাধি ও ঈশ্বরের সমষ্টি উপাধি। "জহদজহৎ" লক্ষণা দ্বারা উপাধি ভাগ ত্যাগ করিয়া, কেবল সত্য ব্রহ্ম ভাগ গ্রহণ করিতে হইবে। উপাধিগত ভেদ কাল্পনিক বিবর্ত্ত। বস্তুতঃ জীব ও ঈশ্বর দুইই ব্রহ্ম। দুয়ে সম্পূর্ণ অভেদ। মহাবাক্য এই সর্ত্ত প্রতিপন্ন করিতেছে। সম্পদাদিরূপে হি ব্রহ্মাত্মৈকত্ব বিজ্ঞানেঽভ্যুপগম্যমানে 'তত্ত্বমসি' 'অহং ব্রহ্মাস্মি' 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' ইত্যেবমাদীনাং বাক্যানাং ব্রহ্মাত্মৈকত্ববস্তুপ্রতিপাদনপরঃ পদসমন্বয়ঃ পীড্যেত ১—১—৪ সূত্রের শাঙ্করভাষ্য।

"অল্পালম্বনতিরস্কারেণোৎকৃষ্ট বস্তুভেদজ্ঞানং সম্পৎ"। আনন্দগিরি।

অল্পমাত্র সাম্য অবলম্বন করিয়া একত্ব কল্পনাকে সম্পৎ বলে। যেমন বৃহদারণ্যকের "যথানন্তং বৈ মনোঽনন্তা বিশ্বেদেবা অনন্তমেব মতেন লোকং জয়তি" এই বাক্যে মন অনন্ত এবং বিশ্বদেব অনন্ত, কেবল এই অনন্ততা লইয়া সাম্য গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহা যথার্থ সাম্য নহে। ছান্দোগ্যে "মনোব্রহ্ম," "আদিত্যো ব্রহ্ম," এই সকল বাক্যে অধ্যাসগত সাম্য আছে। মনে ও আদিত্যে ব্রহ্মদৃষ্টির অধ্যাস করিতে হইবে। এ সাম্যও যথার্থ সাম্য নহে। তত্ত্বমস্যাদি বাক্যে এরূপ অর্থ পীড়িত; অর্থাৎ বলপূর্ব্বক এরূপ অর্থ করিতে হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথম পাদ চতুর্দ্দশ সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য আপন অভিপ্রায় স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি মোটামুটি দেওয়া হইল।

ছান্দোগ্য উপনিষদে নিম্নলিখিত শ্রুতি বাক্য আছে—

"যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভনং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্"।

হে সোম্য, এক মৃৎপিণ্ড জানিলেই, সকল মৃণ্ময় পদার্থ জানা যায়। যেহেতু মৃৎপিণ্ডজাত বস্তু সকল কেবল নামদ্বারাই ভিন্ন এবং সে নামের আরম্ভ বাক্যেই হয়। মৃত্তিকাই এক সত্য পদার্থ।

ঘট, শরাব, উদঞ্চনাদি পার্থিব পদার্থ সকলই মৃদাত্মক। ইহাদের ভেদ কেবল স্বতন্ত্র নাম হইতে। এই নাম কেবল বাক্য মাত্র। বস্তুতঃ কোন

ভেদ বা বিকার নাই। 'নতুবস্তুবৃত্তেন বিকারো নাম কশ্চিদস্তি।' নামরূপী পৃথক অস্তিত্ব অলীক। 'নামধেয়ং মাত্রং হ্যেতদনৃতম্' মৃত্তিকারূপ সত্তাই সত্তা। মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্।

ব্রহ্ম সম্বন্ধে ও ঠিক এইরূপ। প্রপঞ্চ মন্ত্রেরই ব্রহ্ম ব্যতিরেকে কোন স্ব তন্ত্র। অস্তি নাই "ব্রহ্মব্যতিরেকেণ কার্য্যজাতস্য অভাব।"

শ্রুতি সমূহ ও ইহার প্রতিপাদক। ইহা না করিলে, "এক জানিলেই সকল জ্ঞান হয়, ইহার কোন তাৎপর্য্য থাকে না। ঘট, করক ইত্যাদি অবচ্ছিন্ন আকাশ মহাকাশ হইতে ভিন্ন নহে। মৃগতৃষ্ণিকার জল উষর ভূমি হইতে ভিন্ন নহে। মরীচিকার জল দৃষ্টনষ্টস্বরূপ। ক্ষণে দেখা যায়, পরক্ষণে উহার স্বরূপ জানিলেই নষ্ট হয়। মরুভূমি হইতে স্বরূপতঃ মৃগ-তৃষ্ণিকার স্বতন্ত্র উপাখ্যা নাই। সেইরূপ ভোগ্য ভোক্তৃ আদি এই জগৎ প্রপ-ঞ্চের ব্রহ্ম ব্যতিরেকে সত্তার অভাব। যদি এ কথা বল যে ব্রহ্ম অনেকাত্মক। যেমন বৃক্ষ অনেক শাখা বিশিষ্ট, সেইরূপ ব্রহ্ম অনেক শক্তি ও প্রবৃত্তি যুক্ত। অতএব ব্রহ্মে একত্ব ও নানাত্ব উভয়ই সত্য। ব্রহ্মরূপে এক, শাখারূপে নানা। সমুদ্র এক হইয়াও যেন তরঙ্গাত্মক বলিয়া নানা। মৃত্তিকা এক, ঘট শরাবাদি নানা। একাত্মাংশে জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ ব্যবহার সিদ্ধ হয়। নানাত্ব অংশে লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার সিদ্ধ হয়। মৃদাদি দৃষ্টান্তও ইহার অনুরূপ।

এই পূর্ব্ব পক্ষ ভ্রমাত্মক। কারণ ছান্দোগ্য বাক্যে এক মাত্র মৃত্তিকাকে সত্য বলা হইয়াছে। অন্য বিকার জাত ( বাচারম্ভন ) মাত্র।

আবার "স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" এই বাক্যে শরীরী জীবের স্পষ্টই ব্রহ্মভাব উপদেশ করা হইয়াছে। শরীরীর ব্রহ্মাত্মকত্ব স্বয়ং প্রসিদ্ধ। যত্নান্তর সাধ্য নয়। যদি একবার স্বীকার কর, বেদে ব্রহ্মাত্মত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহা হইলে শারীরাত্মত্ব বা জীবত্ব আপনা হইতেই বাধিত হয়। সর্পাদি বুদ্ধি রজ্জ্বাদি বুদ্ধি দ্বারা বিনা যত্নেই বাধিত হয়।

শারীরাত্মত্ব বাধিত হইলেই তদাশ্রয় সমস্ত ব্যবহারও বাধিত হয়। আর এই ব্যবহার সিদ্ধি করিবার জন্যই তোমাকে নানাত্বাংশ অপর ব্রহ্মের কল্পনা করিতে হইতেছে।

বৃহদারণ্যকেও কথিত আছে "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূতৎ কেন কং পশ্যেৎ" যখন আত্মাই সকল, তখন সেই আত্মা কি প্রকারে কাহাকে দেখিবে।

ব্রহ্মাত্মদর্শীর প্রতি সমস্ত ক্রিয়া, কারক, ফল, লক্ষণ ও ব্যবহারের অভাব উপদিষ্ট হইয়াছে।

এ কথা বলাও সঙ্গত নহে যে এই ব্যবহারাভাব অবস্থা বিশেষে নিবদ্ধ। কারণ 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যে কোন অবস্থার প্রসঙ্গ নাই।

ছান্দোগ্যে তস্করের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলা হইয়াছে তস্কর যেমন তপ্ত পরশু গ্রহণ করিয়া মিথ্যা বলিলে দগ্ধ হয় এবং রাজা তাহার বন্ধন করেন, সেই রূপ যে অনৃতাভিসন্ধ তাহার বন্ধ হয় এবং সত্যাভিসন্ধ তাহার মোক্ষ হয় ইহা দ্বারা ও প্রতিপন্ন হইতেছে যে একত্বই এক পারমার্থিক সত্য। যদি একত্ব ও নানাত্ব দুই সত্য হইবে, তাহা হইলে উপনিষদে নানাত্ববাদীকে অনৃতাভিসন্ধ কেন বলিবে?

আবার বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিতেছেন 'মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।'

ঈশ্বরের সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্য বলেন 'এবং অবিদ্যাকৃত নামরূপোপাধ্যনুরোধীশ্বরো ভবতি।' ঈশ্বরের নামরূপ উপাধি অবিদ্যাকৃত।

এই অর্থের বিরোধে রামানুজ স্বামী তত্ত্বমসি মহাবাক্যের নিম্ন লিখিত অর্থ করিয়াছেন।

"কেবল নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বিজ্ঞান হইতে অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়, এই কথা শ্রুতি সকল বলিয়াছেন। এই উক্তি অসৎ। 'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ' 'তমেব বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি,' 'নান্যঃ পন্থা অয়নায় বিদ্যতে' 'সর্ব্বে নিমেষা জজ্ঞিরে,' বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি 'ন তস্যেশে কশ্চন তস্য নাম মহদ্যশঃ' 'য এবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি' ইত্যাদি অনেক শ্রুতি বাক্য পূর্ব্বে উল্লিখিত উক্তির বিরুদ্ধ। ব্রহ্ম সবিশেষ। এই জন্য শ্রুতি বাক্য সকল সবিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই মোক্ষের কথা বলে। শোধক বাক্য সকলও সবিশেষ ব্রহ্ম প্রতিপাদন করে। তত্ত্বমস্যাদি বাক্যের সমানাধিকরণতা নির্বিশেষ ব্রহ্মপর নহে। 'তৎ' ও 'ত্বং' উভয় পদই সবিশেষ ব্রহ্ম বাচক।

'তৎ' পদ সর্ব্বজ্ঞ সত্যসঙ্কল্প, জগৎকারণ ব্রহ্মকেই উল্লেখ করে। ছান্দোগ্য উপনিষদের ঐ প্রকরণেই "তদৈক্ষত বহুস্যাম্" ইত্যাদি বাক্যে সবিশেষ ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে। 'ত্বং' পদ 'তৎ' পদের সমানাধিকরণ। 'ত্বং' পদ অচিদ্বিশিষ্ট জীবৎ-শরীরক পরব্রহ্মকে প্রতিপাদন করে। যখন এক বস্তু দুই প্রকারে অবস্থিত হয়, তখন প্রকার দ্বয়ের বস্তু সামান্য দেখানই সমানাধিকরণের কার্য্য ... ... ... ... ...

প্রকরণের আরম্ভেই 'তদৈক্ষত বহুস্যাম' বলা হইয়াছে। তৎ, ত্বং বস্তুতঃ এক বলিলে এই বাক্যের বিরোধ হয়। একের বিজ্ঞানে সকলের বিজ্ঞানই বা তাহা হইলে কিরূপে ঘটে। জ্ঞান স্বরূপ, নিরস্তনিখিলদোষ, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের অজ্ঞানই বা কিরূপে সম্ভবে? ... ... ...

'তৎ' ও 'ত্বং' এই পদদ্বয়ের মুখ্যবৃত্তি এই যে জগৎ কারণ ব্রহ্মের (তৎ পদ বাচ্যের) জীব (ত্বং পদ বাচ্য) শরীর। বস্তু এক, কিন্তু দুই প্রকার। এই অর্থে সমানাধিকরণতা সিদ্ধ হয় এবং নিরস্ত নিখিল দোষ, সমস্ত কল্যাণ গুণাত্মক ব্রহ্মের জীবান্তর্যামিত্ব ও প্রতিপাদিত হয়। এই অর্থে প্রকরণের প্রারম্ভে যে উপদেশ আছে যে এক বিজ্ঞান দ্বারা সর্ব্ব বিজ্ঞান হয় তাহাও সিদ্ধ হয়। কারণ সূক্ষ্ম চিৎ ও অচিৎ শরীর বিশিষ্ট ব্রহ্ম, স্থূল চিৎ ও অচিৎ শরীর বিশিষ্ট কার্য্য ব্রহ্মে পরিণত হয়। শ্রীভাষ্যের উপক্রমণিকা।

রামানুজ জীবকে ব্রহ্মের শরীর বলিয়াছেন। ব্রহ্মের অন্য শরীর অচিৎ। শরীর ও শরীরীর যেরূপ সম্বন্ধ, জীবও ব্রহ্মের সেইরূপ সম্বন্ধ।

মধ্বাচার্য্য সমানাধিকারণের নিকটেও যান্ নাই। তাঁহার মতে তত্ত্বমসি'র অর্থ 'তস্য ত্বং অসি'—জীব ব্রহ্মের দাস এবং ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মধ্বাচার্য্যের সাম্প্রদায়িক অর্থ চৈতন্যদেব গ্রহণ করেন নাই। সেই জন্য ভেদবাদের অর্থ লইয়া অর্থ লইয়া আমাদের প্রয়োজন নাই।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জীবকে পরা প্রকৃতি এবং অষ্টবিধ প্রকৃতিকে অপরা প্রকৃতি বলিয়াছেন। প্রকৃতি অর্থে মোটামুটি শরীর বুঝায় বটে। কিন্তু জীবকে প্রকৃতি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, 'যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ'। জীব শব্দের অর্থ প্রাণ। জীব প্রাণরূপী। এই প্রাণ জগৎকে ধারণ করিয়া

আছে। শরীর হইতে প্রাণ বাহির হইলেই জীব বাহির হইয়া যায়। সেই জীবকে ভগবান্ 'মমৈবাংশঃ" বলিয়াছেন। জীব ভগবানের অংশ। "জীব ভগবানের বীজ স্বরূপ। যেমন পিতার বীজ মাতার ক্ষেত্রে পতিত হইয়া গর্ভস্থ শিশুর আকারে পরিণত হয় পরে প্রসূত হইয়া একে একে পিতার স্বরূপ ধারণ করে, সেই রূপ জীবরূপী ভগবানের বীজ প্রকৃতির ক্ষেত্রে পতিত হইয়া লোক সকলের মধ্যে লালিত পালিত হইয়া ক্রমে ভগবানের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়।

মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহং।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত:॥
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥

জীবগুলি যেন Weismann সাহেবের Germ plasm। পুত্র যেমন কর্ম্ম অনুসারে পিতা হইতে ভিন্ন হয়, সেইরূপ জীব সকল কর্ম্ম অনুসারে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন হয়। ক্ষেত্র অনুসারেও ক্ষেত্রজ্ঞ বিভিন্ন শক্তি সম্পন্ন হয়।

যেরূপ জীবদেহে Germ plasm আছে, সেইরূপ প্রত্যেক জীবে জীবাত্মা আছে। এই জীবাত্মা অনুপ্রমাণ। সবিশেষ ব্রহ্ম মানিলে জীব সম্বন্ধে এই কথাগুলি মানিতে হয়।

জীব ও ঈশ্বরে অংশ অংশীর ভেদ, শরীর শরীরীর ভেদ নয়। অংশ ও অংশীর যে সমানাধিকারণতা, ত্বং ও তৎ পদের সেই সমানাধিকারণতা এই অর্থ গীতা সম্মত; চৈতন্য দেব এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন।

"এইত ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ।
চৌরাসি লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ।
কেশাগ্র শতেক ভাগ হন শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপে বিচারি। মধ্য ১৯
মায়ার যে দুই বৃত্তি মায়া আর প্রধান।
মায়া নিমিত্ত হেতু বিশ্বের প্রকৃতি উপাদান॥
সেই পুরুষ মায়া পানে করে অবধান।
প্রকৃতি ক্ষুভিত করি করেবীর্য্যাধান।

স্বাঙ্গ বিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি স্পর্শন।
জীবরূপ বীজ তাতে কৈল সমর্পণ। মধ্য ২০

রামানুজ ও মধ্যাচার্য্য "তত্ত্বমসি" পদের মুখ্যার্থ করিতে গিয়া গৌণার্থ করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের অর্থই মুখ্যার্থ। চৈতন্যদেবের অর্থও মুখ্যার্থ। যেমন শঙ্করাচার্য্যকে ব্যষ্টি, ও সমষ্টি উপাধি ত্যাগ করিতে হয়, সেইরূপ চৈতন্য দেবকে অংশ ও অংশী উপাধি ত্যাগ করিতে হয়। বাস্তবিক ব্যষ্টি ও সমষ্টি এবং অংশ ও অংশীর অর্থ একই। ভেদ এই মাত্র শঙ্করাচার্য্যের উপাধি অসৎ; চৈতন্যদেবের উপাধি সৎ। এ ভেদ কেবল সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের ভেদ।

রামানুজ ও মধ্যাচার্য্য তত্ত্বমসি বিবাদে পড়িয়া যাহা করিতে পারেন নাই, চৈতন্য দেব তাহা করিয়াছিলেন। রামানুজ ও মধ্যাচার্য্য স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন যে 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য। এই জন্য ঐ বাক্যের অর্থ লইয়া তাঁহাদিগকে মারামারি করিতে হইয়াছিল এবং বোধ হয় এই উদ্যমে তাঁহারা কৃতকার্য্য হন্ নাই।

মহাপ্রভু দেখাইয়া দেন (আমার বিশ্বাসে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের পর একথা কেহই দেখাইতে সমর্থ হন্ নাই) যে 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য নহে। প্রণবই মহাবাক্য। তত্ত্বমসি কেবল প্রাসঙ্গিক একদেশ মাত্র। প্রণবে জীব আছে, ঈশ্বর আছে, ব্যষ্টি আছে, সমষ্টি আছে, জাগ্রৎ আছে, স্বপ্ন আছে, সুষুপ্তি আছে এবং তুরীয় আছে, তিন পাদ ও মাত্রা আছে এবং চতুর্থ পাদ অমাত্রও আছে। প্রণবে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন সকলই আছে। প্রণবে কর্ম্ম আছে, উপাসনা আছে ও জ্ঞান আছে। অনাদি কাল হইতে এই বাক্য চলিয়া আসিতেছে; এই প্রণবই সর্ব্ব বেদের বীজ। সেই প্রণব মহাবাক্য না হইয়া 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য কিরূপে হইতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং সযাতি পরমাং গতিম্॥

রামগীতায় আছে

পূর্ব্বং সমাধেরখিলং বিচিন্তয়ে
দোঙ্কার মাত্রং সচরাচরং জগৎ।

তদেব বাচ্যং প্রণবো হি বাচকো
বিভাব্যতেঽজ্ঞানবসায়বোধতঃ ॥

চৈতন্যদেব প্রকাশানন্দকে বলিয়াছিলেন,—

"প্রণব' সে মহাবাক্য বেদের নিদান।
ঈশ্বর স্বরূপ প্রনব সর্ব্ববিশ্ব ধাম ॥
সর্ব্বাশ্রিয় ঈশ্বরের প্রণব উদ্দেশ।
"তত্ত্বমসি" বাক্য হয় বেদের একদেশ ॥
প্রণবের মহাবাক্যতা করি আচ্ছাদন।
মহাবাক্য করি তত্ত্বমসির স্থাপন ॥
সর্ব্ববেদ সূত্রে কয়ে কৃষ্ণের অভিধান।
মুখ্য বৃত্তি ছাড়ি কৈল লক্ষণা ব্যাখ্যান ॥
স্বতঃপ্রমাণ বেদ, প্রমাণ শিরোমণি।
লক্ষণা হইলে স্বতঃ প্রমাণতা হানি ॥
এইমত প্রতি সূত্রে সহজার্থ ছাড়িয়া।
গৌন অর্থ ব্যাখ্যা কয়ে কল্পনা করিয়া।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচর্য্যকে মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,—

প্রণব যে মহাবাক্য ঈশ্বরের মূর্ত্তি।
প্রণব হইতে সর্ব্ববেদ জগত উৎপত্তি ॥
তত্ত্বমসি জীব হেতু প্রাদেশিক বাক্য।
প্রণব না মানি তারে কহে মহাবাক্য ॥

রামানুজের অসাধারণ প্রতিভা যাহা করিতে পারে নাই চৈতন্যদেবের দিব্যদৃষ্টি তাহা সহজে করিয়াছিল।

চৈতন্যদেব ব্যাকরণ অলঙ্কার ও কাব্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; তিনি দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই। তথাপি দার্শনিক সার্ব্বভৌমের গর্ব্ব তিনি হাঁসিতে হাঁসিতে চূর্ণ করিয়াছিলেন। পরম বৈদান্তিক প্রকাশানন্দ বিচারে তাঁহার নিকট পরাস্ত হইলেন।

মহাপ্রভু তাঁহার তত্ত্ব পাইলেন কোথায়? শ্রীকৃষ্ণ উপনিষদ সকল দোহন করিয়া যে গীতামৃতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, শঙ্করাচার্য্যের মায়া-

বাদে যে গীতার তত্ত্ব সকল আচ্ছন্ন হইয়াছিল;—পরমপণ্ডিত আচার্য্যগণ যে গীতার মর্ম্ম সম্পূর্ণ রূপে উদ্ধার করিতে সমর্থ হন নাই, মহাপ্রভু চৈতন্য দেব অবলীলা ক্রমে সেই মহৎ গীতামৃতের পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন; এবং সেই অর্থের পুনরুদ্ধার করিবা তিনি ব্যাস সূত্রের যথার্থ ভাষ্য আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্য দেব একদিনের জন্য বলেন নাই, যে তিনি যথার্থ ব্যাস ভাষ্যের উদ্ধার করিয়াছিলেন! তিনি বলিতেন শ্রীমদ্ভাগবত যাহা করিয়াছিল, তিনিও তাহাই করিয়াছিলেন তিনি নূতন কিছুই বলেন নাই। কিন্তু চৈতন্য দেবের মতে শ্রীমদ্ভাগবৎ যেমন ব্যাস সূত্রের ভাষ্য, সেইরূপ তাঁহার উক্তিও শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্য।

"প্রণবের যেই অর্থ গায়ত্রীতে সেই হয়।
সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবরিয়া কয়॥
ব্রহ্মাকে ঈশ্বর চতুঃশ্লোকীতে যে কহিল।
ব্রহ্মা নারদেরে সেই উপদেশ কৈল॥
সেই অর্থ নারদ ব্যাসদেবেরে কহিল।
শুনি বেদব্যাস মনে বিচার করিল॥
এই অর্থ আমার সূত্রের ব্যাখ্যারূপ।
শ্রীভাগবত করিব সূত্রের ভাষ্য স্বরূপ॥
চারি বেদ উপনিষদ যত কিছু হয়।
তার অর্থ লঞা ব্যাস করিল সঞ্চয়॥
যেই সূত্রে যেই ঋক্ বিষয় বচন।
ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোক নিবন্ধন॥

অতএব সূত্রের ভাষ্য শ্রীভাগবত। ভাগবত শ্লোক এবং উপনিষদের একই অর্থ। (ক্রমশঃ)

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

# হিন্দু দর্শন।

## ( লেখকের নিবেদন।

গত ফাল্গুন মাসের পন্থায় হিন্দু দর্শন শীর্ষক প্রবন্ধের নিম্নভাগে গ্রন্থের সম্পাদক মহাশয় যে সমস্ত ফুট্-নোট করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা অত্যাবশ্যকীয়। এই স্থানে অদ্য এই প্রস্তাব লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রথমতঃ সম্পাদক মহাশয় শ্রীভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকের মল্লিখিত বঙ্গানুবাদের প্রতিকূলে আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছেন। তিনি বলেন যে ঐ শ্লোকের অনুবাদে এইরূপ হওয়া উচিত।—

"তত্ত্ববিদ্ ব্যক্তিগণ অদ্বয় জ্ঞানকে এক তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করেন। ঐ জ্ঞানই ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ও ভগবান নামে অভিহিত হয়।" মল্লিখিত অনুবাদ এইরূপ!—"শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ বিশেষে তিন নাম ধারণ করেন। তিনি তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির নিকট অদ্বিতীয় অদ্বয় জ্ঞান ( বৌদ্ধগণের ন্যায় ক্ষণিক জ্ঞান নহেন )। বেদান্তজ্ঞেরা এই অদ্বয়জ্ঞানকে ব্রহ্ম বলেন। হিরণ্যগর্ভের উপাসকেরা পরমাত্মা বলেন। আর ভক্তেরা তাঁহাকে ভগবান্ বলেন।" মূল শ্লোকটী এই :—

"বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।।"

ভা· ১ম স্কন্ধ, ২অঃ ১১শ শ্লোক।

পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী উক্ত শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।—

"নমু তত্ত্বজিজ্ঞাসা নাম ধর্ম্মজিজ্ঞাসৈব ধর্ম্ম এক হি তত্ত্বমিতি কেচিৎ তত্রাহ বদন্তীতি। তত্ত্ববিদস্তু তদেব তত্ত্বং বদন্তি, কিং তৎ, যৎ জ্ঞানং নাম। অদ্বয়মিতি—ক্ষণিক জ্ঞান পক্ষং ব্যাবর্ত্তিতি *। নমু তত্ত্ববিদোঽপি বিগীতবচনা এব নৈবং তস্যৈব তত্ত্বস্য নামান্তরৈঃ অভিধানাৎ ইত্যাহ। ঔপনিষদৈঃ ব্রহ্মেতি, হৈরণ্যগর্ভৈঃ পরমাত্মেতি, সাত্বতৈঃ ভগবানিতি শব্দ্যতে অভিধীয়তে।'

---

* স্বামীর মতে সেই তত্ত্বই পরম অদ্বয় জ্ঞান। শ্রীরঃ—ব

বেদের অন্তভাগের নাম বেদান্ত বা উপনিষদ্, এই জন্য "ঔপনিষদৈঃ" এর অনুবাদে বেদান্তজ্ঞেয় লিখিয়াছি। অদ্বয় জ্ঞান বলিলে বৌদ্ধগণের ক্ষণিক জ্ঞান নিরস্ত হইতেছে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী উক্ত শ্লোকের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া উপসংহারে লিখিয়াছেন:—অপ্রাকৃতত্বেন চিন্মাত্রত্বাৎ তদ্রূপত্বং যদুক্তং বিষ্ণুপুরাণে। তথৈব দ্বিভুজত্ব চতুর্ভুজত্বাদি বিবিধ চিদ্ঘনাকারৈঃ বহিবস্তুবর্ত্তিত্বেহপি। স এবৈকো ভাতি। কিঞ্চ যস্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনমিতি, কৃষ্ণায় পরমাত্মনে ইতি। মদীয় মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতমিতি। অদ্বয়ত্বং পূর্ব্ববৎ শক্তিনাং চিদাদীনাং তদ্বিলাসানাং চ বৈকুণ্ঠাদীনাং তদভিন্নত্বমনানাং তত্তো ভিন্নত্বভাবনৈব অদ্বয়পদেন ব্যাবৃত্তা।

"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহং ইতি। বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্ন মেকাংশেন স্থিতো জগৎ ইত্যাদি বচনেভ্যস্তথা ভগবদুপাসকানাং মোক্ষপ্রাপ্তেবপি দর্শনাৎ। ব্রহ্মপরমাত্মোপাসকানাস্তু প্রেমপ্রাপ্তিঅদর্শনাৎ ভগবত এব ব্রহ্মত্বপরমাত্মত্বে ইত্যতো ভগবত্ত্বমেব মূলং ইতি দ্রষ্টব্যং। অত্র ব্রহ্মোপাসকেভ্যঃ জ্ঞানিভ্যঃ সকাশাৎ পরমাত্মোপাসকো যোগী শ্রেষ্ঠঃ। তেভ্যো যোগিভ্যোহপি ভগবদুপাসকঃ শ্রেষ্ঠঃ ইতি তারতম্যং গীতাসু দৃষ্টং। যথা।—

তপস্বিভ্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যোশ্চাধিকো যোগী তস্মাৎ যোগী ভবার্জ্জুন।।
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ।।

যোগিনামিতি পঞ্চম্যর্থে ষষ্ঠী শ্রীরামানুজাচার্য্যচরণৈঃ ব্যাখ্যাতেতি।।"

শ্রীবল্লভাচার্য্য একদিন শ্রীল মহাপ্রভু চৈতন্যদেবকে বলিয়াছিলেন, যে তিনি শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া ভাগবতের এক টীকা লিখিয়াছেন। তাহাতে মহাপ্রভু উত্তর দিয়াছিলেন যে "যে স্ত্রী স্বামীকে মানে না সে ভ্রষ্টা"। এই বচনানুসারে আমি ও আমার প্রিয়বন্ধু রাজেন্দ্রবাবুকে বলিতে পারি যে শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যা না মানিয়া "জ্ঞারবুদ্ধিতেও" অদ্বয় জ্ঞানের সহিত সঙ্গত হইতে পারিলে পরিণামফল একই দাঁড়াইবে।

শ্রীশুকদেব গোস্বামী রাজা পরীক্ষিতকে বলিয়াছিলেন—

"তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ॥" ভাঃ ১০।২৯।১০।

এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণই পরমাত্মা। সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন যে নারদ ঋষি একথা স্বীকার করেন না।

নারদ সূত্র নামক সুপ্রসিদ্ধ ভক্তিগ্রন্থে আছে:—"ওঁ যথা ব্রজগোপিকানাম্" ॥২১ সূত্র॥ অর্থাৎ যেমন ব্রজ গোপীগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্য কুল, মান, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, এমন কি সজ্জনোচিত পথ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগবর্ত্তী হইয়াছিলেন, সেইরূপ বিধিনিষেধের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ত্যাগ করিয়া ভগবানের একনিষ্ঠ ভজনই উত্তমা ভক্তি।

ব্রজ গোপিকাগণ শ্রীকৃষ্ণের পরিণতা পত্নী ছিলেন না; অন্ততঃ শ্রীভাগবতের কোথাও আমি পরিণয়ের কথা পাই নাই।

শ্রীভাগবতে পাওয়া যায় যে তীব্র বিরহের সময় * গোপীহৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা ও ঐশ্বর্য্য স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল। তজ্জন্য শ্রীনারদ পঞ্চরাত্র বলেন যে—

"হরিভক্তি মহাদেব্যাঃ সর্ব্বমুক্ত্যাদি সিদ্ধয়ঃ।
ভুক্তয়শ্চাদ্ভুতাঃ তস্যাঃ চেটিকাবৎ অনুব্রতাঃ॥"

মহামহিমময়ী হরিভক্তি উদিতা হইলে সর্ব্ব প্রকারের মুক্তি, সিদ্ধি, অদ্ভুত ভুক্তি, সমস্তই দাসীবৎ হরিভক্তির অনুগমন করে; তুচ্ছ জ্ঞানাদির ত কথাই নাই। ভক্তের নিকট ব্রহ্মজ্ঞান না চাহিতেই আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। ভক্তির চমৎকারিত্ব স্ফুরনের জন্য পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান স্বতঃই স্ফূর্ত্তি পায়। ভক্তিমতী গোপীকাগণের অন্তঃকরণে শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্মত্ব ও ভগবত্তা ও শ্রীকৃষ্ণের মহিমা স্বতঃই স্ফুরিত হইয়াছিল। মহাসিন্ধুবৎ ভক্তি সুখের নিকট ব্রহ্মজ্ঞানানন্দ জলবিন্দুবৎ অতি ক্ষুদ্র। গোপিকাগণের শ্রীকৃষ্ণবিরহ সূর্য্যতুল্য এবং শ্রীকৃষ্ণসহ মিলন চন্দ্রজ্যোৎস্না

---

* বিরহ কেন আসিল? বিরহ অর্থে বিচ্ছেদ। বিচ্ছেদ অর্থে বস্তুর সহিত সাময়িক সম্বন্ধচ্যুতি। যে আপনাকে মুক্ত বলিয়াই জানে, যে তাঁহাকে বিশিষ্ট অহংভাবের প্রতিমূর্ত্তি বিশিষ্ট ভাব বলিয়া জানে,—তাহারই বিরহ। কিন্তু বিরহে যে জ্ঞান হয় ঐ জ্ঞান মূর্চ্ছা নহে। পরম একত্ব জ্ঞানে জোয়ার নাই, ভাঁটা নাই। সেই জন্যই গীতা বলেন—তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্তো এক ভক্তি বিশিষ্যতে। এ কথাটা কি? শ্রীমাঃ—

তুল্য। বিরহ কোটিসূর্য্যের প্রভার ন্যায় সন্তাপ জন্মাইয়া শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য সম্বন্ধীয় সমস্ত গুণ প্রদ্যোতিত করে। মিলন, কোটিসুধাংশুর জ্যোৎস্নার ন্যায় আহ্লাদ জন্মাইয়া ভগবানে মাধুর্য্য গুণাবলিকে প্রদ্যোতিত করে, কিন্তু ঐশ্বর্য্যকে আবরণ করে। যেখানে মিলন ও ঐশ্বর্য্য স্ফূর্ত্তি পায়, সেখানে প্রেমের অপূর্ণত্ব জানিতে হইবে। ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণসহ মিলন সময়ে মান করিয়াছেন। বিরহের সময়ে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন। ভক্তি মহাদেবী, না চাহিলেও যেন সর্ব্বজ্ঞান, সর্ব্বৈশ্বর্য্য (১) দান করেন। শ্রীল রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও বলেন—"যে একবার কলিকাতা আসিতে পারে, সে সমস্তই দেখিতে পারে, ফল কথা আগে কলিকাতা আসা চাই। সেইরূপ যে ভক্তি যোগ অবলম্বন করে, ব্রহ্মজ্ঞান তাহার করতলগত ; ফলকথা আগে ভক্তি চাই।"

এই জন্য নারদসূত্রে আছে—

"ওঁ তদ্বিহীনং জারাণামিব" ॥ ২৩ ॥ (২)

"ওঁ নাস্ত্যেব তস্মিন্ তৎ সুখসুখিত্বং ॥ ২৪ ॥

গোপীগণের প্রেম, কাম নহে। নিজেন্দ্রিয় সুখবাঞ্ছার নাম কাম, ভগবানের সুখবাঞ্ছার নাম প্রেম। গোপীগণ কে ছিলেন! শ্রুতিচতুষ্টয় ও গোলোকধাম বাসিনী নিত্যদাম্পত্যে স্থিত গোপী কন্যকা গোপীজনবল্লভের সঙ্গছাড়া থাকিতে পারেন না। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণলীলা করণার্থে মায়া-মনুজ, ও গোপীগণ মায়ামনুজী। শ্রীকৃষ্ণ যদি ভগবান না হইতেন ও ব্রজগোপীকারা যদি সামান্যা নারী হইতেন, তাহা হইলে জারত্ব দোষ

---

(১) এই ভক্তির অর্থ কি? শারীর বুদ্ধির নাম ভক্তি নহে। ঐ বুদ্ধিতে জ্ঞান আসে না। আমাদের জীবনে দেখা যায়, যে আত্মীয় বিয়োগে দুঃখ ব্যতীত—ভগবদ্‌জ্ঞান হয় না। কেন? কারণ আমাদের প্রেম শারীর লালসা মাত্র,—ইহাতে ভোগ আছে, কিন্তু ত্যাগ নাই। সুতরাং নারদ ঋষি সত্যই বলেন যে গোপীদের প্রেমে শারীর জ্ঞান বা ভাব বা বুদ্ধি ছিল না। ঐ প্রেম কেবল স্থূল আসঙ্গ লিপ্সা নহে। গোপীদের মিলনও স্থূল শরীরের ব্যাপার নহে। শ্রীরঃ

(২) তাহা হইলে কি গোপীভক্তি প্রাকৃতিক স্ত্রী পুরুষ ভাবের সম্মিলন? অথচ এই প্রাকৃত ভাবটী আধুনিক ভক্তেরা একমনে প্রণিধানকরণ করিতেছেন। শ্রীরঃ

স্পর্শিত। শ্রীভারতীর উদ্ধৃত শ্লোকের "জারবুদ্ধি" অর্থে একনিষ্ঠ ভজন, বিধিমার্গের দ্বারা, বেদ স্মৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে। এক কথায় রাগানুগার ভক্তি, বৈধী ভক্তি নহে। দেবর্ষি নারদ ও শ্রীভাগবতের অন্যান্য স্থানে এইরূপ অর্থই করিয়াছেন। মল্লিখিত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলায় ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছি। এখানে প্রবন্ধ-বিস্তৃতির ভয়ে সংক্ষেপে এই মাত্র নিবেদন করিলাম।

রাজা পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করিলেন—

"কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং নতু ব্রহ্মতয়া মুনে।
গুণপ্রবাহোপরমস্তাসাং গুণধিয়াং কথং ॥"

অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে মুক্তি হয় না। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে আছে— "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"। গোপীগণের ব্রহ্মজ্ঞান ছিল না, সুতরাং তাহারা গুণময় দেহাংশ কিরূপে ত্যাগ করিল?

ইহার উত্তরে শ্রীশুকদেব বলেন যে বস্তু শক্তি বুদ্ধির অপেক্ষা করে না। না জানিয়া বিষপান করিলেও বিষের কার্য্য হয়।* শ্রীকৃষ্ণ অনাবৃত ব্রহ্ম। তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কর চরণ কেশ নখাগ্রে পর্য্যন্ত অনাচ্ছাদিত প্রকট ব্রহ্ম। সুতরাং তাঁহাকে শত্রুভাবেই হউক, মিত্রভাবেই হউক, একবার মাত্র কোন অঙ্গ বিশেষ স্পর্শ করা মাত্র জীবদেহের গুণময়াংশ চিৎবিভূতিতে পরিণত হয়। জীবমাত্রই ব্রহ্ম সত্য, কিন্তু জীব স্পর্শ করিলে মুক্তি হয় না, কারণ জীব মায়াচ্ছাদিত আবৃত ব্রহ্ম, জীবের ব্রহ্মত্ব স্পর্শ করিতে হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অনাবৃত ব্রহ্ম, তাঁহাকে স্পর্শ করিতে

---

* এই স্থানে দুইটী কথা বুঝিতে হইবে। বস্তুর শক্তি আছে সত্য, কিন্তু যখন আমরা তাহার ব্যক্তভাবে মগ্ন তখন ঐ শক্তির ক্রিয়া দেখা যায় না। প্রত্যেক জীবই ব্রহ্ম কিন্তু আমাদের প্রেমে ত ঈশ্বরভাব প্রতিভাত হয় না। তাহার কারণ আমরা বস্তুকে পরিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি। এই পরিচ্ছিন্ন ভাব দূর করিবার জন্য ভগবান গোপীগণের সহিত সূক্ষ্মশরীরে মিলিত হইতেন। সূক্ষ্মশরীরে লিঙ্গজ্ঞান ও স্থূলতা নাই। সেই এবং অন্যান্য উপায়ে গোপীগণের হৃদয়ে গুণাতীত ভাব প্রকট হইয়াছিল। শুধু স্থূলসঙ্গ লিপ্সায় যাই ভক্তি নহে।

জ্ঞানের আবশ্যকতা নাই, * কোনরূপে অমৃত সাগরের একবিন্দু অমৃত স্পর্শ করিতে পারিলেই অমৃতত্ব লাভ হয়।

আমার পরমবন্ধু রাজেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন যে "উত্তরটী ভাল বুঝা গেল না"। কেন, আমি ত পরের কয়েকটী শ্লোকই উদ্ধৃত করিয়াছি। ছাপার ভুল আছে, "প্রকট" স্থলে "অপ্রকট" ছাপা হইয়াছে। এই উত্তরটী বৈষ্ণব দর্শনের মেরুদণ্ড সদৃশ, আমি বৈষ্ণব দর্শনের বিস্তৃত ব্যাখ্যা কালীন—ইহার বিশদ উত্তর দিব। শ্রীকৃষ্ণ তত্বই এই যে—

"নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতোনৃপ,
অব্যয়স্য অপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ॥"

পরব্রহ্ম অব্যয়, অপ্রমেয়, নির্গুণ, অন্তর্যামী ভগবান্। সেই ভগবানের ব্যক্তি (Manifestation) অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তমগুণময়ী মায়ার রাজ্যে যে বহিস্ফুরণ বা প্রকট অবস্থা, তাহাই শ্রীকৃষ্ণরূপী মায়া মনুজ।

যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি,
তার শক্তি লোক দেখাইতে।
এই রূপ রতন, ভক্তগণের গূঢ় ধন,
প্রকট কৈল নিত্যলীলা হৈতে॥

আমি লিখিয়াছি যে—

"তখন ভক্ত আনন্দবাজারে, আনন্দধামে, আনন্দময় দেহে বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগ করিতে থাকেন" ইত্যাদি। এই স্থানে শ্রদ্ধেয় রাজেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন যে—"যে ভক্তিমার্গে এত আনন্দ উপভোগের স্পৃহা

---

* এ কথার উত্তর শ্রীভগবানই দিয়াছেন, "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।" গীতা। জ্ঞান ভিন্ন চৈতন্যের অতীত সংস্পর্শ স্বীকার করা যায় না—কারণ সমস্ত বস্তুই বাস্তবিক জ্ঞান মাত্র। "সর্ব্ব কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।" এই জ্ঞান বা পরা ভাব আনিবার জন্য শ্রীভগবান অলৌকিক লীলা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ঐ সকল লীলা দ্বারা গোপ গোপীগণ তাঁহাকে স্থূলাতীত পরম পদার্থ বলিয়া কথঞ্চিৎভাবেও জানিতে পারেন। তাহার পর ৺কাত্যায়নীর পূজা ও যোগমায়ার সাহায্যে একত্ব স্থাপন, তাহার পর অশরীরী রাসলীলা। রাসলীলা দ্বৈত মোহ ভ্রমটী ত্যাগ না করিলে বিষয়টী বুঝা যাইবে না। শ্রী রঃ—

থাকে, তাহা ভক্তি বলিয়া গণ্য করা যায় না। উহা অহৈতুকী ভক্তি নহে। ইহাই আধুনিক বৈষ্ণব ধর্ম্মের অবনতির চিহ্ন বলিয়া মনে হয়।”

এই স্থানে বন্ধুবরের এরূপ সন্দেহ হইল কেন? “এ সাগরে ডুবলে মরে না—এ যে অমৃতের সাগর। এ যে সচ্চিদানন্দ সাগর—এতে মরণের ভয় নাই—ঐ সাগর অমৃতের সাগর। যারা অজ্ঞান তারাই বলে যে ভক্তি ও প্রেমের বাড়াবাড়ি করতে নাই। ঈশ্বর প্রেমের কি বাড়াবাড়ি আছে? তাই তোমায় বলি” সচ্চিদানন্দ-সাগরে মগ্ন হও। মনে কর অমৃতের একটী কুণ্ড আছে। কোন রকমে এর অমৃত একটু মুখে পড়লেই অমর হবে; তা তুমি নিজে ঝাঁপ দিয়াই পড়, বা সিঁড়িতে আস্তে আস্তে নেবে একটু খাও, বা কেউ তোমায় ধাক্কা মেরে ফেলেই দিক্, একই ফল। একটু অমৃত আস্বাদন * করলেই তুমি অমর হ'বে।

## গান।

ডুব্, ডুব্, ডুব্, রূপ-সাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবিরে প্রেম রত্নধন॥
খুঁজ, খুঁজ, খুঁজ, খুঁজলে পাবি হৃদয়মাঝে বৃন্দাবন।
দিব্, দিব্, দিব্, জ্ঞানের বাতি হৃদে জ্বল্বে অনুক্ষণ॥
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ডাঙ্গায় ডিঙ্গে চালায় আবার সে কোন্‌জন।
কুবির বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুরুর শ্রীচরণ॥”

[ শ্রীল রামকৃষ্ণ পরমহংস।

* একণে আস্বাদন শব্দটী বুঝা চাই। চিনির বলদ চিনি আস্বাদন করে না। এই এই সংসার শ্রীভগবানের সংসার বা অভিব্যক্তি। কিন্তু সে আস্বাদন ক্ষমতা কি আমাতে আছে? সুতরাং জীব চৈতন্ত অনুরূপ ইন্দ্রিয়শক্তি নির্ভিন্ন না করিলে আস্বাদন পায় না। ঐ ইন্দ্রিয়টী কি? একপ্রকার বুদ্ধি বা যোগমায়া। সুতরাং সেই পরম লীলার মধ্যে অবস্থিত মানবপ্রকৃতি শিশুপাল ভগবানের ভাব বুঝতে পারে নাই। সুতরাং জোর করিয়া অমৃতকুণ্ডে পড়িলেই হয় না। আমরা নিয়ত সেই অমৃতে অবস্থিত রহিয়াছি কিন্তু সে ভগবৎ জ্ঞান কোথায়? সে প্রেম কোথায়? শ্রী—মঃ—

হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে আছে—

"আনন্দো দ্বিবিধঃ প্রোক্তো মূর্ত্তামূর্ত্ত প্রভেদতঃ।
অমূর্ত্তস্যাশ্রয়ো মূর্ত্তো মূর্ত্তানন্দোঽচ্যুতোমতঃ॥" ইত্যাদি।

আনন্দ দুই প্রকার, একটী মূর্ত্ত, অপরটী অমূর্ত্ত। কিন্তু অমূর্ত্তের আশ্রয় মূর্ত্তানন্দ, * সেই মূর্ত্তানন্দই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। আর যিনি অমূর্ত্ত, তিনি পরমাত্মা, জ্ঞানময় নির্গুণস্বরূপ, নির্ব্বিকার ব্রহ্ম। ইহাই সাধুগণের অভিপ্রেত।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব মহাশয়কে নিষ্কাম কর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব এইরূপে উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন—

"সত্ত্বগুণে মৃত্যু হইলে স্বর্গলোকে গমন করে, রজোগুণে মৃত্যু হইলে [illegible] গমন করে, তমোগুণে মৃত্যু হইলে নরকে গমন করে, এবং [illegible]কেরা আমাতে গমন করে। বনে বাস সাত্ত্বিক বাস, গ্রামে [illegible] রাজসিক বাস, দ্যূতাদি গৃহে বাস তামসিক বাস, এবং আমার নিকেতনে যে বাস তাহাকে নির্গুণ বলা যায়। সঙ্গরহিত কর্ত্তাকে সাত্ত্বিক, রাগান্ধ কর্ত্তাকে রাজস, স্মৃতিবিভ্রষ্ট কর্ত্তাকে তামস, এবং আমার সেবাকারী কর্ত্তাকে নির্গুণ বলা যায়। পবিত্র, হিতকর, অনায়াসলভ্য আহার সাত্ত্বিক, ইন্দ্রিয় সুখকর আহার রাজসিক, অশুচি কষ্টকর আহার তামস, এবং আমাতে নিবেদিত ভক্ষ্য মাত্রই নির্গুণ। আত্মা হইতে সমুদ্ভূত সুখ সাত্ত্বিক, বিষয়জনিত সুখ রাজসিক, মোহ দৈন্যাদি সমুদ্ভূত সুখ তামস, এবং আমার চিন্তাজনিত যে সুখ তাহাই নির্গুণ" ইত্যাদি। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের লীলাদি চিন্তাজনিত পরমানন্দ নির্গুণ আনন্দ, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণের নাম ও রূপ এবং বিগ্রহ একই; ভিন্নভেদ নাই, সত্যভামার দর্পচূর্ণ সময়ে ইহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

---

* আনন্দ কি মূর্ত্তভাব? মূর্ত্তভাবের উপর অমূর্ত্ত আনন্দ স্থাপিত হইতে পারে, কিন্তু আনন্দ মাত্রেই জ্ঞান জ্ঞাতা জ্ঞেয় কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া প্রভৃতি ব্যক্তভাবে লয় হইয়া যায়। আমাদের ক্ষুদ্র আনন্দেও আমরা সাময়িক ভাবে সংসার ও ব্যক্তভাব ভুলিয়া যাই ভূমানন্দের ত কথাই নাই। শ্রী—মঃ

মধুরভজন * বৈষ্ণব ধর্ম্মের অবনতি নহে, প্রত্যুত সর্ব্বধর্ম্মের সারাৎসার অংশ। আমার প্রবন্ধ এতদিন পরে শ্রদ্ধেয় রাজেন্দ্রবাবুর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে দেখিয়া পরমসুখী হইয়াছি। আমার বোধ হইতেছে অচিরে রাধিকার অভিসম্পাত রাজেন্দ্রবাবুর উপর কার্য্য করিবে। রাজেন্দ্রবাবু এক জন অতিউচ্চ অধিকারী, সাধনারাজ্যে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহার ন্যায় ভজনানন্দ মহাপুরুষ নিষ্কাম মধুর ভজনের প্রকৃত তথ্য জগৎ সমীপে উদ্‌ঘাটিত করিলে নরজগতের একটী মহান্ উপকার হইবে। শ্রীরাধারাণীর শাপটী এই—

"বঁধু হে নির্জ্জনে পেয়েছি কিছু কহি।
তোমা না দেখিয়া প্রাণ, সদা করে আন চান
তোমারি কারণে এত সহি॥
নন্দসুত সনে, যোষিৎ দোষিতাগণে,
কো নহে গোকুল নারী।
হায় অভাগিনী, কুল কলঙ্কিনী,
কহিতে নয়নে বহে বারি॥
আনের কলঙ্ক কথা, আন না কহয়ত,
সো ইহ বিধির বিধান।
আমারি কলঙ্ক যত, গাওত ভাগবত,
হুকারই বেদ-পুরাণ॥
কেহ বলে ধীরি ধীরি, কেহ জপে উচ্চ করি;
কেহ ত ভাবয়ে মনে মনে।

---

* আমার ব্যক্তব্যটী জানকীবাবু বুঝিতে পারেন নাই। যে ভক্তি অর্থে কেবল সুখের আস্বাদন, যে ভক্তিতে জীবের কেবল ভোগলালসা জন্মায়—সে ভক্তি কাম ভিন্ন অন্য কিছু নহে। এ ভক্তিতে জীব আপনার সুখদ আনন্দাত্মক ইন্দ্রিয় প্রীতির লালসা করে। ৺মহাপ্রভু কি এই কথাই বলেন নাই? ইহা কি আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি নহে? এ ভোগ লালসা কি আপন আনন্দের জন্য নহে? ইহাতে কি কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিরূপ পরম ত্যাগভাব লক্ষিত হয়? শ্রী—সঃ।

অহো কি আশ্চর্য্য কথা,    যথাগো শুনেছ কোথা,
গুরু দেয় সেবকেরই কানে॥
আমার কথায় থাকে যে,    আমার মত হো'ক সে,
বসি কহিলাম এই বৃন্দাবনে।
শুনি রামানন্দ সুখে,    বচন না সরে মুখে,
ধারা বহে ও দুটী নয়নে॥"

কামাকাঙ্ক্ষা প্রবৃত্তিমূলক, বেদোক্ত ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা সাত্ত্বিক নিবৃত্তিমূলক, আর শ্রীভগবানে নির্গুণ, অহৈতুকী (নিজেন্দ্রিয় সুখস্পৃহা হেতু নহে) আকাঙ্ক্ষা নির্গুণ বা নিষ্কাম। গোপিকাগণ গুণময় দেহ ত্যাগ করিয়া এই নির্গুণধামে উপনীত হইয়াছিলেন।

এখন গাও পাঠকগণ! জয় গোপীগণের নিষ্কাম রাসবিহারের জয়॥ গোপীগণ সামান্য জন্তু নহেন। তাঁহারা আত্মাকে ধ্যান করিয়া তৃপ্ত হইবার জন্য নহেন। হে শুষ্কজ্ঞান! হে নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান! তুমি গোপী-শিষ্যের নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিয়া "একমেবাদ্বিতীয়ং" এর ঘাড়ে গিয়া চাপ। গোপী-চাহে কৃষ্ণের অঙ্গ সঙ্গ, অথচ নিষ্কাম অঙ্গ সঙ্গ॥ গোপীর নিকট শ্রীকৃষ্ণ লিখিয়াছেন—

"সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎ সেবনং জনাঃ॥"

ভাগবত ৩।২৯।১৩

তবে গাও গোপীর জয়। হে শ্রুতিগণ! তোমাদের মূলশক্তি যে আজি ব্রজের গোপিকা। তোমরা অন্য কাহাকে বেদধর্ম্মের ভয় দেখাইতে বসিয়াছ? শ্রুতিগণ অন্তদিন ধরিয়া যাঁহার অঙ্গের সৌরভ দিশি দিশি বিকীর্ণ করিয়াছেন, সেই ভগবান্ আজি গোপ এবং শ্রুতিগণ গোপিকা। হে মার্কণ্ডের! তুমি না চণ্ডীতে বলিয়াছিলে বিষ্ণুর মহামায়ার প্রভাবে জীবকুল মমতাবর্ত্তে নিপতিত। এখন কোথায় রহিল তোমার মোহগর্ত্ত; মায়ান্ধকূপের দ্বার যে উন্মোচিত হইল। গোপীগণ পূর্ণ ভগবান্‌কে যে ধরিয়া বসিলেন। ভগবান্ প্রেমের দায়ে বাঁধা রহিলেন—গোপীর কাছে

মানবীর কাছে? * কারণ আজি গোপী মানবী, আর ভগবান্ মায়ামনুষ্য। আর ভগবান্ অতিদূরের বস্তু নহেন; অচিন্ত্য, অগম্য, নিরাকার নহেন। ঐ যে ভগবান্ গোপীর কুঞ্জদ্বারে! পাঠকগণ! একবার চলনা, গোপীর অনুমতি লইয়া কুঞ্জদ্বারে ভগবানের মুখখানি দেখিয়া আসি, শ্রীমুখের হাসি দেখিয়া আসি; আর যদি পারি, ও রাজীব-চরণে আত্মসমর্পণ করিগে! আজি মানব জাতির কি মহাজয়োল্লাস। বল দেখি পাঠকগণ! আজ রাই রাজা, কি কৃষ্ণ রাজা? আজ মানব জয়ী, কি ভগবান জয়ী? আজ বেদধর্ম্ম বড়, কি ব্রজধর্ম্ম বড়? আজ বৈকুণ্ঠ বড়? কি বৃন্দাবন বড়! আজ মানবী বড়, কি লক্ষ্মী বড়? চল না সকলে কুঞ্জদ্বারে যাইয়া মনের দুঃখ জানাই গে! ভগবান্! গায়ে বড় আঘাত লাগিয়াছে। সংসার ভয়ঙ্কর পিচ্ছিল পথ, পুনঃ পুনঃ পদস্খলন হইতেছে, পুনঃ পুনঃ আছাড় খাইয়া পড়িতেছি, আর পারি না।

"তন্নো নিধেহি করপঙ্কজমার্ত্তবন্ধো!
তপ্তস্তনেষু চ শিরঃসু চ কিঙ্করীণাং॥"

( ভাগবত, রাসলীলা, গোপীবাক্য )।

( ক্রমশঃ ) শ্রীজানকীলাল পাল, শাস্ত্রী।

---

# পঞ্চীকরণ।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর। )

ন ক্রুদ্ধঃ পরুষং ব্রূয়াদেতৎ সাধোস্তু লক্ষণং॥"

সম্মানে হৃষ্ট বা অপমানে কুপিত না হওয়া এবং ক্রুদ্ধ হইলেও পরুষবাক্য প্রয়োগ না করা সাধুর লক্ষণ।

---

* লেখক এইমাত্র বলিলেন যে গোপীগণ প্রাকৃত জন্তু নহে। তবে এখন আবার মানব ভাবটী স্থাপন করেন কেন? এই মানব বুদ্ধি লইয়াই ত যত গোল। ছাঁচ না থাকিলে রূপ গ্রহণ হয় না। তদ্রূপ ভিতরের ভগবদ্ভাব প্রকট না হইলে শ্রীভগবানকে জানা যায় না। জীব এই ভিতরের ভগবদ্ভাব "অহং ব্রহ্মাস্মি" সাধনায় বা তদনুরূপ 'আমি ভগবানের দাস" প্রভৃতি ভাবের দ্বারা বুঝিতে পারে। ঐ সাধনায় প্রথমেই দেহ ও দেহীভাব বিসর্জ্জন দিতে হয়। তবে বেদান্তের অপরাধ কি তাহা বুঝা গেল না। শ্রী—সং

স্বধর্ম্ম মানে, নিজের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের স্বধর্ম্ম পৃথক পৃথক্ মানবীয় শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

ব্রাহ্মণদিগের অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ, এই ছয় কর্ম্ম স্বধর্ম্ম বলিয়া জানিবে।

ক্ষত্রিয়দিগের প্রজা-প্রতিপালন, দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ ও স্রক্চন্দন বণিতাদির অনবরত অসেবন এইগুলি স্বধর্ম্ম বলিয়া জানিবে।

বৈশ্যদিগের পশুপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, জলপথে ও স্থলপথে বাণিজ্য কৃষিকর্ম্ম এবং বৃদ্ধির জন্য ধন প্রয়োগ, এই গুলি স্বধর্ম্ম বলিয়া জানিবে।

ধাতা শূদ্রদিগের পক্ষে এই কর্ম্মের ভার সমর্পণ করিলেন যে, তাহারা অসূয়া বিহীন হইয়া প্রাধান্যরূপে এই বর্ণত্রয়ের সেবা শুশ্রূষা করিবেক। ইহাই তাহাদের স্বধর্ম্ম বলিয়া জানিবে।

একের ধর্ম্ম, অন্যে প্রতিপালন করিতে শাস্ত্রে নিষেধ আছে। যথা "স্বধর্ম্মে মরণং শ্রেয় পরধর্ম্ম ভয়াবহ।" স্বধর্ম্মে থাকিয়া কষ্ট পাইয়া মরণ হইলেও তাহার শ্রেয় অর্থাৎ মঙ্গল হয়; পরন্তু পরধর্ম্ম গ্রহণে সুখ পাইলেও উহা পরিণামে নরকোৎপাদক হইয়া থাকে। বক্তের তেজে কেহ পরধর্ম্মগ্রাহী হইয়া যথেচ্ছাচারী হইলেই যে জিতিয়া গেলেন, তাহা নহে; এ চাতুরী শেষ পরিণামে স্থায়ী হয় না। দুই বিশেষণ মুখ্যরূপে যাহাতে থাকে, এমন সদ্গুরুর সমাগম করিবে।

শিষ্য। আপনি, গুরুর শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ, এই বিশেষণ মুখ্য কহিয়াছেন। তাহার মধ্যে যদি এক বিশেষণযুক্ত গুরু হয়, তবে উহাতে কল্যাণকারক বোধ হইবে কিনা?

গুরু। এক বিশেষণযুক্ত গুরুর নিঃসন্দেহ বোধ হয় না। সেই জন্য দুই বিশেষণযুক্ত গুরুর শরণাপন্ন হইবার আবশ্যক। এই বিষয়ে আমি একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি।

দৃষ্টান্ত। কোন এক স্বদেশগমনেচ্ছু পুরুষ দেশে যাইবার পথে চলিতে লাগিল; যাইতে যাইতে পথিমধ্যে একটী নদীর নিকট আসিয়া পড়িল। তখন ঐ নদী উত্তীর্ণ হইবার জন্য তটে দণ্ডায়মান থাকিয়া কোন এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে, আমাকে নদী উত্তীর্ণ হইবার জন্য কি

করিতে হইবে ? এই কথা শুনিয়া সেই নদী তটস্থিত কোন এক পুরুষ, যাহার শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ ছিল এবং চলিতেও সমর্থ কিন্তু অন্ধ ছিল, তখন সে বলিতে লাগিল যে, আমার স্কন্ধের উপরে তুমি উপবেশন কর, আমি তোমায় লইয়া নদীর পরপারে উত্তীর্ণ করিয়া দিব। অন্ধের এবম্প্রকার বাক্য শুনিয়া পারে গমনশীল ব্যক্তি মনে মনে বিবেচনা করিয়া দেখিল যে, এ ব্যক্তি অন্ধ এবং পরপারের ( সম্মুখের ) কিনারাও দেখে নাই, তবে কিরূপে আমাকে উত্তীর্ণ করিতে পারিবে ? অতএব উহাকে বিশ্বাস করিয়া গমন করা ভয়ের হেতু হয়। এই জন্য তাহাকে "না" বলিয়া উত্তর দিল। ঐ সময়ে ঐ তটস্থ অপর একটী পঙ্গু পুরুষ বসিয়াছিল, সে চক্ষে দেখিতে পাইত। সেই পঙ্গু পুরুষ ঐ পরপার গমনেচ্ছু ব্যক্তিকে বলিল যে, তোমার অন্য কাহারও সঙ্গে যাইবার প্রয়োজন নাই, কেন না নদীতে জল খুব কম, তাহা আমি জানি ; অতএব আমি যে দিকে যাইতে বলি, তুমি সেই দিকে যাও, তাহা হইলে অনায়াসে পার হইয়া যাইবে। এই বলিয়া নির্দ্দেশ করিল যে, এই কিনারাতে তুমি একটু নীচু হইয়া "বিশ কদম্" ( বিংশতি পদ ক্ষেপ ) সোজা চলিয়া দক্ষিণ দিকে কিছু ফিরিয়া চলিয়া যাইবে ! তবে বিনা বিঘ্নে পার হইবে। এইরূপ পঙ্গু বচন শুনিয়া তাহাতে সেই পারগমনশীল ব্যক্তির বিশ্বাস হইল না। কারণ, সে বিবেচনা করিতে লাগিল যে ঐ ব্যক্তি নিজে পঙ্গু এবং কোন দিনও ( নিজে ) নদীতে নামে নাই, উহাতে জল বেশী আছে কি কম আছে, তাহা সে স্বয়ং জানে না। অতএব উহার কথায় আমি যদি যাই, আর মধ্যে যদি জল বেশী হয়, তজ্জন্য আমি ডুবিলে সে কি আমার সহায়তা করিতে পারিবে ? এইরূপ নির্দ্ধারণ করিয়া উহার কথা মানিল না। এই প্রকারে, যদিও সেই পঙ্গু সত্য কথা বলিয়াছিল, আর জল ও কম ছিল, তথাপি সেই বক্তা ( উপদেষ্টা ) পঙ্গু হওয়ায় উহার বাক্যে বিশ্বাস হইল না ; এবং পরপারেও যাওয়া হইল না।

ক্রমশঃ।

# বিজ্ঞান প্রাচ্য ও প্রতীচ্য।

প্রতীচ্য দর্শন ও বিজ্ঞান ও জড়বাদী উভয়েই সেইজন্য ধর্মব্যাপারের বিরোধী বলিয়া মনে হয়। জড়বিজ্ঞান বলেন যে জড় পদার্থ ( matter ) ও শক্তি ( Energy ) এই দুইয়ের সম্মিলনে সৃষ্টি। এই সৃষ্টিতে চৈতন্য নাই, ও থাকিলেও তাহার বিশেষ স্থান নাই। জড় আপনার নিয়মে অপ্রতিহত প্রভাবে চলিতেছে, চৈতন্যের দ্বারা তাহার ক্রিয়া ও গতির ব্যতিক্রম হয় না। সাংখ্যের প্রকৃতি যেমন আপনিই কার্য্য করে ও তাহাতে পুরুষের কোন হাত নাই, জড় বিজ্ঞানেও তদ্রূপ। এইমত Sir Qliver Lodge যে যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিতেছেন তাহা জানিলে আমরা সাংখ্যমতের উত্তর দিতে সক্ষম হই। শঙ্করাচার্য্য যে যুক্তিতে সাংখ্যমত খণ্ডন করেন ইহাও ঠিক সেইরূপ। শঙ্কর বলেন যে গুণ সাম্য হইতে সাম্যচ্যুতি বা প্রকাশ হইতে কালে প্রকৃতির অতীত শক্তি বিশেষের আবশ্যকতা স্বীকার করিতে হয়। Sir Oliver ও ঐপ্রকার যুক্তি অবলম্বন করেন। তিনি বলেন যে জড় ও শক্তির মিশ্রনে কার্য্য হয় বটে, কিন্তু তাহাতে চৈতন্যের অধ্যক্ষতা সূচিত হয়। সত্যবটে, জড় লৌহময় রেল থাকে বলিয়াই এঞ্জিনের শক্তিকে একদিকে চালাইয়া রেল গাড়ীর গন্তব্য স্থানে যাইবার গতি সাধিত হয়, কিন্তু রেলের শক্তি তামসিক ও তদ্বারা এঞ্জিনের শক্তিকে অন্যদিকে প্রতিহত করিয়া একদিকে চালিত করা হয়। কিন্তু ইহাতেও চৈতন্যের অভাব সূচিত হয় না ; এঞ্জিনেরশক্তি কেবল মানব চৈতন্যের সাহায্যে জড় জল হইতে প্রকট হয়, পরে ঐ শক্তিকে মানব বুদ্ধির সাহায্যে Translative power রূপে পরিণত করা হয়। রেলও মানব বুদ্ধির সাহায্যে ব্যবহৃত হইয়া গতির সাহায্য করিতে পারে। সুতরাং এস্থানে তিনটি শক্তির ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ রেল বা লৌহ খণ্ডের তামসিকতা বা resistance শক্তি এমন ব্যবহৃত হয় যে সেই তামসিকতাই চৈতন্যের উদ্দেশ্য সাধিত করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ এঞ্জিনে রাজসিক বা কার্য্যকারী শক্তি এই শক্তিও প্রতিদ্বন্দ্বিতা মূলক বা Resistance বাচক কলের সাহায্যে Expansion বা বৃদ্ধি শক্তিকে Translation বা গতি শক্তিতে পরিণত করে। ইহাতে ও চৈতন্যের কার্য্য আছে। তৎপরে এই দুইপ্রকার শক্তিকে উদ্দেশ্য বা সাত্বিক শক্তিদ্বারা চালিত করিয়া বিশেষ কার্য্যসাধিত হয়।

এ বিষয়ে প্রাচ্য বিজ্ঞান কি বলেন ? উহার মতও ঐরূপ। জগৎ বা প্রধান ভাব জানিতে গেলে তামসিক বা Resistance শক্তির আবশ্যকতা আছে বলিয়াই ব্রহ্মার তত্ত্ব সৃষ্টি। তত্ত্ব একদিকে তামসিক এবং চৈতন্যে প্রতিদ্বন্দ্বি বলিয়াই তাহার সাহায্যে অভিব্যক্তি সাধিত হয়। এঞ্জিনের শক্তিযন্ত্র মূলক এবং সৃষ্টি ব্যাপারে ইহাকে বিষ্ণুর Organising বা সংহনন শক্তিবলে। জীব শক্তি কেন্দ্র মূলক চৈতন্য উহাই শিবশক্তি ও এই শক্তির সাহায্যে জগৎ ব্যাপার চালিত ও রক্ষিত হয়। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥

এই তিন ভাবে জগৎ। কিন্তু তিনের অতীত এবং মহত্তর পরম একতা ভাবে আছে। এই মহান ভাবে আর তত্ত্ব, ইন্দ্রিয় ও জীব বা দেবতা রূপ ভিন্নতা নাই। এই মহান ভাবে তিন ভাবই সমন্বিত। এই ভাব আছে বলিয়াই বিভিন্ন ভাবগুলি পরস্পরের উপর, ক্রিয়া করিতে পারে। Sir Oliver Lodge এ ভাব দেখিতে পান নাই। ইহাই পরম গতি ও পরম পদার্থ। ইহাই ধর্ম্মের উপকারিতা প্রতিপন্ন করিতেছে। এই একত্বই সনাতন ধর্ম্মের মূল ভাব। ইহা হইতেই ভক্তি ও মুক্তি। এই অপাপবিদ্ধ, শুদ্ধ, নিরঞ্জনই আমাদের স্বরূপ ভাব ও আলয়।

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ।

১১শ ভাগ। } জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪ সাল। { ২য় সংখ্যা।

# মানবের ইতিবৃত্ত।

ওঁ নমো গুরুদেবায়।

## প্রথম অধ্যায়।

ওঁ নারায়ণঃ পরোঽব্যক্ত অণ্ডমব্যক্তসম্ভবং।
অণ্ডস্যান্তস্ত্বিমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপাচ মেদিনী ॥

### মানবের আধ্যাত্মিক উৎপত্তিক্রম।

গত অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মানবের উৎপত্তিক্রম নির্দ্ধারণ করিতে প্রয়াস পাইতেছে।. জর্ম্মনীতে, ফ্রান্সে ও ইংলণ্ডে, এ বিষয়ে যে সকল ভূরি ভূরি প্রমাণ ও তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে, বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ তাহা তন্ন তন্ন করিয়া মানব তত্ত্বের ধারাবাহিক কুলক্রম নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা দেখাইয়াছেন, কিরূপে প্রাকৃতিক আদিম আণ্ডের রাশি

ঋটিকা ( Fire mist ) হইতে ক্রমোন্নতি বলে বর্ত্তমান সুসভ্য শিক্ষিত মনুষ্য উদ্ভূত হইয়াছে। কিন্তু কেবল মাত্র মানবের স্থূলদেহের উৎপত্তি ও গঠন সম্বন্ধেই উক্ত পণ্ডিতগণের গবেষণা ও অনুসন্ধান পর্য্যবসিত হওয়ায়, তাহা অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। বস্তুতঃ মানবদেহ বিধাতার এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। ইহা অতি সূক্ষ্ম শিল্প নৈপুণ্যের আদর্শ, কারুকার্য্যময় গূঢ় রহস্যযুক্ত একটী যন্ত্রবিশেষ। প্রত্যেক প্রকার প্রাণীজগতে কিরূপে অল্পে অল্পে ক্রমশঃ যুগ যুগান্তর কাল ব্যাপিয়া কোষাণু হইতে কোষাণুর ক্রমোন্নতি হইয়া এই দেহযন্ত্রের উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং এক অবস্থা হইতে ক্রমে ক্রমে কিরূপে অবস্থান্তর ঘটিয়াছে এবং কিরূপে একটী কোষাণু হইতে অসংখ্য পরস্পর সংশ্লিষ্ট কোষাণুপুঞ্জ উৎপন্ন হইতেছে, তাহা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদেরা অসীম ধৈর্য্যসহকারে ও অগাধ বুদ্ধিবলে প্রদর্শন করিতে অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ইহা সামান্য প্রশংসা ও কম গৌরবের বিষয় নহে। কিন্তু বর্ণিত অবস্থান্তরের ও ক্রমিক উন্নতির গূঢ়তত্ত্ব সম্বন্ধে তাহাদের অভিজ্ঞতার অভাব হওয়ায়, অনেক স্থলে ভ্রমপ্রমাদ ঘটিয়াছে। তাহাতে এই হইয়াছে যে, প্রকৃতপক্ষে এক জীব শ্রেণী অপর শ্রেণী হইতে গণনাতীত কাল ব্যাপিয়া পৃথক থাকিলেও তাহাদিগকে একই সময়ের একই শ্রেণীমধ্যে গণনা করা হইয়াছে। আবার পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রেণীকে পরে আনয়ন করা হইয়াছে। তাহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, যাহারা প্রকৃত পক্ষে বংশধর ও স্থলবর্ত্তী, তাহাদিগকে পূর্ব্বপুরুষ ও পূর্ব্ববর্ত্তীগণে আসনে সমাসীন করা হইয়াছে। তাহাতে প্রকৃত তত্ত্বনির্ণয়ের পক্ষে নানারূপ অসুবিধা ঘটিয়াছে। কিন্তু শরীরতত্ত্বের সূক্ষ্মানুসন্ধান করিলেও মানবের প্রকৃত ইতিবৃত্তের মূলানুসন্ধান করা হইল না। কারণ প্রকৃত মানব শুধু স্থূল দেহ নহে। দেহ মানবের ক্ষণভঙ্গুর বাহ্যাবরণ মাত্র।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ গীতা।

তাই দেহতত্ত্ব জানিলে মানবতত্ত্ব জানা হইল না। দেহাভ্যন্তরে হৃদয়াকাশে যে অবিনশ্বর আত্মা বিরাজমান আছেন, এবং এই আত্মার শক্তি স্বরূপ যে জ্ঞান ও বুদ্ধি বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া বাহ্য জগতে বিদ্যমান রহিয়াছে, তৎসম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। কাজেই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ নিত্য ও

অত্যাবশ্যকীয় তত্ত্বগুলি ত্যাগ করিয়া অকিঞ্চিৎকর ও বিনশ্বর শরীরতত্ত্বেরই মাত্র আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু পরমভক্তিভাজন পূজ্যতম ঋষিগণ জীবের কল্যাণের নিমিত্ত পুরাকালে যে শাস্ত্র প্রচার করিয়া ও শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, এবং যে শাস্ত্র জগতের প্রধান প্রধান প্রত্যেক ধর্ম্মেই পুনঃ পুনঃ আলোচিত ধ্রুবসত্য বলিয়া গৃহীত ও প্রচারিত হইয়াছে, সেই মহাত্মাগণ প্রবর্ত্তিত শাস্ত্রে মানবজাতির ও মানব প্রকৃতির প্রত্যেক অংশ সম্বন্ধেই প্রকৃষ্ট ও বিশদ বর্ণনা আছে দেখা যায়। তন্মধ্যে সনাতন হিন্দু শাস্ত্রেই এ সম্বন্ধে বিশদ ও সম্পূর্ণ ইতিহাস পাওয়া যায়, কিন্তু কেবল হিন্দু শাস্ত্রেই যে তাহার বর্ণনা আছে এমন নহে। মানব কিরূপে দেব হইতে স্থাবরে, স্থাবর হইতে পুনরায় দেবত্বে পরিণত হয়, অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় ইসলাম ধর্ম্মেও তাহার স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমান ধর্ম্মে আছে, "আমরা খোদাতাল্লা হইতে আসিয়াছি, আবার তাঁহার নিকট পৌছছিব"।

স্থূলজগৎ হইতে অন্তর্হিতা প্রাতঃস্মরণীয়া মাডাম ব্লেভেট্স্কী কথিত ঋষিগণের শিষ্যা বা উপাসিকা ছিলেন। তিনি ঋষিদের প্রদর্শিত মত এবং তাঁহাদের অনুজ্ঞায় রাজবিদ্যা রাজগুহ্য যোগ সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থাদি লিখিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে (Secret Doctrine) নামক গ্রন্থ শীর্ষ স্থানীয়। একমাত্র এই গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া মানবের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে যাহা যাহা জানা যায়, তাহাই এস্থলে লিপিবদ্ধ করা হইল।

মানবের প্রকৃত ইতিহাস জানিতে হইলে তিনটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। (১) আধ্যাত্মিক, (২) শারিরীক, এবং (৩) মানসিক, এই তিনটী ক্রম বিকাশের প্রতি মনোযোগ করা উচিত। তন্মধ্যে আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশই সর্ব্ব প্রধান; কারণ আত্মা (পুরুষ) পদার্থের (প্রকৃতির) অধীশ্বর। চিন্ময়াত্মা বাহ্য বস্তুকে পরিচালন করেন; ইহাকে নির্দ্দিষ্ট আকার বিশিষ্ট করেন। কাজেই আধ্যাত্মিক ইতিবৃত্ত পরিজ্ঞাত না হইলে, প্রকৃত মানবতত্ত্ব গুহ্য প্রহেলিকাবৎ রহিয়া যায়। আত্মা (পুরুষ) আস্তে আস্তে ভৌতিক পদার্থে (প্রকৃতিতে) অবতরণ করাকেই মানবের আধ্যাত্মিক ইতিবৃত্ত কহে। অপর পক্ষে প্রকৃতিতে জড়িত পুরুষের (আত্মার) ক্রমশঃ উন্নতিকেই কেহ কেহ মানবের শারীরিক ইতিবৃত্ত কহে।

হিন্দুশাস্ত্রে প্রথমটী'ক অনুলোম ( Involution ) ও দ্বিতীয়টীকে বিলোম ( Evolution ) কহে। উর্দ্ধভাগে অনুলোম,-অধোভাগে বিলোম। একটী উর্দ্ধদিক হইতে অধোগামী, অপরটী অধোভাগ হইতে হইতে- উর্দ্ধগামী হইয়া উভয়ে যে স্থানে মিলিত হয়, সেই সঙ্গমস্থলে মানবের আর একটী ক্রমবিকাশ আরম্ভ হয়। এই তৃতীয়টীকে মানবের মানসিক ইতিবৃত্ত কহে। পূর্ব্ব কথিত দুই তত্ত্বকে এই মানসতত্ত্ব সংযুক্ত করাতে এই তিনটী তত্ত্বের একত্র সমবায়ে প্রকৃত মানব গঠিত হইয়াছে। জীব আত্মাদ্বারা অনুস্যূত হইয়া যখন স্থূলদেহে প্রবেশ লাভ করে, তখন প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ হয়। যখন মানবের আধ্যাত্মিক, মানসিক ও দৈহিক ইতিবৃত্তের আলোচনা করা যায়, তখন আমাদের সম্মুখে একটি অপূর্ব্ব দৃশ্যের আবির্ভাব হয়। তখন কথঞ্চিৎ বুঝিতে সমর্থ হওয়া যায় যে, মানবপ্রকৃতি কি এক অভূতপূর্ব্ব ও অত্যাশ্চর্য্য পদার্থ! তখন বুঝিতে পারা যায় যে, শক্তি সামর্থে মূলতঃ মানব ঈশ্বর। ম্যাডাম্ ব্লেভেটস্কী বলেন সাময়িক উপাধিত্রয় নির্ম্মানের জন্য তিনটী ভিন্ন ভিন্ন ক্রম বিকাশ স্বভাবতঃ বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু আমাদের বিশ্বে তাহারা অবিচ্ছিন্ন ভাবে পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া বিরাজমান আছে। প্রথম ক্ষেত্রজ্ঞ বা আদি জীব সম্বন্ধীয়, ইহাকে আধ্যাত্মিক বিকাশ বলে। দ্বিতীয় মানসিক বিকাশ; মানসধ্যানী বা মানস্পুত্রগণ দ্বারা ইহা সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই মানসধ্যানীগণকে সৌরদেব বা অগ্নি ও পিতৃ বলা হইয়া থাকে। তাহারা মানবের জ্ঞানচৈতন্য প্রদান করে। তৃতীয়—শারীরিক বিকাশ; সৌর পিতৃগণের ছায়াবলম্বনে মানবের স্বাভাবিক স্থূলদেহ গঠিত হইয়াছে। এই বিকাশ স্রোতত্রয়ের একত্র সম্মিলনে মানব বর্ত্তমানে এই প্রকার জ্ঞানবুদ্ধি-সম্পন্ন, হস্তপদ বিশিষ্ট জীবরূপে পরিণত হইয়াছে।

এইরূপ দুরূহ বিষয়ের আলোচনা করা যে কিরূপ কষ্টকর ব্যাপার তাহা সহজেই বুঝা যায়।

১। আধ্যাত্মিক ক্রম বিকাশ।

সর্ব্বাগ্রে মানবের আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধেই যথাসাধ্য আলোচনা করা যাইতেছে। তবে বিষয় বড় কঠিন, আলোচনা সন্তোষজনক হইবে না। ইহা বুঝিতে হইলে দুইটী স্থূল প্রধান বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিতে

হইবে। (প্রথম) বিশ্বকর্ম্মা দেব শ্রেণী, (২য়) ক্রম বিকাশঃ ক্ষেত্র Field-of Evolution)। এই আধ্যাত্মিক দেবগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিশ্ব মণ্ডলে তাঁহাদের মানবীয় বিকাশের ও মানবীয় উন্নতির পরাকাষ্ঠা সম্পন্ন করিয়া নব বিশ্বের সৃষ্টি সম্বন্ধে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার সাহায্য করিবার ক্ষমতালাভ করিয়াছেন ও ক্রমশঃ সেই পদে অধিরোহন করিয়াছেন। তাহারা সৃষ্টিকার্য্যে ভগবানের সাহায্যকারী। ভগবান তাহাদের সাহায্যে নূতন ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন কার্য্য সম্পন্ন করেন। এই দেব সকল সৃষ্টি প্রকরণের আদর্শ (Model) তৈয়ার করেন এবং সৃষ্টিকার্য্য পরিচালনা করেন বলিয়া, তাহারা বিশ্বের শিল্পি ও সৃজনকর্ত্তা রূপে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই দেব শ্রেণীর সমষ্টিকেই শাস্ত্রে "বিশ্বকর্ম্মা" বলা হইয়াছে। এই বিশ্বকর্ম্মাদের সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানা নিতান্ত আবশ্যক; কারণ তাহারা বিশ্বের আধ্যাত্মিক জীবনস্বরূপ। তাহাদের দ্বারাই মানব জাতির আধ্যাত্মিক, মানসিক ও দৈহিক ক্রমবিকাশ ও উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে এই বিশ্বদেবগণের বিষয় আলোচনা করা ও অবগত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

গুপ্তবিদ্যা সম্বন্ধে জগতে আবহমান কাল হইতে যে রহস্য বিদ্যমান আছে, অতি পুরাতন সনাতন রাজবিদ্যা এবং রাজগুহ্যযোগের সঙ্গে তাহার কোনরূপ ইতর বিশেষ নাই। এই গুপ্তবিদ্যার ইতিহাস পাঠে জানা যায়, আমাদের বর্ত্তমান বিশ্ব এত দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছে যে এই কালকে আমাদের পক্ষে অসীম এবং অনন্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই গণনায় আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইতে আজ পর্য্যন্ত ১, ৯৫৫, ৮৮৪, ৭০৩ একশ পঁচানব্বই কোটী আটান্ন লক্ষ চৌরাশি হাজার সাতশত তিন বৎসর গত হইয়াছে। এই সময়টা এত সুদীর্ঘ যে তৎসম্বন্ধে কেবল এই বাক্য কয়টী বলা মাত্রই সার; তাহা মানুষের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ধারণা করা একবারে অসম্ভব। যদি কিছু ধারণা করিবার থাকে, তবে এইমাত্র বলা যায় যে আমাদের এই বিশ্ব অসীম ও অনন্ত কাল ব্যাপিয়া বর্ত্তমান আছে। এখন নিবিষ্ট চিত্তে এবং সুগভীর চিন্তা শক্তি বলে বিশ্বের সেই আদি সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মানসচক্ষে কি দেখিতে পাওয়া যায়? ভগবান্ মনুর ভাষায় বলিতে গেলে;—

আসীদিদংতমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণং।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ংপ্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥
ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবান ব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদং।
মহাভূতাদি বৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ॥
যোঽসাবতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্ত সনাতনঃ।
সর্ব্বভূতময়োঽচিন্ত্যঃ সএব স্বয়মুদ্বভৌ॥
সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎসিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ।
তদণ্ডম ভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভং।
তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ংব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ॥

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বসংসার এককালে গাঢ় তমসাচ্ছন্ন ছিল; তখনকার অবস্থা প্রত্যক্ষের গোচরীভূত নহে; কোন লক্ষণ দ্বারা অনুমান করাও দুরূহ। *তখন ইহা তর্ক ও জ্ঞানের অতীত হইয়া সর্ব্বতোভাবে যেন প্রগাঢ়* নিদ্রায় অভিভূত ছিল। পরে স্বয়ম্ভু অব্যক্ত ভগবান মহাভূতাদি তত্ত্বে প্রবৃত্ত বীর্য্য হইয়া সেই তমোরাশিকে ধ্বংস করিয়া প্রকাশিত হইলেন। যিনি মনোমাত্র গ্রাহ্য, সূক্ষ্মতম, অব্যক্ত সনাতন সেই সর্ব্বভূতময় অচিন্ত্য পুরুষ স্বয়ংই প্রথমে শরীরাকারে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রী—যুগল সেবক।

---

# চৈতন্য কথা।

## সূত্রানুসরণ।

এইবার আমরা থিব সাহেবের সঙ্গে সূত্রের অর্থ অন্বেষণ করিব।

ব্যাসের বেদান্ত সূত্রগুলি চারি অধ্যায়ে বিভক্ত। এক এক অধ্যায়ে চারি চারি পাদ। শঙ্করাচার্য্যের সূচনা অনুসরণ করিয়া ভারতীতীর্থ এই সূত্রগুলির অধ্যায় ও পাদ গত ভিন্ন ভিন্ন অধিকরণ বা বিষয় নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহার নির্ণীত অধিকরণ গুলিকে ব্যাসাধিকরণমালা বলে।

শাস্ত্রে ব্রহ্মবিচারাখ্যে অধ্যায়াঃস্যু চতুর্বিধাঃ।
সমন্বয়াবিরোধৌ দ্বৌ সাধনং চ ফলং তথা॥

ব্রহ্ম বিচার্যা বেদান্তসূত্র রূপ শাস্ত্রের চারি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ের বিষয় সমন্বয়, দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয় অবিরোধ, তৃতীয় অধ্যায়ের বিষয় সাধন, চতুর্থ অধ্যায়ের বিষয় ফল।

প্রথম অধ্যায়ে ব্রহ্ম প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য সমূহের সমন্বয় করা হইয়াছে।

সমন্বয়ে স্পষ্টলিঙ্গে প্রশ্নষ্টত্বেহপ্যুপাস্যগম্।
জ্ঞেয়গং পদমাত্রং চ চিন্ত্যং পাদেষ্বনুক্রমাৎ॥

প্রথম অধ্যায়ে স্পষ্ট ব্রহ্মলিঙ্গযুক্ত অর্থাৎ স্পষ্টরূপে ব্রহ্ম প্রতিপাদক শ্রুতি-বাক্যের সমন্বয় করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে উপাস্য ব্রহ্মবাচক অস্পষ্ট শ্রুতিবাক্যের সমন্বয় করা হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে জ্ঞেয় ব্রহ্ম প্রতিপাদক অস্পষ্ট শ্রুতি বাক্যের সমন্বয় করা হইয়াছে। এবং চতুর্থ অধ্যায়ে কেবলমাত্র "অব্যক্ত" ইত্যাদি সন্দিগ্ধ পদ মাত্রের সমন্বয় করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে সাঙ্খ্যযোগ কানাদাদি স্মৃতির সহিত এবং সাংখ্যাদি প্রযুক্ত তর্কের সহিত বেদান্ত সমন্বয়ের বিরোধ পরিহার করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পাদে সাংখ্যাদি মতের দুষ্টত্ব প্রদর্শন করা হইয়াছে।

তৃতীয় পাদের প্রথম ভাগে পঞ্চ মহাভূত বিষয়ক শ্রুতির এবং দ্বিতীয় ভাগে জীব শ্রুতির পরস্পর বিরোধ পরিহার করা হইয়াছে।

চতুর্থ পাদে লিঙ্গ শরীর বিষয়ক শ্রুতি সমূহের বিরোধ পরিহার করা হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে জীবের পরলোক গমনাগমন বিচারপূর্ব্বক বৈরাগ্য নিরূপণ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদের প্রথম ভাগে 'ত্বং' পদের এবং দ্বিতীয় ভাগে 'তৎ' পদের শোধন করা হইয়াছে।

তৃতীয় পাদে সগুণ বিদ্যায় গুণোপসংহার, এবং নির্গুণ-ব্রহ্মে অপুনরুক্ত পদোপসংহার নিরূপিত হইয়াছে।

চতুর্থপাদে নির্গুণ জ্ঞানের বহিরঙ্গ সাধনভূত আশ্রম যজ্ঞাদি এবং অন্তরঙ্গ সাধনভূত সম দম শ্রবণ-মনননিদিধ্যাসনাদি নিরূপিত হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদে জীবের মুক্তি, দ্বিতীয় পাদে ম্রিয়মান জীবের উৎক্রান্তি, তৃতীয় পাদে উত্তরায়ণ মার্গ এবং চতুর্থ পাদে ব্রহ্মপ্রাপ্তি ও ব্রহ্মলোক নিরূপিত হইয়াছে।

এই গেল মোটামুটি অধিকরণ নির্ণয়।

এইবার বিশেষ অধিকরণ নিরূপণ করিতে গিয়া শঙ্করাচার্য্য রামানুজাচার্য্য ও চৈতন্য মহাপ্রভুর মত ভেদ বুঝিতে পারিব।

প্রথম অধ্যায়, প্রথম পাদ।

| | | |
|---|---|---|
| প্রথম অধিকরণ | | সূত্র ১—ব্রহ্মের বিচার্য্যত্ব। |
| দ্বিতীয় | ঐ | সূত্র ২—ব্রহ্মের লক্ষণ "জন্মাদ্যস্য যতঃ" |
| তৃতীয় | ঐ | সূত্র ৩—ব্রহ্ম বেদের কর্ত্তা এবং বেদৈকমেব |
| চতুর্থ | ঐ | সূত্র ৪—বেদান্ত ব্রহ্ম বোধক এবং ব্রহ্মেই পর্য্যবসিত। |
| পঞ্চম | ঐ | সূত্র ৫-১১—অচেতন প্রধান জগতের কর্ত্তা নহে |

এই পাঁচ অধিকরণ পর্য্যন্ত কোন বিবাদ নাই,

ষষ্ঠ অধিকরণ লইয়া সামান্য বিবাদ। অধিকরণের প্রকৃত অর্থ লইয়া কোন বিবাদ নাই। সূত্র ১২-১৯। তৈত্তিরীয় উপনিষদে "আনন্দময়" শব্দ পরমাত্ম বাচক। সেইরূপ ছন্দোগ্য উপনিষদে উল্লিখিত "আদিত্যান্তর্গত হিরণ্ময় পুরুষ" "আকাশ" "প্রাণ" ও "জ্যোতিঃ" শব্দ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বাচক। (সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম অধিকরণ। সূত্র ২০—২৭)।

সেইরূপ কৌষীকতী উপনিষদে "প্রাণোঽস্মি" ইত্যাদি বাক্যে প্রাণ শব্দ ব্রহ্ম বাচক। (১১ অধিকরণ সূত্র ২৮—৩১)।

প্রথম অধ্যায়, দ্বিতীয় পাদ।

ছন্দোগ্য উপনিষদে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত" এই কথা বলিয়া "সক্রতুং কুর্বীত মনোময় প্রাণ শরীরাভা রূপঃ" এইরূপ বলা হইয়াছে। এখন "মনোময়" "প্রাণ শরীরাভারূপঃ" বলিলে জীবাত্মা বুঝায়। কিন্তু পূর্ব্ব অংশে, ব্রহ্মই উপাস্য বলিয়া উপনিষৎ বাক্য রহিয়াছে। তবে কি ব্রহ্ম উপাস্য না জীব উপাস্য? উত্তর ব্রহ্ম উপাস্য। (১ অধিকরণ সূত্র ১—৮)।

কারণ "সত্যকাম," "সত্য সংকল্প," "আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত," এ সকল গুণ জীবাত্মার পক্ষে সম্ভব নহে। ( ২ ও ৩ সূত্র )।

উপনিষদের বাক্যে কর্ম্ম ও কর্ত্তার ভেদ উপলক্ষিত আছে। অর্থাৎ শারীর জীবাত্মা কর্ত্তৃক ব্রহ্ম ( কর্ম্ম ) প্রাপ্ত হন। ভেদ আছে বলিয়াই উপাসক ভাব। "তথোপাস্যোপাসক ভাবোঽপি ভেদাধিষ্ঠান এব।" এইজন্য "মনোময়ত্বাদি" বিশিষ্ট বাক্য শারীর জীবে প্রযুক্ত নহে। ( ৪ সূত্র )।

এক শব্দ দ্বারা জীবাত্মা নির্দ্দিষ্ট হয়। অপর শব্দ দ্বারা পরমাত্মা নির্দ্দিষ্ট হয়। "যথা ব্রীহি বা যবো বা শ্যামাকো বা শ্যামাক তণ্ডুলো বৈবময়মন্তরাত্মান্ পুরুষো হিরন্ময়ঃ"। সতপথ ব্রাহ্মণের এই বাক্যে জীবাত্মা বাচক "অন্তরাত্মান্" শব্দ সপ্তম্যন্ত এবং ঈশ্বর বাচক "পুরুষ" শব্দ প্রথমান্ত। ( ৫ সূত্র ) স্মৃতিতেও জীব ঈশ্বরের ভেদ দর্শিত হইয়াছে। ( ৫ সূত্র )।

শঙ্করাচার্য্য এই ষষ্ঠ সূত্রের টীকা লিখিতেছেন—

স্মৃতিশ্চ শারীর পরমাত্মনো ভেদেন দর্শয়তি "ঈশ্বরঃ সর্ব্ব ভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া" ইত্যাদ্য।

এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই শঙ্করাচার্য্যের মাথা ঘুরিয়া গেল। তিনি দেখেন ব্যাসের সূত্রেত জীব ঈশ্বরের ভেদ সাব্যস্ত হইতে চলিল। আর তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। একবার বেঁকে বসিলেন—"অত্রাহ। কঃ পুনরয়ং শারীরো নাম পরমাত্মনোঽন্যো যঃ প্রতিসিধ্যতে "অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ" ইত্যাদিনা। শ্রুতিশ্চ "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যোঽতোঽস্তি শ্রোতা". ইত্যেবংজাতীয়তা পরমাত্মনোঽন্যমাত্মানং বারয়তি। তথা স্মৃতিরপি: ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত" ইত্যেবং জাতীয়কেতি। অত্রোচ্যতে। সত্যমেবনৈতৎ পর একত্মা দেহেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধ্যুপাধিভিঃ পরিচ্ছদ্যমানো বালৈঃ শারীর ইত্যুপচর্য্যতে। যথা ঘটকরকাদ্যুপাধিবশাৎ অপরিচ্ছিন্নবৎ অবভাসন্তে তদ্বৎ। তদপেক্ষয়া চ কর্ম্মত্ব কর্ত্তৃত্বাদি ভেদ ব্যবহারো ন বিরুধ্যতে প্রাক্ "তত্ত্বমসি ইত্যাত্মৈক ত্বোপদেশ গ্রহণাৎ। গৃহীতে ত্বাত্মৈকত্বে বন্ধমোক্ষাদি সর্ব্বব্যবহার পরিসমাপ্তিরেব স্যাৎ।"

"পরমাত্মা হইতে বিভিন্ন এ শরীরাত্মা আবার কে? বেদান্ত সূত্রেই ত শরীর নিবারিত হইয়াছে। শ্রুতি ও স্মৃতির এক আত্মার নির্দ্দেশ

করে। পরমাত্মাই দেহেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি উপাধি কর্তৃক পরিচ্ছিন্ন হইয়া মুর্খগণ কর্তৃক 'শারীর বলিয়া কথিত হন। ঘট করকাদি দ্বারা বাস্তবিক অপরিচ্ছিন্ন হইলেও আকাশ পরিচ্ছিন্নের ন্যায় বোধ হয়। যতদিন "তত্ত্বমসি এই উপদেশ আমরা গ্রহণ করিতে না পারি, ততদিনই ভেদ ব্যবহার। আত্মৈকত্ব জ্ঞান হইলে বন্ধ মোক্ষাদি সকল ব্যবহারই বিনষ্ট হইয়া যায়।"

ভাষ্যকারের সহিত এ পর্য্যন্ত রামানুজাচার্য্যের কোন বিরোধ হয় নাই। এইবার তাঁহাকে অনুধারণ করিতে হইল। সূত্রকার ভেদ দেখাইতেছেন। ভাষ্যকার অভেদ দেখাইতেছেন। ভেদই সত্য হউক, অভেদই সত্য হউক, বা ভেদাভেদই সত্য হউক, সূত্রের এইরূপ ভাষ্য সত্য হইতে পারে না।

জীবস্য ইব পরস্যাপি ব্রহ্মণঃ শরীরান্তবর্ত্তিত্ব মর্ভ্যুপগতং চেৎ তদ্বদেব শরীর সম্বন্ধ প্রযুক্ত সুখদুঃখোপভোগ প্রাপ্তি রিতি চেন্ন। হেতুবৈশেষ্যাৎ ন হি সরীরান্তর্বর্ত্তিত্বমেব সুখদুঃখোপভোগ হেতুঃ অপিতু পুণ্যাপাপরূপ কর্ম্ম পরবশত্বং তচ্চাপহতপাপ্মণঃ পরমাত্মনো ন সম্ভবতি।

রামানুজ বলেন জীব কর্ম্মবশ, পরমাত্মা কর্ম্মবশ নহেন। জীবও ঈশ্বরের এই ভেদ।

যদি মহাপ্রভু চৈতন্য দেব ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য করিতেন, তাহা হইলে তিনিও বলিতেন জীব ও ঈশ্বরের ভেদ কল্পিত নহে।

ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন জ্বলিত জ্বলন
জীবের স্বরূপ যেন স্ফুলিঙ্গের কণ।

অংশ অংশীর স্বরূপ স্বরূপগত অভেদ থাকিলেও, ভেদগত ব্যবহার নষ্ট হয় না। অন্ততঃ যে একাত্মতার কথা শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন, সে একাত্মতার কথা এ পর্য্যন্ত সূত্রে কিছুই নাই।

"The Sutras of this adhikarana emphatically dwell on the difference of the individual sand the highest self, whence Sankara is obliged to add on explanation in his commentary on Sutra 6 to the effect that the difference is to be understood as not real, but as due of the false limiting adjuncts of the highest self."

*Thebeaut's Introduction of the Commentaries of Sankoara* charya.

( ক্রমশঃ )

শ্রীপূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ।

# পন্থা।

সামান্য কীট হইতে দেবতা পর্য্যন্ত পন্থা পাইবার জন্য ব্যাকুল। সে পন্থা কিসের? দুঃখ নিবৃত্তির বা মুক্তির। দুঃখ নিবৃত্তি বা মুক্তির জন্যই পন্থার আবশ্যক। মুক্তি দুই প্রকার—সামান্য ও ক্ষণিক দুঃখের বন্ধন হইতে মুক্তি ও দুঃখের আত্যন্তিক বা চরম নিবৃত্তি, নির্ব্বাণ বা বিদেহলয়।

কিন্তু সে পন্থা কি এবং কোথায়?

"বেদাবিভিন্নাঃ স্মৃতয়োবিভিন্নাঃ নাসৌমুনির্যস্যমতং ন ভিন্নং।

ধর্ম্মস্য তত্বং নিহতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ।

কি বিষম সমস্যা! বেদ পন্থা হইলেন না, স্মৃতি হইলেন না, মুনিদিগের মত ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া তাহাও পন্থা হইল না, মহাজনের প্রদর্শিত পথই পন্থা। বেদাচার্য্য স্মৃতিকার মুনিগণ যদি মহাজন না হইলেন, তবে কাহাকে মহাজন বলিয়া ধরিব? জগতে অনেক ধর্ম্মনেতা, শাস্ত্রপ্রণেতা, জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত প্রভৃতি দেখা যায়। কাহার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিব? তবেত পন্থা অসম্ভব হইল! পন্থা না পাইলেও উদ্ধার নাই। সে পন্থা কি?

এই যে সে দিন ভারত রাজধানীতে সমগ্র ভারতের লক্ষ্মী সরস্বতীর সমাগম হইল। অবশ্য স্ব স্ব মতানুযায়ী পন্থা আবিষ্কারের জন্য। জাতীয় সমিতি, কৃষি শিল্প প্রভৃতি কত সমিতি হইল, কিন্তু পন্থা কি আবিষ্কৃত হইয়াছে?

বিদেশী ভাষায় শিক্ষিতা কোন ভারত মহিলা বিদেশী ভাষায় স্ত্রী-স্বাধীনতার জন্য গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। স্বাধীন অর্থাৎ স্ব-অধীন নিজে নিজের অধীন বা তত্ত্বের অধীন না হইয়া আত্মের অধীন হওয়া। তত্ত্ব চতুর্ব্বিংশতি দশইন্দ্রিয়, পাঁচতন্মাত্রা, পাঁচমহাভূত, মন; অহং মহত্তত্ব (বুদ্ধি) ও প্রকৃতি। কিন্তু সে আত্ম পদার্থ কি?

নাহোহং দেহোনেন্দ্রিয়ান্যাং তরঙ্গং
নাহোঙ্কার প্রাণ বর্গো ন বুদ্ধিঃ।
দারাপত্যাক্ষেত্র বিত্তাদি দূরে
সাক্ষীনিত্যঃ প্রত্যাগয়া শিবোহং॥

সর্ব্বতোভাবে এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অধীন হইয়া, বিলাসিতা ও আত্মম্ভরীতার অধীন হইয়া এমন কি পরিচারক হইতে জগতের সকল বস্তুর অধীনতা হইতে আপনাকে উদ্ধার না করিয়া অর্থাৎ নিজে পূর্ণমাত্রায় পরাধীন থাকিয়া পরের স্বাধীনতার জন্য চিৎকার কেন? যাহারা অবরোধে সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতা ভোগ করে; তাহাদিগকে বিদেশী রীতি অনুকরণে রাস্তায় ছাড়িয়া দেওয়ার প্রয়াস মঙ্গলজনক নহে।

উল্লিখিতের কিছুই যদি পন্থা না হইল, তবে কি পন্থা নাই? এমন কি কোন পন্থা নাই যাহাতে এক বিজ্ঞানে সমস্ত বিজ্ঞানের ন্যায় এক পন্থার সমস্ত পন্থা পাওয়া যায়? অবশ্য আছে। তাহা প্রকৃত শাস্ত্র ও তাহার প্রকৃত অর্থ উদ্ধার ও বিপথে অগ্রগামী জনসাধারণকে সেই পথে আনয়ন করা। বহু জন্মের অভ্যস্ত বিপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন বহু সময় ও কষ্টসাধ্য হইলেও করিতে হইবে। যিনি যাহাই বলুন অন্য পন্থা নাই। কেবল বৃক্ষের ছায়া ছেদনে বৃক্ষ নষ্ট হয় না নূতন নূতন শাখা জন্মে, শাখার সহিত মূল নষ্ট করা চাই।

সেই শাস্ত্রে কি শিখিবে? শিখিবে মানুষের জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, কেবল দেহেরই জন্ম মরণ। সুতরাং মৃত্যু ভয়ে ভীত হইবেন না,—আত্মা নাত্ম জ্ঞান হইবে, পরনির্ভর (গোলামী) ছাড়িয়া আত্মনির্ভর শিখিবে, কর্ত্তব্যপথে নির্ভীকভাবে অগ্রসর হইবে।

যাহার সামান্য একটু ছায়া লইয়া ভারতীয় ও বিদেশীয়গণ নানা অর্থে নানা ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় সৃষ্টি করিতেছেন ও করিয়াছেন, পিতা মাতা হইতে হিতৈষিণী সেই শ্রুতি কোথায়? শ্রুতি জ্ঞানে অধিকারী করিবার জন্য যে স্মৃতি অর্থাৎ কর্ম্ম বা যোগশাস্ত্রের সৃষ্টি, তাহারই বা দশা কি হইয়াছে? দর্শনশাস্ত্রের কি গতি হইল? নিম্ন অধিকারীগণকে পথে আনিবার জন্য গল্পচ্ছলে যে পুরাণ প্রণয়ন তাহাও বিফল হইল। তন্ত্র ও গীতা গুলি অর্থহীন হইয়া লোকের স্ব স্ব মতানুযায়ী শ্লোক উদ্ধৃত করার উপকরণ হইলেন। পুরাণকার ব্যাসদেব যে ভয়ে ভীত হইয়াছিলেন কালে তাহাই ঘটিল। পাছে লোকে পৌরাণিক প্রবন্ধ গুলিকে সত্য মনে করিয়া বিপথে গমন করে, এই ভয়ে তিনি পুরাণ প্রণয়নের পর বলিয়াছিলেন :—

রূপংরূপ বিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতং
স্তুত্যানির্ব্বাচনীয়তাখিল গুরো দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং, জগদীশঃ তদ্বিকলতা দোষত্রয়ং মৎকৃতং॥

তুমি রূপহীন আমি ধ্যানে তোমার রূপ কল্পনা করিয়াছি, তুমি অনির্ব্বচনীয় আমি স্তোত্র দ্বারা তোমার অনির্ব্বচনীয়তা নষ্ট করিয়াছি, তুমি সর্ব্বব্যাপী আমি তীর্থ যাত্রার উপদেশ দ্বারায় তোমার সর্ব্বব্যাপিত্ব নিরাকৃত করিয়াছি, ভগবন্ আমার এই তিনটী বিকলতা দোষ ক্ষমা কর। ব্যাস নিজেই রূপ হীনের রূপ কল্পনা, অনির্ব্বচনীয়কে স্তোত্রের দ্বারা ও সর্ব্বব্যাপীকে তীর্থে পাওয়ার উপদেশ দেওয়া দূষণীয় বলিয়া স্বীকার করিলেন। মহর্ষি বেদব্যাস পাগল ছিলেন না, অথচ সেই "বাক্যের" দ্বারাই অনির্ব্বচনীয়ের নিকট ক্ষমা চাহিতেন। ইহার অবশ্য কোন গূঢ় অর্থ আছে। নাম, রূপ, স্তোত্র, দর্শন, নিম্ন অধিকারীর জন্য হইলেও উহা দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না। কিন্তু আমরা এমনি হতভাগ্য যে তাঁহার সেই কল্পিত দেবমূর্ত্তির পূজা স্তোত্র কীর্ত্তনাদি ও তীর্থ যাত্রারদ্বারা ঈশ্বর প্রাপ্তির আশা করিতেছি।

"ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ।
সত্য মেকং পরং ব্রহ্ম বিদিত্বৈবং সুখীভবেৎ॥"

এবং

"উত্তমো ব্রহ্ম সদ্ভাবো ধ্যান ভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোঽধমো ভাবো বাহ্য পূজা-ধমাধমঃ॥"

ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত যদি সমস্তই মায়া কল্পিত মিথ্যা হইল তবে কাহার পূজা করিয়া মরি? উত্তম বর্ণাভিমানী হইয়া অধমাধম বাহ্য পূজা ও অধম স্তুতি জপের যদি আশ্রয় লইলাম, তবে অধমেরা কোথায় যাইবে? কল্পিত পৌরাণিক গল্প গুলিকে সত্যভাবে গ্রহণ ও প্রচার দ্বারা ভক্ত, বক্তা, কথক, যাত্রা প্রভৃতি অভিনেতৃগণ সমাজের কি অনিষ্ট সাধনই না করিতেছেন! পুরাণের এই সকল রূপক অপসারিত করিয়া তাহার

প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য জন সাধারণকে অবগত করার যুক্তিযুক্ত উপায় উদ্ভাবন কি নেতাদিগের সর্ব্বপ্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য নয় ?

অধুনা ভারতের হিতসাধন মন্ত্রে দীক্ষিত যে সকল নেতৃবৃন্দ দুরবস্থার চরম সীমা প্রাপ্ত ভারতের দুঃখ দৈন্য যথাসাধ্য বিমোচনের জন্য নিরন্তর ব্যাপৃত রহিয়াছেন, যাহারা পরস্পর বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ভারতীয় ব্যক্তি নিচয়কে একচ্ছত্রতলে সন্নিবেশিত করিবার জন্য বিবিধ পন্থার উদ্ভাবন করিতেছেন তাঁহারা মূল বিষয়টীর আলোচনায় বিরত রহিয়াছেন। ধর্ম্মের দ্বারাই মনুষ্যের জীবন বিশেষ ভাবে গণ্ডীবদ্ধ। সেই বিভিন্ন ধর্ম্ম মতের মধ্যে প্রকৃত তত্ত্ব কি নিহিত আছে যাহা সর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বীর সম্যক আশ্রয়ের বিষয় হইতে পারে, তাহার উপায় নির্দ্দেশ সাধারণকে বুঝাইতে হইবে। শাস্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া সাধারণে কল্পনা বা রূপকের অনুসরণ করতঃ অনন্ত চিন্তার আধার মনকে সঙ্কীর্ণ ও ক্ষুদ্র বিষয়ে নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এইরূপ সঙ্কীর্ণ প্রাণ লইয়া স্বদেশ হিতসাধনরূপ মহদ্ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য কয়জন হৃদয়ের সহিত অগ্রসর হইবেন ?

"যথাহর্করশ্মি সংযোগাদর্ককান্ত হুতাশনং।
আবিঃ করোতি তূলেষু দৃষ্টান্ত সতু যোগিনঃ॥"

স্মৃতিকারের কি উচ্চভাব কি গভীর চিন্তা! আতস পাথর দ্বারা বিস্তৃত সূর্য্য কিরণ কেন্দ্রীভূত হইয়া অগ্নি আবিষ্কার দেখিয়া সর্ব্বত্রগামী বুদ্ধিকে কেন্দ্রীভূত করিতে পারিলে জ্ঞানাগ্নি আবিষ্কৃত হয় ও তদ্দ্বারা অজ্ঞান দগ্ধ হয় ও সর্ব্বজ্ঞ হওয়া যায়। ইহা হইতেই ত্রাটক ও চাক্ষুষী বিদ্যার সৃষ্টি, যাহার সামান্য কণা বাজীকর প্রভৃতির অর্থোপার্জ্জনের পথ হইয়াছে। কথাটা শুনিতে যেমন সহজ কাজে পরিণত করা তেমনি কঠিন। এইজন্য অধিকারী অনুসারে ক্রমে সমাধি, ধ্যান, ধারণা প্রত্যাহার, প্রাণায়াম, আসন, নিয়ম, ও যমের ব্যবস্থা। ব্রহ্মচর্য্য যমের একটী অঙ্গ। ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ শুক্রধারণ। মৃৎভাণ্ডস্থ দুগ্ধদণ্ড দ্বারা মথিত করিলে যেমন মাখন উৎপন্ন হইয়া ঘোল মাত্র অবশিষ্ট থাকে, সেইরূপ দেহভাণ্ডস্থ রক্ত স্ত্রী ( পরস্ত্রী ) চিন্তনরূপ মন্থন দণ্ড দ্বারা মথিত হইলে দেহের শোণিতকে ঘোল স্বরূপ করিয়া দেয় ও দেহকে অসার করিয়া ফেলে। কিন্তু লোকে

ব্রহ্মাকে সার বস্তু মনে করিয়া কি গর্হিত কার্য্য না করিতেছে। এ কল্পিত ঈশ্বরকে ষোড়শ সহস্র গোপীনি-বল্লভ ও স্ত্রীলোকের বস্ত্রহারী করিয়া, পরস্ত্রী লইয়া দিবারাত্রি ক্রীড়া করাইয়া, কখন তাঁহাকে সেব্য সেবক স্বামী স্ত্রী, এমন কি উপপতি উপপত্নী ভাবে পূজা করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের চরম সীমায় উপস্থিত হইতেছে।

ভক্তি কি? ঈশ্বরে পরানুরক্তি। "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে"। কিন্তু ঈশ্বর না বুঝিলে ভক্তি কি রূপে হয়। জন্মজ্ঞানী মহামুনি কপিল বলিলেন "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাৎ"। যিনি যাহাই বলুন ইহাতে কপিলের ঈশ্বর নাস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। তাহার মনের ভাব ঈশ্বর প্রমাণ প্রাপ্য নহেন। তত্ত্বাতীত না হইলে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না।*
কারণ তিনিঃ—

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং
অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং অবাঙ্মনসো গোচরং

নিষ্ক্রিয়ের দ্বারা কার্য্যের আশা ও বাক্যমনের অগোচরকে স্তোত্র কীর্ত্তন জপাদির দ্বারা পাওয়ার দুরাশায় আমরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।

আবার ভগবান পতঞ্জলি বলিলেনঃ—

"ক্লেশ কর্ম্ম বিপাকাশৈরপরামৃষ্ট পুরুষ বিশেষঃ ঈশ্বরঃ।"

ক্লেশ (অস্মিতা, অবিদ্যা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ) কর্ম্ম ও কর্ম্মফল ভোগ আশয়ের (সংস্কারের) অধীন যিনি নন, তিনিই ঈশ্বর। উভয় ঋষির ঈশ্বর সিদ্ধান্ত কথায় ভিন্ন হইলেও প্রকৃত পক্ষে প্রায় এক। জগতে সমস্ত জাতিরই কল্পিত ঈশ্বর আছেন। তাহাদের কোন্ ঈশ্বর ক্লেশাদির অধীন নহেন?

"ভক্তিকর বিশ্বাস কর" এই কথায় আজ দেশ পূর্ণ।

ভক্তি বিশ্বাস কি করা যায়! উহা হৃদয়ের জিনিস, আপনি হইবার জিনিস, করিবার জিনিস নয়। ভক্তি গুণের অধীন! গুণ দেখিলে বা গুণ আছে বলিয়া বিশ্বাস হইলে ভক্তি আপনিই আসিবে। বিশ্বাস বস্তুর অধীন, বস্তু প্রমাণের (প্রত্যক্ষ, অনুমান, আগম) অধীন। প্রমাণ হইলেই বস্তু এবং বস্তু থাকিলে বিশ্বাস অনিবার্য্য। অন্যথা ভক্তি বিশ্বাস হয় না।

---

* লেখকের কি ভয়ানক ভাব। পং সং।

চিত্ত বৃত্তিকে কেন্দ্রীভূত করিবার জন্য ধ্যান। ধ্যানের জন্য ধারণা, কোন বহিঃ করণ বা অন্তঃকরণে, ললাটবিন্দু, ভ্রূমধ্য, বা হৃদপদ্ম নাসাগ্র সহস্রারে বা অন্যত্র ধারণা। এবং সামর্থানুসারে শালগ্রাম শিলা বা অন্য কোন দেবমূর্ত্তিতে ধারণা। এখন সকলের কি অবস্থা? দেবমূর্ত্তিতে ধারণার পরিণতি এখন কোথায়? এখনকার ভক্তি স্রোত কোথায় গিয়া পড়িয়াছে?

"যদেকং নিষ্কলং ব্রহ্ম নির্ব্বিকল্পং নিরঞ্জনং
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।"

তৎপদ সেই পদ। এক নিষ্কল বিকল্প-শূন্য ব্রহ্মপদ, ব্রহ্মরূপ পদ বা সম্পত্তি বা ঐশ্বর্য্য। অর্থাৎ যে গুরু ব্রহ্মরূপ সম্পদ বা ঐশ্বর্য্য দেখান বা ব্রহ্মজ্ঞান দান করেন তাঁহাকে নমস্কার। সেই "তৎপদ" এখন "তস্তপদ" হইয়া ক্রমে হরিপদ, কালীপদ, হরির চরণ কালীর চরণ,—রাঙা চরণ, যুগল চরণ হইয়াছে। সেই চরণ আবার অরবিন্দ রূপ ধারণ করিয়া মকরন্দ ক্ষরণ করিতেছেন ও আমরা সেই চরণার বিন্দের মকরন্দ পানে মাতোয়ারা হইতেছি।

আমরা জন্মের পর হইতেই সন্তানগণকে কি শিখাইতেছি? প্রথমে জুজুর ভয়, পরে ভূতের ভয়, পরে ঠাকুরমার গাঁজাখোরী গল্প এবং শেষে পুরাণের হনুমান জাম্বুবান প্রভৃতির চিত্র ও ভক্তি স্মৃতিশাস্ত্রের কু অর্থ তাহাদের হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া এক একটী অদ্ভুত জীবের সৃষ্টি করিতেছি। প্রকৃত বীর পুরুষ বা বা বীর রমণী প্রস্তুত করিতে কয়জন চেষ্টা করিয়া থাকি? শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য ত্যাগ শিক্ষা দান, তৃণ হইতে হইতে জগতের সমস্ত ত্যাগ। ত্যাগ না শিখিলে বীরত্ব আসিবে না। আমরা রামচন্দ্রের পূজা করি। কিন্তু রাম আসিয়া কি কখনও কাহাকে উদ্ধার করিয়াছেন? রামের পূজা তাঁহারি চরিত্র অনুকরণ ও তাঁহার পন্থা অনুসরণ। রাম সেবক কয় জনে তাঁহার বাল্যের নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক ও বৈরাগ্য শিক্ষা করিয়া থাকেন? সঞ্চিত কর্ম্মফল ক্ষয়ের জন্য তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র সংসারে প্রবেশ। সমস্ত শিক্ষা, শক্তি, পিতৃভক্তি, ভেদজ্ঞান শূন্যতা ও বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। পরিশেষে ত্যাগ, সীতা

ত্যাগ, লক্ষণ ত্যাগ, রাজ্যও সমস্ত ত্যাগ। আমরা কি করিয়া থাকি একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই জানা যায়। জগতের শ্রেষ্ঠ বিষ্ণু অবতার রামচন্দ্র চণ্ডালের অন্ন গ্রহণ করিলেন চণ্ডালকে কোল দিলেন। আমরা বৃথা জাত্যাভিমানী হইয়া অন্তকে কত ঘৃণা করি! রামচন্দ্র রক্ষা করিতে সর্ব্বতোভাবে সমর্থ হইয়াও, সীতা ও সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিলেন, আমরা সর্ব্ব-ত্যাগ দূরে থাকুক সামান্ত জিনিসের মমতা ত্যাগ করিতে পারি না। যেদিন ভারতবাসী এই ত্যাগ শিক্ষা করিবেন, যেদিন ভারতললনা স্নেহ বিসর্জ্জন দিয়া পুত্রকে কর্ত্তব্য পালনে প্রেরণ করিবেন, এবং তাহাতে পুত্রের মৃত্যু হইলেও হাসিতে হাসিতে স্বীয় স্তনদুগ্ধ সার্থক হইয়াছে মনে করিবেন, যেদিন সকলে বুঝিবেন জীবের মৃত্যু নাই; দেহেরই মরণ সুতরাং মৃত্যু ভয়ে ভীত হইবেন না। সেই দিন ভারতের শুভদিন আসিবে, সত্যযুগ পুনরাগমন করিবে। কিন্তু একমাত্র সত্যশাস্ত্রের সত্য মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম ও তাহা কার্য্যে পরিণত করা ভিন্ন তাহা হইবার নহে। নারায়ণ সাগর জলে প্রবেশ দানব হিরণ্যাক্ষকে সংহার করিয়া বেদ উদ্ধার করিয়াছিলেন। কবে আমাদের নেতৃগণ নারায়ণ রূপে অজ্ঞানের অতল জলে প্রবেশ করিয়া দানবদলন করিয়া জ্ঞানরূপী শাস্ত্রকে উদ্ধার করিবেন! কবে ক্ষণস্থায়ী জীবনে বৃথা জাতি যশঃ ধনাভিমান ত্যাগ করিয়া সমস্ত লোককে ভ্রাতৃভাবে দেখিবেন! কবে

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ

ও

জন্মনা জায়তে শূদ্র সংস্কারাদ্দ্বিজমুচ্যতে
বেদজ্ঞানাদ্ভবেদ্বিপ্র ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ।

ইহার প্রকৃত অর্থ গ্রহণ ও প্রতি পালন করিবেন। কবে, বুঝিবেন গুণকর্ম্মে চাতুর্ব্বর্ণ্য বর্ত্তমান জাতি ভেদের সহিত ইহার সম্বন্ধ নাই ও যদি "জন্মনা জায়তে শূদ্র" হইল, তবে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতি কিরূপে শাস্ত্রানুযায়ী হইতে পারে? সত্য বেদের পর সত্য অর্থে কেবল সত্য কথন নহে; যাহা সত্য তাহারই আশ্রয় গ্রহণ। কবে আমরা সেই সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিব, সত্য শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ বুঝিব ও সকলকে বুঝা-

হব। তাহা হইলে এরূপ উপায়ে সমস্ত সমিতির কার্য্য হইবে। ভারত সন্তানগণ যেদিন ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহারই পন্থা উদ্ভাবনা ও সেই পথে ধাবিত হইবেন, সেই দিন সমস্ত দুঃখের অবসান হইবে। ভারতের কি সেদিন আর আসিবে?

শ্রীসারদা চরণ বসু

---

# পঞ্চীকরণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সেই সময়ে ঐ নদী তটোপরি দৈব ইচ্ছাতে এক তৃতীয় পুরুষ আসিয়া পহুঁছিল। সে চক্ষে দেখিতে পাইত, আর চলিতে ও সমর্থ ছিল এবং সন্তরণেও বিশেষ পারদর্শী; তদ্ধেতু সে পারগমনশীল ব্যক্তিকে বলিল যে, আমাব সহিত যদি আইস, আমি তাহা হইলে তোমাকে পারে লইয়া যাইতে পারি। তদনন্তর উহার বচনে বিশ্বাস (ভরসা) আসিল এবং উহার সহায়তায় সে নদী পার হইয়া নিজের দেশে পহুঁছিল। সিদ্ধান্ত। ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছাবান ব্যক্তিকে "স্বদেশ গমনশীল ব্যক্তি" বুঝিতে হইবে। জন্মমরণরূপী প্রবাহ যাহাতে আছে, তাহাকেই সংসাররূপী "নদী" বলিয়া জানিবে। উহার "পরপার" স্থানে, পরমাত্মার প্রাপ্তি বুঝিতে হইবে। নদীর কিনারার উপরে "অন্ধ" ব্যক্তির স্থানে, শ্রোত্রীয় অর্থাৎ কেবল শাস্ত্রজ্ঞ বুঝিতে হইবে। উহার শাস্ত্রার্থ নিরূপণ করণরূপী "পদের" সামর্থ (চলন শক্তি) আছে। পরন্ত (অন্ধত্ব হেতু) পরপারের তটরূপী ব্রহ্মস্বরূপকে দেখিতে পার না। সেই কারণ বশতঃ কেবলমাত্র শ্রোত্রিয় গুরুর আশ্রয়ে "স্বরূপ" প্রাপ্তি

---

* লেখকের মতের সহিত আমাদের মিল্ নাই। লেখকে মনে করেন যে রূপ বা form ত্যাগ করিলেই বুঝি হঠাৎ একেবারে ব্রহ্মভাব প্রকট হইবে। রূপের কার্য্য হইলেই রূপ পড়িয়া যায়; কেবল রাগ করিয়া ভাঙ্গিলে যায় না। পং সং।

হওয়া যায় না। "গুরুর" স্থলে, কেবল ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যানিয়ে। তাহার গুরুকৃপাতে ব্রহ্মস্বরূপের অপরোক্ষ জ্ঞানরূপ চক্ষু আছে, উহাতে সংসার নদীর পরপার যে ব্রহ্ম তাঁহাকে যথার্থ অবগত আছে, কিন্তু তাহার পঙ্গুর অর্থাৎ কেবল ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির বেদ বাক্যের প্রমাণ পূর্ব্বক সযৌক্তিক উপদেশ করণ রূপী "পদ" নাই তাহাতে সে যদি অন্যকে ব্রহ্ম (স্বরূপের) প্রাপ্তির উপায় দেখাইয়া বলে যে, "এই সংসার রূপী নদী অতি তুচ্ছ এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহে গোষ্পদের মত (অনায়াসে) উত্তীর্ণ হইবার সুলভতা আছে। আর পরমেশ্বর এক, অদ্বিতীয়, অনন্ত অসঙ্গ, অক্রিয়, নির্ব্বিকার, নিরাকার, নির্গুণ, নিত্য, প্রত্যগাত্মা, দেহত্রয় হইতে বিলক্ষণ, অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী, পঞ্চকোষাতীত, ব্যাপক দ্রষ্টা, স্বয়ং জ্যোতিঃ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ হয়েন। তাঁহার (পরমেশ্বরের) স্বরূপ জ্ঞানদ্বারা সংসার নদীর পরপারে অক্লেশে সুখে যাইবে।" তথাপি উহার উক্তি সত্য উপদেশ হইলেও, উহার (ঐ ব্রহ্মনিষ্ঠের) বাক্যে অজ্ঞ মুমুক্ষুর বিশ্বাস হয় না; কারণ, সেই বক্তা ব্যক্তি শ্রুতি ও স্মৃতি বাক্যের কোন প্রমানই দিতে বা কিছুই বলিতে পারে না। এইজন্য তাহার বাক্যে সন্দেহ হইয়া থাকে। স্বরূপতঃ, দৃষ্টান্তে নদী পার-গমনশীল ব্যক্তি যেমন নেত্রবান ও পদবান ব্যক্তির সহায়তায় নদী পার হইল, সেইরূপ শ্রোত্রীয় এবং ব্রহ্ম নিষ্ঠ, এই দুই বিশেষণ যুক্ত গুরুর সহায়তাতে সংসাররূপ নদীর পারে যাইতে পারা যায়। অতএব সেই-রূপ গুরুর শরণে যাইতে হইবে।

আর অথর্ব্ব বেদের * মুণ্ডকোপনিষদে যদ্রূপ জিজ্ঞাসু সমিধাদি উপহার-হাতে লইয়া বিনয়পূর্ব্বক পরমতত্ত্বজ্ঞান পাইবার জন্য "শ্রোত্রিয় এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ" —এই দুই বিশেষণযুক্ত গুরুর শরণে যাইতে হয়, এরূপ স্পষ্ট নিরূপণ করিয়াছেন। তদ্রূপ ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়েও শ্রীকৃষ্ণের উক্তি আছে,—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

গুরুকে সাষ্টাঙ্গে নমস্কার করিয়া, তথা গুরুর সন্নিধানে, বন্ধকি? মোক্ষ

---

* পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদ মায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।

কি? বিদ্যা কাহাকে বলে? অবিদ্যা কাহাকে বলে? আত্মা কি? পরমাত্মা কি এবং উঁহার একতা কিরূপে জানা যায়? এইরূপ প্রশ্ন করিয়া ও গুরুকে সেবা করিয়া, সুপ্রসন্ন গুরু সন্নিধানে, পরম শ্রেষ্ঠ মোক্ষের সাধন

---

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভি গচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥ ১২॥
তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্
প্রশান্ত চিত্তায় সমন্বিতায়
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদসত্যং
প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্ম বিদ্যাম্॥ ১৩॥

ইতি প্রথমমুণ্ডকে দ্বিতীয় খণ্ডঃ।

কর্ম্মলব্ধ লোক সকল পরীক্ষা করিয়া, ব্রাহ্মণ বৈরাগ্য অবলম্বন করিবেন; কর্ম্ম দ্বারা নিত্য পদার্থ লাভ করা যায় না। তাহা (অর্থাৎ নিত্যবস্তু, জানিবার জন্ত তিনি সমিধ্ (অর্থাৎ হোমাগ্নি জ্বালনার্থ কাষ্ঠ) হস্তে লইয়া বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট যাইবেন। ১২।

সেই বিদ্বান্ সম্যক্‌রূপে প্রশান্তচিত্ত, শমগুণান্বিত, তদীয় সমীপগত ব্যক্তিকে যদ্দ্বারা সেই অক্ষয়, সত্য পুরুষকে জানা যায় সেই ব্রহ্মবিদ্যা যথাবৎ বলিলেন। ১৩। ইতি মুণ্ডকোপনিষদ্। কিরূপে জানাযায়? এই

কর্ম্মচিতান্ (কর্ম্মলব্ধান্) লোকান্ পরীক্ষ্য ব্রাহ্মণঃ নির্ব্বেদং বৈরাগ্যম্ আয়াৎ (কুর্য্যাৎ); কৃতেন (কর্ম্মণা) অকৃতঃ (নিত্যঃ পদার্থঃ) নাস্তি (ন লভ্যঃ ইত্যর্থঃ)। তৎবিজ্ঞানার্থং সঃ সমিৎপাণিঃ (সমিদ্ধ-হোমাগ্নি জ্বালনার্থং কাষ্ঠস্য তদ্‌গৃহীত হস্তঃ সন্) (শ্রোত্রিয়ং (বেদজ্ঞং) ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুম্ এব অভিগচ্ছেৎ (তৎসমীপং গচ্ছেৎ ইত্যর্থঃ)॥ ১২॥

সঃ বিদ্বান্ তস্মৈ সম্যক্ প্রশান্ত চিত্তায় সমন্বিতায় উপসন্নায় (উপগতায়, সমীপং গতায়) [পুরুষায়] যেন অক্ষরং সত্যং পুরুষং বেদ (বিজানাতি) তাম্ ব্রহ্মবিদ্যাং তত্ত্বতঃ (যথাবৎ) প্রোবাচ॥ ১৩॥

রূপ প্রশ্ন করিয়া ও গুরুকে সেবা করিয়া, প্রসন্ন গুরু সন্নিধানে, পরম শ্রেষ্ঠ মোক্ষের সাধন অদ্বিতীয় পরমাত্মার যে জ্ঞান, উঁহাকে তুমি জানিবে।

অদ্বিতীয় পরমাত্মার যে জ্ঞান, উহাকে তুমি জানিবে; আর জ্ঞানী অর্থাৎ শ্রোত্রিয়, তত্ত্বদর্শী অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ এইরূপ যে গুরু তিনি তোমাকে জ্ঞানোপদেশ দিবেন। তথা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে প্রবুদ্ধ নামক যোগেশ্বর, জনক রাজার প্রতি কহিয়াছেন,—

তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।

শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥ ১ ॥

যে কারণ, ইহলোক ও পরলোকের বিষয় ভোগ সর্ব্বকর্ম্ম জন্য হইলেও নাশবান্ এবং দুঃখদায়ক হয়; সেইজন্য উত্তম (নাশ রহিত পরম সুখ-রূপ) শ্রেয় (মোক্ষ) জানিবার ইচ্ছাবান যে মুমুক্ষু পুরুষ, সে, বেদের সত্যার্থ বেত্তা, শ্রোত্রিয় এবং পরব্রহ্মের অপরোক্ষানুভবে জ্ঞাত, ব্রহ্ম-নিষ্ঠ ও শান্তবান, এইরূপ গুরুর শরণে যাইবে।

শিষ্য। এইরূপ গুরুর শরণে যাইয়া কি করিতে হইবে?

গুরু।—তাঁহার কাছে যাইয়া নিম্ন লিখিত মত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে,—

"জন্ম মরণ কেম্ টলসে মহারে"

"আমার জন্ম মরণ কিরূপে নাশ হইবে?" হে দয়ালু গুরু! এই সংসারে আমার জন্ম মরণ হইতেছে, উহার কিরূপে (নাশ) শান্তি হইবে? জপ করিয়া, তপ করিয়া, কিম্বা তীর্থ করিয়া? অথবা যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারা নিবৃত্তি হইবে? না অন্য কিছু সাধন আছে? এবং সে সময়ে (অর্থাৎ প্রশ্ন সময়ে) আমি কে? এরূপ বিচার করা চাই। আর এই বিচার করিয়া গুরুকে জিজ্ঞাসা করিবে যে, "আমি কে হই?' এই স্থূল দেহ আমি, কি ইন্দ্রিয়গণ আমি? কি প্রাণ মন অহঙ্কার আমি? কি এই সকল সমুদয়ই আমি? অথবা এই সকল হইতে আমি কি পৃথক্? তাহা কৃপা (অনুগ্রহ) করিয়া বলুন।

এইরূপ শিষ্যের জিজ্ঞাসা বচন শুনিয়া গুরু জন্ম মরণ বিনষ্ট হইবার উপায় নির্দ্দিষ্ট করিতেছেন ॥ ২ ॥

সদ্‌গুরু কহে স্ব স্বরূপ জ্ঞান এটলে,

তারা জন্ম মরণ টলশে এ প্রমাণ।

তারা জন্ম মরণো কাগল কাটে,
সদ্‌গুরু বচনে বিশ্বাস রাখে এমাটে ॥ ৩ ॥

সদগুরু বলিতেছেন, তুমি তোমার স্বরূপকে জানিয়া লও, (চিনিয়া লও) অর্থাৎ "আমি সচ্চিদানন্দরূপ; দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির সাক্ষী, প্রত্যগাত্মা, আর দেহ ইন্দ্রিয়াদি আমি নহি তথা দেহের ধর্ম্ম বর্ণ আশ্রমাদি, তথা ইন্দ্রিয়গণের ধর্ম্ম, অন্ধ্য বধিরতাদি, উহাও আমার স্বরূপে নাই; কেবল শুদ্ধ চৈতন্ত স্বরূপ আমি। এইরূপ জ্ঞান যখন তোমার দৃঢ় হইবে, সেই সময় (সেই মুহূর্ত্তে) তোমার জন্ম মরণ বিনষ্ট (নিবৃত্তি) হইবে। ইহা প্রমাণ সিদ্ধ কথা। এই প্রকার, অনেক শ্রুতিতে ও কথিত আছে যে, "জ্ঞান হইতে মোক্ষ হইয়া থাকে।" "সেই আত্মাকে জানিয়া মৃত্যু হইতে পার হইয়া মোক্ষ হয়।" "জ্ঞান ব্যতীত অন্ত কোন ও পথ মোক্ষ দায়ক নাই।" সেইরূপ স্মৃতিতেও উক্ত আছে যে, "আত্ম-জ্ঞান বিনা কেবল জপ তপ কর্ম্মাদি করিয়া মোক্ষ হয় না; কারণ কি, এই সকল সাধন (বা তপস্তা দ্বারা পাপাশক্তি যাওয়ায় ইহা) কেবল অন্তঃকরণ শুদ্ধির হেতু হয়। পরন্তু, মোক্ষের কারণ কেবল জ্ঞানই হয়।" যেমন, পাক করিতে হইলে, কাট, বাসন (পাত্র), আনাজ (শস্ত) ও তুণআদি সাধন সামগ্রীর আবশ্যক, পরন্তু অগ্নি বিনা পাক সিদ্ধ হয় না। সেইরূপ জ্ঞান বিনা মোক্ষ হয় না; তদ্ধেতু তোমার স্বরূপকে তুমি জানিয়া অর্থাৎ চিনিয়া লও। উক্ত প্রকারে, এই চৌপা-ইয়ের পূর্ব্বার্দ্ধতে জ্ঞান দ্বারাই জন্ম মরণাদি দুঃখের নিবৃত্তি হয়, এইরূপ কথিত হইয়াছে, তাহা শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয়। এইরূপ নিরূপণ করিয়া উত্তরার্দ্ধতে সেই জ্ঞান হইবার জন্ত, তথা জন্মাদি দুঃখের কারণরূপ পাপাদি কর্ম্মের নিবৃত্তি হইবার জন্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্গুরুর উপ-দেশেতে বিশ্বাস (সন্নিষ্ঠা) রাখিতে হইবে। তাহা নিরূপণ করা হইয়াছে।

"তারা জন্ম মরণনো কাগল কাটে," আর যদি তুমি সদ্গুরুর উপদেশ বাক্যে বিশ্বাস রাখ, তবে তোমার জন্ম মরণের কাগজ ফাটিয়া যাইবে।

শিষ্য। হে মহারাজ! জন্ম মরণের যে কাগজ (দলিল) পুনশ্চ তাহা আবার কি?

গুরু। জীব পাপ পুণ্যাদি যে যে কর্ম্ম করিতেছে, উহা যমরাজের কারবারে চিত্রগুপ্ত লিখিতেছেন, আর সেই সেই কর্ম্মকারক জীবকে যমরাজা জন্মাদি দ্বারার সুখ দুঃখাদি ফল দিতেছেন; তাহাতেই ৮৪ লক্ষ যোনিতে প্রাণী ভ্রমণ করে, এইরূপ পুরাণে কথিত আছে। ইহাকেই জন্ম মরণের কাগজ বলে। সেই জন্য সদ্‌গুরু যে সচ্চিদানন্দস্বরূপ স্বস্বরূপের ( নিজ আত্মার) উপদেশ করেন, সেই বচনেতে অনুভব করিয়া দৃঢ়বিশ্বাস রাখিলে, তবে এই ( জন্ম মরণরূপ ) কাগজ ফাটে ( ছিঁড়ে )। অর্থাৎ জন্মমরণের দুঃখ বিনাশ হয়। ইহার উপর স্থূল ভাবে বুঝিবার জন্য এক দৃষ্টান্ত কহিতেছি, শ্রবণ কর।

দৃষ্টান্ত। একজন সুপ্রতিষ্ঠিত ও বিখ্যাত ধনবান সওদাগর ছিল। তাহার স্বীয় অজ্ঞাতসারে কোন দুর্জ্জন লোকের সহিত ব্যবসার সম্বন্ধে সমুদয় মূলধন বিনষ্ট হইয়া গেল। আর তদ্বিপরীতে সেই ধনবান্ ঋণী হইয়া গেল এবং তাহার পাওনাদার তাহাকে অনেক প্রকার দুঃখ দিতে লাগিল, তাহাতে সে বিচার করিল যে, আমি কাহার চাকুরি বা দাসত্ব করিয়া কিছু উপার্জ্জন দ্বারা পাওনাদারগণকে কিছু কিছু দিতে থাকি; এই ধারণা করিয়া সামান্য বেতনে পসারি ( অর্থাৎ বেনে বা মুদি ) ও কাপুড়ে (অর্থাৎ তন্তুবায় বা বস্ত্র ব্যবসায়ী ) আদির চাকুরি করিতে লাগিল, পরন্তু ইহাতে দুই শত টাকা বার্ষিক উপার্জ্জন হয় এবং তাহা উহার পেটখরচাতেই চলিয়া যায়; তাহাতে পায়নাদারগণকে কিরূপে সুদ দিতে শক্তিবান্ হইবে? এই প্রকারে কিছুদিন গত হইলে ইহার উপর দিন প্রতিদিন খরচ আরও বাড়িয়া গেল, তাহাতে উহার পাওনাদারগণ অনেকবার তাগাদা করিয়া উহাকে দুঃখ দিতে লাগিল; ঐ ঋণী-ধনবানের কোন দয়ালু হিতৈষী মিত্র ছিল। তিনি এই সময়ের মধ্যে উহাকে বলিতে লাগিলেন, যে হে ভাই! এই সামান্য বেতনে নির্ধন পুরুষের দাসত্ব করিয়া তুমি কখন ঋণমুক্ত হইতে পারিবে না। সেই জন্য এক উপায় আমি তোমায় বলি, সেই মত কর। এই সহরে বিষ্ণুদত্ত নামে এক বড় ধনবান আছে। সে শ্রীমন্ত ধনবান লোক ), আর তাঁহার প্রকৃতিও উদার। উহার শরণাগত হইয়া বেতন যাচিঞা ছাড়া, তন্মনে নিজের কর্ত্তব্য কাজ বুঝিয়া, যে প্রকার কার্য্য করিতে আজ্ঞা করে, সেই প্রকার কার্য্য, সত্যতায় ও নিষ্কপটে

তুমি নির্ব্বাহ করিবে। বেতনের কথা যদি বলে, ত "না" কহিও; আর বলিও যে, অন্ন বস্ত্র ব্যতীত আমি এখন আর কিছুই চাহি না। উহাতে তোমার উপর দৃঢ় বিশ্বাস হইবে, এবং আত্মীয় বুঝিয়া তোমাকে ঋণ হইতে মুক্ত করিবে। এইরূপে সেই হিতৈষী বন্ধুর বাক্য শুনিয়া ঐ ঋণী নিতাই বিষ্ণু দত্তের নিকটে চাকরী করিতে যাইতে লাগিল। আর উহার সহিত স্নেহ করিয়া উপরোক্ত প্রমাণে কার্য্য করিতে লাগিল। তাহাতে সেই বিষ্ণুদত্ত উহাকে (অর্থাৎ ঐ ঋণী সওদাগরকে) বিনা বেতনে আর সত্যতায় চাকরি (কার্য্য) করিতে দেখিয়া সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারির অধিকার (পদ) দিল। এই প্রকারে ঐ অধিকারে উহার দুই তিন বৎসর অতীত হইয়া গেল। সেই সময়ে উহার পাওনাদার গণেরা বিচার করিল যে, এই ঋণী (সওদাগর) ভাল (সৎ) লোকের নিকটে ও বৃহৎ পদমর্য্যাদাযুক্ত কার্য্যের অধিকারে আছে। তদ্ধেতু উহার নিকট হইতে আমাদের পাওনা টাকা আসিতে পারে। এইরূপ আশাতে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত উহার নিকট আর তাগাদা করে না। তথাপি ও পাওনাদারকে সে কিছু দেয় না। সেইজন্য, এক দিন সে রাস্তাতে যাইতেছে, এমত সময়ে পাওনাদারেরা তাহাদের এক লোক দ্বারা উহাকে রাস্তায় দাঁড় করাইয়া, অতিশয় তিরস্কার পূর্ব্বক পীড়াপীড়ি করিয়া (আগ্রহাতিশয় সহকারে) জোর তাগাদা করিল এবং অনুচিত কঠোর বচন বলিল। উহা শুনিয়া সেই ঋণী অতি চিন্তাতুর হইয়া নিজের ধনীর (মনিবের) বাড়ীতে গেল। ধনী উহাকে চিন্তাতুর দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, হে মুনিম্! আজ কিছু চিন্তিত আছ কি? ঐ শুনিয়া মুনিমের (শ্রেষ্ঠ কর্ম্মচারী অর্থাৎ সেই ঋণীর) চক্ষুতে অশ্রু পড়িল; উহা দেখিয়া শেঠ (ধনী) জিজ্ঞাসা করিল যে, তোমার এত অধিক দুঃখ কি হইয়াছে, তাহা আমাকে বল। তোমার যে দুঃখ আছে তাহা আমি নিবৃত্তি করিব। আমার নিকট বলিতে তুমি কিছু ভয় করিও না। তাহাতে মুনিম বলিল যে, আমি প্রথম না জানিয়া বিশ্বাস করিয়া দুর্জ্জনের সহিত ব্যবসা করিয়াছিলাম, সেই কারণে আমার মূলধন পর্য্যন্তও নাশ করিয়া (হারাইয়া) বসিয়াছিলাম এবং উল্টে আমি ঋণী

হইয়াছি। আমার পাওনাদারগণ আপনার চাকরীতে থাকিবার পরেও আজ পর্য্যন্ত কিছুই বলে নাই; পরন্তু আজ উহারা এক লোক দ্বারা মধ্য বাজারে দাঁড় করাইয়া অতি কঠোর (দুঃসহ) বাক্য বলিল, আর আমায় অত্যন্ত অপমান করিয়াছে, সেই কারণে আমার দুঃখ হইয়াছে এই হেতু আমি চিন্তাতুর হইয়াছি। ইহা শুনিয়া ধনী বলিতে লাগিল যে, আরে বেচারা! (ভাল মানুস!) আজ পর্য্যন্তও আমার সহিত কোন কথাই বল নাই, বলিতে ত, ঐ সময়েই আমি তোমাকে কর্জ্জ হইতে মুক্ত করিয়া দিতাম। পরন্তু, চিন্তা নাই; তোমার পাওনাদার গণের কাছে তোমার লিখিত দলিলাদি কাগজ পত্র কিছু আছে কিম্বা নাই? যদি থাকে, তবে সেই পাওনাদারগণের নাম বল। ইহা শুনিয়া সে নাম বলিল। তাহার পরে পাওনাদারগণকে ডাকাইয়া শেঠ বলিল, "তোমাদের পাওনার আমি সব চুক্তি করিয়া দিতেছি, ইহাতে তোমাদের কবুল অঙ্গীকার বা স্বীকার পত্র) রাখ। মুনিমকেও জিজ্ঞাসা করিল যে, যে রীতে আমি চুক্তি করিব, তাহাতে তোমার বিশ্বাস আছে (হইবে) কি না? মুনিম্ (অর্থাৎ সেই ঋণী) বলিল, "আপনি যাহা করিবেন তাহাই আমি স্বীকার করিব। তৎপরে শেঠ পাওনাদারগণের সঙ্গে সমযুক্তি (বন্দোবস্ত) করিয়া "খৎ" দস্তাবেজের কাগজ সেই সময়ে ছিঁড়িয়া ফেলিল; তাহাতে কর্জ্জদারকে কর্জ্জ হইতে ঋণ মুক্ত করিয়া দিল।

সিদ্ধান্ত। অজ্ঞানী যে জীব, সে কাম ক্রোধাদিরূপ দুর্জ্জনের সঙ্গে আত্মবোধরূপী ধন হারাইয়া দিয়াছে। আর আমি সংসারী, কর্ত্তা, ভোক্তা হই, এইরূপ অজ্ঞানে পাপ পুণ্য কর্ম্মের সম্বন্ধ দ্বারা যমরাজার কর্জ্জদার হইল; এবং সে পাপ পুণ্যাদি সর্ব্ব পুণ্যাদি সর্ব্ব কর্ম্ম ফল ভুলিবার জন্য যমরাজার বহিতে লেখাইতেছে। সেই জন্য পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণ হইতেছে। এইরূপ করিয়া সেই কর্ম্মের ফলরূপ জন্মাদি দুঃখ হইতে মুক্ত হইবার জন্য কোন দ্বৈতবাদী গুরুর চরণে যাইয়া তাঁহার সেবা (পরিচর্য্যা) করে। তথাপি জন্মমরণ হইতে মুক্তি পাইবার কোন সদুপদেশ উহাঁর নিকটে মিলিল না এবং ঐ দুঃখই রহিল; আর সংসারের ক্লেশে অনেক দুঃখ হইতে লাগিল; এমন সময়ে পূর্ব্বপুণ্য বশাৎ সমার্গে লইয়া যাইবার

কোন এক জ্ঞানবান্ মিত্র মিলিল। সে বলিতে লাগিল কি, হে ভাই। ভেদবাদী গুরু কেবল ধর্ম্ম মাত্র হরণকারী হয়; তাহার সেবায় শোক ও জন্ম মরণরূপী দুঃখ হইতে নিবৃত্ত হইয়া পরমপদ প্রাপ্তি হইবার নহে। সুতরাং উহাকে ত্যাগ করিয়া কোন শ্রোত্রীয় ব্রহ্মনিষ্ঠ বৈরাগ্যবান্ এবং পরম দয়াল গুরুর শরণে যাইয়া নিষ্কপটে ও নিষ্কামে কায়িক বাচিক আর খাঁটী (সত্য বা শুদ্ধ) মানসে তাঁহার সেবা কর। যাহাতে তিনি তোমার উপর প্রসন্ন হইয়া তোমার জন্ম মরণের কাগজ (কর্ম্মবন্ধন) যাহার যমরাজার ওখানে (স্থানে) লেখান হইয়াছে, তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিবার উপায় নির্দ্দেশ করিবেন। এইরূপে সে মিত্রের বচন শুনিয়া ব্রহ্মবেত্তা গুরুর স্মরণে যাইয়া তাঁহার আরাধনা করিয়া গুরুকে প্রসন্ন করিল। তৎপরে গুরু কৃপা করিয়া বলিলেন যে, তোমার কি ইচ্ছা আছে? তোমার যে কোন ইচ্ছা হইবে তাহা নিবৃত্তি করিবার উপায় আমি তোমাকে প্রদর্শন করিব। তৎপরে শিষ্য বলিতেছেন যে, হে মহারাজ! অধ্যাত্ম অধিভূত এবং অধিদৈব, এই ত্রিতাপ দ্বারা গ্রীষ্ম ঋতুর মধ্যাহ্ন কালে মরিচীর তাপে যেরূপ প্রাণী সন্তপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ আমি তপ্ত হইয়াছি, আর আমি যে পাপপুণ্যাদি করিয়াছি, তাহার উল্লেখ যমরাজার কাছে আছে, সে উল্লেখের কাগজ যাহাতে ছেঁড়া হয়, সেইরূপ উপায় নির্দ্দেশ করুন (বলিয়া দিন) যাহাতে আমি মুক্ত হই।

তাহা শুনিয়া গুরু কহিতেছেন যে, সর্ব্ব পাপকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, পুণ্য কর্ম্মের ফল ঈশ্বরার্পণ করিয়া সমাধি-সুখ-সাধন-সম্পন্ন হইয়া দুর্জ্জনের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া আমার উপদেশে তুমি বিশ্বাস কর। সেই উপদেশ এই যে, এই স্থূল দেহ তুমি নহ, ইহা দৃশ্য হয়, অর্থাৎ দেখা যাইতেছে; তুমি তাহার দ্রষ্টা হও, অর্থাৎ দর্শনকারী আত্মা হও। সেই হেতু, উহা তুমি নহ। এই দেহের নাশ হইলে, উহা দগ্ধ করিয়া থাকে, অর্থাৎ উহা তখন কোন কর্ম্ম ভুগিতে সামর্থবান্ হয় না। আর তাহার সাক্ষী যে, তুমি আত্মা, উহা ত পূর্ণ ও ব্যাপক এবং আকাশের ন্যায়; উহার কিছু গমনাগমন কার্য্য নাই, আর সে কিছু কর্ম্মের ফল ও ভোগে না। তৎপরে শেষে (অবশিষ্ট) রহিল যে চিদাভাসরূপ জীব সংযুক্ত সূক্ষ্ম দেহ,

উহা পাপ পুণ্য কর্ম্মের সম্বন্ধ হেতু উঁচু নীচু (উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট) শরীরে যাইয়া জন্ম মরণ দ্বারা সুখ দুঃখ ভুগিতেছেন। সেই সূক্ষ্ম দেহেতে ও জীব নিজের বাস্তবিক স্বরূপভূত সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মার সহিত অভেদ জ্ঞান করিলে উহার (সেই সূক্ষ্ম দেহের) নাশ হইয়া থাকে। তখন কর্ম্মের ভোক্তা কেহই থাকে না। তাহাতে যমরাজা উহার কাগজ তৎক্ষণাৎ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেন। সেইজন্য, দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি অহঙ্কারেতে অহংবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া, তথা সেই দেহেন্দ্রিয়াদির সঙ্ঘাত (একত্র মিলন) হইতেও অহংবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া, সেই দেহাদির প্রকাশক, সচ্চিদানন্দ, নিত্যমুক্ত, অকর্ত্তা, অভোক্তা, "আমি আত্মা হই" এইরূপ জ্ঞান সম্পাদন করা উচিত। আর এই জ্ঞানেতেই মোক্ষ হইয়া থাকে। সেই জ্ঞান ব্যতীত জন্ম মরণ নিবৃত্তি করিবার অন্য কোনই উপায় (মুখ্য সাধন বা শ্রেষ্ঠ সাধন) নাই।

শিষ্য।—হে মহারাজ! আমার বহুকালের অসংখ্য কর্ম্ম আছে। তথা অজ্ঞান কার্য্য দেহাধ্যান ও বহুকাল হইতে আছে; উহা নিবৃত্তি হইবার জন্য অনেক সময় চাই; এবং আপনি বলিলেন যে, সদ্‌গুরুর বচনে বিশ্বাস রাখিলে শীঘ্রই তোমার জন্ম মরণের কাগজ কাটিবে (ছিঁড়িবে!), ইহা কিরূপে নিশ্চয় হইবে?

গুরু।— এমা বার নহি লাগশে জ্ঞান,
এবুঁ বেদবচন ছে প্রমাণ।
আ পঞ্চীকরণনো বিচার জোকবে,
তো হনণা মুক্তি মলশে তাহাবে ॥৪॥

টীকা।—হে ভাই! অনাদি কাল হইতে তোমার কর্ম্ম, অজ্ঞান, তথা দেহাধ্যান আছে; কিন্তু উহা নিবৃত্ত হইবার জন্য আত্মজ্ঞান হইলে, পশ্চাৎ কিছুই (লেশমাত্র) বিলম্ব হয় না। তৎসম্বন্ধে এক দৃষ্টান্ত আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর।

দৃষ্টান্ত।—যেমন, পৃথিবীর উপর একটী পর্ব্বত আছে। উহার গুহা মধ্যে বহু দিবসাবধি অন্ধকার আছে। সেই অন্ধকার, জপ তপ করিলে, কিম্বা যষ্টীর প্রহারে যাইবার নহে। কিন্তু, কেবল প্রকাশ (আলোক)

মাত্রেই নাশ হয়। যখন উহার মশাল লইয়া যাওয়া হইবে, তখন অন্ধকারের এমন বলিবার ক্ষমতা নাই যে, আমি বহু দিনের, তদ্ধেতু আমি (শীঘ্র বা সহজে) যাইব না; কারণ কি, সেই অন্ধকারের বিরোধী প্রকাশ (আলোক) প্রকট হইবা মাত্র, উহা তৎক্ষণাৎ (ঝটিতি) নিবৃত্ত হয়; (যেরূপ) ইহাতে (ইহা যাইতে) বিলম্ব (দেরী লাগে) হয় না।

সিদ্ধান্ত। (সেইরূপ) শরীরে বহুকালের অজ্ঞান, তথা তজ্জন্য (অর্থাৎ অজ্ঞান হেতু তাহাতে উৎপন্ন হইয়াছে যে,) দেহাধ্যাস আর কর্ম্মসমূহ রহিয়াছে কিন্তু "অহং ব্রহ্মাস্মি" এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞানরূপী প্রকাশ যে সময়ে হয়, সেই সময়েই সেই (প্রাক্ত) অজ্ঞানাদির নিবৃত্ত হইয়া থাকে। ইহাতে বেদবচনের প্রমাণ আছে। তাহার অর্থ নিম্নে লেখা হইল।

"দেবনে জনীলে সর্ব্বপাশ (সকলবন্ধ) নিবৃত্ত থায়ছে॥"

অর্থ। দেবকে জানিলে সর্ব্ব পাশ (বন্ধন) নিবৃত্ত হয়।

"তে আত্মানে জানীনেজ মৃত্যুনে তরেছে, মোক্ষ থবানে
জ্ঞান বিনা বীজা কই পন মার্গ ছে নহি।"

অর্থ। সেই আত্মাকে জানিয়া মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হয়; মোক্ষ হইবার জন্য জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন মার্গ (পন্থা) নাই। সেইরূপ জ্ঞান দ্বারা সকল পাপাদি কর্ম্মের নাশ হইয়া থাকে এইরূপ শ্রীভগবান গীতাতে বলিয়াছেন—

"যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥"

টিকা। হে অর্জ্জুন। যদ্রূপ প্রজ্জলিত অগ্নিকাষ্ঠকে পোড়াইয়া ভস্মরূপ করিয়া দেয়, তদ্রূপ নিরন্তর অভ্যাস দ্বারা প্রবল হইয়াছে যে জ্ঞানাগ্নি উহাও পাপপুণ্য মিশ্রিতরূপ সর্ব্ব কর্ম্মকে ভস্ম (নাশ) করিয়া দেয়।

শিষ্য। হে মহারাজ। আপনি বলিলেন যে, আত্মজ্ঞানের দ্বারায় মোক্ষ হইবে, পরন্তু সেই আত্মার জ্ঞান আমার কি প্রকারে হইবে, যাহাতে (যে জ্ঞান সাধনে) আমি মুক্ত হইব?

এই রীত্যনুসারে শিষ্যের আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া চৌপাইয়ের উত্তরার্দ্ধ দ্বারা গুরু উত্তর দিতেছেন,—

গুরু। "জো পঞ্চীকরন বেদি"—এই পঞ্চীকরণের বিচার যদি তুমি কর,

তবে তোমার আত্মার জ্ঞান (আত্মজ্ঞান) হইবে। আর এই জ্ঞান দ্বারা দেহাধ্যাস নিবৃত্ত হইবে। তাহার পরে জীবিতাবস্থায় এই দেহে অবিলম্বে তোমার মোক্ষ প্রাপ্তি হইবে।

শিষ্য। হে মহারাজ! আপনি বলিলেন যে, পঞ্চীকরণের বিচার দ্বারা তোমার মোক্ষ হইবে, পরন্তু পঞ্চীকরণে কি উক্ত হইয়াছে, তাহা অনুগ্রহ করিয়া (আমায়) বলুন।

গুরু। এমা পঞ্চভূতনো বিচারজ কহ্যো, জুদাঁ তত্ত্ব বতায়ো।

সদ্‌গুরুমুখে সমঝী লেজো, তো ব্রহ্ম সুখ পামে আজো ॥৫॥

টিকা। হে ভাই! এই পঞ্চীকরণে পঞ্চভূতের বিচার উক্ত আছে। পঞ্চভূত (বলিলে) অর্থাৎ পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু এবং আকাশ। ইহার (অর্থাৎ পঞ্চভূতের), তথা স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ, এই তিন শরীরের পৃথক পৃথক প্রকারে তত্ত্বের বিভাগ বর্ণন করা আছে; এবং তাহা ভৌতিক তত্ত্ব হইতে পৃথক তথা উহার জ্ঞাতা দ্রষ্টা (সাক্ষী) যে আত্মা, তাহার তত্ত্ব অর্থাৎ স্বরূপও প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই পঞ্চীকরণের অর্থ, ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্‌গুরুর সন্নিধানে শ্রবণ করিয়া বুঝিয়া লইবে। তাহা বুঝিলে, আত্মতত্ত্বের অনুভব হইবে। তাহা হইলে, সেই যোগ-হইতে এই (বর্তমান) দেহের জীবিতাবস্থা-তেই শীঘ্র ব্রহ্মসুখ প্রাপ্তি হইবে।

শিষ্য। হে মহারাজ! ব্রহ্মনিষ্ঠ সদগুরুর সন্নিধানে পঞ্চীকরণ শ্রবণ করিয়া বুঝিবার কি দরকার আছে? কারণ কি, সেই পঞ্চীকরণ ত প্রাকৃত ভাষাতেই আছে; আর আমি পড়িতে পারি, এরূপও আছে, এবং অর্থও বুঝা যাইতেছে; ইহাতে আপনি "সদগুরু সন্নিকটে বুঝিয়া লইবে"—এরূপ কি জন্য বলিলেন?

গুরু। হে শিষ্য! অক্ষর পড়িতে পারে, অর্থও বুঝিতে পারে, কিন্তু সদ্‌গুরুর উপদেশ ব্যতীত শব্দের যে যথার্থ তাৎপর্য্য কি তাহা কিছুই বুঝিতে পারে না, আর, আত্মার নিঃসন্দেহের বোধও হয় না; এরূপও লোক আছে। তদুপরি (তদুপলক্ষে) এক দৃষ্টান্ত বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর।

দৃষ্টান্ত। কোন এক ধনাঢ্য গৃহস্থ ছিল। সে বিচার করিল যে আমার কাছে ঢের ধন আছে। তাহাতে এই সময়ে আমি যদি উহা গুপ্তভাবে

সংগ্রহ করিয়া রাখি, তাহা হইলে কোন সময়ে আমার অথবা আমার সন্তান সন্ততির ব্যবহারে আসিবে। এই বিচার করিয়া নিজের এক বৃহৎ (আশ্রম) স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিল; উহাতে (ঐ আশ্রমে) সিদ্ধেশ্বর মহাদেবের একটী শিখরবন্ধ (চূড়াযুক্ত) মন্দির করিল। তাহার চূড়াতে অর্থাৎ শিখরে কেহ না জানিতে পারে, এমন গুপ্ত ভাবে ধন রাখিয়া, একখানি পৃথক্ খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছিল যে "সংবৎ ১৭২৫ সালে উত্তরায়ণের সূর্য্যে চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে অষ্টমীর দিনে ১২ ঘটিকার সময়ে সিদ্ধেশ্বরের মন্দিরের শিখরে ১৫ লক্ষ স্বর্ণ-মোহর আমি রাখিয়াছি। যখন উহার আবশ্যক হইবে, তখন তাহা বাহির করিবে।" এইরূপে উপরোক্ত কথাগুলি লিখিয়া সেই খাতা অতি যত্নসহকারে একটি গুপ্ত স্থানে রাখিয়া দিল। তাহার পরে বহুবর্ষ গত হইলে, সেই গৃহস্থ ব্যক্তি সপরিবারে তীর্থযাত্রায় গমন করিল। তীর্থযাত্রায় বাহির হইলে পর পথিমধ্যে অকস্মাৎ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া, সেই ধনী ব্যক্তির একটী সামান্য উপসর্গেই বাক রোধ হইল এবং উহাতেই সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তৎপরে তাহার শিশুসন্তান ও ভৃত্যবর্গ তথা (সেই তীর্থের রাস্তা) হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। কালক্রমে ঐ বালক (অর্থাৎ সেই তীর্থের পথে মৃত ধনী ব্যক্তির পুত্র) বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ব্যবসা করিতে আরম্ভ করিল; পরন্তু, তাহার বারম্বার ব্যবসাতে ক্ষতি হওয়ায় সমস্ত মূলধন বিনষ্ট হইল এবং উল্‌টে কর্জ্জদার হইয়া পড়িল। তাহাতে তাহার পাওনাদারগণ তাহাকে নানাপ্রকারে ক্লেশ দিতে লাগিল। তখন সে ঋণদায়ে পীড়িত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল যে আমার পূর্ব্ব পুরুষগণ মহা ধনবান ছিলেন এবং অনেকের সঙ্গে আদান প্রদানের (লেন দেনের) ব্যবসাও করিতেন। অতএব পুরাতন খাতাপত্র অনুসন্ধান করিয়া দেখি, যদি কাহারও নিকট কিছু পাওনার কথা অনুসন্ধান হয়, তাহা হইলে, এক্ষণে উহাতে আমার বিশেষ উপকার দর্শিবে। এইরূপ বিচার করিয়া সেই ব্যক্তি পুরাতন খাতাপত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিল। অন্বেষণ করিতে করিতে যে খাতায় "১৫ লক্ষ মোহরের বিবরণ" লিখিত ছিল, তাহা দৃষ্টিগোচর হইল। তাহাতে সে অত্যন্ত আনন্দিত হইল। তৎপরেই সে রাজমিস্ত্রী ও মজুর লাগাইয়া দেবালয়ের শিখির (ভাঙ্গিয়া

নামাইয়া আনিল, এবং উহার মধ্যে সোণার মোহরের অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুই খুঁজিয়া পাইল না। তাহাতে সে দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল যে, এ রকম খাতায় মিথ্যাকথা লেখা হইবে কি? অথবা আমি ঠিক পড়িতে ও বুঝিতে পারি নাই? এইরূপ ধারণা করিয়া সেই 'বাক্য' (অর্থাৎ খাতায় যেরূপ সেই ১৫ লক্ষ মোহরের বিবরণ লিখিত আছে উহা) স্বীয় মিত্রদিগকে পড়িতে দিল। তাহাতে তাহারা পড়িয়া বলিল যে, মন্দিরের শিখরে ধন আছে এইরূপ খাতায় লেখা আছে। তাহা হইলে শিখরে (মন্দিরের চূড়ায়) অনুসন্ধান কর। এতদ্বাক্য শ্রবণে সেই বালক বলিল যে, (অনুসন্ধানে) উহাতে (শিখর মধ্যে) কিছুই মিলিল না। তাহা শুনিয়া সেই মিত্রবর্গ বলিল যে, (তাহা হইলে) এই খাতায় মিথ্যা খবর লিখিত আছে। তৎপরে সে অন্যান্যকে উহা পড়িতে দিল; তাহারাও সেই একই প্রকারের অভিপ্রায় বর্ণনা করিল। পরে তাহাদের মধ্যে কোন একজন বলিল যে, "মিথ্যা করিয়া লেখা আছে"—এরূপ আপনি বিচার না করিয়াই বলিতেছেন। উহাতে লিখিত আছে যে সোণার মোহর, তাহা কাহারও নিকট হইতে খরিদ করিয়া লওয়া হইতে পারে। আর উহার (মোহরের মূল্যের বিবরণ কাহারও না কাহারও খাতায় লেখা থাকিতে পারে। তজ্জন্য সেই খাতায় অনুসন্ধান কর, যাহাতে এই রকম (অর্থাৎ ঐ মোহরের মূল্যের বৃত্তান্ত) লেখা আছে কিনা। তাহার পর, সেই বর্ষের সকল খাতাই অনুসন্ধান করা হইল এবং তাহাতে জানা গেল যে, পৃথক পৃথক ব্যক্তিগণের নিকট হইতে, এই সোণার মোহর ক্রয় করা হইয়াছিল এবং তাহার মূল্যও চুক্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছিল; এ সমস্ত বিবরণ সকলই পাওয়া গেল। আর ১৫ লক্ষ সোণার মোহরের দরুণ এক পৃথক্ খাতায় দেব খাতে খরচ লেখা আছে, ইহাও জানিতে পারা গেল। তাহা দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইয়া বলিতে লাগিল যে, আমরা সকলে না বুঝিয়া এই খাতায় লিখিত বিবরণকে মিথ্যা বলিতেছিলাম। "শিখরে ধন রাখা হইয়াছিল"—এই কথা ত সত্যই; পরন্তু আমরা পাইলাম না। অতএব কেহ চুরী করিয়া থাকিবে। তাহার বা এখন কি প্রকারের খবর পাওয়া যাইবে? এইরূপে (শিখর-বর্ণিত) ধন না পাওয়ায় সেই বালক অত্যন্ত চিন্তিত হইল; আর

যা'কে তা'কে জিজ্ঞাসা আরম্ভ করিল ; পরন্তু কেহই কোন সন্ধান বলিতে পারিল না। এইরূপ চিন্তায় কিছুদিন গত হইলে পর, সেই বালক নিজের বংশের কোন একজন বৃদ্ধ বুদ্ধিমান পুরুষের ( আত্মীয়ের ) কাছে যাইয়া, সর্ব্ব বৃত্তান্ত আরম্ভ হইতে শুনাইল এবং বলিল যে, ( কিছুতেই আর ) ধন মিলিল না ; কেবল যে তাহারই চিন্তা আমার আছে, এমত নহে; কিন্তু এই দেবালয়ের শিখর ( ভাঙ্গিয়া ) নামান হইলে পর, সাধারণজনবর্গে প্রবাদ চলিল যে, এই বালক এমন অকর্ম্মা ( দুঃর্ভাগ্য ) যে, পিতা দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, পুত্র তাহা বিনাশ (ধ্বংস) করিয়া ফেলিল ; ইহাতেই আমার মনে অতিশয় কষ্ট হইয়াছে। আর পুনর্ব্বার যে, ঐ শিখর নির্ম্মাণ করাইব, এরূপ অর্থও আমার নিকট ( কিছুমাত্র ) নাই। আর পাওনাদারেরাও তাগাদা করিয়া আমাকে বিশেষ দুঃখ দিতেছে, তজ্জন্য আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। সেই জন্য আপনি আমায় কৃপা করিয়া যদি কোন সদুপায় নির্দ্দেশ করেন তাহা হইলে আমার অনেক মঙ্গল (ভাল) হয়। তাহার এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই বুদ্ধিমান বৃদ্ধ পুরুষের মনে দয়ার সঞ্চার হইল, এবং বলিল, হে ভাই! তুমি কোন চিন্তা করিও না ; তোমার খাতায় যাহা লেখা আছে তাহা সত্য ; এবং সেই ধনও তুমি পাইবে। পরন্তু এখন আমি তোমাকে এই দুই শত টাকা দিতেছি, তাহা ব্যয় করিয়া দেবালয়ের শিখর যেমন পূর্ব্বে ছিল, সেইরূপ পুনঃ (পূর্ব্ববং) চড়াইয়া ( নির্ম্মাণ করাইয়া ) দেও। উহাতে যেন কোনরূপ তফাং ( ফেরফার ) না হয়, এরূপ ব্যবস্থায় নির্ম্মাণ করিবে। এইরূপে পূর্ব্ববৎ ( শিখর নির্ম্মাণ করিয়া চৈত্র শুক্লাষ্টমীর দিবস প্রাতে আমার নিকট আসিও। এই বলিয়া তাহাকে (বৃদ্ধ) বিদায় দিল। তৎপরে সেই বালক ( ঐ বৃদ্ধের বাক্যানুসারে ) দেবালয়ের শিখর যেমন ছিল, ( পূর্ব্ববৎ ) সেইরূপ চড়াইয়া (প্রস্তুত করিয়া) দিল, এবং চৈত্র শুক্লাষ্টমীর দিনে সেই বৃদ্ধ পুরুষের নিকট যাইয়া, তাঁহাকে নিজের গৃহে সঙ্গে করিয়া আনিল। আর তাঁহাকে কথায় সে ( ঐ বালক ) অনেক উৎসাহ পাইল। তৎপরে মধ্যাহ্ন দ্বাদশ ঘটিকার সময় হইলে, বৃদ্ধ পুরুষ বলিল যে, এই সময় দেবালয়ে এস, আমরা সিদ্ধেশ্বর মহাদেব দর্শন করি। এই বলিয়া উভয়ে দেবদর্শন করিয়া প্রদক্ষিণ করিতে গেল ; সেই সময়ে

সেই শিখরের ছায়া নীচে জমীর উপর দেখাইয়া সেই বৃদ্ধ বলিল, হে ভাই! এই স্থানকেই দেবালয়ের শিখর বলা যায় এবং এই স্থান খনন করিবামাত্র সেই মুহূর্ত্তমধ্যেই এই স্থান হইতে উল্লিখিত ধন প্রাপ্ত হইবে। তাহার পরে ঐ বালক সেই নির্দ্দিষ্ট স্থান খনন করাইলে, তৎক্ষণাৎ উহা হইতে ১৫ লক্ষ সোণার মোহর প্রাপ্ত হইল। তাহাতে সেই বালক অত্যন্ত আনন্দিত হইল এবং ধনবানও হইল, আর তাহার দুঃখও নিবৃত্ত হইল।

( ক্রমশঃ )

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ শর্ম্মা।

---

# বিচারসাগর।

## সূক্ষ্ম সৃষ্টি নিরূপণ।

অপ্রপঞ্চীকৃত ভূত আর কার্য্য তার।
মন, প্রাণ, দশেন্দ্রিয় সূক্ষ্ম সৃষ্টি সার।
পঞ্চীকৃত ভূত হতে স্থূল সৃষ্টি যত।
চতুর্দ্দশ লোক সহ ব্রহ্মাণ্ড উদ্গত ॥
কারণ সূক্ষ্ম, স্থূল এই দেহ তিন।
আর পঞ্চকোষ শিষ্য মায়ায় বিলীন ॥
পঞ্চকোষ মধ্যে আত্মা পৃথক চিন্তন।
মুঞ্জতৃণ মধ্যে ভিন্ন ইষীকা * যেমন ॥

[ টীকা :—অপঞ্চীকৃতভূত ও তাহার কার্য্য অন্তঃকরণ, প্রাণ, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় এই সকলকে সূক্ষ্মসৃষ্টি কহে। ইন্দ্রিয় দ্বারা সূক্ষ্ম সৃষ্টির জ্ঞান হয় না। নেত্র নাসিকাদি গোলক ইন্দ্রিয়ের বিষয়। পরন্তু সেই গোলকস্থিত ইন্দ্রিয় কাহারো ইন্দ্রিয় বিষয় নহে। সূক্ষ্ম সৃষ্টির অনন্তর, ঈশ্বরের ইচ্ছায় স্থূলসৃষ্টি হেতু ভূত সমূহের পঞ্চীকরণ হয়।

সেই পঞ্চীকরণ দ্বিবিধ বলিয়া উক্ত হয় :—

( ১ ) প্রত্যেক ভূত তুল্যাংশে দুই ভাগ হইয়া প্রত্যেক ভাগের আবার চারি চারি ভাগ হয়। ভূত পঞ্চকের প্রত্যেকের প্রথম অর্দ্ধ অংশ ছাড়িয়া

---

* তূলি, বর্ত্তিকা।

অপর অর্দ্ধাংশের প্রত্যেক চারি ভাগ পৃথক থাকে; এবং একের অর্দ্ধ অংশ, অপরের চারি ভাগ যুক্ত অর্দ্ধাংশে মিলিত হইয়া পঞ্চীকরণ সাধিত হয়।

(২) প্রত্যেক ভূত তুল্যাংশে দ্বিভাগ হয় না। এক অংশে পাঁচ ভাগের এক ভাগ থাকে ও অপর অংশে পাঁচ ভাগের ৪ ভাগ থাকে। চার ভাগযুক্ত বড় অংশগুলি পৃথক থাকে। পাঁচ ভাগের একভাগযুক্ত প্রথমোক্ত ছোট অংশটি আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়। এই এক এক ভাগ ঐ বড় ভাগের সহিত মিলিত হইয়া পঞ্চীকরণ সাধিত হয়।

প্রত্যেক ভূতে পঞ্চ ভূতের মিলনকে পঞ্চীকরণ কহে। যে সকল ভূতের পঞ্চীকরণ হইয়াছে, তাহাদিগকে পঞ্চীকৃত কহে।

### স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি।

সেই পঞ্চীকৃত ভূত সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়গণের বিষয় স্থূল ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয়। সেই ব্রহ্মাণ্ড উদরে ভূ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য এই সপ্তলোক উর্দ্ধে, এবং অতল, সুতল, পাতাল, বিতল, রসাতল, তলাতল, ও মহাতল এই সপ্ত লোক নিম্নে আছে। এই চতুর্দ্দশ লোকে জীবগণের ভোগযোগ্য অন্নাদি ও ভোগ আয়তন দেব, মানব, পশু আদি স্থূল শরীর উৎপন্ন হয়। সংক্ষেপে এই সৃষ্টি নিরূপণ করা গেল *। মায়ার কার্য্যের সবিস্তার নিরূপণ কোটি ব্রহ্মার বয়সেও শেষ হয় না।

---

* সংক্ষেপ সৃষ্টি প্রকরণ। পরব্রহ্ম ( Ever unknowable ) ব্রহ্মণ ( unknown but knowable )

# ঈশ্বর।

প্রাজ্ঞ—(ম) প্রজ্ঞান ঘন, আনন্দযুক্ত, ( সুষুপ্তি ) — অবিদ্যা, মায়া, প্রকৃতি।

সূত্রাত্মা, হিরণ্যগর্ভ ( সমষ্টি ), তৈজস ( ব্যষ্টি )—(উ), অন্তঃপ্রজ্ঞ, সূক্ষ্মভূক্, ( স্বপ্ন )

বৈশ্বানর, বিরাট—(অ) বহিঃপ্রজ্ঞ, স্থূলভুক ( জাগ্রত ) মহত্ব (ব্যক্ত)

অহঙ্কার তত্ব।

- সাত্বিক অহঙ্কার, বৈকারিক ( জ্ঞানশক্তি )
  - অন্তঃকরণ—
    - ১। বুদ্ধি
    - ২। মন
    - ৩। চিত্ত
    - ৪। অহঙ্কার
  - দশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ বৈকারিক দেবগণঃ—
    - ১। দিকপাল (শ্রবণ-শব্দ)
    - ২। বায়ু ( ত্বক-স্পর্শ )
    - ৩। সূর্য্য ( নেত্র-রূপ )
    - ৪। বরুণ ( রসনা-রস )
    - ৫। অশ্বিনীকুমার (নাসিকা গন্ধ)
    - ৬। অগ্নি ( বাক )
    - ৭। ইন্দ্র ( পানি )
    - ৮। উপেন্দ্র বা বিষ্ণু ( পাদ )
    - ৯। মিত্র বা যম ( পায়ু )
    - ১০। প্রজাপতি ( উপস্থ )
- রাজসিক অহঙ্কার ( ক্রিয়াশক্তি )
  - পঞ্চপ্রাণঃ—
    - ১। পান
    - ২। অপান
    - ৩। সমান
    - ৪। ব্যান
    - ৫। উদান
  - পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়।
    - পঞ্চভূত
      - স্থূল ব্রহ্মাণ্ড
        - সত্যলোক
        - তপ, জন, মহ, স্ব, ভুব ভূ।
        - অতল সুতল, পাতাল বিতল, রসাতল, তলাতল
        - মহাতল।
- তামসিক অহঙ্কার ( দ্রব্যশক্তি
  - [ আদি-তত্ব, অনুপাদক তত্ব ]
  - শব্দতন্মাত্র
    - —আকাশ-তত্ব স্পর্শতন্মাত্র
    - —বায়ুতত্ব রূপতন্মাত্র
    - —তেজতত্ব রসতন্মাত্র
    - —অপতত্ব গন্ধতন্মাত্র
    - —পৃথ্বীতত্ব

## আত্মবিবেক—পঞ্চকোষ।

ত্রিবিধ শরীর ও পঞ্চকোষ মায়া ও তাহার কার্য্যে নিহিত। শুদ্ধ সত্বগুণ সহিত মায়া ঈশ্বরের কারণ শরীর। মলিন সত্বগুণ সহিত অবিদ্যা অংশ জীবের কারণ শরীর। পঞ্চ সূক্ষ্মভূত উত্তর শরীরের উৎপাদক। মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার, পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এই সকল জীবের সূক্ষ্ম শরীর। সকল জীবের সূক্ষ্ম শরীর মিলিত হইয়া ঈশ্বরের সূক্ষ্ম শরীর। সমস্ত স্থূল ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বরের স্থূল শরীর। জীবের ব্যষ্টি স্থূল শরীর প্রসিদ্ধ। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এই ত্রিবিধ শরীর লইয়াই পঞ্চকোষ বর্ত্তমান। কারণ শরীরকে আনন্দময় কোষ কহে। বিজ্ঞানময় মনোময়, ও প্রাণময় এই ত্রিবিধ কোষ সূক্ষ্ম শরীরে বর্ত্তমান। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি অর্থাৎ বুদ্ধিকে বিজ্ঞানময় কোষ কহে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের সঙ্কল্প বিকল্প বৃত্তি অর্থাৎ মনকে মনোময় কোষ কহে। পঞ্চপ্রাণ ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রাণময় কোষ। স্থূল শরীরকে অন্নময় কোষ কহে। ঈশ্বর শরীরে ঈশ্বরের কোষ ও জীব শরীরে জীবের কোষ। কোষ অর্থে খাপ বা আবরণ।

---

* সমষ্টি অজ্ঞানরূপ মায়া ঈশ্বরের কারণ শরীর। তাহাই ঈশ্বরের আনন্দময় কোষ। জীবের সূক্ষ্ম শরীর সমষ্টিরূপ হিরণ্যগর্ভ ঈশ্বরের সূক্ষ্ম শরীর। তাহাতেই ঈশ্বরের বিজ্ঞানময়, মনোময় ও প্রাণময় এই ত্রিবিধ কোষ বিদ্যমান। দিকপাল, বায়ু, সূর্য্য, বরুণ ও অশ্বিনীকুমার ঈশ্বরের এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং সমষ্টি বুদ্ধিময় মহত্তত্ত্ব স্বরূপ বা সকল বুদ্ধি অভিমানী ব্রহ্মরূপ ঈশ্বরের বুদ্ধি মিলিয়া তাঁহার বিজ্ঞানময় কোষ বিদ্যমান। শ্রোত্রাদির অধিষ্ঠাতৃ দেবতারূপ ঈশ্বরের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও সমষ্টি মনরূপ অহঙ্কারময় বা সকল মন অভিমানী চন্দ্রমাময় ঈশ্বরের মন মিলিত হইয়া, তাঁহার মনোময় কোষ বিদ্যমান। অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, প্রজাপতি ও যম ঈশ্বরের এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও সমষ্টিপ্রাণ বা বায়ু অভিমানী দেবতা রূপ ঈশ্বরের প্রাণ মিলিত হইয়া, তাঁহার প্রাণময় কোষ বিদ্যমান। সমষ্টি স্থূল সৃষ্টিরূপ বিরাট ঈশ্বরের স্থূল শরীর। তাহাই তাঁহার অন্নময় কোষ। ঈশ্বর দৃষ্টিতে সেই পঞ্চকোষ তাঁহার আপন ব্রহ্ম রূপের আবরক নহে।

খাপের ন্যায় পঞ্চকোশ † আত্মার স্বরূপ আচ্ছাদন করে। সুতরাং অন্নময়াদিকে কোষ কহে। অনেক মন্দমতি পুরুষ এই কোষ-পঞ্চকে যে অনাত্ম বস্তু আছে, তাহার কোন একটিকে আত্মজ্ঞানে প্রকৃত সাক্ষী আত্ম স্বরূপ হইতে বিমুখ রহে। অন্নময়াদি কোষ পঞ্চক আত্মস্বরূপকে আচ্ছাদন করে।

অন্নময় কোষ। আত্মা—বিরোচন মত, দেহাত্মবাদ :—

অসুরস্বামী বিরোচনমত অনুসারে অনেক মন্দভাগ্য পুরুষ স্থূল শরীররূপ অন্নময়কোষকে আত্মা কহে। তাহারা এই যুক্তি প্রয়োগ করে যে—যাহাতে অহং বুদ্ধি হয়, তাহাই আত্মা। সেই অহংবুদ্ধি স্থূলদেহে হয়। স্থূল শরীরই আত্মা। কিম্বা যাহাতে মুখ্য প্রীতি হয় তাহাই আত্মা। স্ত্রী পুত্র ধন পশু আদি স্থূল শরীরের উপকারক না হইলে প্রীতি হইত না। যাহার নিমিত্ত অন্য পদার্থে প্রীতি হয়, তাহা স্থূল শরীরেই মুখ্য প্রীতি হয়। সুতরাং স্থূলশরীরেই আত্মা। বসন, ভূষণ, অঞ্জন, মজ্জন, নানাবিধ ভোজন দ্বারা সেই স্থূলশরীরের সজ্জা ও পোষণই পরম পুরুষার্থ।

ইন্দ্রিয় আত্মা—ইন্দ্রিয় আত্মাবাদী মত :—

আবার কেহ কেহ এরূপ কহে যে—"স্থূল শরীর আত্মা নহে। কিন্তু যাহার নিমিত্ত স্থূলশরীরে জীবন ব্যবহার হয় এবং যাহা না থাকিলে সেই শরীরে মরণ ব্যবহার হয়, সেই আত্মা স্থূলদেহ হইতে পৃথক। জীবন মরণ ইন্দ্রিয়গণের বশ। যতকাল দেহে ইন্দ্রিয় থাকে, ততকাল জীবন থাকে, কোন ইন্দ্রিয় না থাকিলে মরণ উপস্থিত হয়। "আমি দেখি," "আমি শুনি," "আমি বলি" এই রীতিতে ইন্দ্রিয়সমূহে অহং বুদ্ধি হয়। সুতরাং ইন্দ্রিয়ই আত্মা।

প্রাণ আত্মা—হিরণ্যগর্ভ উপাসকের মত :—

হিরণ্যগর্ভের উপাসকগণ প্রাণকে আত্মা কহে। তাহাদের মতে মরণ সময় যখন মূর্চ্ছা হয় তখন মুমূর্ষুর প্রাণবায়ু থাকিলে তাহার পুত্রাদি পরিবারবর্গ জানিতে পারে যে জীবন আছে, এবং প্রাণবায়ু না থাকিলে

† কেহ কেহ সপ্তকোষ স্বীকার করেন। স্থূলদেহ, লিঙ্গশরীর ( Astral Body ), প্রাণ, কাম, মন, বুদ্ধি ও আত্মা এই সাত ভাগে মানব বিভক্ত। এ সম্বন্ধে Mrs. Besant এর "Man and his bodies" "Seven Principles of man" এবং "Self and its Sheaths" দ্রষ্টব্য।

জ্ঞানে যে মরণ হইয়াছে। কিন্তু নেত্রেন্দ্রিয় না থাকিলেও অন্ধ জীবিত থাকে। পরন্তু প্রাণ বিনা দেহ তদ্দণ্ডেই শ্মশানবৎ অমঙ্গল ও ভয়ঙ্কর হইয়া পতিত হয়। "আমি দেখি" 'আমি শুনি' এই প্রতীতি হইতেও আত্মা ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন সিদ্ধ হয়। কারণ যদি এইরূপ প্রতীতি হয় যে 'নেত্রস্বরূপ আমি দেখি' "শ্রবণস্বরূপ আমি শুনি" তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ই আত্মা সিদ্ধ হয়। কিন্তু "নেত্রবান্ আমি দেখি 'শ্রোত্রবান আমি শুনি" এইরূপই প্রতীতি হয়। সুতরাং আত্মা ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন। সুষুপ্তিকালে সকল ইন্দ্রিয়ই অভাব হয়। সে অবস্থায় প্রাণ থাকে বলিয়া জীবন ব্যবহার হয়। সুতরাং প্রাণ থাকে বলিয়া জীবন ব্যবহার হয়। সুতরাং জীবন মরণ ইন্দ্রিয়ের অধীন নহে। স্থূলদেহের ও প্রাণের বিয়োগকে মরণ কহে। সুতরাং জীবন মরণ প্রাণেরই অধীন। সেই প্রাণই আত্মা।

মন আত্মা—মন আত্মবাদীর মত :—

আবার কেহ কেহ কহেন যে—"প্রাণ ত জড। সুতরাং ঘটের ন্যায় অনাত্মা। বন্ধমোক্ষ মনের অধীন। বিষয়াসক্ত মন বন্ধের হেতু ও বিষয়-বাসনা রহিত মন মোক্ষের হেতু *। মনের সম্বন্ধ বিনা ইন্দ্রিয় হইতেই জ্ঞান হয় না। সুতরাং মন সকল ব্যবহারেই হেতু। মনই আত্মা।

বুদ্ধি আত্মা—বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমতঃ—

ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ কহেন—"মনের ব্যাপার বুদ্ধির অধীন। কারণ মন বুদ্ধিরই আকার প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ক্ষণিক বিজ্ঞানরূপ বুদ্ধিই আত্মা, মন নহে। বৌদ্ধ মতের অভিপ্রায় এই যে—সম্পূর্ণ পদার্থ বা পদার্থ সমষ্টি বিজ্ঞানের আকার। সেই বিজ্ঞান প্রকাশরূপ। ক্ষণে ক্ষণে বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও নাশ হয়। পূর্ব্ব বিজ্ঞানের সমান অন্য বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া পূর্ব্ব বিজ্ঞানের নাশ হয়। সেইরূপ তৃতীয় বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও দ্বিতীয় বিজ্ঞানের নাশ। এই রীতিতে নদী প্রবাহবৎ বিজ্ঞান ধারাকারে বিদ্যমান। সেই বিজ্ঞানধারা দ্বিবিধ—(১) আলয় বিজ্ঞানধারা ও (২) প্রবৃত্তি বিজ্ঞানধারা। "আমি আমি" ( I am I ) এইরূপ বিজ্ঞান ধারাকে আলয় বিজ্ঞানধারা কহে, তাহারই নাম বুদ্ধি। "ইহা ঘট" "উহা শরীর" এইরূপ বিজ্ঞান

---

* মন এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধ মোক্ষযোঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং। মুক্তং নির্ব্বিষয়ং স্মৃতম॥ অমৃত বিন্দু উপনিষদ।

ধারাকে প্রবৃত্তি বিজ্ঞানধারা কহে। আলয় বিজ্ঞানধারা হইতে প্রবৃত্তি বিজ্ঞান ধারার উৎপত্তি হয়। প্রবৃত্তি বিজ্ঞানধারাতেই মনের স্বরূপ বিদ্যমান। সুতরাং মন আলয়বিজ্ঞান ধারারূপ বুদ্ধিরই কার্য্য। সেই বুদ্ধিই আত্মা। বৌদ্ধমতে আলয়বিজ্ঞান ধারা বিষয়ে প্রবৃত্তি বিজ্ঞানধারারা কোন চিহ্ন দ্বারা নির্ব্বিশেষ ক্ষনিক বিজ্ঞানধারার স্থিতিকেই মোক্ষ কহে। এই রীতিতে বিজ্ঞানবাদীগণ বুদ্ধিকে ক্ষণিক ও স্বয়ম্প্রকাশরূপ কল্পনা করিয়া আত্মা কহে।

আনন্দময় কোষ আত্মা—ভট্টের মত।

পূর্ব্ব মীমাংসার বার্ত্তিককার ভট্টমত—"বিদ্যুতের ন্যায় আত্মা ক্ষণিক রূপ নহে কিন্তু স্থিরস্বরূপ আত্মা জড়স্বরূপ ও চৈতন্যস্বরূপ। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—সুষুপ্তি হইতে উঠিয়া পুরুষ বলে "আমি জড়ে সুপ্ত ছিলাম'। সুতরাং আত্মা জড়রূপ। জাগরিত হইলে জাগরণ অনন্তর পুরুষের স্মৃতি হয়। অজ্ঞান পদার্থের স্মৃতি হয় না। সুষুপ্তি কালে আত্মস্বরূপ হইতে ভিন্ন জ্ঞানের অন্য কোন সাধন নাই। সুতরাং সুষুপ্তিকালে স্মৃতিহেতুরই জ্ঞান হয়। তাহাই আত্মার স্বরূপ। এই রীতিতে খদ্যোতের ন্যায় আত্মা প্রকাশ ও অপ্রকাশরূপ। জ্ঞানরূপ বলিয়া প্রকাশরূপ এবং জড়রূপ বলিয়া অপ্রকাশ রূপ। আনন্দময়কোষ সেই প্রকাশ ও অপ্রকাশরূপ। কারণ সুষুপ্তিকালে চৈতন্যের আভাস সহিত অজ্ঞানকে আনন্দময় কোষ কহে সে স্থলে আভাস তৎ প্রকাশরূপ ও অজ্ঞানত অপ্রকাশ রূপ। সুতরাং ভট্ট মতে আনন্দময় কোষই আত্মা।

আনন্দময় কোষ আত্মা—শূন্যবাদী (মাধ্যমিক বৌদ্ধ) মতঃ—

শূন্যবাদী বৌদ্ধগণ কহে—আত্মা নিরংশ। সুতরাং এক আত্মাকে প্রকাশরূপং ও অপ্রকাশ কখন সম্ভবে না। খদ্যোতের এক অংশ প্রকাশরূপ ও অপর অংশ অপ্রকাশ রূপ। সুতরাং অংশ রহিত আত্মা বিষয়ে খদ্যোতের ন্যায় উভয়রূপ কখন সম্ভবেনা। উভয়রূপ সিদ্ধির জন্য আত্মা অংশবান স্বীকার করিতে হয়। অংশবান পদার্থ ঘটাদি উৎপত্তি ও নাশযুক্ত। সেইরূপ অংশবান হইলে আত্মা ও উৎপত্তি ও নাশযুক্ত স্বীকার করিতে হয়। উৎপত্তি ও নাশযুক্ত পদার্থ উৎপত্তির পূর্ব্বে ও নাশের পরে অসৎ হয়। মধ্যকালেও সৎ হয় না পরন্ত অসৎই থাকে। সুতরাং আত্মা অসৎরূপ। সেইরূপ আত্মা হইতে ভিন্ন পদার্থ সমষ্টি উৎপত্তিনাশযুক্ত। সুতরাং অসৎরূপ। এই রীতিতে আত্মা ও সমগ্র অনাত্মা বস্তু অসৎরূপ বলিয়া পরমতত্ত্ব শূন্যই বটে।

# বিজ্ঞান প্রাচ্য ও প্রতীচ্য।

অনেকেই শুনিয়া সুখী হইবেন যে শ্রীমতি অনি বেসান্ত পরাবিদ্যা সভার দ্বিতীয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার মত বিদুষী প্রতিভাশালিনী স্ত্রীলোক জগতে অত্যন্ত বিরল। ভরসা করি তাঁহার তত্ত্বাবধানে পরাবিদ্যা সভার ক্রমোন্নতি সাধিত হইবে।

কিন্তু এই নির্ব্বাচন ব্যাপারে পুরাকালে সমুদ্রমন্থনের ন্যায় গরল ও অমৃত উৎপন্ন হইয়াছে। সভ্যগণ যে ব্যক্তি বিশেষকে ভালবাসিতে ও শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছেন এবং যে ভালবাসা ও শ্রদ্ধার বলে নির্ব্বাচন ব্যাপারটি সুসিদ্ধ হইল ইহা সুখের কথা বটে। মানব প্রথমে ব্যক্তি বিশেষকে লইয়াই ভক্তি ও শ্রদ্ধা বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করিতে শিখে। কোন এক মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন যে প্রেমের মত পাবনি শক্তি দ্বিতীয় নাই। তবে দুঃখের সহিত বলিতে হইবে সভ্যগণের প্রেম এখন ও স্থূলদেহে পর্য্যবসিত। আশা করি সময়ে এই দোষটি সভা হইতে দূর হইয়া যাইবে। ব্যক্তিগত ভাব লইয়া অনেক দূর যাওয়া যায় বটে, কিন্তু তদ্দারা ব্রহ্ম বিদ্যা লাভ করা হয় না।

এইবার গরলের কথা বলিব। সভ্যগণের হৃদয়ে অনৈসর্গিক ও অদ্ভুত ঘটনাবলীর প্রতি যে প্রেম রহিয়াছে তাহা এই ব্যাপারে ব্যক্ত হইল। অনৈসর্গিক ও অদ্ভুত ঘটনাগুলি স্বভাবতঃ দুর্ব্বোদ্ধ ও তাহার তত্ত্ব নিরাকরণ করা সহজ নয়। তত্ত্ব নির্দ্ধারিত না হইলে উহা কুসংস্কার ও অজ্ঞানের মূল হইয়া থাকে। এইটি সভার বিষম বিপদ ইঙ্গিত করিতেছে। আর একটী কথা বলিবার আছে। পরতন্ত্র আবেশ এবং স্বাধীন ভাবে চিত্তের প্রসার এই দুইটী যে কত প্রভেদ তাহা শাস্ত্র পাঠে কথঞ্চিত জানা যায়, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, নির্ব্বাচন ব্যাপারে দুইএর প্রভেদ লোপ পাইবার মত হইয়াছে। প্রকৃত সাধক আবিষ্ট চিত্ত পরাধীন যন্ত্র বিশেষ নহে। তিনি স্বীয় প্রযত্নে বিদ্যার সাহায্যে আপনার ক্ষুদ্র অহংজ্ঞানকে পরিমার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া ক্রমে প্রত্যগাত্মার সহিত আপনাকে এক সূত্রে গঠিত করেন তাহার ফলে তাহার অহঙ্কার ক্ষুদ্র বিশিষ্টভাব ত্যাগ করিয়া মহান আত্মারূপে পরিণত হয় ঐ মহান আত্মা পরে বিশ্বাত্মারূপে পতিত হয়। কিন্তু এই আত্মভাবকে আত্মারূপে চক্ষু কান মন ইত্যাদি ইন্দ্রিয়াদি অভিব্যক্তি দ্বারা মাপ করিতে গেলে ফল অজ্ঞান।

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহু ইন্দ্রিয়েভ্য পরং মনঃ।
মনসস্তু পরাবুদ্ধি বুদ্ধের্য্য পরসস্তু সঃ।

সভ্যগণ শ্লোকের অর্থটী হৃদয় ক্ষেত্রে সর্ব্বদা রাখিয়া দিলে বুঝিতে পারিবেন যে আত্মার একদেশে মাত্র এই নিখিল বিশ্ব অবস্থিত তাহার প্রকৃত ভাব ক্ষুদ্র মায়িক দেহাত্ম জ্ঞানে আবদ্ধ ঘটনা বা ব্যক্তি বিশেষ দ্বারা প্রমাণিত হইতে পারে না।

ওঁ

# পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ।

১১শ ভাগ | আষাঢ়, ১৩১৪ সাল। | ৩য় সংখ্যা।

## শান্তি-শতক।

[ শিহ্লন-বিরচিত ]

১

গ্রন্থের সূচনা লাগি' ভেবেছিনু দেবগণে করিব প্রণাম,
কিন্তু তারা বিধির অধীন ,
তবে কি নমিব বিধি ? সেও পুন কর্ম্মফল দানে অবিরাম,
কর্ম্ম-বাধ্য বিরিঞ্চি প্রবীণ ,
কি হবে পূজিয়া কত কর্ম্মফল, ফলমাত্র কর্ম্ম-বিটপির ?
কর্ম্মদেবে পূজি তবে বশ যার দেব সবে, বিধান বিধির।

২

কি দুষ্কর কর্ম্ম মরি ! সাধিতেছে আত্মজ্ঞানে বিবেকী নির্ম্মল
উপভোগ্য ধন পরিহরি' ,

লব্ধ ধনে স্পৃহা-হীন , - কিন্তু মোরা কামনায় এমনি বিবশ
ধন-আশা কভুনা পাশরি !
নাছিল, নাহিক এবে, নাহি আশা ভবিষ্যতে করিব অর্জ্জন,
বাঞ্ছা শুধু আছে ঘিরে, তব নারি হেন ধন করিতে বর্জ্জন !

৩

ধন্য সেই গুহাবাসী যতিবৃন্দ ব্রহ্ম-জ্যোতি করে যারা ধ্যান
বসি' গূঢ় গিরির কন্দরে ,
চক্ষে বহে আনন্দাশ্রু, অঙ্কশায়ী পক্ষিকুল করে তাহা পান
সহাস্যমুখে নিঃশঙ্ক অন্তরে .
মোর, শুধু মনে মনে কল্পনায় গড়ি যবে আকাশ-প্রাসাদ,
বাপী-তট ক্রীড়া-বন, কেলিগৃহ, কাটে আয়ু বাড়ে অবসাদ ।

৪

শিথিল হয়েছে এবে বন্ধ্যাঙ্গম, জরা-ব্যাধি-বিকলিত বপুঃ,
নাহি বাঞ্ছা স্বজন-ভবনে ,
বিপ্র-ভোগে নাহি সাধ,—কিন্তু অহো ! হত-বিধি বিড়ম্বনে তবু
নাহি ছাড়ে, বাড়ে লোভ মনে ।
আশার নাহিক পার, সংসারের তত্ত্ব-সার না ফুটিল মনে,
বর্দ্ধিত বয়স সহ বাড়িছে সংশয়-মোহ হতাশ জীবনে ।

৫

কতবার জেনেছিত বীভৎস বিষয়-পঙ্ক, তবু বলবতী
আয়ুষ্মতী বিষয়-বাসনা .
কতনা বুঝেছি মনে চিরস্থায়ী নহে দেহ, গেছে তব মতি,
হ্রাস-হীনা প্রমোদ-কামনা ,
হৃদয়ে স্ফুরয়ে যদি ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ, তব হৃদি নহে নির্ব্বাসন,
মানব-অন্তরে অহো ! একি দৈব বিড়ম্বনা নাহি নির্দ্ধারণ ।

৬

দাহ-জ্বালা নাহি জানে পতঙ্গম, পড়ে তাই প্রদীপ-শিখায়,
অবিদিতে ঘটয়ে মরণ ,

বড়িশ আমিষ-মাখা মৃত্যু-বাণ নাহি জানি' লোভ-বশে হায়।
মীন-দল করয়ে ভক্ষণ,
কিন্তু মোরা কামনারে বিপজ্জাল-বিজড়িত জেনে শুনে মরি।
ছাড়িতে না পারি তায়, অহো কি জটিল হায়! মায়া মোহকরী।

৭

মুনি সম আমাদেরো আছে ক্ষান্তি, নহে তাহা ক্ষমার কারণ,
দুর্ব্বলতা নিদান তাহার,
গৃহ-সুখ ছাড়িয়াছি, সে নহে সন্তোষতরে, দুখ-নিবন্ধন,
শীতাতপ সহি অনিবার,
হেতু তা'র নহে তপঃ, ধ্যান-রত, নহে বিষ্ণু, ধনের কারণে।
করম মুনির মত, ফল তা'র বিপরীত কামরত মনে।

৮

কতিপয় গ্রামে পশি' শস্ত্র-ভয়ে দীন প্রজা করিয়া মন্থন
করে যারা নামের জাহির,
নটকের চাটুবাদে পুন যারা বিচলিত হয় স্ফীত মন,
তারা কি পালক পৃথিবীর?
পুন সেই বিপ্রগণে কেমনে পণ্ডিত ভণে, যা'রা স্বার্থ বশে
সৃষ্টিস্থিতিলয়েশ্বরে পরিহরি, নরেশ্বরে পূজয়ে মানসে।

৯

ত্রিজগত-নাথ যিনি, চিত্ত সেবা, একাধিপ, পুরুষপ্রধান,
ভক্তে যিনি দেন শ্রীচরণ,
না গণি' সে নারায়ণে, কতিপয় গ্রামেশ্বরে সঁপিয়ে পরাণ,
কি মূঢ়তা জানে মূঢ়মন।
কি পায়ও মোরা গণি কাচমূল্যে চিন্তামণি করিনু বিক্রম,
ভব-ভোগ-বাসনায় জনম বিফলে যায় অহো কি বিস্ময়!

১০

বিধি ভুজঙ্গের তরে সদালভ্য সমীরণ করিলা অশন,
না চাহিতে লভে সে আহার।

পশুগণ বনে বনে পরিভ্রমি' তৃণাঙ্কুর করয়ে ভোজন,
প্রয়োজন না হয় চেষ্টার।
ভব-সিন্ধু-পার-ক্ষম মোরা' কিন্তু নহি ক্ষম জীবিকা-অর্জ্জনে,
সহজে না মিলে ভক্ষ্য, নিঃশেষিত গুণলক্ষ ধন-উপার্জ্জনে।

ক্রমশঃ

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

---

# কর্ম্ম বিভাগ।

মানুষের আত্মা হইতে যে শক্তিত্রয় উৎসারিত হইতেছে, তাহাদিগের নাম জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি। শক্তির প্রকাশ ক্রিয়াতে। যে ক্রিয়াতে জ্ঞানশক্তির প্রকাশ, তাহার নাম ভাবনা (thought); যে ক্রিয়াতে ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ, তাহার নাম বাসনা (desire); এবং যে ক্রিয়াতে ক্রিয়া-শক্তির প্রকাশ, তাহার নাম চেষ্টনা (action)। ক্রিয়ারই নামান্তর কর্ম্ম। অতএব মানুষের কর্ম্ম ত্রিবিধ—ভাবনা, বাসনা ও চেষ্টনা।

মানুষ ইহজন্মে অনেক কর্ম্ম করিতেছে। বহুসংখ্যক ভাবনা, বাসনা ও চেষ্টনার সে কর্ত্তা। এই সমস্ত তাহার 'ক্রিয়মাণ' কর্ম্ম। কিন্তু ইহজন্মই তো মানুষের প্রথম জন্ম নহে, মানুষ এবারের পূর্ব্বে আরও অনেকবার জন্মিয়াছিল। ইহ জন্মের পূর্ব্বে পূর্ব্বে তাহার অনেক অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তবচার্জ্জুন।

'হে অর্জ্জুন। তোমার ও আমার বহু বহু জন্ম ব্যতীত হইয়াছে।'

ভগবান অর্জ্জুনের সম্বন্ধে যাহা বলিলেন, প্রত্যেক জীবের সম্বন্ধেই তাহা বক্তব্য। আমাদের প্রত্যেকেরই বহু বহু জন্ম ব্যতীত হইয়াছে। এই যে আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম, সে সকল জন্মেও আমরা বহু বহু কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি। অনেকানেক ভাবনা, বাসনা ও চেষ্টনার কর্ত্তা হইয়াছি। সেই

আমরাই আবার ইহজন্মে কর্ম্ম করিতেছি। অতএব ক্রিয়মাণ কর্ম্মের কর্ত্তাও যে জীব, সেই জীবই ঐ সকল প্রাক্তন কর্ম্মেরও কর্ত্তা। প্রাক্তন অর্থে পূর্ব্বতন অর্থাৎ পূর্ব্বজন্ম কৃত কর্ম্ম।

আমাদের পূর্ব্বজন্মে কৃত বা ইহজন্মে ক্রিয়মাণ কর্ম্ম হয় শুভ, না হয় অশুভ ; হয় পুণ্য, না হয় পাপ , হয় সুকৃত না হয় দুস্কৃত। আমরা জানিয়াছি যে কর্ম্ম করিলেই তাহার ফলভোগ করিতে হয় , তা' সে কর্ম্ম সুকৃতই হউক আর দুস্কৃতই হউক।

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতংকর্ম্ম শুভাশুভম্।
ভোগ ভিন্ন কর্ম্ম ক্ষয় হয় না ;
নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটী শতৈরপি।

এক জন্ম কেন, কোটী কল্পকাল বহিয়া যাউক, যতক্ষণ না কর্ম্মের ভোগ হইতেছে, ততক্ষণ সে কর্ম্মের ক্ষয় নাই। যে জন্মে কৃত কর্ম্ম, যদি সেই জন্মেই তাহার ভোগ হইয়া যায় তবে ভালই , কিন্তু তাহা প্রায়ই হয় না। অল্প কর্ম্মই সেই জন্মে ভোগের দ্বারা ক্ষয় হইয়া যায়, কিন্তু অধিকাংশই পরজন্মে ভোগের জন্য 'সঞ্চিত' হইয়া থাকে। এই অভুক্ত প্রাক্তন কর্ম্মকে সঞ্চিত কর্ম্ম বলে। অতএব কর্ম্মকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে ,—ক্রিয়মাণ ও সঞ্চিত।

ক্রিয়মাণঞ্চ যৎ কর্ম্ম বর্ত্তমানং তদুচ্যতে।
* * * *
অনেক জন্ম সংজাতম্ প্রাক্তনং সঞ্চিতং স্মৃতম্।
[ দেবী ভাগবত, ৬।১০।৯, ১২]

'ক্রিয়মান যে কর্ম্ম তাহাকে বর্ত্তমান কর্ম্ম বলা হয়। অনেক জন্ম কৃত পূর্ব্বতন কর্ম্মকে সঞ্চিত বলে।

এইরূপ প্রত্যেক মানুষের রাশি রাশি সঞ্চিত কর্ম্ম রহিয়াছে। সেই সকল কর্ম্মকে ভোগের দ্বারা ক্ষয় করিবার জন্যই জীব জন্মান্তর পরিগ্রহ করে। যাহার সমস্ত কর্ম্মের ক্ষয় হইয়াছে, তাহার আর জন্ম হয় না। মানুষ জন্মিয়া পরিমিত কাল মাত্র জীবিত থাকে। মানবের আয়ুর পরিমাণ সাধারণতঃ শত বৎসরের অধিক নহে। বেদ বলিয়াছেন—"শতায়ুর্ব্বৈ পুরুষঃ" এই কয়

বৎসরের মধ্যে কয়জনের সহিতই বা তাহার সম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যে অসংখ্য জীবের সহিত সে কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কয় জনই বা ইহজন্মে বিদ্যমান রহিয়াছে বা উৎপন্ন হইয়াছে এবং কয় জনের সহিতই বা তাহার সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। অথচ যাহার সহিত কর্ম্মসূত্রের যোগ—যে উপকার পাইয়া তাহার নিকট ঋণী—অথবা যাহার অপকার করাতে সে তাহার নিকট ঋণী হইয়াছে তাহার সহিত সংযোগ না হইলে তো, সে কর্ম্মের শেষ হইবে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে এক জন্মের মধ্যে, সঞ্চিত কর্ম্মের অত্যল্প অংশেরই ক্ষয় সম্ভব। সেইজন্য কর্ম্মের যাঁহারা বিধাতৃ পুরুষ, তাঁহারা দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া এইরূপ যোগাযোগ করিয়া দেন যে, সমস্ত সঞ্চিত কর্ম্মের মধ্যে এক নির্দ্দিষ্ট অংশ মাত্রের ইহজন্মে ভোগ সমাধা হয়। এই নির্দ্দিষ্ট অংশের নাম 'প্রারব্ধ' কর্ম্ম। সঞ্চিত কর্ম্মরাশির মধ্যে যে কর্ম্ম-পুঞ্জ পরস্পর সমঞ্জস—যাহাদের একই স্থূলদেহে ভোগ সাধন সম্ভবপর যাহা এক জীবনের মধ্যে ভোগ দ্বারা ক্ষয় হইতে পারে তাহাদিগেরই সমষ্টি 'প্রারব্ধ' কর্ম্ম। এই কর্ম্মভোগের নিমিত্ত তাহাকে এমন দেশের অধিবাসী করা হয় যেখানকার ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, শাসননীতি প্রভৃতি তাহার প্রকৃতির অনুগুণ। সে এমন জাতিতে জন্মগ্রহণ করে, যে জাতির জাতীয় স্বভাব তাহার স্বভাবের অনুকূল। সে এমন বংশে উৎপন্ন হয়, যে বংশ সন্ততির নিয়মে তাহার দৈহিক ও মানসিক বৃত্তির অনুরূপ দেহ তাহার লাভ হইতে পারে। এইরূপে প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগের ব্যবস্থা হয়। প্রারব্ধ=প্র+আরব্ধ, অর্থাৎ যে কর্ম্মের ভোগ আরব্ধ হইয়াছে।

> সঞ্চিতানাং পুনর্মধ্যাৎ সমাহৃতা কিয়ৎ কিল।
> দেহারম্ভে চ সময়ে কালঃ প্রেরয়তীব তৎ।
> প্রারব্ধং কর্ম্ম বিজ্ঞেয়ং -
>
> [ দেবী ভাগবত ৬।১০।১১,১২ ]

'সঞ্চিত কর্ম্ম সমূহের মধ্যে যে নির্দ্দিষ্ট অংশ নবজন্মের প্রাক্কালে কাল ভোগের জন্য প্রেরণা করেন, তাহাই প্রারব্ধ কর্ম্ম।'

দেবী ভাগবত অন্যত্র এইরূপ বলিয়াছেন—

পূর্ব্বদেহং পরিত্যজ্য জীবঃ কর্ম্মবশানুগঃ।
স্বর্গং বা নরকং বাপি প্রাপ্নোতি স্বকৃতেন বৈ॥

*　　　*　　　*

ভুনক্তি বিবিধান্ ভোগান্ স্বর্গে বা নরকেঽথবা॥
ভোগান্তে চ যদোৎপত্তেঃ সময়স্তস্য জায়তে।
তদৈব সঞ্চিতেভ্যশ্চ কর্ম্মভ্যঃ কর্ম্মভিঃ পুনঃ।
যোজয়ত্যেব তং কালঃ

[ দেবী ভাগবত, ৪।২১।২২ ৫ ]

'দেহান্তে জীব স্বকৃত কর্ম্মানুসারে স্বর্গ বা নরক লাভ করে। সেই স্বর্গ বা নরকে তাহাকে নানা প্রকার ভোগ ভুগিতে হয়। পরে ভোগের অবসানে যখন তাহার পুনর্জন্মের সময় হয়, তখন কাল সঞ্চিত কর্ম্ম সমূহের মধ্য হইতে কতকগুলি কর্ম্মের সহিত তাহাকে সংযুক্ত করেন।' ইহাই 'প্রারব্ধ' কর্ম্ম।

এই ভাবে কর্ম্মের বিভাগ এইরূপ দাঁড়াইতেছে সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মাণ। সঞ্চিত কর্ম্ম যেন অপক্ক ফল—এখন ও ভোগের যোগ্য হয় নাই; প্রারব্ধ কর্ম্ম পরিপক্ক ফল—সে ফল ভোগের উপযুক্ত হইয়াছে। ইহ জন্মের যাহা প্রারব্ধ কর্ম্ম তাহা ভোগ করিতেই হইবে—ভোগ ভিন্ন তাহার ক্ষয় হইবে না।

প্রারব্ধ কর্ম্মণাং ভোগাদেব ক্ষয়ঃ

সেই জন্য কেহ কেহ জ্যা-মুক্ত শরের সহিত প্রারব্ধ কর্ম্মের তুলনা করিয়াছেন যেমন ধানুকী যে তীর ছাড়িয়াছে, তাহা লক্ষ্য স্থানে পঁহুছিবেই, সেইরূপ যে (প্রারব্ধ) কর্ম্মের ভোগ আরম্ভ হইয়াছে, তাহা ভুগিতে হইবেই।

যে জন্মে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং যে জন্মে সেই কর্ম্মের ভোগ হইতেছে, ইহার মধ্যেত প্রচুর ব্যবধান। দেশ, কাল, জাতির ভেদ সত্ত্বেও সেই কর্ম্মও তাহার ভোগের সহিত সংযোগ কিরূপে রক্ষিত হয়? ইহার উত্তর পতঞ্জলি ঋষি যোগ সূত্রে এই ভাবে দিয়াছেন,

তিনি বলেন যে, সাধারণ জীবের কর্ম্ম ত্রিবিধ।

ত্রিবিধমিতরেষাম্।

[ পাতঞ্জল সূত্র, ৪।৭ ]

কৃষ্ণ, শুক্ল-কৃষ্ণ ও শুক্ল জীবের এই ত্রিবিধ কর্ম্ম। পাপ, পুণ্য ও মিশ্র কর্ম্মের এই তিন বিভাগ। যে জন্মে যে কর্ম্মের ভোগ হইবে, জীবের চিত্ত-ক্ষেত্রে তাহার অনুগুণ বাসনার প্রকাশ হয়।

ততঃ তদ্বিপাকানুগুণানামেব অভিব্যক্তির্বাসনানাম্।

[ যোগসূত্র—৪।৮ ]

অর্থাৎ 'যে জাতীয় কর্ম্মের যে বিপাক, তাহারই অনুগুণ বাসনার উদয় হয়। বিগুণ বাসনার উদয় হয় না। এইরূপে ভোগের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়।'

অতঃপর পতঞ্জলি বলিতেছেন,—

জাতি দেশকাল ব্যবহিতানামপি আনন্তর্য্যং স্মৃতি সংস্কারয়োঃ একরূপত্বাৎ।

[ যোগসূত্র, ৪।৯ ]

'কর্ম্ম ও ভোগের মধ্যে শত সহস্র জাতি, বহুদূর দেশ, ও কল্পকোটীকালের ব্যবধান থাকিতে পারে। কিন্তু তাহাতে তাহাদের আনন্তর্য্যের ক্ষতি হয় না, তথাপি তাহাদের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। যেহেতু,—স্মৃতি ও সংস্কার একরূপই থাকে।"*

শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত।

---

* যথাঽনুভবাস্তথা সংস্কারাঃ। তে চ কর্ম্মবাসনারূপাঃ। যথা চ বাসনা স্তথা—স্মৃতিরিতি জাতিদেশকাল ব্যবহিতেভ্যঃ সংস্কারেভ্যঃ স্মৃতিঃ। স্মৃতেশ্চ পুনঃ সংস্কারা ইত্যেবমেতে স্মৃতিসংস্কারাঃ কর্ম্মাশয় বৃত্তিলাভ বশাদ্ব্যজ্যন্তে। অতশ্চ ব্যবহিতানামপি নিমিত্ত নৈমিত্তিক ভাবানুচ্ছেদাদানন্তর্য্যমেব সিদ্ধমিতি। –[ যোগসূত্র –৪।৯ ব্যাসভাষ্য ]।

# ভারতীয়-কথা।

## আদিপর্ব্ব—নায়কগণের যৌবনাবস্থা।

( ১০ )

### দ্রোণাচার্য্য।

ইতি মধ্যে, কুরুপাণ্ডব কুমারগণ আলস্যে এবং শৈশব চপলতায় অমূল্য সময় নষ্ট করিতেছেন দেখিয়া, মহারাজ, বিদ্যাবিনয়াদি এবং অস্ত্র শিক্ষার নিমিত্ত, বিদ্বান ও অস্ত্রবিদ্যা-বিশারদ বীর্য্যশালী আচার্য্য কৃপের তত্ত্বাবধানে তাঁহাদিগকে সমর্পণ করিলেন। কৃপাচার্য্যের আলয়ে সেই সময় দ্রোণ নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। এই ব্রাহ্মণ কৃপাচার্য্যের ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

দ্রোণের পরিচয়, দ্রুপদের সহিত মিলন।

দ্রোণ মহর্ষি ভরদ্বাজ পুত্র। পৃষত নামে এক রাজা ভরদ্বাজ ঋষির সখা ছিলেন। দ্রোণের সমবয়স্ক দ্রুপদ নামে এই রাজার এক পুত্র ছিল। মহর্ষি-ভরদ্বাজ-আশ্রমে দ্রোণ এবং দ্রুপদ পরস্পরের সখা হইলেন এবং এক সঙ্গে ক্রীড়া ও অধ্যয়নাদি করিতে লাগিলেন। দ্রোণ ক্রমশঃ নিজগুণে সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ হইয়া উঠিলেন এবং উপরন্তু ভৃগুনন্দন সকাশে, প্রয়োগ, সংহার ও রহস্যের নিয়মের সহিত ধনুর্ব্বেদ ও অস্ত্রশস্ত্র প্রাপ্ত হইলেন।

দ্রুপদের সহিত বিবাদের কারণ।

অনন্তর দ্রোণ এক দিন সুপ্রীতমনে প্রিয় বাল্যসখা পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের নিকট গমন করিয়া পূর্ব্বসম্বন্ধ স্মরণ করতঃ তাঁহাকে "সখা" বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন। দ্রুপদের তখন অবস্থান্তর বশতঃ মতিগতি সমস্ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তিনি রাজসিংহাসনোপরি উপবিষ্ট, রাজচ্ছত্র শিরে শোভিত, রাজদণ্ড হস্তে বিরাজমান, লক্ষ লক্ষ নরনারী উচ্চারিত "মহারাজ" "মহারাজ" শব্দ কর্ণে গুঞ্জরিত হইতেছে,—এ হেন উচ্চ স্থানে আরোহণ করিয়া তিনি কি প্রকারে শ্রীহীন দরিদ্র ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের "সখা" সম্বোধনে উত্তর দিবেন? ক্রোধে চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিলেন, পদ মর্য্যাদা নিবন্ধন রাজসিক প্রাণে ভীষণ

তরঙ্গ উঠিল, রোষকষায়িতলোচনে উত্তর করিলেন, "হে অল্পমতে, অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ভূপালদিগের ঈদৃশ শ্রীহীন ও নির্ধন মনুষ্যদিগের সহিত বন্ধুত্ব সম্ভবপর হয় না। বাতুল ব্রাহ্মণ জাননাকি সমানে সমানে সখ্য-ভাব হয়, রাজা না হইলে রাজার বন্ধুত্বের পাত্র অপর কে হইতে পারে? একপ উদ্ভ্রান্ত প্রকৃতিকে স্থির কর, পুনর্বার ওরূপ সম্বোধনে আমাদের কর্ণ কলুষিত করিও না।"

বাজারে বলেন আজি চিরকালে দেখা।
অবধান কর রাজা হই আমি সখা॥
এতশুনি নরপতি কটাক্ষেতে চায়।
নয়ন লোহিত-বর্ণ করে কম্প কায়॥
'কোথাকার দ্বিজ তুমি দরিদ্র ভিক্ষুক।
অজ্ঞান বাতুল কিম্বা হইবা দুর্ম্মুখ॥
আমি মহারাজ হই পাঞ্চাল ঈশ্বর।
কোন লাজে সখা বল সভার ভিতর॥
ধনীরে নির্দ্ধনসখা কভু না যুয়ায়।
সুর নরলোকে কেহ সখা নাহি হয়॥
কোথা সখা হইয়াছে নৃপতি ভিক্ষুকে।
সমানে সমানে সখা যায় অতি সুখে॥"

হরি! হরি! দ্রোণের পূর্ণ বাল্যসখ্যের এই প্রতিদান! আর দ্রুপদ তুমি তুচ্ছ সুবর্ণমণ্ডিত, রতন খচিত রাজসিংহাসনের প্রথম সোপানে উঠিতে না উঠিতেই মদৈশ্বর্য্যে জগৎ অন্ধকার দেখিলে। আশ্চর্য্য নহে, মানুষের পাঠ্য-জীবন বড় উদারতাময় হয়, পূর্ণ সন্তোষ সুধায় হৃদয় ভরিয়া থাকে তথনকার দৃষ্টিতে কুটিলতা থাকে না, হাসিতে নিষ্ঠুরতা থাকে না—ঐশ্বর্য্যের অভিমান থাকে না। দ্রোণের সেই ভাব এখনও প্রবল আছে, কিন্তু দ্রুপদের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সহিত বিকার আসিয়াছে, ক্ষেত্রে অহঙ্কার প্রবেশ করিয়াছে। পাঠ্যাবস্থার সে সরলতা নাই—সে আত্মহারা ভাব নাই—রাজ ঐশ্বর্য্য মধ্যে অবস্থিত দ্রুপদ এখন শিখিয়াছেন যে তাঁহার সেবকগণের তাঁহার মত ভোগ স্পৃহায় অধিকার নাই, তিনি এখন রাজা হইয়া ক্ষণে ক্ষণে "এহি—গচ্ছ,' 'পতোত্তিষ্ঠ,' 'বদ—মৌনংসমাচর' এই প্রকার পরস্পর বিরুদ্ধ আদেশ

করিতে শিখিয়াছেন, সুতরাং অহঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কীর্ণতা আসিয়াছে—অভেদকণ্ঠ "আত্মপর" গানে অভ্যস্ত হইয়াছে, তাই তিনি আজ রাজা হইয়া জীর্ণশীর্ণ দরিদ্র ব্রাহ্মণের সখ্যে ঘৃণা বোধ করিলেন। কিন্তু ভাবিলেন না

"নীর্বিগচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেন।"

ভাবিলেন না যে এই অসার বাক্‌প্রয়োগের জন্য তাঁহাকে অতিশীঘ্রই কি পরিমাণে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে। তাঁহার উক্তির প্রতি অক্ষর তাঁহারই বিরুদ্ধে প্রমাণীকৃত হইবে।

দ্রোণ নিরুত্তর—অধোবদনে রাজ সভা পরিত্যাগ করিলেন।

পরে হস্তিনাপুর যাইয়া কৃপাচার্য্যের নিকট প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করতঃ তাঁহাকে কুরুপাণ্ডবদিগের অস্ত্রশিক্ষায় সহায়তা করিতে লাগিলেন।

একদা যুধিষ্ঠির প্রভৃতি বীর বালকগণ মিলিত হইয়া "গুলিকা" ক্রীড়া করিতে করিতে প্রহৃষ্টমনে বিচরণ করিতেছিলেন। ক্রীড়া করিতে করিতে তাঁহাদের গুলিকা একটী কূপে পতিত হইল। সকলেই সবিশেষ মনোযোগ সহকারে সেই গুলিকা উদ্ধার করিবার বিশেষ যত্ন করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না। এমন সময়ে জনৈক শ্যামবর্ণ বৃদ্ধভাবাপন্ন, কৃশ, অগ্নিহোত্র-পুরস্কৃত, কৃতাহ্নিক ব্রাহ্মণকে সেই পথে যাইতে দেখিয়া কুমারগণ তাঁহাকে চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া গুলিকা উদ্ধারের জন্য অনুরোধ করিলেন। ব্রাহ্মণ ঈষদ্‌হাস্য করিয়া স্বীয় অঙ্গুরীয় কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন এবং তৎপরে একমুষ্টি ঈষীক (বেণা) লইয়া তদ্দ্বারা গুলিকা উত্তোলন এবং পরে একটী বাণ নিক্ষেপ করিয়া স্বীয় অঙ্গুরীয় পুনরায় ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিলেন। বিস্ময়াবিষ্ট কুমারগণ ব্রাহ্মণের এই অদ্ভুত শিক্ষাকৌশলে স্তম্ভিত হইয়া কহিলেন "ব্রাহ্মণ! এই বিদ্যা অন্য ব্যক্তিতে দৃষ্ট হয় না, আপনাকে আমরা প্রণাম করি। আপনার পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক আমাদিগকে অনুগৃহীত করুন এবং আমরা আপনার কি উপকার করিতে পারি আদেশ করুন।" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, "বৎসগণ! তোমরা ভীষ্মদেবের নিকট আমার আকৃতি ও গুণের বিষয় অবিকল বর্ণনা করিও, তিনিই আমার পরিচয় দিবেন।" অতঃপর কুমারগণ ভীষ্মদেব সকাশে

দ্রোণের কুরুপাণ্ডবগণের পূর্ণ শিক্ষাভার প্রাপ্তি এবং আচার্য্য পদে অধিষ্ঠান।

ব্রাহ্মণের অদ্ভুতশিক্ষাকৌশল যথাবিহিত বর্ণনা করিলেন। ভীষ্মদেব সমস্ত শুনিয়া ব্রাহ্মণকে দ্রোণ বলিয়া জানিতে পারিলেন, কারণ এ বিচিত্র শিক্ষা কৌশল আর অপর কাহারও গোচর ছিল না। তখন তিনি দ্রোণকেই আচার্য্যপদের একমাত্র উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিলেন এবং স্বয়ং তৎক্ষণাৎ তথায় গমন করতঃ সমাদর সহকারে তাঁহাকে আনয়ন করিলেন। দ্রোণও আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ইতিহাস জ্ঞাপন করিলেন। পরে ভীষ্মদেব কহিলেন কুরুপাণ্ডবদিগের এই রাজ্য ও যাহা কিছু ঐশ্বর্য্য আছে, আপনি সমুদায়ের রাজা স্বরূপ হইয়া থাকুন ও তাহাদিগকে শিষ্যত্বে বরণ করুন। সমস্ত কুরু পাণ্ডব আপনারই হইল।

সৌভাগ্যক্রমে এরূপ অদ্ভুতগুণপ্রভাশালী আচার্য্য পাইয়া সকলের আনন্দের অবধি রহিল না।

( ক্রমশঃ )

শ্রীমনোরঞ্জন সিংহ।

---

# মানব নিজ অদৃষ্ট বিধাতা।

দুইটী উপায়ে মানবগণকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। একটী বিজ্ঞান, অপরটী ধর্ম্ম। প্রাচীনকালে ধর্ম্ম-যাজকেরাই বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন, কিন্তু বর্ত্তমানকালে বিজ্ঞান এবং ধর্ম্ম শিক্ষক এক ব্যক্তি নহেন। বৈজ্ঞানিকেরা অনেক সময়ে ধর্ম্মের প্রতিকূলতাচরণ করিয়া থাকেন। ফলকথা একটু বিশেষ করিয়া দেখিলে এই দুইটী প্রণালীর পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়। পূর্ব্বকালে বহু জ্ঞানালঙ্কৃত মহাত্মাগণ শাস্ত্রাদেশে মানবগণকে ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝাইতেন, কিন্তু শিষ্যমণ্ডলী সেই সমস্ত জ্ঞানগর্ভ উপদেশ সকল সময়ে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন না। এই জন্য যখন আমরা কোনও শাস্ত্র পাঠ করি তাহাতে আচার্য্যগণের ভূরি ভূরি অবশ্যপাল্য সদনুষ্ঠান বিধায়ক আদেশ দেখিতে পাই। তাঁহারা কখনও যুক্তি তর্কে সেই সমস্ত ভগবৎ প্রসঙ্গ বুঝাইবার চেষ্টা করেন নাই। কেবল বলিয়াছেন যে ইহাই ভগবানের আদেশ। খ্রীষ্টান পাদরীরাও ওই কথাই কহিতেন। বস্তুতঃ আত্মতত্ত্বদর্শী সাধুরা স্ব স্ব জ্ঞানদ্বারা যাহা অনুভব করিতেন তাহাই শিষ্যগণের নিকট প্রকাশ

করিতেন। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরা ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে যে সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থ দিয়া গিয়াছেন তাহা কেবল ওইরূপ আপ্তবাক্যে পরিপূর্ণ অর্থাৎ মনুষ্য কোনও যুক্তি তর্ক না করিয়া উল্লিখিত শাস্ত্রাদেশে আপনাকে কর্ত্তব্যের পথে পরিচালিত করে ইহাই তাঁহাদের অভিপ্রায়।

মহাভারতের ন্যায় মহান গ্রন্থ সকলের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে তাহাতে বহুবিধ উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায় ও প্রতি উপাখ্যানে যে একটী করিয়া সার তত্ত্ব নিহিত আছে তাহাও উপলব্ধি হয়। উক্ত গ্রন্থে অনেকস্থলে মানবের একাধিক জীবনের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। যে কর্ম্মফলে তাহাকে পুনঃ পুনঃ এই পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় এবং যদ্দ্বারা সে আপনার ভাগ্য গঠন করিয়া থাকে উপনিষৎ পাঠে তদ্বিষয় মানবের বোধগম্য হয়। কর্ম্মফল কখনও মিথ্যা হইবার নহে। আমি এ জন্মে যেমন কর্ম্ম করিব পর জন্মে সেইরূপ ফল আমাকে ভোগ করিতেই হইবে। এমন কি মনুষ্যের ভবিষ্যৎ জন্মস্থান পর্য্যন্ত এই কর্ম্মফলে নির্ব্বাচিত হয়। মনুষ্য কল্পনা দ্বারা বাসনা সৃষ্টি করে এবং সেই বাসনা হেতু একস্থানে বা স্থানান্তরে জন্ম প্রাপ্ত হয়।

মনুও বলেন যে আমরা ইহ জন্মের কর্ম্মদ্বারা জন্মান্তর পরিগ্রহ করিয়া থাকি এবং আমাদের ইহকালের চিন্তা কার্য্য ও বাসনা ভবিষ্যৎ জীবনের ভাগ্য নিরূপণ করে। এই সমস্ত শাস্ত্রীয় অনুশাসনবাক্য যাহা মহাভারতাদি গ্রন্থে উপাখ্যানচ্ছলে কথিত হইয়াছে এবং যাহাকে অবলম্বন করিয়া মনুষ্য ভাবী জীবনের কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হইবে, সেই সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্বের সহজ ব্যাখ্যা আমাদের বিবেচনায় জনসাধারণের বিশেষ আদৃত। কোন এক উপাখ্যানে এরূপ কথিত হইয়াছে যে একব্যক্তি সর্ব্ব দর্শনে সুপণ্ডিত ও সর্ব্ব ধর্ম্মে অভিজ্ঞ হইয়াও কেবল কর্ম্মদোষে সমাজের সর্ব্ব নিম্নস্তরে এমন কি অতি নীচ ব্যাধ গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া সর্ব্ব নিকৃষ্ট ব্যবসায় পশুবধে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার এ দুর্দ্দশা কে করিল? তিনি নিজেই পূর্ব্ব জন্মের কুকর্ম্ম ও কুচিন্তায় আপনার ইহজন্ম সৃজন করিয়াছিলেন।

এইরূপে ঋষিগণ শাস্ত্রের মর্ম্ম সকল নানাবিধ গল্পে সন্নিবেশিত করিয়া প্রকৃত কর্ম্মবিধি মানবমণ্ডলীকে শিক্ষা দিয়াছেন। এই ঋষিগণ দেবতা নহেন, তাঁহারা মানব, তবে সাধারণ মানব শ্রেণীভুক্ত নহেন। তাঁহারা

ত্রিকালজ্ঞ, ভূত ভবিষ্যৎ তাঁহারা দেখিতে পান এবং কোন্ ব্যক্তি পূর্ব্বজন্মের কোন্ কর্ম্মফলে বর্ত্তমান জীবনে সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে তাহাও তাঁহাদের দৃষ্টির গোচরীভূত। তাঁহারা কোন্ উদ্দেশ্য সাধন জন্য এই সমস্ত দিব্যদৃষ্ট ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন? উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, কেবল মনুষ্য উহা পাঠ করিয়া সদসৎ কর্ম্মফল বুঝিতে পারিবে এবং তদনুযায়ী শিক্ষা লাভ করিয়া আপনাদিগের বর্ত্তমান জীবন পরিচালিত করিতে পারিবে ও ভবিষ্য জীবনের সুখের দ্বার উদ্ঘাটিত করিতে পারিবে, এমন কি জীবনান্তে আকাঙ্ক্ষিত অবস্থা প্রাপ্ত হইবে ইহাই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের শাস্ত্রীয় উপদেশ একই ভিত্তিতে গঠিত অর্থাৎ সকল ধর্ম্মই মনুষ্যের বর্ত্তমান উন্নতি অবনতিকে ভবিষ্যোন্নতি অবনতির মূল বলিয়া থাকে। হিন্দু শাস্ত্রে ছান্দোগ্য উপনিষৎ পাঠ কর দেখিবে তাহার একস্থানে কথিত হইয়াছে যে, মনুষ্য চিন্তার সৃষ্টিকর্ত্তা, অথচ চিন্তা-সৃষ্ট জীব, অর্থাৎ আমরাই মনে মনে নানা চিন্তা উৎপন্ন করি, অবশেষে সেই চিন্তানুসারে আমরা ভবিষ্যৎ জন্ম গ্রহণ করি। মণ্ডুক উপনিষদে দেখিতে পাইবে যে মনুষ্য নূতন নূতন কল্পনা দ্বারা চিন্তা গঠিত করে এবং সেই সেই চিন্তার প্রভাবে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এবং ভিন্ন ভিন্ন গৃহে জন্ম প্রাপ্ত হয়। আবার বৃহদারণ্যক উপনিষদকার বলেন যে স্বর্ণকার যেমন, স্বর্ণ লইয়া আপনার মনোমত বিভিন্ন প্রকারের অলঙ্কার গঠন করে, সেইরূপ মনুষ্য ইহজীবনের ইচ্ছা ও কামনা দ্বারা পর জীবন গঠিত করে। প্রাচীন শাস্ত্র ছাড়িয়া মহাত্মা গৌতমের অপেক্ষাকৃত আধুনিক শিক্ষার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও দেখিতে পাইব যে, তিনি অবিকল সেই একই সত্যের প্রতিপাদন করিয়াছেন—বলিয়াছেন যেমন শকটচক্র বৃষের পশ্চাদ্ধাবিত হয়, সেইরূপ দুঃখ দারিদ্র্যও পাপাচারী ব্যক্তির অনুগমন করে। এমন কি অতি আধুনিক খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থেও সেইরূপ উপদেশই লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থের একস্থানে কথিত হইয়াছে "প্রতারিত হইওনা, ঈশ্বর উপহাসের পাত্র নহেন," "যিনি যে জাতীয় বীজ বপন করিবেন তিনি সেই জাতীয় ফল প্রাপ্ত হইবেন।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য।

# আমিষ ও নিরামিষ আহার।

প্রাণাঃ প্রাণভৃতামন্নমন্নং লোকোঽভিধাবতি।
বর্ণ প্রসাদঃ সৌস্বর্য্যং জীবিতং প্রতিভাসুখং।
তুষ্টিঃ পুষ্টির্বলং মেধা সর্ব্বমন্নে প্রতিষ্ঠিতং॥

অন্নই প্রাণিদিগের প্রাণ, লোকে অন্নের চেষ্টায় ধাবিত হয়, লাবণ্য, সুস্বর আয়ু, প্রতিভা, সুখ, তুষ্টি, পুষ্টি, বল ও মেধা সকলই অন্নে প্রতিষ্ঠিত। অন্নের প্রতি সমস্তই নির্ভর করিতেছে, এই হেতু বিশেষ বিচার পূর্ব্বক অন্ন সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। চরক ঋষি আর এক স্থানে বলিয়াছেন, —

লৌকিকং কর্ম্ম যদ্‌বৃত্তৌ, স্বর্গতৌ যচ্চ বৈদিকং,
কর্ম্মাপবর্গে যচ্চোক্তং তচ্চাপান্নে প্রতিষ্ঠিতং।

প্রাণ ধারণের নিমিত্ত লৌকিক কর্ম্ম, স্বর্গলাভের জন্য বৈদিক কর্ম্ম, এবং মুক্তি লাভের জন্য যৌগিককর্ম্ম, সমস্তই অন্নের উপর নির্ভর করে। অতএব শাস্ত্র নিষিদ্ধ বা অপবিত্র অন্নগ্রহণ করিলে শরীর ও মন উভয়ই বিচলিত হয়।

সুবিখ্যাত জারমন্ রসায়নবিৎ লিবিগ সাহেব ১৮৬৯ সালের লণ্ডন ল্যান্সেটে' লিখিয়াছেন, —

মাংশাসী পশু সকল আহারের তারতম্য অনুসারেই শাকাশী পশু অপেক্ষা এত হিংস্র হইয়া থাকে। গিয়েসেনের পশু শালায় একটি ভল্লুক ছিল, তাহাকে কেবল রুটী আহার করাইলে সে শান্ত ও ধীর ভাবে বাস করিত, কিন্তু কিছু দিন মাংস খাইতে দিলেই, সে ভয়ানক হিংস্রক হইয়া পড়িত। শূকরকে মাংস খাওয়াইলে ক্রোধন স্বভাব হয় এবং মনুষ্যকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করে, ডাল্‌কুত্তাকে মাংস খাওয়াইলে তাহারাও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে।

ডাক্তার টম্‌সন্ সাহেব লিখিয়াছেন—"একবার জন কয়েক দেশী নিরামিষাশী লোককে উত্তমরূপে মাংস খাওয়ান হয়। তাহারা আগ্রহের সহিত সমস্ত খাইয়া ফেলিল, কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, দু এক ঘণ্টা পরে মুখভঙ্গি, হাবভাব এবং অসংলগ্ন ব্যবহার দৃষ্টে বুঝা গেল তাহাদের বেশ নেশা হইয়াছে। আর এক সময়ে ঐরূপ খাওয়াইয়া দেখা হয়, সে সময়েও সকলের

দেখা হইয়াছিল। (Experimental Researches on the Food of Animals).

নানাপ্রকার পরীক্ষার দ্বারা তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, শাকাশী পশু সকলকে মাংস আহার করাইলে, উহাদের মাংস কটু ও বিষাক্ত হয়। কোন রূপ সুগন্ধ দ্রব্য খাওয়াইলে পশুর মাংসেও সেইরূপ গন্ধ পাওয়া যায়।

এই সকল পরীক্ষার ফলে, আজকাল অনেকেই স্বীকার করেন যে, খাদ্যের প্রকৃতির উপর জীবের প্রকৃতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে।

জগতে যাহা কিছু অন্ন বলিয়া পরিগৃহীত হয়, তাহা দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়,—নিরামিষ ও আমিষ। নিরামিষান্নের মধ্যে ফল, মূল, শস্য, শাক, সবজি প্রভৃতি উদ্ভিজ্জই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। এক শ্রেণীর জীব এই সকল নিরামিষান্ন আহার করিয়া জীবন ধারণ করে এবং আর এক শ্রেণীর জীব প্রধানতঃ মাংস ভোজন করিয়া থাকে। মাংসাশী পশু এবং মনুষ্য উভয়েই প্রায় শাকাশী পশুর মাংসই ভোজন করিয়া থাকে। জগতে এই দুই সম্প্রদায় চিরকালই বর্ত্তমান আছে। হিন্দুশাস্ত্রকার বিচার পূর্ব্বক স্থির করিলেন, যজ্ঞে পশু হনন করিয়া সেই মাংস ভোজন করা যাইতে পারে কারণ তাহা হইলে উহারা উচ্চযোনি প্রাপ্ত হয়। মনু ৫।৪০। এক্ষণে যজ্ঞবিহিত ক্রিয়া প্রায় লোপ পাইয়াছে, অথচ আমাদের মধ্যে বৃথা পশুহত্যা অবাধে চলিতেছে। মাংস ভোজন প্রথা সমর্থন কল্পে, সংক্ষেপতঃ আমিষভোজী বলেন যে,—

১। বহুকাল মাংসাহার করাতে উহা এখন আবশ্যকীয় হইয়া পড়িয়াছে, এ অভ্যাস ত্যাগ করিলে অনিষ্ট হইবে। জন্মগত অভ্যাস।

২। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, যে জাতি অধিক মাংস খাইয়া থাকে, যেমন ইংরাজ জাতি—সেই জাতিই জগতের মধ্যে মহাশক্তিশালী এবং সর্ব্ব-জাতির শীর্ষস্থানীয়। মাংসাশী পশু ও মনুষ্য মহাবলশালী।

৩। এমন অনেক দেশ আছে, যেখানে মাংস না খাইলে মানুষ বাঁচিতে পারে না। যেমন উত্তর মেরু প্রদেশ। সেখানে শাক সবজি খুব কম উৎপন্ন হয়, আর বহিরুত্তাপ অত্যন্ত কম, এই কারণে সে স্থানে মাংসাহার বিশেষ আবশ্যকীয়। মাংস উত্তেজনা কারক।

৪। শাক সবজি, চাউল দাউলে আছে কি? তাহা খাইয়া কি কাজ

কর্ম্ম করা যায়? মাংসে যবক্ষারময় পদার্থ অধিক পরিমাণে আছে। ডাক্তারেরা বলেন, যবক্ষারই তেজ বর্দ্ধক, পুষ্টিকারক। চরকঋষি নানা প্রকার উৎকৃষ্ট, অপকৃষ্ট মাংসের তালিকা ও গুণাগুণ লিখিয়াছেন। মনুও বলিয়াছেন, জগতীতলে যে কিছু পদার্থ আছে প্রজাপতি জীবের অন্নস্বরূপেই সৃষ্টি করিয়াছেন; অতএব স্থাবর ও জঙ্গম উভয়ই জীবের ভোজ্য। (৫।২৮।২৯) মাংস না খাইয়াই আমাদের জাতিটা একেবারে বলহীন ও নিরীহ হইয়া পড়িয়াছে। মাংসই একমাত্র পুষ্টিকারক আহার।

৫। কোন কোন ইংরাজ বলেন যে, বহুকাল নিরামিষ আহার করিলে বীর্য্যহানি বশতঃ সন্তানোৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া যায়; কাযেই এরূপ আহারে মনুষ্য জাতিরই লোপের সম্ভাবনা।

৬। পশু সকল ত আহারের নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছে। বলবান জীব দুর্ব্বলের প্রাণনাশ করিয়া তদ্দারা জীবন ধারণ করিতেছে, ইহাই জাগতিক নিয়ম।

৭। মাংসাশী পশুর ন্যায় মাংস কাটিয়া খাইবার দাঁত আমাদের রহিয়াছে! মাংসাহার যদি ভগবানের উদ্দেশ্য বিরুদ্ধ হইত, তবে এরূপ দাঁত থাকিত না।

৮। মাংস অতি সহজে পরিপাক হয়, সেকারণে মাংসভোজীদিগের মধ্যে উদরাময় বড় দৃষ্ট হয় না। নিরামিষাশী একগুণ আহার করিয়া দশগুণ মলত্যাগ করেন এবং প্রায়ই উদরাময় ভোগ করেন। নিরামিষ ভোজীদের পাকস্থলী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং তাঁহাদের মধ্যে ভুঁড়ি অধিক দৃষ্ট হয়।

যখন জানা গিয়াছে যে পশুর মত উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে, তখন প্রাণিবধে যদি পাপ হয়, তবে উভয় সম্প্রদায়কেই সমান পাপভোগ করিতে হইবে।

ক্রমশঃ।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষাল।

# আদর্শ-চরিত্র।

## ৬। ধর্ম্মব্যাধ।

পতিব্রতা গৃহিণী, তপোনিরত ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণ কৌশিককে ক্রোধ সন্তপ্ত দেখিয়া সান্ত্বনা প্রয়োগপূর্ব্বক অপরাধের ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি পতিশুশ্রূষাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ধর্ম্ম, অধিকন্তু ভর্ত্তাকে সমুদয় দেবগণ অপেক্ষাও প্রধান বলিয়া জ্ঞান করেন এবং তাহার ফলস্বরূপ ব্রাহ্মণ যে ক্রোধানলে বলাকা দগ্ধ করিয়াছেন, তাহা তিনি জানিতে পারিয়াছেন। ধর্ম্ম নানাপ্রকার, অতি সূক্ষ্ম এবং দুর্জ্ঞেয় এবং যদিও তিনি ব্রাহ্মণ, স্বাধ্যায়নিরত, এবং শুচি, তথাপি প্রকৃত ধর্ম্মতথ্য তিনি অবগত নহেন। সুতরাং ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইবার জন্য মিথিলায় ধর্ম্মব্যাধের সমীপে তাঁহার গমন করা কর্ত্তব্য।

মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের বর্ণিত উপাখ্যান হইতে আমরা যাহা সংগ্রহ করিতে পারি, তাহাতে দেখিতে পাই যে, ধর্ম্মব্যাধ মিথিলাবাসী, এবং মৃগ ও মহিষ মাংস বিক্রেতা। ব্যাধ সূনা মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া মাংস বিক্রয় করিতেছে দেখিয়া, তপোনিরত এবং শুচি ব্রাহ্মণ অতীব বিস্মিত হইলেন। তিনি পতিব্রতা স্ত্রীর বাক্যে এবং জনক পরিপালিত মিথিলায় দ্বিজগণের মুখে ব্যাধ বৃত্তান্ত ইতি পূর্ব্বে শ্রুত হইয়াছিলেন, সুতরাং এরূপ স্থলেও তাঁহার চিত্তবিকার উপস্থিত হইল না। প্রকৃত শিক্ষার্থীর পক্ষে ব্রাহ্মণ এবং ব্যাধ এ পার্থক্য জ্ঞান থাকিলে শিক্ষা অসম্ভব এবং এই পার্থক্য জ্ঞানহেতু আমরা সহজেই পদস্খলিত হইয়া উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হই। আমাদের আধুনিক ধর্ম্মজীবন পার্থক্যপূর্ণ এবং বহির্মুখীভাব হেতু ভেদজ্ঞান জড়িত। ইহা জাতিগত, ব্যক্তিগত নহে, এবং আমাদের অন্তর্নিহিত, সুতরাং প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভের অন্তরায়। পুরাণাদি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রকৃত আর্য্য-ধর্ম্ম আধুনিক হিন্দুধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ প্রভেদ। ক্ষত্রিয় বংশজাত শ্রীকৃষ্ণ গোপ-গৃহে পালিত হইলেও জাতিভ্রষ্ট হন নাই, দ্রৌপদী প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জনাদি ঋষি-মহর্ষিগণ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, ব্রাহ্মণ কৌশিক মাংস-বিক্রেতা ব্যাধের নিকট আচমনীয় গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই; রামচন্দ্রও

অস্পৃশ্য চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিয়া ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত হন নাই। দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে ধর্ম্ম-শাসনে বিভিন্নতা এবং আংশিক বিপর্য্যয় ভাব অবশ্যম্ভাবী; এবং এই জন্যই বোধ হয় অধুনা আমরা অন্তর্মুখী পবিত্রতা সম্পাদনে অসমর্থ হইয়া প্রকৃত ধর্ম্মের নিম্নসোপানে ভ্রমণ করিতেছি। ইহা যে গর্হিত নহে তাহা ধর্ম্মব্যাধের উপদেশে উপলব্ধি হইবে। জিজ্ঞাসু কৌশিককে ধর্ম্মব্যাধ বলিতেছেন যে,—"যাঁহারা কাম, ক্রোধ, দম্ভ, লোভ ও কপটতা বশীভূত করিয়া, ইহাই ধর্ম্ম, এইরূপ বোধে সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁহারাই শিষ্ট ও শিষ্টগণের সম্মত।" সুতরাং দেখা যায় যে চিত্তের কতকগুলি কুৎসিত বৃত্তি দমন করাই ধর্ম্ম এবং উক্ত দমনই গীতার উপদিষ্ট আত্মধর্ম্ম বা স্বধর্ম্ম এবং উক্ত প্রবৃত্তি সমূহের বশীভূত হওয়াই পরধর্ম্ম। এই পরধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাবান হওয়া নিতান্ত কথার কথা নহে। মনকে নিগ্রহ করিয়া এই গুলি দমন করা অর্জ্জুনও দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়াছিলেন, সুতরাং ধার্ম্মিক হইয়াছি মনে করিলেই ধার্ম্মিক হওয়া যায় না। সেই জন্য গীতায় ভগবান বলিয়াছেন যে, সদোষ হইলেও স্বধর্ম্মানুসরণ করাই শ্রেয়ঃ। এ জীবনে যতটুকু সৎপ্রবৃত্তি লইয়া আসিয়াছি এবং ক্রমোন্নতি কল্পে যে বিধি অবলম্বন করিয়া আমাকে জীবন পরিচালিত করিতে হইবে তাহাই আমার ধর্ম্ম। যিনি জীবনের সেই বিহিত মার্গ প্রদর্শন করান তিনিই প্রণম্য, তিনিই উপদেষ্টা এবং গুরুদেব।

ব্যাধ ও কৌশিকের কথোপকথনে আমরা জ্ঞাত হই যে, জনকরাজ্যে এক ব্যক্তিও কুকর্ম্মী ছিল না এবং প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্ম ব্যাধ তাহার প্রমাণ। ব্রাহ্মণ, ব্যাধের মাংসবিক্রয় কর্ম্ম নিতান্ত অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন এবং তাহার এই বিসদৃশ ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া অনুতপ্ত হন। ব্যাধ ব্রাহ্মণকে শান্ত করিয়া বলিতেছেন যে, "হে ব্রহ্মণ্। আমি স্বয়ং পশু হত্যা করি না, অন্যের দ্বারা হত বরাহ ও মহিষের মাংস সর্ব্বদা বিক্রয় করিয়া থাকি। আমি মাংস ভোজন করি না।" তিনি পুনরায় বলিতেছেন, "হে দ্বিজোত্তম! আমি স্বধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া আপনার ব্যবহার পরিত্যাগ করি না, প্রত্যুত আপনার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল বলিয়া উহা দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি...... যে ব্যক্তি স্বকর্ম্ম-নিরত তাহাকে ধার্ম্মিক বলা যায়।"

ধর্ম্মব্যাধের হিংসা সম্বন্ধে উপদেশ রহস্যপূর্ণ। তিনি বলিতেছেন—"দেখুন পুরুষগণ লাঙ্গল দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিতে করিতে বহুবিধ প্রাণীগণের প্রাণ-সংহার করে; অতএব এ বিষয়ে আপনার কি বিবেচনা হয়?......সমুদয় পৃথিবী ও আকাশ জীবে পরিপূর্ণ; অণুমাত্র ও প্রাণীশূন্য স্থান নাই; এই নিমিত্ত লোকে অজ্ঞাতসারে অবশ্যই তাহাদিগকে বিনষ্ট করে। অতএব এ বিষয়ে আপনার কি বিবেচনা হয়? পূর্ব্বে মহাত্মারা অহিংসা পরম ধর্ম্ম বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু দেখুন এই লোক মধ্যে কোন্ ব্যক্তি না হিংসা করে। বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে কেহই অহিংসক নাই, অহিংসা নিরত যতিগণও হিংসা করিয়া থাকেন।" পরিশেষে তিনি বলি-লেন—'এইরূপে বুদ্ধি-বিভেদ বশতঃ জগতে নানা প্রকার ধর্ম্মাধর্ম্ম দৃষ্ট হয়। হে দ্বিজবর। ধর্ম্মাধর্ম্ম-মূলক কর্ম্মের বিষয় বর্ণন করিতে অনেক অবশিষ্ট রহিল; কিন্তু যে সকল ব্যক্তিরা স্বধর্ম্ম নিরত তাহারাই যশস্বী ও মান্য হয়।"

ধর্ম্মব্যাধ গার্হস্থ ধর্ম্ম হইতে বিজ্ঞান সম্মত অন্যান্য নানাবিধ বিষয়ে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। সে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করা এস্থলে সম্ভব নহে; সাধারণতঃ ব্যাধ যেরূপে তাঁহার জীবন অতিবাহিত করিতেন এবং যে উপায়ে তিনি ব্যাধজন্মে তপোনিরত কৌশিক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞানলাভ করিয়া-ছিলেন তাহাই দেখা যাউক।

অনন্তভক্তিসহকারে পিতামাতার সেবা করিয়া ধর্ম্মব্যাধ তাঁহার জীবনে এতদূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ ব্যাধদম্পতী তনয়ের অকপট ভক্তিতে প্রীত হইয়া তাঁহার প্রতি যে আশীর্বচন প্রয়োগ করিতেন ব্যাধের তাহাতেই সমস্ত ক্লেশ কষ্ট দূরীভূত হইয়া চিত্তের নির্ম্মলতা সম্পাদিত হইয়াছিল; এবং নির্ম্মলতা হেতু পূর্ব্বজন্মের অর্জ্জিত জ্ঞান সম্যকরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়া-ছিল। ব্যাধের সেবা যে কিরূপ অকপট ছিল তাহা আমরা তাঁহার কথায় জানিতে পারি—"হে ব্রাহ্মণ। আমার ভার্য্যা, পুত্র, সুহৃজ্জন ও প্রাণ এই সমুদয়ই ইঁহাদিগের সেবার নিমিত্ত আছে। আমি পুত্র কলত্র সমভিব্যাহারে সতত ইঁহাদিগের শুশ্রূষা করি। হে দ্বিজসত্তম। আমি স্বয়ং ইঁহাদিগকে স্নান করাইয়া পদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক স্বহস্তে আহার প্রদান করি। সতত ইঁহাদের অনুকূল বাক্য প্রয়োগ করি। বিপ্রিয় বাক্য কদাচ আমার মুখ

হইতে বিনির্গত হয় না। অধিক কি, ইহাঁদের প্রিয়কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত যদি অধর্ম্মাচরণ করিতে হয়, তথাপি আমি তাহাতে পরাঙ্মুখ হই না।"

কৌশিক এতক্ষণে তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন এবং ব্যাধও সেই সত্যশীলা পতি-পরায়ণা কামিনী কেন ব্রাহ্মণকে তাঁহার সমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা জ্ঞাত হইয়া হিতোপদেশ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে পুত্র বিরহ শোকে অন্ধ বৃদ্ধ জনক জননীর সেবার জন্য তাঁহাদের সমীপে যাইতে উপদেশ করিলেন। ব্রাহ্মণও "হে মহাত্মন্। অদ্য আমি তোমার সত্যাচার সন্দর্শনে পরম প্রীত হইলাম। আমি নরকে নিপতিত হইতেছিলাম, তুমিই অদ্য আমাকে সমুদ্ধৃত করিলে" ইত্যাকার শিষ্ট বাক্য প্রয়োগ ও যথা-বিহিত বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে উপস্থিত হইয়া যথান্যায়ে দৃঢ়তর ভক্তি সহকারে পিতামাতার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

---

# মানবের ইতিবৃত্ত।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

তিনি স্বীয় শরীর হইতে বিবিধ প্রজা সৃষ্টির ইচ্ছা করিয়া ধ্যানযোগে প্রথমতঃ জলের সৃষ্টি করিলেন এবং তাহাতে আপন শক্তি-বীজ অর্পণ করিলেন। অর্পিত বীজ জল সংযোগে সুবর্ণবর্ণোপম কোটীসূর্য্যসমপ্রভ একটি প্রকাণ্ড অণ্ডে পরিণত হইল। এমন ভাষা নাই যাহা নূতন বিশ্বের আবির্ভাব সম্বন্ধে মনুর এই বর্ণনা অপেক্ষা অধিকতর ভাবব্যঞ্জক হইতে পারে! অসীম, অনন্ত তিমিররাশির মধ্যে এই মহান্ জ্যোতির আবির্ভাবের বর্ণনা মনুষ্য ভাষার অসাধ্য। মনুষ্যভাষা সম্যকবর্ণনার অন্তরায় ও প্রতিবন্ধক স্বরূপ দাঁড়ায়। তজ্জন্যই মানবজাতির আদিপুরুষ ভগবান মনু এই রূপকের ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

৩। ত্রিমূর্ত্তি। ঈশ্বর জ্যোতির্ম্ময় শৈলের ন্যায় প্রকাণ্ড অণ্ডরূপে আবির্ভূত হইয়া পরে ত্রিমূর্ত্তিতে ত্রিধা বিভক্ত হইলেন। এই ত্রিমূর্ত্তি অতি মহান্, অতি গরীয়ান। এই ত্রিমূর্ত্তি ভগবান্ ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন তিনটী

শক্তি ও বিভূতি। তন্মধ্যে একজন সৃষ্টিকর্ত্তা, একজন পালনকর্ত্তা, ও একজন সংহারকর্ত্তা। তিনে এক, একে তিন। অচিন্ত্য ঈশ্বর ত্রিধা বিভক্ত হইলেও ভগবানের যে সর্ব্বব্যাপী চিন্ময়ভাব তাহাদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা সর্ব্বদাই অবিভক্ত থাকে। এই ত্রিমূর্ত্তিকে একত্রে শব্দ-ব্রহ্ম বলা হয়। গ্রীকজাতির ভাষায় তাহাদিগকে লগই (Logoi), একমূর্ত্তিকে একবচনে লগস্ (Logos) কহে। লগস্ অর্থে বাক্য। বাক্যে শব্দ নিহিত। শব্দ ভগবান্ ঈশ্বরের অসীম ও অনন্তশক্তির পরিচালক। শব্দ যেমন সৃজন করে, তেমনি রক্ষা এবং বিনাশ করে। জগতের প্রধান প্রধান প্রত্যেক ধর্ম্মেই এই ত্রিমূর্ত্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কেল্‌ডিয়া মিশর, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের প্রাচীন ধর্ম্মে এক ঈশ্বর হইতে কথিত তিনের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। স্বরূপতঃ এক, কিন্তু শক্তির বিকাশে তিন।

৪। সপ্তদেব—অদিতির সপ্তপুত্র। এই অভিনব ত্রিমূর্ত্তিকে পরিবেষ্টন করিয়া অপর সাতজন অপূর্ব্বদেব বিদ্যমান আছেন, তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ডে জন্মলাভ করিয়া সুকৃতিফলে এই আধ্যাত্মিক গিরিশিখরের অত্যুচ্চ শৃঙ্গে অধিরোহণ করিয়াছেন। এই সপ্তদেব ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মে বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছেন। হিন্দু ধর্ম্মে তাঁহারা অদিতির সপ্তপুত্র নামে খ্যাত। অষ্টমপুত্র মার্ত্তণ্ড বা সূর্য্য। প্রত্যেক আদিত্যের স্বস্ব গৃহ আছে। তাহাদিগকে সৌর মণ্ডলের সপ্ত অধিষ্ঠাতা দেব বলা হইয়া থাকে। মিশরের ধর্ম্ম গ্রন্থাদিতে তাহাদিগকে সপ্ত গুহ্যদেব বলা হইয়াছে। পারস্য দেশীয় যোরোয়াষ্টার ধর্ম্মে তাঁহারা আমসাসাপণ্ড (Amshaspuns) নামে খ্যাত, ইহুদি ধর্ম্মে তাঁহাদিগকে সেফিরথ্ (Sephiroth) কহে। খ্রীষ্টান ও ইসলামধর্ম্মে তাঁহারা আর্কএঞ্জেল (Archangel) নামে খ্যাত। যাহা হউক, নামে কিছু আইসে যায় না। তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মে বিভিন্ন নামে অভিহিত হইলেও এই ব্রহ্মাণ্ড সাম্রাজ্যে ঈশ্বরের প্রতিনিধি রূপে এই ত্রিমূর্ত্তিকে পরিবেষ্টন করিয়া বিরাজিত আছেন। তাঁহারা প্রত্যেকে স্বস্ব রাজ্য শাসন ও স্বীয় স্বীয় বিভাগ পরিচালনা ও সংরক্ষণ করিতেছেন। পরাবিদ্যার গ্রন্থাদিতে (Theosophical Literature) তাঁহাদিগকে গ্রহদেব ও গ্রহের অধিষ্ঠদেব

বলা হইয়াছে, কারণ সৌরমণ্ডলের জ্যোতির্ম্ময় সপ্ত অধিষ্ঠদেবের সঙ্গে সাতটী বিশুদ্ধ গ্রহের সংস্রব রহিয়াছে। এই পরিদৃশ্যমান গ্রহগুলি এই সপ্তদেবের বাহ্য স্থূলদেহ স্বরূপ। বাহ্যদৃষ্টিতে তাহাদের কয়েকটী গ্রহ লইয়া আমাদের এই বিশ্ব নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক ভাবে দেখিতে গেলে, তাঁহারা অদিতির সপ্তপুত্র। তাঁহাদের প্রত্যেকের এক একটী বাসোপযোগী গৃহ বা গ্রহ আছে, তাহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত স্বীয় স্বীয় রাজ্যপালন ও নির্দ্দিষ্ট বিভাগীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন।

৫। বিশ্বকর্ম্মা দেবগণ ( Creative Hieraichies )। আবার তাঁহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া বিশ্বকর্ম্মা দেবগণ বিরাজমান আছেন। তাঁহারা দ্বাদশ শ্রেণিতে বিভক্ত। এক এক বিভাগে এক এক জন করিয়া দ্বাদশজন অধিনায়ক দেব আছেন। আবহমানকাল হইতে তাহাদের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ আছে। আমাদের দেশের জ্যোতিষ শাস্ত্রে যে রাশিচক্র প্রচলিত আছে, তাহা এই দেবগণের জ্ঞাপক। রাশিচক্র আধুনিক পণ্ডিতগণের মস্তিষ্কপ্রসূত বা নবাবিষ্কৃত নহে। স্মরণাতীত কালের পূর্ব্বে শিক্ষাগুরু মহাপুরুষগণ চতুর্থ জাতিকে ( দৈত্য জাতিকে ) ইহা অর্পণ করিয়াছিলেন। এইরূপ শিক্ষকদের শীর্ষস্থানীয় একজন প্রধান ব্যক্তির নাম আমাদের সুপরিচিত। মহাভারত ও অন্যান্য শাস্ত্র গ্রন্থাদিতে তাঁহার উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি অসুর ময় বা ময়দানব। যুধিষ্ঠির মহারাজের রাজসূয়যজ্ঞ কালে বিচিত্র কারুকার্য্যময় সুপ্রসিদ্ধ রাজসভা তিনিই নির্ম্মাণ করেন। তিনি প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের অগ্রণী। ভারতে এবং মিশরদেশে তিনিই রাশি চক্র প্রবর্ত্তিত করেন ও জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা দেন।

আমাদের এই বিশ্ব কি প্রণালীতে নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার চিত্র এই রাশিচক্ররূপে অক্ষরে অনন্ত চিত্রপটে অঙ্কিত আছে। এই রাশিচক্রের রহস্যভেদ করিতে পারিলেই বুঝিতে পারা যায়, এক একটী গ্রহকে কেন এক একটী রাশির রাজা বলা হইয়াছে। গ্রহ বলিতে গ্রহের অধিষ্ঠান কর্ত্তাকে বুঝায়। তিনি তাঁহার অধীন অন্যান্য দেবগণের সাহায্যে তাঁহার সাম্রাজ্য সৃজন করিয়া সেই গ্রহস্থিত জীবগণের উন্নতি বিধান করেন।

আবার বলি, প্রণিধান কর। প্রথমে ত্রিমূর্ত্তি। ব্যষ্টিতে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, পালনকর্ত্তা বিষ্ণু, সংহারকর্ত্তা শিব; সমষ্টিতে ঈশ্বর। তৎপর তাঁহার চতুর্দ্দিকে প্রতিনিধি স্বরূপ সপ্তদেব। এই বিশ্ব প্রধানতঃ সাতভাগে বিভক্ত। তাঁহারা ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে এক এক বিভাগের শাসনকর্ত্তা স্বরূপ নিযুক্ত আছেন। তাঁহাদের চতুর্দ্দিকে দ্বাদশ শ্রেণীর বিশ্বকর্ম্মা দেবগণ বিশ্বের সৃজন কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। তন্মধ্যে বর্ত্তমানে পাঁচ শ্রেণীর বিশ্বকর্ম্মাগণ আমাদের বিশ্বের অত্যুন্নত জ্ঞানীদিগেরও জ্ঞানের বহির্ভূত হইয়াছেন; তাঁহারা এই বিশ্বের সীমা ও সংস্রব ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, কারণ এই পাঁচ শ্রেণীমধ্যে চার শ্রেণী মুক্তিলাভ করিয়াছেন, এক শ্রেণী মুক্তির দ্বারে উপস্থিত। এই পাঁচ শ্রেণী বাদে অপর সাত শ্রেণী আমাদের সঙ্গে সংসৃষ্ট, তাঁহারাই এই অধ্যায়ের আলোচ্য।

জীবাত্মা সকল প্রত্যেকে ঈশ্বরের এক একটী অংশ। "অংশানী নুনভেদস্থাৎ ব্রহ্মবহ্নি স্ফুলিঙ্গবৎ।" ঈশ্বর জ্বলন্ত অগ্নি, জীব তাহার এক একটী স্ফুলিঙ্গ বা কণা। "মমৈবাংশঃ জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ॥" এই সপ্তশ্রেণীর বিশ্বকর্ম্মা দেবগণ ঈশ্বরের অংশরূপ আমাদিগকে অর্থাৎ জীবগণকে যেন সংস্পর্শ করিয়া আছেন, যেহেতু এই সাত শ্রেণীর মধ্যে এক শ্রেণী এই জীবলোক দ্বারাই গঠিত। এই সাত শ্রেণী সম্বন্ধে সংক্ষেপে ক্রমশঃ আলোচনা করা যাইতেছে। তন্মধ্যে তিন শ্রেণী অরূপ, শেষ চার শ্রেণী রূপদেব।

অরূপদেবগণ।

(ক) প্রথম শ্রেণী। বৈশ্বানরগণ। তাহারা রূপ ও অবয়ব বিহীন। তাঁহারা বিশ্বের জীবন এবং হৃদয়স্বরূপ, অথবা তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা বা ইচ্ছা শক্তি। পরমাত্মার ঐশ শক্তি তাহাদের দ্বারা প্রত্যেক জীবে রশ্মি স্বরূপে প্রবেশলাভ করিয়া হৃদয়স্থিত আত্মাকে প্রবোধিত ও উদ্ভাসিত করে।

(খ) দ্বিতীয় শ্রেণী। তাঁহারা প্রথম শ্রেণীর নিম্নে। তাঁহাদের মধ্যে অগ্নি এবং আকাশ এই দুইতত্ত্বের একত্র সমাবেশ ও সমন্বয়। যুক্তি ও জ্ঞান একাধারে এই শ্রেণীতে বিদ্যমান। তাঁহাদের দ্বারা জীবে ধীশক্তির বিকাশ এবং বুদ্ধির স্ফুরণ হইয়া থাকে।

(গ) তৃতীয় শ্রেণী। তাঁহারা মহৎ বা বিশ্বের সমষ্টি মন। তাঁহাদের মধ্যে অপ্, তেজঃ ও ব্যোম এই তিনের একত্র সমাবেশ। তাঁহারা জীবে ক্রিয়াশক্তি প্রদান করেন।

এই তিন শ্রেণী অরূপদেব। তাহারা এত সূক্ষ্মভূতে অবস্থিত যে তাঁহারা কোন অবয়ব গ্রহণ করিতে পারেন না, অথচ সকল অবয়বেই তাঁহারা ওতঃপ্রোত ভাবে বিরাজমান আছেন।

রূপদেবগণ।

(ঘ) চতুর্থ শ্রেণী। মানবজীবাত্মাগণ। আমাদের মানবজীবাত্মাগণ এই শ্রেণীভুক্ত, তাঁহারা অবিনশ্বর জীবসমূহ। প্রকৃতপক্ষে আমরা আমাদের পরমপিতা পরমেশ্বরের হৃদয়রাজ্যে অবিচ্ছিন্নভাবে বিরাজমান আছি, কিন্তু বাহ্যজগতে আমরা পরস্পর পৃথক ও ভিন্ন বলিয়া অনুমিত হইতেছি।

(ঙ) পঞ্চম শ্রেণী। অসুরগণ। পঞ্চম শ্রেণীর বিশ্বকর্ম্মাগণ মকর নামে অভিহিত। পঞ্চভুজ ক্ষেত্র ( Pentagon ) ইহাদের জ্ঞাপক চিহ্ন। এই শ্রেণিতে প্রকৃতির দুইটী আধ্যাত্মিক ও দুইটী পার্থিব বিভূতির আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রিয়া এবং অক্রিয়া এই দুইয়ের বিরোধ প্রথমে তাহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের পুরাণাদিতে তাহারা অসুরনামে প্রসিদ্ধ, প্রায় প্রত্যেক ধর্ম্মশাস্ত্রেই তাহাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সৃষ্টির প্রারম্ভে লোক—পিতামহ ব্রহ্মার প্রথম দেহ হইতে তাহাদের উদ্ভব হয়, সেই দেহ ব্রহ্মা ত্যাগ করাতে ইহা জগতে অন্ধকার রূপে পরিণত হইল। এই শ্রেণীর বহুসংখ্যক দেব পূর্ব্ববর্ত্তী বিশ্বে উন্নতিলাভ করিয়া পরিপক্কাবস্থায় এই জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাহারাও অসুরনামে অভিহিত হইলেও অন্ধকার হইতে যাহাদের উদ্ভব হইয়াছে, তাহারাই এই পঞ্চম শ্রেণীভুক্ত। তাহারা অসাধারণ আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান্ ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে জ্ঞানবান হইলেও অহঙ্কারের বীজ তাহাদের মনে নিহিত ছিল। এই অহঙ্কার তত্ত্বটী মানবের উন্নতির প্রধান সহায়। এক এক বিশ্বে সপ্তগ্রহ চক্র আছে। এই অসুরগণ প্রথম গ্রহচক্ররূপ বিটপীর ফলস্বরূপ।

(চ) ষষ্ঠ শ্রেণী। অগ্নিষ্বাত্ত পিতৃগণ এই শ্রেণীভুক্ত। তাঁহারা পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার দিবা বা জ্যোতিঃ দেহ হইতে উৎপন্ন। তাঁহারা দেবগণের পিতৃপুরুষ।

তাঁহারা অগ্নিষ্বাত্ত পিতৃনামে খ্যাত। তাঁহারা আত্মজ্ঞানী, মানসধ্যানী। মানবের আত্মা এবং স্থূল-দেহ ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত উপাধিই তাঁহারা প্রদান করেন। তাঁহারা দ্বিতীয় চক্রের ফলস্বরূপ।

(ছ) সপ্তম শ্রেণী। বর্হিষদ পিতৃগণ এই শ্রেণীভুক্ত। তাঁহারা ব্রহ্মার সান্ধ্যদেহ হইতে উৎপন্ন। অগ্নিষ্বাত্ত পিতৃগণ যেমন মানবের মানসিক উন্নতিবিধান করেন, বর্হিষদ পিতৃগণ তেমনি মানবের স্থূলদেহ সৃজন ও ক্রমিক উৎকর্ষসাধন করেন। বিশ্বকর্ম্মা সপ্তশ্রেণীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ কথিত হইল। তাঁহারা জীবগণের উন্নতিসাধন কল্পে বিশ্বস্রষ্টা ভগবান ব্রহ্মার সৃষ্টি বিষয়িনী কার্য্যে সহায়তা করেন। জীবগণ স্বস্ব কর্ম্মবশে দেহধারণ করিয়া এই ধরণীতলে বিচরণ করে এই বিশ্বকর্ম্মা দেবগণ তাহাদের আধ্যাত্মিক শক্তির স্ফুরণ করিয়া উন্নতিবিধান করেন।

ক্রমশঃ

যুগল সেবক।

---

# রূপসনাতন ও জীব গোস্বামী।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর। )

সনাতন গোস্বামীর স্বপ্নদর্শন।

এইভাবে কিছুকাল অতীত হইলে, সনাতন গোস্বামী একদা নিদ্রাযোগে একটি আশ্চর্য্য স্বপ্ন দর্শন করিলেন। ঐ স্বপ্ন দর্শনের পর হইতেই তাঁহার অন্তরে বৈরাগ্যের উদয় হয়। স্বপ্নটি এই—একটি পরমসুন্দর নবীন সন্ন্যাসী সনাতন গোস্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সনাতন, আর কালবিলম্ব করিও না, সত্বর সেবাকার্য্যে মনোনিবেশ কর। শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার ও ভক্তি শাস্ত্রের প্রচার কর।" এই কথা বলিয়াই সন্ন্যাসী অন্তর্হিত হইলেন। তখনই সনাতন রূপগোস্বামীকে শুনাইলেন। ভ্রাতার কথা শুনিয়া রূপগোস্বামী বলিলেন। "আর্য্য, শুনিয়াছি, নবদ্বীপে শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হইয়াছেন। বোধহয়, তিনিই স্বপ্ন দর্শন দিয়া ঐপ্রকার উপদেশ

করিয়াছেন। আমরা বিষয়ান্ধকূপে পতিত। পতিতপাবন প্রভু আমাদিগকে কি উদ্ধার করিবেন না?" এই কথা বলিতে বলিতেই অশ্রুধারায় তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক দুই ভ্রাতা নির্জ্জনে পরামর্শ করিয়া দৈন্যবিনয় সহকারে মহাপ্রভুকে একখানি পত্র লিখিলেন। প্রভু সনাতন গোস্বামীর ঐ পত্র প্রাপ্ত হইয়াও উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় কোনরূপ উত্তর-প্রদান করিলেন না। সনাতন গোস্বামী কিন্তু পত্রের উত্তর না পাইয়া উপর্য্যুপরি আরও কয়েকখানি পত্র লিখিলেন। পরিশেষে মহাপ্রভু ঐ সকল পত্রের উত্তর স্বরূপ নিম্ন লিখিত শ্লোকটি প্রেরণ করিলেন।

"পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্॥"

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎকার।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে প্রভু সন্ন্যাস করিয়া দক্ষিণদেশে গমন করিলেন। দাক্ষিণদেশ ভ্রমণ করিয়া পুনর্ব্বার গৌড়দেশ হইয়া শ্রীবৃন্দাবন গমনের অভিলাষ করিলেন। গৌড়দেশে পদার্পণ হইলেই সহস্রাধিক লোক প্রভুর অনুগামী হইলেন। তদ্ব্যতীত প্রভু যেখানেই রাত্রিযাপন করেন, সেইস্থানেই তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রভূত লোকের সমাগম হইতে লাগিল। প্রভু এইরূপে শান্তিপুর হইতে গঙ্গাতীর পথে গৌড়ের সমীপবর্ত্তী রামকেলি পর্য্যন্ত গমন করিলেন। এই রামকেলিতেই সনাতন গোস্বামী ও রূপগোস্বামীর বাসস্থান। প্রভু রামকেলিতে উপস্থিত হইলে, গৌড়েশ্বর হুসেনসার একজন কোতোয়াল যাইয়া গৌড়েশ্বরকে প্রভুর আগমন বার্ত্তা নিবেদন করিলেন। কোতোয়াল বলিলেন, "গৌড়েশ্বর! রামকেলি গ্রামে এক হিন্দু সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। তিনি নিরবধি কীর্ত্তন করেন। তাঁহার সঙ্গে অসংখ্য লোক। ঐ সকল লোক তাঁহার অতিশয় বাধ্য। দেখিলে, রাজবিদ্রোহের আশঙ্কা হয়। গৌড়েশ্বর, সে সন্ন্যাসী আমি আর কখন দেখি নাই। তাঁহার সৌন্দর্য্য কন্দর্পকেও পরাজয় করিয়াছে। অঙ্গকান্তি সুবর্ণের সদৃশ উজ্জ্বল। শরীর প্রকাণ্ড, ভুজযুগল আজানুলম্বিত, নাভি সুগভীর, গ্রীবা সিংহের তুল্য,

স্কন্ধ গজেন্দ্রের স্কন্ধ সদৃশ। নয়নযুগল কমলদলের ন্যায় বিশাল ; কোটি চন্দ্র ও বদনের তুলনা হয় না। অধর রক্তবর্ণ, দন্ত সকল মুক্তার ন্যায় সুগঠিত ; ভ্রূযুগল কামধনুর সমান। সুপীন বক্ষঃস্থল চন্দনচর্চ্চিত, কটিদেশে অরুণবর্ণ বসন। চরণযুগল পদ্মের তুল্য, নখগুলি দর্পণের ন্যায় নির্ম্মল। দেখিলে বোধ হয়, কোন রাজার নন্দন সন্ন্যাসী হইয়া ভ্রমণ করিতেছেন। সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নবনীতের ন্যায় কোমল। সেই সুকোমল অঙ্গ মুহুর্মুহু কঠিন ভূমিতলে পতিত হইতেছে, তথাপি, কি আশ্চর্য্য, সেই পতনে পাষাণও বিদীর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু অঙ্গে সামান্য ক্ষতচিহ্নও দেখা যায় না। ঐ অঙ্গে কদম্বকোরকের ন্যায় অপূর্ব্ব পুলকাবলী। ক্ষণে ক্ষণে ঘোরতর স্বেদ ও কম্প। হাজার লোকেও ধরিয়া রাখিতে পারে না। নয়নে নদীর স্রোতের ন্যায় বারিধারা বহিতেছে। কখন হাসিতেছেন, কখন কাঁদিতেছেন। কখন মূর্চ্ছা যাইতেছেন। মূর্চ্ছায় শ্বাস পর্য্যন্ত থাকে না, দেখিলে ভয় হয়। সদাই বাহু তুলিয়া নাম কীর্ত্তন করিতেছেন। কখন ভোজন করেন, কখন শয়ন করেন, দেখি নাই। চারি দিক্ হইতে দর্শনার্থ সমাগত লোকে লোকারণ্য হইতেছে, যে আসিতেছে, প্রায়ই আর গৃহে ফিরিয়া যাইতেছে না। যাহা দেখিয়াছি, তাহা নিবেদন করিলাম।" এই কথা বলিয়া কোতোয়াল নিরস্ত হইলেন। গৌড়েশ্বর শুনিয়া কোতোয়ালকে বিদায় দিলেন। পরে ভাবিলেন, পূর্ব্বে ফকির যাঁহার কথা বলিয়াছিলেন, বোধ হয়, সেই মহাপুরুষেরই শুভাগমন হইয়াছে। এই প্রকার চিন্তার পর, তিনি কেশব নামক জনৈক কর্ম্মচারীকে ডাকাইয়া বলিলেন, "কেশব, শুনিলাম, রামকেলিতে একজন হিন্দু সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে অনেক লোকজন, তুমি কি তাঁহার বিষয় কিছু বিদিত আছ ?" কেশব অতীব সজ্জন, বিশেষতঃ তিনি গৌড়েশ্বরকে হিন্দুর দ্বেষ্টা বলিয়াই জানিতেন, অতএব প্রকৃত কথা গোপন করিয়া বলিলেন, "হাঁ, আমি জানিয়াছি, একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, তিনি বৃক্ষতলে বাস করেন, ভিক্ষুক সন্ন্যাসীমাত্র।" গৌড়েশ্বর কেশবের মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন, "তুমি গোপন করিলে কি হইবে! আমি বুঝিয়াছি, তিনি সামান্য ভিক্ষুক সন্ন্যাসী নহেন! হিন্দুর যিনি নারায়ণ তিনিই সন্ন্যাসী হইয়া দেখা দিয়াছেন। আমি গৌড়ের রাজা, তিনি বিশ্বের রাজা। অন্যথা লোকে আপনার খাইয়া তাঁহার

আজ্ঞা বহন করিবে কেন? তোমরা কি কখন আপনার খাইয়া আমার আজ্ঞা বহন কর? যাহা হউক, কোতোয়ালকে আমার আদেশ বিজ্ঞাপন কর, যেন কেহ ঐ সন্ন্যাসীর উপর কোনরূপ অত্যাচার না করে। উনি আমার অধিকার মধ্যে স্বাধীন ভাবে যথেচ্ছা বিচরণ করুন।" কেশব "যে আজ্ঞা" বলিয়া বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক বাহিরে যাইয়া কোতোয়ালকে রাজাজ্ঞা বিজ্ঞাপন করিলেন। পরে অব্যবস্থিত যবনরাজের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া গোপনে একজন ব্রাহ্মণ দ্বারা, রাজধানীর নিকট হইতে স্থানান্তরে গমন করাই যুক্তিযুক্ত, এই কথা প্রভুর ভক্তগণের নিকট বলিয়া পাঠাইলেন। এ দিকে গৌড়েশ্বর সেই দিনই সনাতন গোস্বামীকে নিভৃতে ডাকাইয়া মহাপ্রভুর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, সনাতন গোস্বামী বলিলেন।

"যে তোমারে রাজ্য দিল যে তোমার গোসাঞা।
তোমার দেশে তোমার ভাগ্যে জন্মিলা আসিয়া॥
তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে বাক্য সিদ্ধ হয়।
ইঁহার আশীর্ব্বাদে তোমার সর্ব্বত্রেতে জয়॥
মোরে কেন পুছ তুমি পুছ আপন মন।
তুমি নরাধিপ হও বিষ্ণু অংশ সম॥
তোমার চিত্তে চৈতন্যেরে কৈছে হয় জ্ঞান।
তোমার চিত্তে যেই লয় সেইত প্রমাণ॥"

গৌড়েশ্বর বলিলেন, "এই সন্ন্যাসী সাক্ষাৎ ঈশ্বর, ইহাই আমার মনে হয়।" যে যবনরাজ হুসেন খাঁ উড়িষ্যার রাজার সহিত সংগ্রাম করিয়া এক সময়ে শত শত দেবমন্দির ও দেবমূর্ত্তি নষ্ট করিয়াছিলেন, তিনিই এখন শ্রীগৌরাঙ্গের প্রসাদে সবিস্ময়ে তাঁহার প্রতি কোনরূপ অত্যাচারের চেষ্টা না করিয়া ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিলেন। সনাতন গোস্বামী গৌড়েশ্বরের ভাগ্যের প্রশংসা করিতে করিতে গৃহে গমন করিলেন।

সনাতন গোস্বামী গৃহে আসিয়া ভ্রাতা রূপ গোস্বামীর সহিত পরামর্শ করিয়া রাত্রিযোগে শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ দর্শনার্থ গমন করিবেন ইহাই স্থির করিলেন। অর্দ্ধ রাত্রির সময় দুই ভাই ছদ্মবেশে প্রভুর স্থানে গমন করিলেন। প্রথমে নিত্যানন্দ প্রভু ও হরিদাস ঠাকুরের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল।

তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে জানাইয়া তাঁহার আদেশ মত ভ্রাতৃদ্বয়কে লইয়া প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। সনাতন গোস্বামী ও রূপ গোস্বামী দন্তে তৃণ ধারণ পূর্ব্বক গললগ্নীকৃতবাসে দণ্ডবৎ ভূমিতলে পতিত লইলেন। তাঁহারা ভূমিতলে পতিত হইয়া প্রভূত আর্ত্তিপ্রকাশ সহকারে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। প্রভু দুই ভাইকে উঠিতে বলিলেন। তাঁহারা উঠিয়া প্রভুর স্তব সহকারে প্রার্থনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

"জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য দয়াময়।
পতিতপাবন জয় জয় মহাশয়॥
নীচ জাতি নীচ সঙ্গে করি নীচ কাজ।
তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ॥
পতিত তারিতে প্রভু তোমার অবতার।
আমা বহি জগতে পতিত নাহি আর॥
জগাই মাধাই দুহঁ করিলে উদ্ধার।
তাঁহা উদ্ধারিতে শ্রম নহিল তোমার॥
ব্রাহ্মণ জাতি তারা নবদ্বীপে ঘর।
নীচ সেবা নাহি করে নহে নীচের কূর্পর॥
সবে এক দোষ তারা হয়ে পাপাচার।
পাপরাশি দহে নামাভাসেতে তোমার॥
তোমার নাম লয়ে করে তোমার নিন্দন।
সেই নাম হৈল তার মুক্তির কারণ॥
জগাই মাধাই হৈতে কোটি কোটি গুণ।
অধম পতিত পাপী আমি দুই জন॥
ম্লেচ্ছ জাতি ম্লেচ্ছ সঙ্গী করি ম্লেচ্ছ কর্ম্ম।
গোব্রাহ্মণদ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম॥
মোর কর্ম্ম মোর হাতে গলায় বান্ধিয়া।
কুবিষয় বিষ্ঠাগর্ত্তে দিয়াছে ফেলাইয়া॥
আমা উদ্ধারিতে বলী নাহি ত্রিভুবনে।
পতিতপাবন তুমি সবে তোমা বিনে॥

আমা উদ্ধারিতে যদি দেখাও নিজ বল।
পতিতপাবন নাম তবে সে সফল॥
সত্য এক বাত কহোঁ শুন দয়াময়।
মো বিনু দয়ার পাত্র জগতে নাহি হয়॥
মোরে দয়া করি কর স্বদয়া সফল।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড দেখুক তোমার দয়া বল॥
আপনা অযোগ্য দেখি মনে পাঙ ক্ষোভ।
তথাপি তোমার গুণে উপজায় লোভ॥
বামন যৈছে চাঁদ ধরিতে চায় করে।
তৈছে মোর এই বাঞ্ছা উপজে অন্তরে॥"

ভ্রাতৃদ্বয়ের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন, "দবির খাস ও সাকর মল্লিক। তোমরা দুই ভাই আমার পুরাতন দাস। আজ হইতে তোমাদের নাম থাকিল, সনাতন ও রূপ। তোমরা দৈন্য ত্যাগ কর, তোমাদিগের দৈন্য দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। তোমরা এইরূপ দৈন্য করিয়া আমাকে বার বার পত্র লিখিয়াছিলে। সেই সকল পত্রেই আমি তোমাদিগের ব্যবহার বিদিত হইয়াছিলাম। আমি তোমাদিগের পত্র হইতেই তোমাদিগের অন্তঃকরণ জানিয়াছি এবং তোমাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত একটি শ্লোকও লিখিয়া পাঠাইয়াছি। সম্প্রতি গৌড়ে আগমনও তোমাদিগের নিমিত্ত। অন্যথা আমার এই রামকেলিতে আসিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। সকলেই বলেন, রামকেলিতে আসিবার কারণ কি? আমার মনের ভাব ত কেহই জানেন না। আমি কেবল তোমাদিগকে দেখিবার নিমিত্তই এই স্থানে আসিয়াছি। তোমরা আমার নিকট আসিয়াছ, ভাল হইয়াছে। এক্ষণে গৃহে গমন কর, মনে কিছুই ভয় করিও না। তোমরা দুই ভাই আমার জন্মজন্মের কিঙ্কর। অচিরেই কৃষ্ণ তোমাদিগকে উদ্ধার করিবেন।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া প্রভু দুই ভ্রাতার মস্তকে হস্ত প্রদান পুরঃসর তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে প্রভু নিজ ভক্তগণকে বলিলেন, "তোমরা সকলে কৃপা করিয়া দুই ভাইকে উদ্ধার কর।" সনাতন ও রূপ গোস্বামীর প্রতি প্রভুর কৃপা দেখিয়া ভক্তগণ আনন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। পরে

দুই ভ্রাতা নিত্যানন্দ, হরিদাস, শ্রীরাম, মুকুন্দ, জগদানন্দ, মুরারি ও বক্রেশ্বর প্রভৃতি ভক্তগণের চরণ তলে পতিত হইলেন। ভক্তগণ ভ্রাতৃদ্বয়কে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, "প্রভু তোমাদিগকে আত্মসাৎ করিয়াছেন।" তখন সনাতন ও রূপ গোস্বামী সকলের নিকট অনুমতি লইয়া গমনকালে বলিলেন, "প্রভো, এ স্থানে আর অধিককাল থাকার প্রয়োজন নাই, স্থানান্তরে বিজয় হউক। যদিও গৌড়েশ্বর প্রভুকে যথেষ্ট ভক্তি করেন, তথাপি তিনি যবন, তাঁহাকে বিনাশ করা উচিত হয় না। আরও একটি কথা, তীর্থ যাত্রায় এত অধিক লোক সঙ্গ ভাল নয়, বৃন্দাবন যাত্রার এরূপ রীতি নয়। প্রভুর অবশ্য ভয়ের কোন কারণ নাই, কিন্তু লৌকিক লীলায় লোক ব্যবহারই সঙ্গত হয়।" এইরূপ বলিয়া সনাতন ও রূপ গোস্বামী চলিয়া গেলেন। প্রভুও আর সেই স্থানে থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না। পরদিন প্রভাতে উঠিয়াই যাত্রা করিলেন। রাজমহলের নিকটবর্ত্তী কানাইর নাটশালা নামক স্থান পর্য্যন্ত গমন করিলেন। ঐ স্থানে যাইয়াই বলিলেন, এবার শ্রীবৃন্দাবনে যাইব না।" এই কথা বলিয়াই প্রভু ফিরিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

---

## পঞ্চীকরণ।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর। )

এক্ষণে দেখ যে, বহিতে যাহা লেখা ছিল, তাহার কিছুই অসত্য নহে। অক্ষর সকলেই পড়িতে পারিয়াছিল। অর্থ ও বুঝিতে পারিয়াছিল। শিখরে ধন ও ছিল পরন্তু অন্য কাহারও দ্বারা তাহা মিলিল না। কারণ কি, তাহারা সকলে বহিতে পড়িয়াছিল, কিন্তু উহাতে চৈত্র মাসের অষ্টমীর দিনে দ্বাদশ ( ১২ ) ঘটিকার সময়ে ইহাতে ধন রাখা হইয়াছে, তাহা লিখিবার কি অভিপ্রায় আছে, উহা কেহই বুঝিতে পারে নাই। আর সেই বৃদ্ধ পুরুষ বিচার করিল যে, অন্তরীক্ষ শিখরে ধন রাখে নাই, আর সেই ছোট শিখরে পনর

লাখ সোনার মোহরের সমাবেশও হয় না, তবে পৃথিবীতে শিখরের ছায়ার স্থানে রাখিয়াছে; অপিচ উহার লিখন সময়ে সেই জায়গার উপর যে ছায়া পড়ে সেই সময়—নতুবা মাসকে ত্যাগ করিয়া অন্য সময়ে আর অন্য মাসে যদি সেই শিখরের ছায়ার স্থান খনন করে, তাহা হইলেও ঐ ধন পাওয়া যাইবে না। তর্কেতু যখন সেই লেখার অভিপ্রায়-জ্ঞাতা বুদ্ধিমান বৃদ্ধ পুরুষ মিলিল, তখনই ধনপ্রাপ্তি হইল।

সিদ্ধান্ত। যদ্রূপ দৃষ্টান্ত, তদ্রূপ সংস্কৃত ভাষা, তথা প্রাকৃত ভাষা আদি বেদান্তের গ্রন্থগুলি যিনি পড়িতে সমর্থ হন, এবং তাহার শব্দার্থও করিতে জানেন, পরমাত্মা সর্ব্বত্র পূর্ণ, দেহত্রয়ের দ্রষ্টা, তিনি জানেন যে, অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী পঞ্চকোশাতীত সচ্চিদানন্দরূপ সেই সকল কথাও সত্য। দেহরূপী শিখরে সচ্চিদানন্দ আত্মারূপী ধন আছে, আর শ্রুতি স্মৃতি শাস্ত্ররূপী বহি গুলিতে ও তাহা লেখা আছে, তথাপি ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্‌গুরুর দ্বারা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য জানা ব্যতীত আত্মধনের প্রাপ্তি কখন হয় না। ব্রহ্মার পুত্র নারদ ঋগ্বেদ আদি চারি বেদ, পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্রে বিশারদ ছিলেন; কিন্তু তাঁহার আত্মজ্ঞান ছিল না। তজ্জন্য তিনি শোকাকুল হইয়া সনৎকুমার নামক গুরুর শরণাপন্ন হইবেন। তাঁহার উপদেশ দ্বারা নিরতিশয় সুখরূপ পূর্ণ আত্মাকে অপরোক্ষ জানিয়া শোক রহিত হইয়াছিলেন। ইহা ছান্দোগ্য উপনিষদে সবিস্তার কথিত আছে। সেইজন্য উক্ত আছে যে,—

"সদ্‌গুরু মুখে সমজী লেজো,
তো ব্রহ্মসুখ পামে আজো॥ ৫॥"

পূর্ব্বে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্‌গুরুর উপদেশ বিনা কেবল নিজের বুদ্ধি বিচার দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎ অপরোক্ষ বোধ হয় না। সেই জন্য এইরূপ গুরুর শরণ লইবে। আর গুরু যে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ করেন, সেই উপদেশে মুমুক্ষু নিজের মন যেরূপে নিশ্চল করিয়া হৃদয়ে ধারণ করে, তাহাব প্রকার নিরূপণ করিতেছেন।

গুরু। মন নিশ্চল করি ধারণা ধরে,
শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন করে।

তো সাক্ষাৎকার তুঁ পোতে ভাই,

এমা সন্দেহ রহে না কাঁই ॥ ৬ ॥

টীকা। মুমুক্ষু পুরুষকে গুরু যে সদুপদেশ প্রদান করেন, তাহাতে শিষ্য নিজের মনকে স্থির ( নিশ্চল ) রাখে, সেই মন স্থির রাখিবার বিষয়ে যে দৃষ্টান্ত কহিতেছি, তাহা শ্রবণ কর।

দৃষ্টান্ত। কোন দুইটী প্রতিবেশীর, পরস্পর পরস্পরের সহিত পরম্পরা ক্রমে ঈর্ষা ছিল, তাহাদের মধ্যে একজন অন্য এক ব্যক্তির নিকট নিজের প্রতিবেশীর কোন কিছু বিরুদ্ধ বার্ত্তার পরিচয় গৃহে বলাবলি করিত। সেই সময়ে সেই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিবেশী,—"এ আমার কথা বলিতেছে"—ইহা অনুমান করিয়া রহিল, ) সেই গৃহের বা জানালার নিকট, এমন একটী গুপ্তস্থানে থাকে যাহাতে তাহার প্রতিপক্ষ তাহাকে জানিতে না পারে, এমন ভাবে থাকিয়া, যে সব কথা হয়, তাহা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিতে লাগিল। সেই সকল কথা গুপ্তভাবে শুনিবার সময়, সে স্থির হইয়া, মশক ও ডাঁশের দংশনাদি অবধি সহ্য করিয়া এবং ক্ষুধা তৃষ্ণায় উদাসীন থাকিয়া কাষ্ঠবৎ নিশ্চল ভাবে অবস্থিত থাকিয়া, সমস্ত কথা একাগ্রতার সহিত অবধারণ করিল। উহা তাহার স্মৃতিতেও রহিয়া গেল, এবং আবশ্যক হইলে সে তাহা স্মরণ করিতে লাগিল।

অতএব তাহার যেমন সেই কথাতে একাগ্রতা ছিল, সেইরূপ মুমুক্ষুর গুরুর সদুপদেশেও একাগ্রচিত্ত হওয়া উচিত। আর শীত উষ্ণ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মান অপমান ইত্যাদি সহ্য করিয়া, উপদেশ হইতে নিজের মনকে অন্য স্থানে যাইতে দেওয়া ও উচিত নহে।

যেমন কোন ধনেচ্ছু পুরুষ ধন প্রাপ্তির জন্য বহু উপায় ( প্রযত্ন, কৌশল বা চেষ্টা ) করিয়া থাকে, তাহাকে যদি কোন এক পুরুষ বলে যে আমি তোমাকে ধন প্রাপ্তির এক উপায় বলিতেছি, তৎসমস্ত একাগ্রমনে ধারণ করিয়া সেই প্রমাণে কার্য্য করিবে; তাহা হইলে তোমার বহুধন প্রাপ্তি হইবে। সেই কথা শুনিয়া ধনেচ্ছু পুরুষ ধন প্রাপ্ত হইবার কথা যেমন একাগ্রমনে ধারণ করেন অথবা যেমন কোন স্বর্গপ্রাপ্ত হইবার ইচ্ছাবান পুরুষকে স্বর্গ মিলিবার ( প্রাপ্ত হইবার ) উপায় যদি কেহ বলিয়াদেয়, তাহা

হইলে, স্বর্গেচ্ছু পুরুষ উহা একাগ্রমনে ধারণ করিয়া থাকে ; তথা নিজের জয়েচ্ছু ( জয়কামী ) পুরুষকে জয় প্রাপ্তি হইবার সদুপায় যদি কেহ দেখাইয়া দেয়, তাহা হইলে জয়েচ্ছু পুরুষ যেমন তাহা একাগ্রমনে ধারণ করে, সেইরূপ মুমুক্ষু পুরুষের সচ্চিদানন্দ আত্মার বোধ হইবার জন্য, সদগুরুর উপদেশ বাক্য একাগ্রমনে ধারণ করা উচিত ; আর সেই মুমুক্ষু ব্রহ্মনিষ্ঠ সদগুরু দ্বারা বেদান্ত শাস্ত্রের শ্রবণ করিয়া পশ্চাৎ স্বয়ং তাহা মনন ও নিদিধ্যাসন করিবে। তাহার প্রকার এই যে, অরণ্যে কোন বাদিত্র বাদনসহ গান করে, উহাতে মৃগ ( হরিণ ) যেরূপ একাগ্রচিত্ত রাখিয়া গুরুমুখনিঃসৃত শব্দের তাৎপর্য্যার্থের সহিত বেদান্তশাস্ত্র শ্রবণ করিবে , এবং তৎপরে যাহা শ্রবণ করা হইয়াছে, তাহা যুক্তি ও দৃষ্টান্ত দ্বারা যে প্রমাণে সংশয় নাশ হয় সেইরূপ প্রমাণে মনন করিবে। যেমন গাভী চরিয়া আসিয়া স্থির হইয়া শুইয়া ( নিবৃত্তিতে বসিয়া ) পশ্চাৎ পুনঃচর্ব্বণ করিয়া ( জাবর কাটিয়া ) তৃপ্তি পায় ; সেইরূপ বেদান্তবাক্য শ্রবণ করণান্তর পুনঃ মনে স্মরণ করিয়া একান্তে অধিক মনন করায় দৃঢ়বোধ রূপী তৃপ্তি হয়। যদ্রূপ, বাদাম পেস্তা শর্করা ( মিশ্রি ) এবং অন্ন, যদি বহু চর্ব্বণ করিয়া খাওয়া হয়, তাহা হইলে, খুব সুস্বাদ বোধ হয়, আর পাচক-শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া শরীরকে পুষ্টিও করে ; তদ্রূপ, বেদান্তের বারম্বার মনন করাতে অভেদ-তাৎপর্য্য জ্ঞাত-হওয়া-রূপী স্বাদ লাগে ও আত্মজ্ঞানের পুষ্টি ( দৃঢ়ত্ব ) হয়।

উক্ত প্রকারে মনন করিবার পরে, স্বজাতীয় প্রত্যয়ের প্রবাহ, আর বিজাতীয় প্রত্যয়ের তিরস্কার রূপ নিদিধ্যাসন করিবে, 'যাহাতে বরাবর ( সহজেই ) আত্মার অনুভব হয়।

স্বজাতীয় প্রত্যয়ের প্রভায় অর্থাৎ আমি সৎ, চিৎ, আনন্দ, কূটস্থ, অক্রিয়, অজর, অমর, পূর্ণ, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তরূপ আত্মা হই। এই জ্ঞানরূপ বৃত্তির প্রবাহ থাকিবে।

বিজাতীয় প্রত্যয়ের তিরস্কার অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কি শূদ্র, উহা আমি নহি ; তথা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ কি সন্ন্যাসী, তাহাও আমি নহি, তথা পুরুষ, স্ত্রী, বালক, যুবা, বৃদ্ধ, সুখী, দুখী, কর্ত্তা ও ভোক্তা, ইহাও আমি নহি। এইরূপ জ্ঞানপূর্ব্বক দেহাধ্যাসের তিরস্কার কথিত হয়।

এই প্রকারে, হে ভাই! শ্রবণ মনন আর নিদিধ্যাসন (ধ্যান) করিবে, তবে "আমি আত্মা, নির্ব্বিকার, শুদ্ধ ব্রহ্মরূপ হই"—এইরূপ সাক্ষাৎকার তোমার হইবে, ইহাতে কোনও সন্দেহ থাকিবে না।

পূর্ব্বে দ্বিতীয় যে চৌপায়েতে জন্ম মরণ নিবৃত্ত হইবার জন্ত শিষ্য প্রশ্ন করিয়াছিল যে, "জন্ম মরণ কেম্‌টল্‌সে যাহাবে",—তাহার উত্তর পূর্ব্বে, "সদগুরু কহে স্বস্বরূ জান,"—ওই চৌপায়ে সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে; তথাপি "অহং মমেতি" অদ্ধ শ্লোক দ্বারা ব্যাখ্যান পূর্ব্বক বন্ধন নিবৃত্তির উপায় গুরু বিস্তৃত করিয়া নিরূপন করিতেছেন।

গুরু। হে শিষ্য। তুমি আমাকে পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে যে, আমার জন্ম মরণ কিরূপে বিনষ্ট হইবে? অর্থাৎ আমার বন্ধন কিরূপে নিবৃত্ত হইবে? কিন্তু প্রথমে সেই বন্ধনের যদি জানা হয়, তবে তাহা নিবৃত্তি করিবার উপায় হইতে পারে; পরন্তু সেই বন্ধন যদি চেনা (অবগত হওয়া) না হয় যে কি বন্ধন আছে, আর বন্ধন কোথা হইতে হইতেছে, তবে তাহার নিবৃত্ত করিবার উপায় কিরূপে হইতে পারে? যদ্রূপ রোগের "নিদান" আর "রূপ" না বুঝিয়া সে রোগকে নিবৃত্ত করিবার কোন ঔষধ নিরূপণ হইতে পারে না; তদ্রূপ প্রথম বন্ধনের "রূপ" তথা তাহার "কারণ" বুঝা (জ্ঞাত হওয়া) উচিত। তাহা তোমার জানা আছে কি নাই?

শিষ্য। সেই বন্ধন বিষয়ে আমি কিছুই জানি না, এবং উহা (বন্ধন) কিরূপেই বা হইয়া থাকে? আর উহা কি? সেই বন্ধন হইতে নিবৃত্তির উপায়ই বা কি আছে? তাহা কৃপা করিয়া বলুন।

শ্লোকার্দ্ধ।

গুরু। অহং মমেত্যয়ং বন্ধো, নাহং মমেতি মুক্ততা।

অর্থ। দেহ আমি, আর দেহাদি আমার, এইরূপ যে জ্ঞান, তাহাই বন্ধনের "রূপ;" আর এই বন্ধন "স্বরূপের" অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইতেছে; সেইজন্ত "স্বরূপের" অজ্ঞানই বন্ধনের কারণ, আর দেহ ইন্দ্রিয়াদি আমি নহি, আর সে সকল আমারও নহে; এইরূপে দেহাদি হইতে অহন্তা মমতার যে নিবৃত্তি হয়, তাহাই মোক্ষ।

শিষ্য। এই "অহন্তা" "মমতা" কিরূপে নিবৃত্ত হইবে ?

গুরু। হে শিষ্য। সাধন দ্বারা "অহন্তা" "মমতা" নিবৃত্ত হয়।

শিষ্য। আমি যে সাধন করিতেছি, উহাতে ত "আমি দেহ" ও "আমার দেহ"—এইরূপ "অহন্তা" "মমতা" রহিয়াছে; কিন্তু বিনষ্ট হইতেছে না; কারণ কি, যদি আমি ত্যাগ করি ত "আমি ত্যাগী হই" "আমি ত্যাগ করিয়াছি," যদি আমি যোগ করি, তবে "আমি যোগী হই" "আমি যোগ করিয়াছি," যদি আমি তপ করি ত "আমি তপস্বী হই," "আমি তপ করিয়াছি," এইরূপ অভিমান উৎপন্ন হইতেছে। যে যে সাধন করি সেই সেই সাধনে 'আমি দেহ"—আর—"আমার দেহ"—এরূপ অহন্তা মমতা রহিয়া যায়। আর আপনি বলিতেছেন যে সাধন দ্বারা বিনষ্ট হইবে; উহা কিরূপে (বিনষ্ট) হইবে ? তাহা কৃপা করিয়া বলুন।

---

# পরলোকগত মানব।

মানব পরলোক প্রাপ্ত হইলেও যে তাহার সত্বা বিদ্যমান থাকে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বর্ত্তমান আছে। আমরা পন্থার গ্রাহকগণের কৌতুহল নিবারণার্থ কয়েকটি সত্য ঘটনা ধারাবাহিকরূপে উল্লেখ করিব। সেই সকল ঘটনার বিষয় আলোচনা করিলে পরলোকগত মানবের সত্ত্বা সম্বন্ধে সকল সন্দেহ তিরোহিত হইয়া যায়। উক্ত ঘটনাগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রকৃত নাম ও ধাম আমরা কোন কোন স্থলে অনিবার্য্য কারণ বশতঃ গোপন রাখিতে বাধ্য হইব। কিন্তু বর্ণিত ব্যাপার সমূহের সত্যতা সম্বন্ধে অবিশ্বাসের কোনও কারণ নাই।

( ১ )

প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে ভাগলপুর জেলান্তর্গত কোনও গ্রামের জমীদার শিওনারায়ণ সিং মহাশয়ের মৃত্যু হয়। যে বাসভবনে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল, তাঁহার মৃত্যুর পর সেই ভবন তাঁহার আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরদিন হইতে প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় সেই বাটীতে নানাপ্রকার

অদ্ভুত শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। সময়ে সময়ে বোধ হইত যেন কেহ সেই স্থানে বেড়াইতেছে; আর, মধ্যে মধ্যে নস্য গ্রহণ করিতেছে। এই সকল শব্দ শুনিয়া পল্লীস্থ প্রায় সকলেই ভীত হইয়াছিল। কিন্তু সেই গ্রামে দুইজন ইংরাজী শিক্ষিত যুবক বাস করিতেন। তাঁহারা এই অলৌকিক ঘটনাটিকে মিথ্যা গল্প বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহারা অবশেষে গ্রামস্থ লোকদিগের অনুরোধে ঘটনার যথার্থতা নিরাকরণে অভিলাষী হইলেন এবং একদিন রাত্রে উভয়ে পিস্তল ও তরবারি সঙ্গে লইয়া সেই বাড়ীর রন্ধনশালায় লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন। রাত্রি প্রায় এগারটা, এমন সময়ে তাঁহাদের বোধ হইল যেন দ্বিতলস্থ গৃহে কেহ পাদচারণ করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে ডিবা ঠুকিয়া সজোরে নস্য গ্রহণ করিতেছে। অনন্তর শব্দ ক্রমশঃ অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, বোধ হইল যেন কেহ দ্বিতলস্থ কক্ষ হইতে নিম্নতলে অবতরণ করিয়া ক্রমে রন্ধনশালার দিকে আগমন করিতেছে। অল্পক্ষণ পরেই রন্ধন শালার আবদ্ধ দ্বার সহসা উন্মুক্ত হইয়া গেল, অথচ কে এই দ্বার উন্মুক্ত করিল তাহা বুঝা গেল না। যুবকদ্বয় এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হইলেন বটে, কিন্তু ভীত হইলেন না; তৎক্ষণাৎ একজন দ্বার লক্ষ্য করিয়া পিস্তলের আওয়াজ করিলেন এবং অপর যুবক তরবারী উত্তোলনপূর্ব্বক তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। কিন্তু কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। তখন তাঁহারা পাতি পাতি করিয়া বাটীর প্রত্যেক স্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পাদচারণ ও নস্য গ্রহণের শব্দ পূর্ব্ববৎ মধ্যে মধ্যে শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। যুবকদ্বয় মনোযোগপূর্ব্বক কর্ণপাত করিয়া শুনিলেন যে শিওনারায়ণের জীবিতাবস্থায় পাদচারণ ও নস্য গ্রহণকালে যেরূপ শব্দ হইত এই শব্দও অবিকল তদনুরূপ; সুতরাং এই শব্দ শিওনারায়ণের প্রেতাত্মা কর্তৃক সংঘটিত হইতেছে তদ্বিষয়ে তাঁহাদের কোনও সন্দেহ রহিল না।

তৎপর দিবস যুবকদ্বয় ঘটনাটি গ্রামস্থ সকলের নিকট বর্ণনা করিলে, শিওনারায়ণের প্রেতাত্মা যে প্রত্যহ রাত্রে তাঁহার বাটীতে বিচরণ করে তাহা সকলেরই বিশ্বাস হইল। বিশ্বাস হইল না কেবল মাধো সিংহের। মাধো সিং সে অঞ্চলের একজন বিখ্যাত পালোয়ান, দুর্দ্ধর্ষ লোক, ভয় কাহাকে বলে

তাহা তিনি জানিতেন না। তিনি বলিলেন, আচ্ছা, আমি কিছুদিন ঐ বাড়ীতে বাস করিব, দেখিব, কেমন ভূত। এই বলিয়া একদিন তিনি উক্ত বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন, সঙ্গে একটীমাত্র ভৃত্য। তিনি বড়ই তামাকুপ্রিয় ছিলেন, এই ভৃত্যটি না হইলে তাঁহার চলিত না। ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইল, মাধো সিং ভৃত্যকে ভাল করিয়া এক ছিলিম তামাকু সাজিতে আদেশ করিলেন। ভৃত্যও তামাকু সাজিয়া গুড়গুড়ির জল ফিরাইতে কূপের নিকট গেল। কিন্তু সে জল ফিরাইয়া যেমন পশ্চাৎ ফিরিয়া আসিবে অমনি সে দেখিল কে যেন তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। প্রথমে সে ভাবিল যে তাহার প্রভুই দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, কিন্তু ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়াই যাহা দেখিল, তাহাতে সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে মূর্ত্তি আর কাহারও নহে, মৃত শিও-নারায়ণের! প্রথমতঃ ভৃত্যের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, কিন্তু পরক্ষণেই সে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। মাধো সিং ভৃত্যের চীৎকার শুনিবামাত্র তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার কারণ জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই কূপের কিয়ৎদূরে একটি মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। তিনি শিওনারায়ণ সিংকে বিশেষ-রূপে চিনিতেন, এখন মূর্ত্তিটি দেখিয়াই কাহার মূর্ত্তি তাহা আর তাঁহার চিনিতে বাকী রহিল না। ( ক্রমশঃ )

---

# প্রাচ্য ও প্রতীচ্য।

পরা-বিদ্যাসমিতির সভাপতি নির্ব্বাচন ব্যাপারে অনেকগুলি গুরু তত্ত্বের মীমাংসার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে ; তন্মধ্যে মহাপুরুষদিগের প্রকৃত ভাব ও তাঁহাদের সহিত সভ্যগণের সম্বন্ধটী তত্ত্বাংশে সর্ব্বপ্রথমে বিবেচনা করা আবশ্যক ; অর্থাৎ ঐ সম্বন্ধের স্বরূপ, গভীরতা ও প্রকাশের আলোচনা আবশ্যক। অনেকেরই বিশ্বাস এই যে মহাপুরুষগণ আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র অহঙ্কৃতির বিশিষ্ট ভাবমাত্র ও তাঁহাদের হৃদয়ে ও "আমার" "তোমার" প্রভৃতি ভেদ ভাবের স্থান আছে। তাঁহারা যেন বিশিষ্ট জীবের বিশিষ্টতাময় গুণের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া জীব চৈতন্যের বাহির হইতে জীবকে সহায়তা করেন। অপর পক্ষে জীবও কোন কৌশলে তাহার ক্ষুদ্র দেহাত্ম জ্ঞানটী একক্ষণের জন্য হারাইয়া ফেলিলেই, হঠাৎ মহত্তর ও চৈতন্যে উপনীত হয়।

* * * * *

আমাদের মনে হয় যে হিন্দু শাস্ত্রে ঈশ্বর সম্বন্ধে ভাবগুলি যেমন উত্তরোত্তর প্রকট হইতে থাকে তদ্রূপ গুরু সম্বন্ধীয় জ্ঞানও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত ও গভীরতা প্রাপ্ত হয়। কর্ত্তব্যপরায়ণ কর্ম্মবাদী নৈয়ায়িকের নিকট ঈশ্বর কর্ম্মফল প্রদাতা ও সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া প্রতীত হন। নৈয়ায়িক কর্ত্তব্য জ্ঞানে আপন অহঙ্কার স্তম্ভ করিয়াছেন বলিয়াই, তাঁহার আপন মহত্তর ঈশ্বররূপী ভাবটী

তাঁহার বাহিরে গিয়া সংকল্পশীল বিশিষ্ট সাত্ত্বিক অহঙ্কার রূপে দেখা দেয়। সাংখ্য প্রযত্ন ও ক্রিয়াকে চৈতন্য হইতে বাহির করিয়া দেখে বলিয়াই, তত্তৎ গুণকে স্বীয় মহত্তর চৈতন্যের অপরাংশে পর্য্যবসিত করিয়া প্রকৃতি বলিয়া দেখিতে শিখে। জীব চৈতন্যের অবস্থা প্রসার ও আত্মজ্ঞানের উপর তাহার ঈশ্বর ও জগৎভাব স্থাপিত হয়।

* * * * *

আমাদের মনে হয় যে গুরু সম্বন্ধেও মানবের জ্ঞান ঐরূপ ক্রমে প্রকাশিত হয়। স্থূল দেহাত্ম জ্ঞান ত্যাগ না করিতে পারিলে গুরু নামধেয় চালক চৈতন্যকে স্থূল দেহের উপর ক্রিয়াশীল মূর্ত্ত শরীরধারী বিশিষ্ট চৈতন্য বলিয়া মনে হয়। অহঙ্কার ত্যাগ না করিতে পারিলে, গুরুকে বাহিরস্থিত ইচ্ছা সংকল্প ও প্রযত্নশীল সূক্ষ্ম জীববিশেষ বলিয়া ধারণা হয়। কিন্তু অহঙ্কারকে অল্পাধিক পরিমাণে ত্যাগ করিতে পারিলে এবং তাহার ফলে কর্ত্তাকর্ম্ম-ক্রিয়াত্মক ত্রিপুটীর হাত অল্প পরিমাণেও এড়াইতে পারিলে আর গুরুর মহিমা অহঙ্কারের ভেদাত্মক বিশিষ্টতায় ন্যস্ত করিতে হয় না। তখনই সাধক স্থূল বা সূক্ষ্ম অহঙ্কারের দ্বারা রঞ্জিত না করিয়া গুরুকে একত্বমূলক মহাশক্তি বলিয়া চিনিতে পারেন। এ প্রকার গুরু-সহবাস দেশ কাল কার্য্য সাধনা প্রভৃতি বিশিষ্ট ভাবের উপর আর নির্ভর করে না। তখনই মহাপুরুষগণকে অতীত ব্যক্তিত্বের দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাদিগকে অহঙ্কারের কেন্দ্র বলিয়া দেখিতে হয় না।—তখনই ক্ষুদ্র কর্ত্তারূপী সাধক ভাবের সহিত ক্রিয়া লেশশূন্য স্থির বিভু চৈতন্যে সমন্বয় বলিয়া মহাপুরুষগণকে দেখা যায়। তখনই প্রকৃত পক্ষে সাধক শিষ্যত্বে গৃহীত হইলেন; এবং বাহিরের সাময়িক কেন্দ্ররূপী গুরু অন্তঃস্থ চৈতন্যরূপে শিষ্য হৃদয়ে প্রকট হইয়া অহঙ্কারমূলক অজ্ঞান তিমির নাশ করিয়া সর্ব্বকালে সর্ব্বভাবে ও সর্ব্বজীবে একভাবে স্থিত হ্রাসবৃদ্ধিহীন একত্ব-বাচক আত্মারূপে প্রকটিত হয়েন। যেমন স্থূল বস্তু ত্যাগ করিলেই স্থূলের অতীত ভাব হৃদয়ে অল্পে অল্পে প্রকাশিত হয় তদ্রূপ প্রথমে স্বীয় রূপ ও নামের মোহ ত্যাগ করিয়াই প্রকৃত ভাবে উপনীত হওয়া যায়। যতদিন অহঙ্কার থাকে ততদিন গুরু ও আত্মা বাহিরের পদার্থ। রামপ্রসাদ যেমন জগন্মাতাকে খাইয়া ফেলিতে চাহিয়াছিলেন, তদ্রূপ সাধককেও গুরু সম্বন্ধে স্বীয় ক্ষুদ্র ভেদ ভাবগুলিকে দূর করিয়া একতা জ্ঞানের সাহায্যে গুরুকে আপনার করিতে হইবে। ভাবের তারতম্যে প্রকাশের তারতম্য। তবে ভাই আর কেন স্বীয় সম্পত্তিরূপে গণ্য, পোষাকী, গুরু বা মহাপুরুষ খাড়া করিয়া নিজের ও জগতের অহঙ্কার কুহক বৃদ্ধি কর। অহঙ্কার ও ভেদজ্ঞান ত্যাগ না করিলে গুরুর গুরুত্ব কেবল অলৌকিক ভেল্কীবাজির উপর স্থাপিত হয়।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়।

ওঁ

# পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাত্ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

১২শ ভাগ } শ্রাবণ, ১৩১৪ সাল। { ৪র্থ সংখ্যা।

## শান্তি-শতক।

( শিহ্লন-বিরচিত )

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

১১

বনবাসী হে কুরঙ্গ! ধনিগণ-মুখ-ভঙ্গ না দেখ কখন,
চাটু বাদে নাহি প্রয়োজন,
ধনীর গর্ব্বিত-বাণী শুনিতে না হয় কভু, না কর ভ্রমণ
লুব্ধাশ্বাসে সমগ্র ভুবন;
ক্ষুধাকালে নব তৃণ খাও সুখে, নিদ্রাগমে হও নিদ্রাগত,
এ সুখ জীবন অহ! কেমনে লভিলে কহ কোন তপ ব্রত?

১২

অযত্ন সুলভ তৃণে বন মাঝে ওহে মৃগ! কর বিচরণ
পরিপুষ্ট করি' কলেবর,

# অদৃষ্ট ফল।

আমরা দেখিয়াছি যে জীবের কর্ম্ম তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়; ভাবনা, বাসনা ও চেষ্টনা। আমরা আরও দেখিয়াছি যে উৎকট হইলে যে জন্মে কৃত কর্ম্ম সেই জন্মেই তাহার ফলভোগ হয়——ইহা "দৃষ্ট জন্ম বেদনীয়।" কর্ম্মের যে ফল "অদৃষ্ট জন্ম বেদনীয়" অর্থাৎ যে ভাবনা বাসনা ও চেষ্টনার ফল জন্মজন্মান্তরে ভোগ করিতে হয়, এক কথায় তাহার নাম অদৃষ্ট। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের অদৃষ্ট কিরূপে পর জন্ম নিয়মিত করে?

প্রথম ভাবনা। এ সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম ছান্দোগ্য উপনিষদে এইভাবে বিবৃত হইয়াছে;—

অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষঃ
যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে
পুরুষো ভবতি, তথেতঃ
প্রেত্য ভবতি।————ছান্দোগ্য, ৩।১৪।১।

অর্থাৎ, "জীব ভাবনাত্মক, ইহ জীবনে জীব যেরূপ ভাবনা ভাবে, দেহান্তে সে সেইরূপ হয়।"

ভগবান্ও গীতায় বলিয়াছেন,—

শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যৎশ্রদ্ধঃ স এব সঃ॥ [গীতা, ১৭।৩]

অর্থাৎ, "জীব শ্রদ্ধাময়। যাহার যেরূপ শ্রদ্ধা সে সেইরূপ।" *

অতএব, ইহাই স্থির, যে আমরা যাহা ভাবি, তাহাই হই। আমরা যদি সত্যের বিষয়, পুণ্যের বিষয় ভাবি, তাহা হইলে সত্যশীল পুণ্যশীল হই। যদি আমাদের ভাবনা পবিত্র শুদ্ধ শুচি হয়, তবে আমরা পবিত্র শুদ্ধ শুচি হই। এক কথায় আমরা যদি কু বিষয় ভাবি তবে কু হই, সুবিষয় ভাবি তবে সু হই।

---

* ধম্মপদেও এই কথা বলা হইয়াছে।

All that we are is the result of what we have thought, it is founded on our thoughts, it is made up of our thoughts.

(Dhammapad)

অতএব আমাদের স্বভাব (যাহার অনুসারে আমাদের আচার নিরূপিত হয়) তাহা আমাদের ভাবনা দ্বারা গঠিত হয়। এই নিয়মের ফল এইরূপ দাঁড়ায় যে, ইহ জন্মে আমরা যে চরিত্র ও মানসিক প্রকৃতি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের ভাবনার ফল।

দ্বিতীয়, বাসনা বা কামনা। জীব যাহা কামনা করে, যেখানে সেই কামনার বস্তু সেখানে জীবকে যাইতে হয়। জীব যদি স্বর্গকাম হয়, তবে তাহার বাসনা তাহাকে স্বর্গাভিমুখে লইয়া যায়। তাহার বাসনার বস্তু যদি পৃথিবীতে থাকে তবে তাহাকে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হয়। এইরূপে সে যাহা চায় তাহাই পায়। সেইজন্য পনিষদ্ বলিয়াছেন —

স ঈয়তেঽমৃতো যত্র কামম্।

[ বৃহদারণ্যক, ৪।৩।১২ ]

"সেই অমৃত (জীব) সেখানে যায়, যেখানে তাহার কামনার বস্তু।"*

মুণ্ডক উপনিষদেও এই কথা বলা হইয়াছে।

কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ
স কামভি র্জায়তে তত্র তত্র ॥

[ মুণ্ডক, ৩।২।১ ]

'সকাম ব্যক্তি যে বস্তুর কামনা করে, বাসনার দ্বারা সে সেখানেই জন্মায়।'

এইভাবে বৃহদারণ্যকও অন্যত্র বলিয়াছেন

তদেব সক্তঃ সহ কর্ম্মণৈতি—
লিঙ্গং মনো যত্র নিসক্তমস্য।
প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণ স্তস্য
যৎ কিঞ্চেহ করোত্যয়ম্ ॥
তস্মাৎ লোকাৎ পুনরৈত্যস্মৈ।
লোকায় কর্ম্মণ ইতি নু কাময়মানো ॥

[ বৃহদারণ্যক, ৪।৪।৬ ]

---

* The mental faculties of each successive life are made by the thinkings of the previous lives. Ancient Wisdom, 25)

অর্থাৎ, 'জীবের মন বাসনার বশে যেখানে আসক্ত হয়, জীব কর্ম্মের দ্বারা তাহাই প্রাপ্ত হয়, এবং সেই কর্ম্মফল ভোগ করিয়া ইহলোকে কর্ম্মের জন্ম আবার জন্মগ্রহণ করে। সকামীর এইরূপ গতি।'

বস্তুর বিষয়ে যাহা বলা হইল, ব্যক্তির বিষয়েও সেই কথাই খাটে। জীবের বাসনা রাগ ও দ্বেষের আকার ধারণ করিয়া অন্য জীবের সহিত তাহার সম্বন্ধ স্থাপন করে। যাহার সঙ্গলাভের জন্য তাহার প্রবল কামনা, অথবা যাহার প্রতি তাহার প্রবল বিরাগ, সেই সব ব্যক্তির সহিত তাহার পরজন্মে সম্বন্ধ স্থাপন হওয়া সুনিশ্চিত।

তৃতীয় চেষ্টনা। আমরা যেমন কর্ম্ম করি, তেমনি ফল পাই। যেরূপ বীজ বপন করি, তাহার অনুরূপ বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। আমড়া বৃক্ষে আম্র ফল ফলিল না বলিয়া ক্ষুণ্ণ হওয়া মূঢ়তার কার্য্য। * এই মর্ম্মে উপনিষদ্ বলিতেছেন,

যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি—সাধুকারী সাধুর্ভবতি পাপকারী পাপো ভবতি পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন।

[ বৃহদারণ্যক, ৪।৪।৫ ]

'জীবের যেমন কর্ম্ম যেমন আচরণ সেইরূপ গতি হয়, যাহার সাধু কর্ম্ম সে সাধু হয়, যাহার অসাধু কর্ম্ম সে অসাধু হয়। (জীব) পুণ্য কর্ম্মের ফলে পুণ্যাত্মা ও পাপ কর্ম্মের ফলে পাপাত্মা হয়।'

সংক্ষেপে—'যৎ কর্ম্ম কুরুতে তদভি সংপদ্যতে।'

[ বৃহদারণ্যক ]

'যেরূপ কর্ম্ম করে, সেইরূপ ফল প্রাপ্ত হয়।' অর্থাৎ, সে যদি পূর্ব্বজন্মে অন্যকে সুখী করিয়া থাকে, তবে সেও ইহ জন্মে সুখভোগ করে। কিন্তু সে যদি পূর্ব্বজন্মে কাহাকেও দুঃখ দিয়া থাকে, তবে ইহজন্মে তাহাকেও দুঃখ ভোগ করিতে হয়। এক কথায় বলিতে গেলে জীবের জন্মান্তরীণ চেষ্টার

---

* খ্রীষ্টীয় আচার্য্য St. Paul এই মর্ম্মে বলিয়াছেন :—

"Be not deceived. God is not mocked: for whatsoever a man soweth that shall he also reap."

[Galatians—vi, 76]

অনুরূপ ইহজন্মে তাহার অবস্থা হয় *। ইহাকেই বলে কর্ম্মের বিপাক। এই প্রসঙ্গে পতঞ্জলি বলিয়াছেন,

সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ।

[ যোগসূত্র, সাধন পাদ, ১৩ ]

'অর্থাৎ কর্ম্মের বিপাক ত্রিবিধ জাতি, আয়ু, ভোগ'। জীব কোন্ দেশে, কোন্ কুলে, কাহার গৃহে, জন্মগ্রহণ করিবে, তাহার আয়ুঃ কতদিন হইবে, কতদিন সে কর্ম্মফল ভোগ করিবে, সে ভোগ সুখ অথবা দুঃখের আকর হইবে, কি পরিমাণ সুখ ও দুঃখ তাহার জীবনের সহিত জড়িত থাকিবে, এ সমস্তই তাহার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের উপর নির্ভর করে।

এই 'জাত্যায়ুর্ভোগাঃ' প্রধানতঃ জীবের প্রারব্ধ কর্ম্মের দ্বারা নিয়মিত হয়। ইহজন্মে যাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, যেমন পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি জীবনযাত্রার উপকরণ যে প্রকারের ও পরিমাণের হয়, দেহের স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য যতদূর লাভ হয়, সমাজের যে স্তরে তাহার আসন নির্দ্দিষ্ট হয়, যে পরিমাণ সুখ দুঃখের সহিত তাহার সংস্রব হয়, এ সমস্তই তাহার প্রারব্ধ কর্ম্ম। † এইরূপে অদৃষ্ট পরজন্ম নিয়মিত করে।

এ সম্বন্ধে অন্যান্য কথা পরবর্ত্তী প্রবন্ধে আলোচিত হইবে।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

---

* Actions make environment

† Broadly speaking, the favorable or unfavorable nature of the physical surroundings into which we are born depends on the effect of our previous actions in spreading happiness or unhappiness among other people. The physical results on others of actions on the physical plane work out karmically in repaying to the actor physical good or bad surroundings in a future life. (Ancient Wisdom, P. 255)

# সাধন-পন্থা

ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ প্রভৃতি সপ্ত লোক, প্রকৃতির স্থূল সূক্ষ্ম ও অতিসূক্ষ্ম অণু দ্বারা গঠিত। মানব তাঁহার অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পঞ্চ কোষের সাহায্যে এই সকল লোকে কার্য্য করিয়া থাকেন। এই কোষগুলি আত্মার শক্তির ক্রিয়াক্ষেত্র এবং এক এক কোষ সাহায্যে, আত্মার শক্তি এক এক ভাবে প্রকাশ পায়। সাধারণ মানবে আত্মার এই সমস্ত শক্তি সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হয় না,—এমন কি কতকগুলির চিহ্নমাত্র ও দৃষ্ট হয় না মানব, বিশেষ সাধনার দ্বারা, ক্রমে ক্রমে, তাহাদিগকে বিকাশ করিতে থাকে। জীবনের বা "আত্মশক্তির" অভিব্যক্তির সহিত কোষগুলিও বিকসিত হইয়া উঠে, এবং স্থূল জগতে কার্য্য করা সাধারণ মানবের পক্ষে যেরূপ সহজ-সাধ্য, সূক্ষ্ম ও অতিসূক্ষ্ম লোকে কার্য্য করাও যোগীর পক্ষে সেইরূপ সহজসাধ্য। বিশেষ পদস্খলন না হইলে সাধারণ মানবও প্রকৃতির নিয়মানুসারে অতি সুদূর ভবিষ্যতে এই সমস্ত উচ্চশক্তির অধিকারী হইবে। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষেরা মহতী সাধনাবলে তাঁহাদিগের অননুভবনীয় অতীন্দ্রিয় শক্তির বিকাশ করিয়াছেন, এবং লোক হিতার্থে তাঁহারা বিবিধ লোকে বিচরণ করেন। এই সমস্ত লোক ও অতীন্দ্রিয়বিষয়ীভূত অবস্থা, সাধারণ মানবের এক্ষণে অগোচর; কিন্তু যাঁহার অবসর আছে, হৃদয়ে সাহস আছে, এবং সেই সাহস উপযোগী শক্তি আছে, তাঁহার যদ্যপি তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহা হইলে তিনি এই শক্তির ও অবস্থার কথঞ্চিৎ আভাস পাইতে পারেন। একবার স্বাদলাভ হইলে তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস জন্মে এবং সেই শক্তি ও জ্ঞান পূর্ণভাবে লাভ করিবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা ও চেষ্টা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যাঁহাদিগের এইরূপ তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে তাহাদিগের জন্যই এই "সাধন-পন্থা"। এই "পন্থা" অনুসরণ করিয়াই মহাপুরুষেরা জীবন্মুক্তি লাভ করিয়াছেন, এবং এই পন্থাই সেই মহাতীর্থ মহাগুরু-সান্নিধ্য লাভ করাইয়া দেয়।

এই "পন্থায়" প্রবেশাধিকারী হইতে হইলে অধিষ্ঠাতা দেবতার নামে একখানি নৈবেদ্য উৎসর্গ করিতে হয়, তাহা না করিলে তাহাতে প্রবেশ করিতে কেহই অধিকারী হইতে পারেন না। এই নৈবেদ্যের প্রথম

উপকরণ—এই পৃথিবীর মধ্যে যাহা তুমি সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাস, যাহা লইয়াই তুমি পৃথিবীতে আছ,—যাহার জন্য পৃথিবী এবং তোমার পার্থিব দেহ তোমার এত প্রিয়বোধ হইতেছে —তোমার সেই পরম প্রিয় পদার্থটী, শ্রীগুরুদেবের চরণ পঙ্কজে উৎসর্গ করিতে হইবে, তোমাকে আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে; জগতের তরে তোমাকে আত্মবিসর্জ্জন করিতে হইবে;—যাহা কিছু বাসনা আছে, তাহার উচ্ছেদ করিতে হইবে,—পার্থিব সমস্ত পদার্থ হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন ভাবিতে হইবে। ইহাই দক্ষিণ মার্গের প্রথম সোপান, এবং যতদিন না এই সোপান উত্তীর্ণ হইবে ততদিন এই কণ্টকাকীর্ণ, বিপদসঙ্কুল পথে অধিরোহন করা একান্ত অসম্ভব।

ইহাই যোগমার্গ। যদি কেহ ভাবেন,—এই মার্গে পদার্পণ করিলে মানব পার্থিব সুখ ও শান্তি ইত্যাদির মিষ্ট আস্বাদ পাইবেন, তাহা হইলে তাহার সম্পূর্ণ ভুল। এই মার্গের প্রত্যেক সোপান উত্তীর্ণ হইতে পারিলে, মানব যে শিরোরত্ন লাভ করেন, তাহা শীতল ও সুখসেব্য নহে, তাহা অত্যুষ্ণ, তীক্ষ্ণধারযুক্ত তপ্ত লৌহ নির্ম্মিত, তিনি যে মালা গলদেশে ধারণ করেন, তাহা সুগন্ধযুক্ত নন্দনের পারিজাত কুসুমের নহে, তাহা রুধিরপায়ী বিষময় ভুজঙ্গের তীব্র বেষ্টন—মহাকাল লক্ লক্ জিহ্বা বিস্তার করিয়া তাঁহার বদনের চারিধারে গর্জ্জন করে, তাঁহার অধরদেশে জ্বালাময় অগ্নিসন্নিভ বিষ উদ্গীরণ করে, তাঁহার হৃদয়ের প্রত্যেক গ্রন্থিতে দংশন করিয়া তাঁহার হৃদয়কে পুড়াইয়া দেয়। যতদিন অবধি তাঁহার হৃদয় কোকনদে "আমিত্ব"-জ্ঞানরূপ একটী মাত্রও কীট অবস্থান করে ততদিন এইরূপ যন্ত্রণার তীব্র অগ্নি-পরীক্ষা হইতে থাকে।

(২)

জগতে গুরুর অভাব নাই। তাঁহাদিগের চরণপ্রান্তে লইয়া যাইবার পথও অপ্রকাশিত নহে। কেবল অভাব শিষ্যের হৃদয়ের, কেবল অভাব তাহার প্রেমের, কেবল অভাব তাঁহাকে লাভ করিবার তাহার তীব্র আকাঙ্ক্ষার। এই অভাবই আমাদিগকে তাঁহার নিকট হইতে দূরে রাখে,—আমরা যে তাঁহাদিগের নিকটে যাইবার পথ জানিনা, তাহা নহে।

(৩)

পৃথিবী স্বরগসম, করিতে হইলে পরে,
পৃথিবীতে চাহি এক
দেব অবতাব।
পৃথিবীর জীবনেব, ভীষণ সংগ্রাম কালে,
লইতে হইবে তাঁরে,
সেনাপতি ভার ॥
চিনিতে পাবিনা মোরা, আমাদেরি কোনো পাশে,
হয়ত করেন বাস,
কোন মহাজন।
তাঁহার পবিত্র কর্ম্ম, তাঁহার বিচিত্র ধর্ম্ম
কেহ নাহি বুঝি , আছি
সংসারে মগন ॥
তাঁহারিত দৈবশক্তি, কবিতেছে পৃথিবীকে,
শান্তিজলে ধৌত, পূত,
স্বর্গ আকাব।
পাপময় অন্ধকার, ধীরে সরাইয়া দিয়া,
ঐশ্বরিক জ্যোতিটুকু
দেন উপহাব ॥
হয়ত বা আছে কেহ, দানব ধর্ম্মী লোক,
আসুরিক শক্তি দিয়া—
জগতে আবার,
তমিস্রা ও পাপ বৃদ্ধি, করিছে সতত হেথা,
অধোগামী কবিতেছে
অন্তর সবার ॥
তাঁর পবিত্রতাময় প্রেম ভাগিরথী জলে,
মিশাইছে সদা পাপ,
কলুষতা ভার ॥

এইরূপ অন্ধকার, আলোকের, মধ্যদিয়া,
ধরিতেছে মর্ত্ত্যভূমি,
স্বরগ আকার।
দেবতা অসুর দুই, স্বইচ্ছায়, অনিচ্ছায়,
করেন স্থাপন এই
ধর্ম্ম রাজ্য তাঁর॥

(৪)

সর্ব্ব শাস্ত্র আলোচনা করিলে একই সত্যে উপনীত হওয়া যায়; সামান্যত তাহাদিগের মধ্যে বাহ্য পার্থক্য দৃষ্ট হইলেও তাহাদিগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একই। সত্য যেন নানা আবরণে বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে বিভাসিত হইতে থাকে। একই সূর্য্যরশ্মি যেমন দূর্ব্বাদলের উপর পতিত হইয়া হরিদ্বর্ণ ধারণ করে, গৈরিকের উপর পতিত হইয়া রক্তবর্ণ হয়, আবার ময়ূরের পুচ্ছের উপর বিবিধ বর্ণের আঁখি আকিয়া দেয়, ঠিক সেইরূপ একই সত্য বিবিধ শাস্ত্ররূপ উপাদানে বিবিধ ভাবে প্রকাশ পায়। একই সুর বীণার তন্ত্রে, বাঁশরীর মুখে, গায়কের কণ্ঠে, বিবিধরূপ ধারণ করে। ইহাতে বিস্ময়ের কোনও কারণ নাই। সনাতন ধর্ম্ম—ব্রহ্মবিদ্যা, দক্ষিণ মার্গাবলম্বী এক ঋষিসম্প্রদায় হইতেই সকল দেশে প্রচারিত হইয়াছে। এই জীবন্মুক্ত ব্রহ্মর্ষিগণ পরাবিদ্যার চিরন্তন রক্ষয়িতা। যে ধর্ম্ম প্রাচীন ভারতের তপোবনে সংসার বিরাগী ও রাজর্ষির হৃদয়ে প্রাণের প্রবাহ আনিয়া দিত—কর্ত্তব্য পরাঙ্মুখ সাধকের ক্লৈব্য ও হৃদয়-দুর্ব্বলতা নাশ করিত, যাহা একদিন সর্ব্বজীব-দুঃখ-কাতর হৃদয়তন্ত্রী হইতে কপিলাবস্তুর রাজপ্রাসাদে গভীর মূর্চ্ছনা তুলিয়াছিল, যাহার মধুর প্রেমবন্যায় ভাগীরথীর দুকূল একদিন ভাসিয়া গিয়াছিল; যাহা মরুময় আরব প্রদেশে সন্ন্যাসী ও কর্ম্মবীর স্বজন করিয়াছিল ও গ্যালিলির শান্ত হ্রদে প্রেমের তুফান তুলিয়া, দুঃখী ও ঘৃণিত ধীবর জাতিকে সঞ্জীবিত করিয়াছিল—তাহা একই প্রস্রবণ সম্ভূত—কেবল বিভিন্ন ধারা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকট। সেই প্রস্রবণ এই মহর্ষি সঙ্ঘ। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণ পূর্ণ প্রেমের অবতার, তাঁহারা মানব উন্নতিকল্পে সদাই যত্নবান। তাই আবশ্যক বুঝিলে তাঁহারা নানাস্থানে, দেশ কাল পাত্র উপযোগী করিয়া এই সনাতন ধর্ম্ম প্রচার করেন।

পৃথিবী যেরূপ সৌরজগতের অন্তর্গত একটী গ্রহ, সেইরূপ আরও বহু গ্রহ আছে। প্রাণীস্রোত তাহাদিগের সকলের ভিতর যে সমান অভিব্যক্ত তাহা নহে। শুক্রগ্রহ আমাদিগের অপেক্ষা অনেক পুরাতন; তথাকার সাধারণ মানব উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছেন। আমরা যাঁহাদিগকে মহা গুরু ও গুরুাশ্রমের মহর্ষি সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া আখ্যাত করি, তাঁহারা কর্ণধার হইয়া আমাদিগকে উন্নতির পথে অগ্রসর করাইবার জন্য পৃথিবী হইতে অত্যুন্নত প্রাচীন শুক্রাদি গ্রহ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহা-দিগের দ্বারাই গুরুাশ্রম সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত। তাঁহাদিগের কৃপায় ও তাঁহা দিগের শিক্ষায় আমাদিগের পৃথিবীর কোনও কোনও ভাগ্যবান সন্তান তাঁহাদিগের সান্নিধ্য লাভ করিয়াছেন। ইহারাও তাঁহাদিগের মত অনন্ত করুণার প্রস্রবণ এবং মানবের দুঃখ দূর করিবার জন্য সেই ঋষি সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া বিশ্ব প্রেমের পবিত্র ধারা বর্ষণ করিতেছেন। শিষ্য আগ্রহবান হইলে তাঁহারা আসিয়া তাহার ক্ষুদ্র ও দুর্বল হৃদয়কে সু পথের দিকে চালনা করেন. পাছে তাহার অমঙ্গল হয়, পাছে সে প্রলোভনে মুগ্ধ হয়, এই তাঁহাদিগের চিন্তা।

জানিনা আমাদিগের জননী এত দয়াবতী কিনা, কিন্তু জানি. সেই মহর্ষি-দিগের আত্মসুখ বোধ নাই, জগতের মঙ্গল সাধন করাই তাঁহাদিগের কার্য্য।

প্রত্যেক বৈদিক ক্রিয়া কলাপেই যজ্ঞ বা হোম করা হিন্দুর প্রথা। আমরা হোম অবসানে হোমের তিলক ধারণ করিয়া আমাদিগের অনুষ্ঠানের সফলতা উপলব্ধি করি। এই মহর্ষিদিগের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনরূপ মহাপুণ্য কর্ম্মেও একটী হোম কার্য্যের ব্যবস্থা আছে। সেই হোম শেষে আমরা যখন প্রেম, ভক্তি ও পরহিতে আত্মোৎসর্গরূপ ত্রিফলক ললাটে ধারণ করিতে পারিব, তখন দেখিব যে গুরুদেবের চরণ কমল সেই ত্রিফলক মধ্যে বিরাজিত রহিয়াছে। সেই মহর্ষি এইরূপ ভক্তিমান ত্যাগী শিষ্যকে সনাতন শিক্ষা ও গুহ্যতম উপদেশ দ্বারা গুরুাশ্রমের দ্বারদেশে উপস্থাপিত করেন। এই দ্বার প্রেম ও জ্ঞানরূপ দুইটী অর্গলের দ্বারা দৃঢ় আবদ্ধ। সাধক নিরহঙ্কার ও স্বার্থচিন্তা শূন্য না হইলে কখনই সেই দ্বার অতিক্রম করিতে সক্ষম হন না।

জনৈক বিদ্যার্থী।

# মানব নিজ অদৃষ্ট বিধাতা।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

কিন্তু আধুনিক খৃষ্টীয় উপদেষ্টাগণ কর্ম্মবাদী নহেন, তাঁহারা অনেক স্ব-কপোলকল্পিত উপায় উদ্ভাবন করিয়া এই চিরন্তন প্রাকৃতিক মূল সত্যের অপলাপ করিয়াছেন। অর্থাৎ কর্ম্ম বন্ধন ছিন্ন হইবার নহে, কর্ম্মফলে মনুষ্য জন্মান্তর প্রাপ্ত হয় এই প্রাচীন সত্যটী তাঁহারা নানা কৌশলে আবৃত রাখিয়াছেন। "প্রতারিত হইওনা, ঈশ্বর অবজ্ঞার পাত্র নহেন" এই শাসন বাক্য স্মরণ রাখা অতীব মঙ্গলের বিষয়। এক জীবন যায় অপর জীবন আসে; এইরূপ বারংবার পৃথিবীতে যাওয়া আসা করিতে হয়। প্রতি জীবনে পূর্ব্ব জীবনের রোপিত বীজ ইহ জীবনে অবশ্যম্ভাবী ফল উৎপন্ন করে। প্রতি জীবনে মানুষ ভাবী জীবনের শস্য সংগ্রহ করে।

এক জীবন যেমন অন্য জীবনের পরবর্ত্তী সেইরূপ প্রতি জীবন তৎপূর্ব্ব জীবনের সহিত জন্য-জনক ভাবে, কর্ম্ম-কারণ সূত্রে শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং প্রতি জীবনই কর্ম্মসূত্র দ্বারা তৎপরবর্ত্তী জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট। অতি প্রাচীন মত সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ উক্ত হইল, এক্ষণে বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বিজ্ঞানের শিক্ষা ভিন্ন প্রকার, বিজ্ঞান যাহা বলে তাহা পরীক্ষা ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা প্রতিপাদিত হয়। সমীক্ষা ও পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয় বলিয়াই বিজ্ঞান আজকাল ধর্ম্মের উপর অনেকটা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। একালের মানুষ দোষ গুণ বিচার পরতন্ত্র, প্রমাণাপেক্ষী ও সন্দিহান চিত্ত এবং প্রত্যেক বাক্যে প্রমাণ অন্বেষণ করিয়া থাকে।

এখন তাহারা আর গুরু মুখ-নিঃসৃত ধর্ম্মোপদেশে তৃপ্ত হয় না। প্রতি কথায় শাস্ত্রাদেশের সত্যতা যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া লইতে চায়। বিজ্ঞান ধর্ম্মাপেক্ষা তাহাদের সেই প্রমাণলিপ্সা পূরণ করিতে সমর্থ হয়, যেহেতু বিজ্ঞানের বিষয় সকল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, সুতরাং সকলে সহজেই তাহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে ধর্ম্ম আধ্যাত্ম-জ্ঞান সাপেক্ষ, ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা বোধগম্য হইবার নহে।

যাহাদের অধ্যাত্মজ্ঞান বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে তাঁহারাই কেবল বুঝিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অতীব বিরল। জগতের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ কর্ত্তৃক ধর্ম্ম অতি প্রাচীন কাল হইতে সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে। আর্য্য ঋষিগণ অনাদি কাল হইতে সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র মানবকে প্রদান করিয়া ধর্ম্ম সংরক্ষণ ও ধর্ম্মজীবন পরিপোষণ করিয়া আসিতেছেন। সেই সকল মহাত্মারা কখন কোন কালেই মানবের কল্যাণ বিস্মৃত হয়েন নাই। এখনও তাঁহারা তাঁহাদের অভয় কর উত্তোলন করিয়া আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিতেছেন। যখন তাঁহারা দেখিলেন মানুষ মোহাচ্ছন্ন হইয়া ঘোরতর সন্দেহ জালে আপনাকে আবদ্ধ করিয়াছে ও বিজ্ঞানের কুহকে পড়িয়া ধর্ম্মের অবমাননা করিতেছে, তখন তাঁহারা তাহার ধর্ম্মজীবন ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য একটী নূতন পন্থাবলম্বন করিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক ভাষার সাহায্যে পুরাতন সত্য পুনঃ প্রচার করা প্রয়োজন। যাহাতে আজি কালিকার লোকের মন স্ব স্ব প্রবৃত্তি অনুযায়ী যুক্তি তর্কে অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত সনাতন ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে, এই মহদুদ্দেশ্য সাধন কল্পে তাঁহারা বিজ্ঞানের আকারে তত্ত্ব জ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন।

এই অভিপ্রায়ে পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ তাঁহাদের শিষ্যমণ্ডলীর মধ্য হইতে দুই এক জনকে মনোনীত করিয়া শিক্ষা দান প্রণালী বুঝাইতে লাগিলেন ও Madam Helena Blavatsky নাম্নী জনৈকা রুষদেশীয় রমনীরত্নকে আধুনিক জনসমাজে প্রেরণ করিলেন। এইরূপে প্রাচ্য গুপ্ত বিদ্যায় শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি প্রাচীন তত্ত্ব সকল নবীনতর আকারে পুনঃ প্রচার করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় উপদেশ সমর্থন জন্য বেদ উপনিষদ্ এবং পুরাণাদি হইতে বচন সকল সংগ্রহ করিয়া আধুনিক বিজ্ঞানের যুক্তি ও প্রমাণের সহায়তা অবলম্বনে ইদানীন্তন মানবগণের বুদ্ধির উপযোগী করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। তাঁহার গুরুমণ্ডলী তাঁহার পৃষ্ঠ পোষক হইলেন, এইরূপে ব্রহ্ম বা পরাবিদ্যা প্রচার আরম্ভ হইতে লাগিল। ইহাতে জগৎকে নূতন শিক্ষা দিবার বিদ্যা কিছু নাই, নূতন তত্ত্ব নাই, নূতন বিষয়ও নাই। ইহা কেবল পুরাতন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সমুদয় নূতন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষা দেয়

মাত্র। এইরূপে বিজ্ঞানকে ধর্ম্মের উত্তর-সাধক স্বরূপ নিযুক্ত করা হইল। এবং এই ধর্ম্ম-বিজ্ঞান-সঙ্গমে ইদানীন্তন মানব আপনকে নিমজ্জিত করিয়া যুক্তি তর্কের মীমাংসা লাভে নিজ নিজ বুদ্ধিবৃত্তি চরিতার্থ করিতে সমর্থ হইলেন। ইহা যে কোনও নূতন ধর্ম্ম নহে, কেবল প্রাচীন দুরূহ হিন্দু শাস্ত্র সকলের সহজ ব্যাখ্যা তাহাও সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত হইলেন। যাহা প্রাচীন শাস্ত্র সকলের অনুমোদিত নহে তাহা ইহাতে নাই, পরন্তু কঠিন শাস্ত্রার্থ সমুদয় অতি বিশদ ও সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যের বোধগম্য করিবার জন্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

যে কর্ম্ম দ্বারা আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ন্ত্রিত, সেই কর্ম্মবাদের ভিত্তিও এই শাস্ত্রের উপর সংস্থাপিত। এই মহর্ষিগণ কেবল যে কর্ম্মের গূঢ় রহস্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নহে, যাহাতে শিষ্যগণ নিজে নিজে তাহা সপ্রমাণ করিয়া লইতে পারে ও সেই সকল রহস্য সাধারণ মানবকে বুঝাইতে পারে তাহারও উপায় বলিয়া দিয়াছেন,—অতীতের সহিত বর্ত্তমানের সম্পর্ক দেখাইবার জন্য জগতের কতকগুলি অতীত ঘটনা শিষ্যগণের প্রত্যক্ষীভূত করিয়াছেন। এইরূপে যাহাতে কর্ম্মবিধান স্পষ্টতঃ ও সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হয় সেই জন্য স্থূল জগতে কর্ম্মের গতি ও ফলাফল দেখাইয়াছেন।

( ক্রমশঃ )

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য।

---

# আমিষ ও নিরামিষ আহার।

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর। )

ইহার উত্তরে নিরামিষভোজী বলেন যে,—

১। কোন একটি নৈতিক আদর্শ বহুকাল অমান্য করা হইয়াছে বলিয়া সে আদর্শ নষ্ট হইতে পারে না। জগতে কোন কোন জাতি চিরকালই নিরামিষাশী থাকিয়া আদর্শ রক্ষা করিতেছে। দক্ষিণ আমেরিকার ওরিনোকো নদীর তটবাসীরা বহুকাল যাবৎ মাটি আহার করিয়া থাকে। মাটি খাদ্য নহে এবং শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর, এই হেতু উহা খাওয়া অনুচিত। কিন্তু অভ্যাসের দোহাই দিয়া মাটি খাওয়াঁও প্রশস্ত, এরূপ যুক্তি মূর্খেই প্রয়োগ

করিয়া থাকে। পুরাকালে জগতের অধিকাংশ সভ্যজাতি নিরামিষভোজী ছিলেন। গ্রীস, রোম, ইজিপ্ত ও হিন্দুস্থানবাসীরা কদাচিৎ মাংস ভোজন করিত। তাহাদের পক্ষে মাংসাহার যদি অনাবশ্যক বোধে না চলিয়া থাকে, তবে এখনই বা উহার এত আদর কেন? তাহাদের সহিত আমাদের আকৃতিগত কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় নাই। এখনও সভ্যসমাজে অনেক ব্যক্তি মাংসাহার ত্যাগ করিয়াপূর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ ও তেজস্বী বোধ করিতেছেন। অতএব মাংস আহার করা নিতান্ত প্রয়োজন, ইহা ত্যাগ করিলে অনিষ্ট হইতে পারে, এমন প্রমাণ পাওয়া গেল না।

২। স্বীকার করি—ইংরাজই প্রকৃত মাংসখাদক জাতি এবং পৃথিবী মধ্যে তাহারাই অধুনা সম্রাট। অষ্ট্রেলিয়ার টেরাডেল ফুগো এবং অন্যান্য স্থানের আদিম অধিবাসী সকল, ইংরাজের অপেক্ষা অধিক মাংস আহার করিয়াও অসভ্যাবস্থায় কায়ক্লেশে জীবন যাপন করিতেছে। ইতিহাসে দেখা যায় এক শতাব্দি পূর্ব্বে যখন ইংরাজজাতি, অতুল একতা সাহস ও বীর্য্য দেখাইয়া, জগতে প্রথম শক্তি বলিয়া স্বীকৃত হয়, সে সময়ের ইংলণ্ডবাসীরা অতি অল্পই মাংস ভোজন করিত। তাৎকালিক একজন মধ্যবিৎ ভদ্রলোক এক সপ্তাহে এমন কি এক মাসে যত পরিমাণে মাংস খাইতেন, আধুনিক একজন ইংরাজ একদিনে তাহার অধিক মাংস আহার করেন! এখনও এক জন আয়রলণ্ডবাসী এক সপ্তাহে যতটা মাংসাহার করেন, একজন ইংরাজ এক দিনে তাহার অধিক খান। স্কটলণ্ডবাসী হাইল্যাণ্ডারের ছোলাই প্রধান খাদ্য। তাহারা মাংস অতি অল্পই খায়। রোম, গ্রীস, পারস্য দেশবাসী লোকে নিরামিষভোজী হইয়া কত বৃহৎ বৃহৎ সাম্রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন। সেকালের মনুষ্যাবয়বের ভাস্কর্য্য মূর্ত্তি সকল দৈহিক পরিপুষ্টির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। যে ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম সর্ব্বোপরি মস্তক উন্নীত করিয়া এখনও জগতকে নূতনতত্ত্ব শিখাইতেছে, আজ যাহার কথা ইংলণ্ড, জারমণি, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের পণ্ডিতবর্গের মুখে ধ্বনিত হইতেছে, সেই ধর্ম্ম-দ্রষ্টারা নিরামিষভোজীই ছিলেন। অহিংসা তাঁহাদের মূলমন্ত্র ছিল। এত দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, কেবল মাংসাহার করে বলিয়াই ইংরাজ শ্রেষ্ঠ নহে, তাহার বড় হইবার অন্য নানাবিধ কারণ আছে।

৩। বরফান দেশে ( হিমানী প্রধান দেশে ) মাংস না খাইলে প্রাণ বাঁচে না,এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং দেখা যায় উত্তর-মেরু প্রদেশের হরিণ প্রভৃতি শাকাশী প্রাণিবর্গ অল্লাহারে বেশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনেকের ধারণা আছে যে, মাংস উত্তাপ বৃদ্ধিকারক, কারণ উহাতে যবক্ষার অধিক পরিমাণে আছে ; এবং শারীরিক উত্তাপ বৃদ্ধি করিতে হইলে আহারের মাত্রা বাড়াইতে হয়। কিন্তু যবক্ষার আমাদের দেহে বড় বেশী উত্তাপ প্রদান করে না, বরং শ্বেতসারময় পদার্থ, শর্করা এবং মেদময় পদার্থ হইতেই আমাদের শরীর অধিক উত্তাপ সংগ্রহ করে এবং উদ্ভিদ জগতেই তাহা অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। ঐ দেশে যে সব লোক ভ্রমণ করিয়াছেন তাঁহারা ভ্রমণ সময়ে অভ্যাস মত দুইবার আহার করিয়া স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইয়াছেন, অধিক আহারের কোন প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নাই।

৪। এদেশের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, ভেতো বাঙ্গালী যতদিন ইংরাজের মত অধিক পরিমাণে মাংস ভোজন এবং কিয়ৎ পরিমাণে মদ্যপান না করিবে ততদিন এ জাতির উন্নতির কোন আশা নাই। মাংসেই অধিক পরিমাণে যবক্ষার বিদ্যমান আছে, অন্য কোন পদার্থে সেরূপ নাই এবং যবক্ষারই একমাত্র বলকারক সামগ্রী, এই ভুল বিশ্বাসই এ ধারণার মূল। তাঁহাদের প্রথম বিশ্বাস সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

আমরা যাহা কিছু আহার করি, বিশ্লেষণ দ্বারা সে সকলকে চারি শ্রেণী ভুক্ত করা যায়, -

১। যবক্ষার ( Nitrogenous Elements )

২। শ্বেতসার ( Carbonaceous or Starchy Products. )

৩। মেদ ( Fats. )

৪। জল ও লবণজাতীয় পদার্থ (Inorganic Elements, Water and Salts.)

ডিম্বের শাদা অংশ, সকল প্রকার মাংস, ও গম, ছোলা, মটর মসূর প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ এবং ( Casein ) ছানা এই সকল পদার্থে যবক্ষারের অংশ অধিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে।

সকল উদ্ভিদ, যব, ধান্য প্রভৃতি শস্য, অধিকাংশ ফল ও মূলে এবং ইক্ষু-চিনি, খর্জ্জুরচিনি, আঙ্গুর প্রভৃতি ফল প্রসূত চিনি—শর্করা জাতীয় এই সকল পদার্থে শ্বেতসার অত্যন্ত অধিক পরিমাণে আছে। মাখন, চর্বী এবং বাদাম নারিকেল প্রভৃতি ফলে মেদ অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।

লবণজাতীয় পদার্থের মধ্যে, Phosphates and Carbonates of Potash, Soda and Lime, and Chlorides of Potash and Soda ই প্রায়শঃ দৃষ্ট হয়।

এ সকল ব্যতীত খোসা, ডাঁটা প্রভৃতি অনেক অপাচ্য বস্তুও আমরা গ্রহণ

করি। ইহা খাদ্যের পবিমাণ বর্দ্ধক এবং পরিপাক নাড়ির উত্তেজক ও মল সঞ্চালক, এই হেতু এ সকলের বিশেষ আবশ্যকতা আছে।

নিম্নে প্রধান প্রধান খাদ্য দ্রব্যে যবক্ষাব, শ্বেতসার প্রভৃতি পদার্থ শতকরা কত পরিমাণে আছে, তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল।

| | শতাংশে | | | | Salts |
|---|---|---|---|---|---|
| | জল | যবক্ষার | শ্বেতসার | মেদ | লবণজাতীয় পদার্থ |
| গম | ১৩.৬ | ১২.৪ | ৬'.৯ | ১.৪ | ১.৮ |
| বার্লি | ১৩ ৮ | ১১.১ | ৬৪ ৯ | ২.২ | ২.৭ |
| ছোলা | ১২ ৪ | ১০.৪ | ৫৭.৮ | ৫ ২ | ৩ |
| চাউল | ১৩ ১ | ৭.৯ | ৭৬.৫ | ০.৯ | ১ |
| মসূর দাউল | ১১ ৫ | ২৪ ৮ | ৫৪.৮ | ১.৯ | ২ ৪ |
| মটব | ১৪ | ২৩ ৭ | ৪৯ ৩ | ১.৬ | ৩ ১ |
| আলু | ৭.৮ | ২ | ২০.৬ | ০.২ | ১ |
| ষাঁড়ের মাংস | ৭৬.৬ | ২০ | ০.৬ | ১.৫ | ১.২ |
| বাছুরের মাংস | ৭৫.৬ | ১৮.৪ | ০.৮ | ২.৯ | ১.৩ |
| শূকর মাংস | ৭২.৬ | ১৯ ৯ | ০.৬ | ৬ ২ | ১.১ |
| মোরগ মাংস | ৭০.৮ | ২২.৭ | ১.৩ | ৪.১ | ১.১ |
| মৎস্য | '৮ | ১৮ ১ | ০ | ২.৯ | ০ |
| ডিম্ব | ৭৪ | ১৪ | ০ | ১০.৫ | ০ |
| মাতৃ দুগ্ধ | ৮৯ ১ | ২.৭ | ০ | ৩.২ | ০ ৪ |
| গাভী দুগ্ধ | ৮৬ | ৪ ১ | ০ | ৩.৯ | ০.৮ |
| মাখম | ১৩.৮ | ০.৬ | ০ | ৮৪.৪ | ০ ৮ |
| Pea Nuts বাদাম | ৬ | ২৮ | ১৮ | ৪৬.২ | ৩.৩ |

এই তালিকাতে দেখা যায় যে মটর, মসূব, বাদাম প্রভৃতিতে যবক্ষার মাংসাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন গম, বার্লি, ছোলা এবং চাউলেও যবক্ষারের পরিমাণ কম নহে। (ক্রমশঃ)

শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষাল।

# রূপসনাতন ও জীবগোস্বামী।

( ৩য় সংখ্যায় ১১২ পৃষ্ঠার পর হইতে )

## শ্রীরূপ গোস্বামীর গৃহত্যাগ।

প্রভুর সহিত সাক্ষাতের পর হইতেই শ্রীরূপ গোস্বামী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীসনাতন গোস্বামীর সহিত বিষয় ত্যাগের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে একদিন রাত্রিকালে গৌড়েশ্বরমহিষী গৌড়েশ্বরের অঙ্গের একস্থানে একটি চিহ্ন দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নাথ, ইহা কিসের চিহ্ন ?" গৌড়েশ্বর প্রথমতঃ উহা গোপন করিবার চেষ্টা করিলেন। পরে রাজ্ঞীর আগ্রহাতিশয় দেখিয়া বলিলেন. "আলাউদ্দীন যখন গৌড়ের রাজা ছিলেন, তখন আমি তাঁহার অধীনস্থ সুবুদ্ধি রায় নামক একজন হিন্দু জমীদারের অধীনে কর্ম্ম করিতাম। ঐ সুবুদ্ধি রায় আমাকে একটি জলাশয় খনন করিবার ভার দেন। তিনি উক্ত কার্য্যে আমার কোন একটি ছিদ্র পাইয়া আমাকে কশাঘাত করেন। ইহা সেই কশাঘাতের চিহ্ন " শুনিয়াই রাজ্ঞী অগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, "ঐ সুবুদ্ধি রায় কি এখনও জীবিত আছে ?" গৌড়েশ্বর বলিলেন, "হাঁ, তিনি এখনও জীবিত আছেন। আলাউদ্দীনের রাজ্যচ্যুতির সম্বন্ধে তিনি আমার একজন প্রধান সহায় এবং চিরদিনই আমার পোষণকর্ত্তা ছিলেন।" রাজ্ঞী বলিলেন, "এখনই সুবুদ্ধি রায়ের শিরশ্ছেদনের আজ্ঞা হউক।" গৌড়েশ্বর বলিলেন, "তাহা কখনই হইতে পারেনা, তিনি আমার পোষণকর্ত্তা, বিনা দোষে আমাকে দণ্ড করেন নাই।" রাজ্ঞী বলিলেন, সুবুদ্ধি রায়ের প্রাণদণ্ড না হইলে, আমি আত্মহত্যা করিব।" গৌড়েশ্বর অগত্যা সেই রাত্রিতেই সহকারী মন্ত্রী রূপ সাকর মল্লিককে আনয়ন করিবার নিমিত্ত কেশবকে প্রেরণ করিলেন। রূপ সাকর মল্লিক কেশবের মুখে গৌড়েশ্বরের আদেশ শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহিত রাজভবনের অভিমুখে গমন করিলেন। রাত্রি দুই প্রহরের ও অধিক

হইয়াছিল। বিশেষতঃ মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ ও ঘন গর্জ্জনের সহিত বারিধারা পতিত হইতেছিল। তাঁহারা যাইতে যাইতে যখন কোন একটি নীচ জাতির গৃহের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন গৃহস্থিতা নীচকুলোদ্ভবা রমণী তাঁহাদিগের পদশব্দ শুনিয়া নিজ পতিকে বলিলেন, "এই ভয়ঙ্করী রাত্রিতে কে ঘরের বাহির হইয়াছে ?" স্বামী বলিলেন, "বোধ হয়, কুকুর যাইতেছে।" পত্নী বলিলেন, "হাঁ, এই রাত্রে কুকুরও ঘরের বাহির হয় না। নিশ্চয় কোন ধনী লোকের ভৃত্য প্রভুর কার্য্যার্থ গমন করিতেছে।" শ্রীরূপ গোস্বামী উহাদিগের ঐ প্রকার কথোপকথন শ্রবণ করিলেন। উহা তাঁহার অন্তরে বিশেষ আঘাত করিল। তিনি আপনাকে উক্ত নীচজাতি হইতেও অধম ও পরাধীন ভাবিয়া যারপরনাই দুঃখিত হইলেন। যাহা হউক, রাজ ভবনে উপস্থিত হইয়া গৌড়েশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত ঘটনাই শুনিলেন এবং গৌড়েশ্বরের অভিপ্রায় বিদিত হইয়া সুবুদ্ধি রায়ের জীবন রক্ষার্থ রাজ্ঞীকে প্রবোধিত করিলেন। সুবুদ্ধি রায়ের প্রাণবধের পরিবর্ত্তে জাতি নাশের পরামর্শই স্থির হইল। শ্রীরূপ গোস্বামী তদনন্তর যথাগত পথে নিজ গৃহে আগমন করিলেন। তিনি গৃহে আসিয়াই সংসার ত্যাগ মনস্থ করিলেন। পরে জ্যেষ্ঠের অনুমতি অনুসারে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সৎ ব্রাহ্মণ দ্বারা সংসার মুক্তির জন্য বিবিধ পুরশ্চরণ করাইলেন। তদনন্তর নিশ্চিন্ত হইবার নিমিত্ত পরিজনবর্গের কিয়দংশ চন্দ্রদ্বীপের বাটীতে ও অপর কিয়দংশ ফতোয়াবাদের বাটীতে প্রেরণ করিলেন। পরিশেষে যে কিছু ধনসম্পত্তি ছিল, তাহা হইতে দশ সহস্র মুদ্রা জ্যেষ্ঠের প্রয়োজনার্থ গৌড়ের কোন বিশ্বস্ত বনিকের নিকট রাখিয়া অবশিষ্ট কুটুম্ব, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব সকলকে যথাযোগ্য বিভাগ করিয়া দিলেন। এই সকল ব্যাপার গৌড়েশ্বরের অজ্ঞাতসারেই সমাহিত হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ কানাইর নাটশালা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক নীলাচলেই গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার গতিবিধি জানিবার নিমিত্ত দুইজন লোক উৎকলে প্রেরণ করা হইয়াছিল এই সময়ে ঐ দুই জন লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "শ্রীগৌরাঙ্গ বনপথে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়াছেন।" শ্রীরূপ গোস্বামী ফতোয়াবাদের বাটীতে অবস্থান কালে এই সংবাদ শুনিলেন। শুনিয়াই অবিলম্বে শ্রীবৃন্দাবন গমনের অভিলাষ করিলেন। তাঁহার অভিলাষ বিদিত

হইয়া তৎকনিষ্ঠ বল্লভও তাঁহার অনুগমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী আর কাল বিলম্ব না করিয়া রামকেলিতে জ্যেষ্ঠের নিকট, প্রভুর শ্রীবৃন্দাবন গমন, গৌড়ের বনিকের নিকট দশ সহস্র মুদ্রা রক্ষণ এবং বল্লভকে লইয়া নিজের পশ্চিম যাত্রা প্রভৃতি বিষয়ক একখানি পত্র লিখিয়া, কনিষ্ঠ বল্লভের সহিত প্রয়াগাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

## শ্রীসনাতন গোস্বামীর কারাবাস।

শ্রীসনাতন গোস্বামী তখনও রাজকর্ম্ম করিতেছিলেন। তিনি অন্তরে বিষয়বিরক্ত হইয়া ও বাহিরে শ্রীরূপ গোস্বামীর ন্যায় বিষয়কর্ম্ম ত্যাগ করেন নাই। ভ্রাতার পত্র প্রাপ্ত হইয়া সত্বর বিষয়ত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। মনে মনে বিষয় ত্যাগের উপায় অবধারণ পূর্ব্বক রাজসমীপে যাতায়াত প্রায় বন্ধ করিয়া পণ্ডিতগণের শাস্ত্রালোচনায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। সুযোগ পাইলেই শ্রীগৌরাঙ্গের চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইবেন, ইহাই উদ্দেশ্য স্থির থাকিল। উপর্য্যুপরি তিন দিন মন্ত্রী সনাতনের অনুপস্থিতি দেখিয়া গৌড়েশ্বর কিঞ্চিৎ সন্দিহান হইলেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতির কারণ জানিবার নিমিত্ত একজন লোক প্রেরণ করিলেন। ঐ লোক মন্ত্রী সনাতনের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "মন্ত্রিবর, গৌড়েশ্বর আপনার তিন দিন সভায় অনুপস্থিতির কারণ জানিবার নিমিত্ত আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। আমি যাইয়া কি নিবেদন করিব, বলিতে আজ্ঞা হউক।" সনাতন গোস্বামী বলিলেন, "আমার শরীর অসুস্থ বলিয়া সভায় উপস্থিত হইতে পারি নাই, ইহাই নিবেদন করিবে।" গৌড়েশ্বর প্রেরিত কর্ম্মচারী ঐ কথা শুনিয়া রাজভবনে ফিরিয়া গেল এবং গৌড়েশ্বরের নিকট শরীরের অসুস্থতাই মন্ত্রীর অনুপস্থিতির কারণ নিবেদন করিল। গৌড়েশ্বর মন্ত্রীর শরীর অসুস্থ শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য রাজবাড়ীর চিকিৎসককে পাঠাইয়া দিলেন। চিকিৎসক যাইয়া দেখিলেন, মন্ত্রী সনাতন স্বচ্ছন্দে পণ্ডিত মণ্ডলীর সহিত শাস্ত্রালাপে কালাতিপাত করিতেছেন। তিনি দেখিয়াই বুঝিলেন, মন্ত্রীর শরীর অসুস্থ নহে। তখন বলিলেন, "গৌড়েশ্বর আপনার অস্বাস্থ্য সংবাদ পাইয়া আপনাকে দেখিবার নিমিত্ত আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। আমি যাইয়া কি

বলিব, তাহাই বলুন। আপনার শরীর বোধ হয়, সুস্থই আছে?' সনাতন গোস্বামী বলিলেন, "মহাশয়, আমার শারীরিক কোন পীড়া নাই; মন নিতান্ত অসুস্থ; সংসার হইতে বাহির না হইলে, ঐ অসুখ নিবৃত্ত হইবে এরূপ ত বোধ হয়না, আমার দ্বারা রাজকার্য্য চলিতে পারে না; গৌড়েশ্বরকে বলিবেন, আমাকে রাজকার্য্য হইতে অবসর প্রদান করিলেই সুখী হইব।" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি অভিবাদনাদি পুরঃসর রাজচিকিৎসককে বিদায় দিলেন।

চিকিৎসক গৌড়েশ্বরের নিকট প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বলিলেন, মন্ত্রী অসুখের ভান করিয়া গৃহে বসিয়া আছেন। তাঁহার ভাবগতি দেখিয়া বোধ হইল, তিনিও ভ্রাতৃপ্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিবেন।

গৌড়েশ্বর চিকিৎসকের মুখে মন্ত্রীর ব্যবহার বিদিত হইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে স্বয়ংই তাঁহার আবাসে গমন করিলেন। সনাতন গোস্বামী গৌড়েশ্বরকে সমাগত দেখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যথাযোগ্য অভিবাদন পুরঃসর আসন প্রদান করিলেন। গৌড়েশ্বর আসন গ্রহণ পূর্ব্বক বলিলেন, মন্ত্রিন্, কয়েক দিন তোমার অনুপস্থিতিতে রাজকার্য্যের অতিশয় বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। সত্বর সভায় উপস্থিত হইয়া কার্য্য সকল পর্য্যবেক্ষণ করা হউক। তখন সনাতন গোস্বামী বলিলেন, "বঙ্গেশ্বর, আমার চিত্ত অতিশয় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই যাইতে পারি নাই। আমি যে এরূপ অবস্থায় তাদৃশ গুরুতর কার্য্য চালাইতে পারি এমনত বোধ করি না।" গৌড়েশ্বর মন্ত্রীর এই প্রকার উত্তর শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেন, এবং ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পুনশ্চ বলিলেন, "বুঝিলাম, যাহাতে আমার রাজ্য উৎসন্ন হইয়া যায়, তাহাই তোমার অভিপ্রায়। আমিত কখনই তোমার ধর্ম্মকর্ম্মের বাধক হই নাই, তবে কেন তুমি রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিবে? রাজকার্য্যও কি ধর্ম্ম কর্ম্মের অন্তর্গত নয়?" সনাতন গোস্বামী বলিলেন, "রাজন্, আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য, রাজকার্য্য ধর্ম্মকর্ম্মেরই অন্তর্গত। কিন্তু রাজকার্য্য যে ধর্ম্মের অন্তর্গত, আমি তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি, অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার স্থানে অপর লোক নিযুক্ত করিয়া আমাকে অবসর প্রদান করিলেই কৃতার্থ হইব।" মন্ত্রীর শেষ কথা

শুনিয়া গৌড়েশ্বর কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তোমার ভ্রাতা দস্যুর ন্যায় সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া পলায়ন করিয়াছে, তুমিও অসুখের ভান করিয়া সমস্ত কাজকর্ম্ম নষ্ট করিতেছ। তোমারা কি ধর্ম্মের জন্য অধর্ম্মাচরণেও কুণ্ঠিত হও না? রাজাপরাধ কি পাপ নহে? ঐ পাপের কি দণ্ড নাই"? সনাতন গোস্বামী রাজার কথায় অন্তরে বিরক্ত হইয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "আপনি রাজ্যেশ্বর ও স্বাধীন; ইচ্ছা হইলেই অপরাধীর দণ্ড বিধান করিতে পারেন।" এই কথায় গৌড়েশ্বর অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া আর কোন কথাই না বলিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি মন্ত্রীর বাটী পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই মন্ত্রী যাহাতে পলায়ন করিতে না পারেন, এইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন, এবং মন্ত্রীর মত পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত যে কিছু উপায় অবলম্বন করা উচিত বোধ হইল, তাহাও করিলেন, কিন্তু কিছুমাত্র ফলোদয় হইল না, মন্ত্রীর মত পরিবর্ত্তন হইল না। তখন গৌড়েশ্বর অনন্যোপায় হইয়া সনাতন গোস্বামীকে বন্দী করিলেন।

এই সময়ে পূর্ব্ব মন্ত্রী পুরন্দর বসু, যিনি এতাবৎকাল সনাতন গোস্বামীর সহকারিতায় নিযুক্ত ছিলেন তিনিই, সনাতন গোস্বামীর কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। তিনি মন্ত্রিপদের উপযুক্ত হইলেও, স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর ছিলেন বলিয়া তাঁহার মন্ত্রণা অনেক সময়েই কল্যাণকর হইত না, গৌড়েশ্বর ইহা বুঝিতেন। ঐ পুরন্দর বসুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকান্ত বসুও গৌড়েশ্বরের অধীনে কর্ম্ম করিতেন। তাঁহার কার্য্য ছিল, বঙ্গেশ্বরের অধিনস্থ উড়িষ্যা প্রদেশের কর সংগ্রহ করিয়া গৌড়ে প্রেরণ করা। শ্রীকান্ত বসু মন্ত্রী সনাতন কর্ত্তৃকই উক্ত কর্ম্মে নিয়োজিত হয়েন। সনাতন গোস্বামীর কারাবাসকালে উড়িষ্যার করদাতৃগণ শ্রীকান্ত বসুর কোন অসদ্ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে কর প্রদানে অসম্মত হইলে, ঐ সকল করদাতার সহিত যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। পুরন্দর বসু ভ্রাতার দোষ গোপন পূর্ব্বক করদাতাদিগকে বলপূর্ব্বক আয়ত্ত করিবার মন্ত্রণা করিলেন। গৌড়েশ্বর পুরন্দর বসুর মন্ত্রণানুসারে যুদ্ধ যাত্রায় কৃতসঙ্কল্প হইয়া সনাতন গোস্বামীকে সঙ্গে লইবার নিমিত্ত কারাগৃহে যাইয়া তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্তই বলিলেন। সনাতন গোস্বামী শুনিয়া বলিলেন "আমার যতদূর বিশ্বাস শ্রীকান্ত বসুর দোষেই উড়িষ্যার করদাতারা কর দেন নাই। গৌড়েশ্বরের অন্য কোন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী যাইলেই কর আদায় হইবে,

যুদ্ধের প্রয়োজন হইবে না। শ্রীকান্ত বসুকে কর্ম্মান্তরে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার পরিবর্ত্তে অন্য কোন কর্ম্মচারীকে প্রেরণ করিলেই যখন কর আদায়ের সম্ভাবনা দেখা যায়, তখন তজ্জন্য বহুব্যয়সাধ্য ও লোকক্ষয়কর সংগ্রামের প্রয়োজন দেখা যায় না।" গৌড়েশ্বর বলিলেন, "যদি তাহাই হয়, তবে তুমিই, ইহার যেরূপ সুবন্দোবস্ত উচিত, তাহা কর।" সনাতন গোস্বামী বলিলেন "নরনাথ, আমার আশা পরিত্যাগ করুন।" গৌড়েশ্বর বলিলেন, "আমি কখনই তোমার আশা পরিত্যাগ করিতে পারিব না। কল্য তুমি কারামুক্ত হইয়া উড়িষ্যায় করাদায়ের সুবন্দোবস্ত করিবে। এই কথা বলিয়া গৌড়েশ্বর চলিয়া গেলেন।

এদিকে বর্ত্তমান মন্ত্রী পুরন্দর বসু গৌড়েশ্বরের মুখে সনাতন গোস্বামীর মন্ত্রণা শ্রবণ করিয়া, উহা স্বার্থের পক্ষে হানিজনক বুঝিয়া কৌশলে সনাতনের পরামর্শ যে নিতান্ত কুপরামর্শ এবং রাজ্যের বিশেষ অমঙ্গলকর, ইহাই গৌড়েশ্বরকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিলেন। দুঃসময় উপস্থিত হইলে, বুদ্ধিমানেরও বুদ্ধির লোপ হইয়া থাকে। পুরন্দর বসুর পরামর্শই গৌড়েশ্বরের মনোনীত হইল। রাজার অবাধ্য ও রাজকর্ম্মে সম্পূর্ণ অমনোযোগী সনাতনের মন্ত্রানুসারে কার্য্য করিলে, উড়িষ্যার রাজ্য হস্তচ্যুত হইবার সম্ভাবনা, ইহাই গৌড়েশ্বরের ধারণা হইল। অগত্যা যুদ্ধ যাত্রাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া অবধারিত হইল। গৌড়েশ্বর পুরন্দর বসুকে লইয়াই উড়িষ্যায় যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রয়াগ যাইতে যাইতে পথেই এই সমস্ত ঘটনা বিদিত হইলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

---

# ভারতীয় কথা।

## আদিপর্ব্ব—নায়কগণের যৌবনাবস্থা।

### ( ১১ )

মনোযোগ—অর্জ্জুন।

একদা সমস্ত শিষ্য মণ্ডলী নির্জ্জনে সমীপস্থ হইলে দ্রোণ কহিলেন,—"হে কুমারগণ। এক অতি অভিলষিত বিষয় আমার মনোমধ্যে সর্ব্বদা জাগরুক রহিয়াছে, যখন তোমরা শস্ত্রবিদ্যায় সম্যক্ পারদর্শিতা লাভ করিবে, তখন আমার সেই অভীষ্ট বিষয়টী পূর্ণ করিবে, ইহা সত্য কর।"

অর্জ্জুন ব্যতীত অপর সকলে মৌনী থাকিলেন। কেবল অর্জ্জুনই, আচার্য্যের যে অভিলাষই হউক না কেন কায়মনোবাক্যে তাহার সাধনে প্রতিশ্রুত হইলেন।

অর্জ্জুনের এরূপ প্রগাঢ় গুরুভক্তি দর্শনে আচার্য্যের গণ্ড বহিয়া আনন্দ ধারা বহিল। অর্জ্জুন সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় শিষ্য হইলেন।

দ্রোণের বচন শুনি সব শিষ্যগণ।  
নিঃশব্দ হইল সবে না কহে বচন॥  
অর্জ্জুন বলেন করি সত্য অঙ্গীকার।  
করিব পালন, হয় যে আজ্ঞা তোমার॥  
অর্জ্জুন বচনে দ্রোণ হরিষ অন্তর।  
আলিঙ্গিয়া চুম্ব দিল মস্তক উপর॥

একদা প্রদোষকালে অর্জ্জুন ভোজন করিতেছিলেন, এমন সময়ে বায়ুবেগ প্রভাবে প্রদীপটী নির্ব্বাপিত হইল। কিন্তু এই অন্ধকারে অর্জ্জুনের ভোজন কার্য্যের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইল না, চিরন্তন অভ্যাস হেতু হস্ত বদন ব্যতীত অন্যত্র গমন করিল না। এই অতি সাধারণ ব্যাপারে অর্জ্জুনের চিত্ত আকৃষ্ট হইল। বুদ্ধিমান পাণ্ডুনন্দন ইহার তথ্য নিরূপণ করিলেন। চিরন্তন অভ্যাসের ফল দেখিলেন। তখন তিনি শরাসন লইয়া অদৃশ্য লক্ষ্যে

অতি সাধারণ বস্তুর তথ্য নিরূপণ ও তাহাতে গম্ভীর মনঃসংযোগের ফল।

শরনিক্ষেপ অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলেন। অর্জ্জুনের এবম্বিধ উত্তমে আচার্য্য যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন।

[ সামান্ত ও সাধারণ ক্রিয়াগুলি মনঃসংযোগ পূর্ব্বক ও চিন্তাশীলতার সহিত লক্ষ্য করিলেই আমরা অনেক মহৎ ও আবশ্যকী বিষয় জানিতে পারি। প্রতিবস্তু, প্রতিক্ষেত্রে মনঃসংযোগ পূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণই মহৎ শিক্ষার সোপান। ]

## গুরুভক্তি—একাগ্রচিত্ততা—একলব্য।

অনন্তর আচার্য্য দ্রোণের অসাধারণ অস্ত্র শিক্ষা কৌশল দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল এবং শত শত রাজকুমারগণ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণের নিমিত্ত আগমন করিলেন, তন্মধ্যে হিরণ্যধনু নামক নিষাদ-রাজার পুত্র একলব্যও শিক্ষাপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইলেন। দ্রোণাচার্য্য কিন্তু একলব্যকে নিষাদতনয় বলিয়া শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলেন না। অস্ত্র-শিক্ষা বিজ্ঞানে নানারূপ চিত্তশুদ্ধি, মন্ত্র সাধন এবং চিত্তবৃত্তি দমনের আবশ্যক। যাঁহারা পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি ফলে ও কর্ম্মানুযায়ী ইহজন্মে উপযুক্ত ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাই এই শিক্ষার উপযুক্ত পাত্র ইত্যাদি বলিয়া একলব্যকে প্রত্যাখান করিলেন। একলব্য কিন্তু ইহাতে কিছু মাত্র ক্ষুব্ধ হইলেন না—পরন্তু আচার্য্যের চরণবন্দনা করিয়া বনে প্রস্থান করিলেন। অরণ্যে গমন পূর্ব্বক একটী মৃণ্ময় দ্রোণ প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া গুরুজ্ঞানে পূজা করতঃ তৎসমীপে একাগ্রচিত্তে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

নিষাদতনয়—একলব্য।

দ্রোণাচার্য্য মুখে তবে নিষ্ঠুর শুনিল।
দণ্ডবৎ করিয়া অরণ্যে প্রবেশিল॥
নিষাদের বেশ ত্যজি হৈল ব্রহ্মচারী।
জটাবদ্ধ পরিধান ফলমূলাহারী॥
মৃত্তিকার দ্রোণ এক করিয়া রচন।
নানাপুষ্প দিয়া তার করয়ে পূজন॥
নিরন্তর একলব্য হাতে ধনুঃশর।
সর্ব্বমন্ত্র অস্ত্র হাতে হইল ধনুর্দ্ধর॥

একলব্যের এই অত্যাশ্চর্য্য গুরুভক্তি, শ্রদ্ধা এবং উদ্দেশ্য-সাধনে অধ্যাবসায়ী চেষ্টা ও একাগ্রচিত্ততার ফল ও তদনুরূপ হইল। কেন না হইবে—একলব্যের পুরুষকার আছে, উদ্যোগেরও ত্রুটী নাই সুতরাং ফল ফলিতেই হইবে। একলব্য বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া কেবল গুরুভক্তির অফুরন্ত স্রোতে অন্তর অবগাহন করাইয়াছিলেন। লোক সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, নির্জ্জন প্রদেশে গুরুপ্রেমমুগ্ধ হইয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অবস্থিতি করিয়াছিলেন—অস্ত্র শিক্ষা ভিন্ন অন্য কামনা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন—এই আন্তরিক সৌন্দর্য্যের বিকাশে একলব্যের অভীষ্ট সিদ্ধির পথ উন্মুক্ত হইল।

আবার—জীব ক্রমোন্নতিশীল। জীবগণের মধ্যে মনুষ্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইতর প্রাণীগুলি ক্রমে উন্নত হইয়া মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য সদসৎ উভয় প্রকারে কার্য্য করিতে সক্ষম, সুতরাং শুভাশুভ কর্ম্মের জন্য তাহারাই পুরস্কার-যোগ্য বা দণ্ডার্হ। ভগবদ্দত্ত প্রবৃত্তি গুলির সদ্ব্যবহার করিলেই মানব প্রাধান্য লাভ করে বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর জীবে পরিণত হয়। বিধিদত্ত প্রবৃত্তি-গুলির সদ্ব্যবহার জনিত ফলে একলব্যের প্রাধান্য প্রাপ্তি। গুরু তাঁহাকে শিষ্যত্বে বরণ করিলেন না। কিন্তু তিনি ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি "বিচিন্ত্যানি বিচেয়ানি বিবেচ্যানি পুনঃ পুনঃ। কৃপণস্য ধনানীব তন্নামানি ভবন্তমে॥" গুরু-প্রেম-বিমুগ্ধ হইয়া একাগ্রচিত্ততার ফলে তাঁহার অস্ত্র শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল।

একদা কুরুপাণ্ডবগণ আচার্য্য সহ বনে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন, একলব্য সেই সময় তাঁহার বিরলে শিক্ষিত অদ্ভুত বাণ-প্রয়োগ-কৌশল দেখাইয়া সকলকে স্তম্ভিত করিলেন। এরূপ অসাধারণ শিক্ষা কৌশলে সকলে আশ্চর্য্য হইয়া তৎক্ষণাৎ আচার্য্যকে সংবাদ দিলেন। দ্রোণ অর্জ্জুনকে সঙ্গে লইয়া একলব্যের সন্ধানে বনে প্রবেশ করিলেন। একলব্য দূর হইতে ইঁহাদিগকে দেখিয়া দ্রোণের নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং তাঁহার পাদগ্রহণপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন ও যথাবিহিত পূজা করিয়া আপনাকে শিষ্যরূপে নিবেদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন। দ্রোণ তখন কহিলেন,—"হে বীর। যদি তুমি বাস্তবিকই আমার শিষ্য হও, তাহা হইলে আমাকে দক্ষিণাস্বরূপ কিঞ্চিদ্দান কর।"

গুরু ভক্তি।

যাহার অন্তরে গুরুভক্তির প্রবল স্রোত বহিতেছে, তাঁহার গুরুকে অদেয় কি আছে! একলব্য নিজের বলিতে যাহা আছে সমস্তই গুরুচরণে অর্পণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। * * *

"কৃপা করি আপনি আইলে এই দেশে।
এ দ্রব্য সে দ্রব্য নাহি করহ বিচার॥
সকল দ্রব্যেতে হয় গুরু অধিকার।
যে কিছু যাচিল প্রভু সকলই তাহার॥
আজ্ঞা কর গুরু করিলাম অঙ্গীকার॥"

দ্রোণাচার্য্য কহিলেন, "যদি তোমার অবশ্য দেয় হয়, তবে আমাকে তোমার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠটী দান কর।" সত্যব্রত গুরুভক্ত বীর গুরুর এই দারুণ প্রার্থনায় বিচলিত হইলেন না। কঠোর সংযমে ও দীর্ঘকালব্যাপী সাধনার ফলে তদীয় চিত্তের যে উন্নতি লাভ হইয়াছিল একলব্য তাহাই দেখাইলেন—অদীনচিত্তে, প্রফুল্ল অন্তঃকরণে স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতঃ বিনা বিচারে স্বীয় দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ স্বহস্তে ছেদন পূর্ব্বক গুরু দক্ষিণা স্বরূপ উপহার দিয়া গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। ধন্য একলব্য! ধন্য সাধনা!! ধন্য গুরুভক্তি!!!

"যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ।

## কর্ম্মফল।

দ্রোণাচার্য্যের কিন্তু একলব্যের প্রতি এরূপ প্রাণহীন আদেশ বড়ই কঠিন বোধ হয়। কিন্তু ইহাতে এক অতি প্রয়োজনীয় শিক্ষার বিকাশ পাইতেছে। পূর্ব্বজন্মের কামনায় ও কর্ম্মের বৈচিত্র্য হেতু সৃষ্টির বৈচিত্র্য—

"কর্ম্ম বৈচিত্র্যাৎ সৃষ্টি বৈচিত্র্যং"

মানবের স্থূল শরীর সৃষ্টির অঙ্গ। সুতরাং কর্ম্ম বৈচিত্র্যহেতু স্থূলশরীরে বৈচিত্র্য বিরাজিত। কিন্তু এই যে কর্ম্মানুযায়ী স্থূল শরীরের বিকৃতি বা অধোগতি হয়—তাহা বল পূর্ব্বক অপনোদন হয় না। সুন্দর হইতে ত সকলের মনে সাধ, কিন্তু হইতে পারে কি? সে ত দূরের কথা, সকলে সর্ব্বদা সুস্থ শরীরে থাকিতে পারে কি? শারীরিক সুস্থতা রোগ

করিলেও জরা যন্ত্রণার হস্তে পরিত্রাণ নাই। নিজের শরীর, যাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা আত্মীয় বলিয়া মনে হয়, তাহার উপরই আমাদের হাত নাই—কর্ম্মসূত্রে আমরা এমনই আবদ্ধ। বিজ্ঞান-প্রসূত বাহ্য ঔষধ বাহ্য রোগের উপশম করিতে পারে, কিন্তু যে বিকাব কর্ম্মফল জনিত মজ্জাগত তাহার অপনোদনে বাহুবল প্রয়োগ নিষ্ফল। কর্ম্মফলে কাক হইলে, হঠাৎ ময়ূর পুচ্ছে দেহ আচ্ছাদন করিলেই ময়ূর হয় না। তবে এই কর্ম্মসূত্র নিবন্ধন স্থূল শরীরে যে অধোগতিক বিকৃতি হয় তাহার কিঞ্চিন্মাত্র অপনোদন হয়—আত্ম-তত্ত্ব দর্শন সাহায্যে। এই আত্ম-তত্ত্ব দর্শনে গুরুকৃপাই একমাত্র উপায়, গুরু বলই একমাত্র ঔষধ।

একলব্যের পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলজাত স্থূল শরীরের কর্ম্ম অনুযায়ী না করিয়া তাঁহার ক্ষমতার বহির্ভূত কার্য্য করিতে প্রয়াসী হইলেন। জন্মান্তর অপেক্ষা করিলেন না। যে ফল ভক্ষণে তাঁহার অধিকার নাই সেই ফলই তাঁহার খাইতে নিদারুণ ইচ্ছা হইল। একদিকে তাহাব পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল—অন্য দিকে অসাধারণ গুরুভক্তি, অমানুষিক ধৈর্য্য, অদম্য বাসনা, কঠোর সাধনা। কিন্তু স্থূল শরীরে যাহা কর্ম্মফল তাহাব খণ্ডন হইবে না। শরীর দ্বারা কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত শরীর দ্বারাই হইল - দ্রোণাচার্য্য মাত্র সেই প্রায়শ্চিত্ত করাইবার গুরু আত্ম-তত্ত্ব দর্শন সমুদ্রে একমাত্র কর্ণধার—গুরু তিনি গুরুর কার্য্যই করিলেন। এদিকে একলব্যের উচ্চ ক্ষেত্রের মানসিক উচ্চ ভাব গুলি তাহার কর্ম্ম ক্ষেত্রেরও উন্নতির সোপান প্রশস্ত করিতে লাগিল।

যেমন গুরুভক্তি—তেমনই গুরুকৃপা। দ্রোণের কাঠিন্য নহে—অপার গুরুকৃপা।

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীমনোরঞ্জন সিংহ।

# প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আদর্শাবলী।

( মাননীয়া এনি বেশান্ত কৃত "Hindu Ideals" হইতে অনুবাদিত। )

১। বর্ত্তমান তোমরা বিদ্যার্থী হইলেও কতিপয় বর্ষ মধ্যেই সংসারক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া তোমাদিগকে ভারতের ভবিষ্যৎ সংগঠনে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। তোমাদিগের পক্ষে কার্য্যতঃ উপযোগী হইবে বলিয়া এই বক্তৃতা-মালা অভিপ্রেত হইয়াছে। যথাবিহিত রূপে যাপিত ছাত্রজীবন, দীর্ঘতর গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনের উদ্যোগ পর্ব্ব স্বরূপ হওয়া উচিত, এবং এই ছাত্র জীবনে যে সকল প্রভাব তোমাদিগের উপর ক্রীড়া করে, তাহাদের দ্বারাই তোমাদিগের চরিত্র ও তোমাদিগের ভবিষ্যৎ গঠিত হইতেছে। তোমাদের মানসক্ষেত্রের চিন্তা, তোমাদের হৃদয়সঞ্চিত আশা, তোমাদের ক্রীড়াভূমির সংগ্রাম, তোমাদের বিদ্যামন্দিরের পাঠ, তোমাদের চতুর্দ্দিকস্থ চিন্তা ও মতপ্রবাহ,—এ সকলই শক্তিসংহতি, যদ্দারা তোমাদের জীবন গঠিত ও ভাগ্য রঞ্জিত হইতেছে। তোমরাই ভবিষ্য ভারতের প্রতিনিধি স্বরূপ, এবং তোমাদের মাতৃভূমির ভাগ্যের সংগঠন বা বিপরিণাম তোমাদেরই আয়ত্তাধীন। তোমাদিগের আচরণাদি সুপথপ্রবর্ত্তিত ও তোমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিতে সহায়তা করণোপযোগী আদর্শ সমূহ তোমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরাই আমার বাসনা; কারণ, ভারতসন্তানগণ ভারতের প্রতিভা বুঝিতে এবং তাঁহার স্থিতির জন্য একটী সুদৃঢ় ও উন্নত মার্গ নির্ম্মাণ করিতে শিখিলেই, ভারত অন্যান্য জাতির মধ্যে তাঁহার যথার্থ স্থান পুনর্লাভ করিতে পারেন।

২। কিন্তু এই প্রথম বক্তৃতায় আমরা প্রতীচ্য ও প্রাচ্য এই উভয় প্রকারেই আদর্শাবলীর প্রতি দৃষ্টি করিব, কারণ, বর্ত্তমান কালের অবস্থা গতিকে আমাদের উভয় প্রকার আদর্শই বুঝা ও উভয় প্রকারেরই সহিত সহানুভূতি থাকা আবশ্যক। যে পরম পুরুষ ভূমণ্ডলস্থ সকল জাতির ভাগ্য চক্রের নিয়ন্তা, তাঁহারই ইচ্ছাবলে এই ভারতভূমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জনপদ-বাসিগণের পরস্পর সম্মুখ সাক্ষাৎ হইয়াছে, এবং অধুনা তাহাদের পরস্পরের প্রভাব অভূতপূর্ব্ব শক্তির সহিত ক্রিয়া করিতেছে। তোমাদের ভবিষ্যৎ

কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে কর্ম্মঠ হইতে হইলে তোমরা পাশ্চাত্য জগৎ সম্বন্ধে, এবং যে যে মনোভাব দ্বারা উহা পরিচালিত ও যে যে আদর্শ দ্বারা উহা অনুপ্রাণিত হইতেছে তৎসম্বন্ধে, কিছু কিছু বুঝিতে অবশ্য শিক্ষা করিবে। পাশ্চাত্য জগৎ যে চক্ষে পাশ্চাত্য আদর্শবৃন্দ দর্শন করে, তোমরাও সেই চক্ষে উহা-দিগকে, পক্ষপাতবিকৃত না করিয়া, দর্শন করিতে অবশ্য শিক্ষা করিবে।

প্রতীচ্য জনপদবাসীর পক্ষে প্রাচ্য জনপদ সম্বন্ধে কিছু অবগত হওয়া যত সহজ, প্রাচ্য জনপদবাসীর পক্ষে প্রতীচ্য জনপদ সম্বন্ধে কিছু অবগত হওয়া তত সহজ নহে। ইংরাজের ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্রই গতিবিধি, সর্ব্বস্থানই তিনি পরিদর্শন করেন, সকল জাতিরই সহিত বসবাস করেন। যদ্যপি তিনি চক্ষুষ্মান ও সহানুভূতিশীল হন, তাহা হইলে বিবিধ জাতি দ্বারা জগৎ কি-ভাবে দৃষ্ট হইতেছে তাহা তিনি অবগত হইতে পারেন, এবং চতুর্দ্দিকস্থ মত-প্রবাহ ও চিন্তাস্রোত বুঝিয়া লইতে পারেন। কিন্তু হিন্দুর পক্ষে ইহা এরূপ নহে। ইদানীন্তন কুসংস্কার বশে, (সুখের বিষয় এই যে এ কুসংস্কার ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে এবং আমার বিশ্বাস অচিরেই বিলুপ্ত হইবে) হিন্দু তাঁহার স্বদেশ সীমা মধ্যেই আবদ্ধ এবং তদ্বহিঃস্থ বিশাল বিশ্বরাজ্যের বহিভূর্ত। অতি অল্পসংখ্যক হিন্দুই প্রতীচ্য জাতিগণ সম্বন্ধে পুস্তক লিখিত বিবরণ ব্যতীত আর বেশী কিছু অবগত আছেন। হয়ত তোমাদের কেহই ইংরাজ ভূমির বায়ু সেবন বা ইংরাজ জীবনের স্পন্দনপ্রবাহ কখনও অনুভব করিবে না। তথাপি ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ এত ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে যে একটীর অপরটীকে বুঝিবার প্রয়োজন অতীব গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তোমাদের ইংরাজদিগকে বুঝিতে এবং ইংরাজদের তোমাদিগকে বুঝিতে পারা উচিত হইতেছে। এই অভিপ্রায় উপলক্ষ করিয়া আমি পাশ্চাত্য আদর্শাবলী সম্বন্ধে তোমাদিগকে কিছু বলিব, এবং এ আদর্শাবলীর দ্বারা পাশ্চাত্য জীবন ও পাশ্চাত্য চিত্ত কি ভাবে গঠিত হইয়াছে তাহা দেখাইয়া তোমাদিগের সহায়তা করিতে চেষ্টা করিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসাধু সেবক শর্ম্মা।

# বেদান্ত দর্শন।

## শাঙ্কর ভাষ্যাভাস।

[ পূর্ব্ব পক্ষ ]

রৌপ্য শ্বেতবর্ণ, ঝিনুকও শ্বেতবর্ণ, এই উভয়ের বর্ণ তুল্য বলিয়া ঝিনুকে রৌপ্যের ভ্রম হওয়া সম্ভব; কিন্তু সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম বিশিষ্ট অন্ধকার এবং আলোকে পরস্পর ভ্রম কদাপি সম্ভব নহে। সেইরূপ উপভোগ্য সংসার এবং জগতের যাবতীয় বস্তু জড়ে, উপভোগকারী চৈতন্যের কদাপি ভ্রম সম্ভব নহে। সুতরাং জড়ের ধর্ম্ম জাড্য ( জড়তা ) এবং আত্মার ধর্ম্ম চৈতন্যে পরস্পর ভ্রম কথনও প্রমাণিত হইতে পারে না। অতএব একমাত্র পরমাত্মাতে যে সমস্ত জগতের ভ্রম হইতেছে ইহা বলা সম্পূর্ণই যুক্তিবিরুদ্ধ। বরং এই আত্মা ও জগৎ উভয়েই সত্য এইরূপ বলাই যুক্তি সিদ্ধ।

[ উত্তর পক্ষ ]

আত্মায় অনাত্মার ভ্রম প্রমাণসিদ্ধ না হউক বা যুক্তিবিরুদ্ধই হউক, কিন্তু আমরা অনাদিসিদ্ধ অবিবেক প্রভাবে আত্মা হইতে স্বতন্ত্র দেহাদিতে 'আমি' 'আমার' ইত্যাদি রূপ ব্যবহার করিয়া থাকি। সুতরাং এই জ্ঞানকে মিথ্যা না বলিয়া কি বলিব? অতএব আমরা ইহাই স্থির করিতেছি যে সত্য এবং মিথ্যা এই উভয় জ্ঞান একত্র জড়িত করিয়া আমরা এই দেহে আত্মার আরোপ করিয়া থাকি। প্রাণী মাত্রেরই ইহা স্বাভাবিক এবং অনাদিসিদ্ধ।

এইরূপে আত্মাহীন বস্তুতে যে আত্মা বলিয়া জ্ঞান বা আভাস তাহাকেই অধ্যাস বা ভ্রম বলা হইয়া থাকে।

একণে জিজ্ঞাস্য এই যে যাহা বিষয়, তাহা যখন লোকের জ্ঞান হইয়া থাকে তখন বিষয়ের অতীত পদার্থ পরমাত্মার জ্ঞান কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ইহার উত্তর এই যে, আত্মা সম্পূর্ণরূপে বিষয়ের অতীত নহে; কারণ আত্মা যখন 'আমি' এইরূপ 'অস্মৎ' শব্দের বিষয় তখন ইহা বিষয়ও বটে এবং অপরোক্ষ ( প্রত্যক্ষ ) ও বটে। অর্থাৎ 'আমি' 'আমি' জ্ঞান যখন আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেরই রহিয়াছে তখন আত্মা সকলেরই প্রত্যক্ষ হইতেছে। যদিও

আত্মার যথার্থ রূপ নির্ণয় কালে তাহা উপাধিশূন্য এবং অংশরহিত বটে কিন্তু যে পর্য্যন্ত সেইরূপ বিশেষ জ্ঞান না হয়, সেই পর্য্যন্ত অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া জীব সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, এবং অংশ বিশিষ্ট বলিয়া প্রতীতি হয়। অতএব বালকগণ যেমন অজ্ঞতা প্রযুক্ত অপ্রত্যক্ষ আকাশকে নীলবর্ণের কটাহ (কড়াই) বলিয়া মনে করে, সেইরূপ অজ্ঞতা বা অবিদ্যা প্রযুক্ত আমরা অপ্রত্যক্ষ এবং উপাধি রহিত আত্মাতে বিদ্যাবত্তা বা মূর্খতা, সুখ বা দুঃখের আরোপ করিয়া থাকি। কিন্তু তাই বলিয়া রজ্জুতে সর্পের আরোপ হইলেও রজ্জু কখনও সর্প হইয়া যায় না। আমি রজ্জুকে সর্প জ্ঞান করিলাম বলিয়া, সেই নির্জ্জীব রজ্জু সংসারের লোককে দংশন করিয়া সর্পের কার্য্য সমাধা করিতে পারিবেক না।

এইরূপে আত্মাতে অনাত্মার এবং অনাত্মাতে আত্মার অধ্যাস হইলেও কাহারও সহিত কাহারও সম্বন্ধ নাই। এই জন্য একের দোষ বা গুণে অন্যের কিছুই আসে যায় না। এই আত্মা এবং অনাত্মার পরস্পর অধ্যাসপ্রযুক্তই আমরা প্রমাণ, প্রমেয়, আমি আমার এবং লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার করিয়া থাকি। ব্যবহার মাত্রই অবিদ্যা কল্পিত, সুতরাং সমস্ত বিধি শাস্ত্র, নিষেধ শাস্ত্র বা মোক্ষ শাস্ত্র অবিদ্যা মূলক। এই অবিদ্যা প্রভাবেই বিশ্ব সংসার এবং তদান্তর্গত প্রবৃত্তি নিবৃত্তি প্রভৃতি সমস্ত লৌকিক ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। আত্মার যথার্থ স্বরূপ বিদিত থাকিলে অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়, নির্লিপ্ত, নির্গুণ সর্ব্বব্যাপী আনন্দ স্বরূপ আত্মার বিষয় জ্ঞাত হইলে তাহার স্নেহাদিতে আমিত্ব বুদ্ধি জন্মে না; সুতরাং সে এই দেহদ্বারা স্বর্গলোক বা মুক্তি প্রাপ্তির জন্য কোনও কার্য্য ও করিতে পারে না।—যেমন যখন আমরা গাঢ় নিদ্রাতে অভিভূত হই, তখন আমাদের দেহেতে কোনরূপ অভিমান না থাকায় কোনও কার্য্যই করিতে সমর্থ হই না। সুতরাং দেহে অভিমান না থাকিলে বেদান্ত শাস্ত্র প্রেরিত হইয়া স্বর্গাকাঙ্ক্ষা প্রযুক্ত কার্য্য করাও সম্পূর্ণই অসম্ভব। ব্যবহার জগতের কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য যে সকল শাস্ত্রের প্রয়োজন, তাহারাও ততদিন পর্য্যন্তই প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয়, যে পর্য্যন্ত মানুষের এই অজ্ঞানতা রূপ দেহাভিমান দূর না হয়। কেবল অজ্ঞ মানবেরাই যে সংসারের বস্তু সকল লইয়া প্রত্যক্ষাদি ব্যবহার করিয়া থাকে তাহা নহে; যে সকল জ্ঞানীগণের

সংসার ভ্রম কল্পিত এইরূপ জ্ঞান হইয়াছে তাঁহারও লৌকিক ব্যবহার কালে অজ্ঞ মানবেরই ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। যেমন পশুরা কোনও ব্যক্তির হস্তে প্রহারাভিপ্রায়-সম্পন্ন-দণ্ড দর্শন করিলে "আমি মরিব" এই ভয়ে পলায়ন করে, আবার অভিনবোৎপন্ন সজীব তৃণপূর্ণ হস্ত দেখিলে "আমি ভক্ষণ করিয়া সুখী হইব," এই মনে করিয়া ঐ ব্যক্তির নিকট গমন করে; সেইরূপ জ্ঞানীগণও যখন রোষ কষায়িত লোচন খড়্গহস্ত পুরুষকে দর্শন করিয়া পলায়ন করে, তদ্বিপরীতে আবার সাদর সম্ভাষণ দেখিলে তাহার সম্মুখীন হয়, তখন জ্ঞানীতে ও পশুতে ত কিছুমাত্রই প্রভেদ নাই; তথাপি কিন্তু লোকে পশুকে অজ্ঞান এবং মানুষকে জ্ঞানী বলিয়া থাকে। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ আর কিছুই নহে - পশুগণ মনে করিয়া থাকে যে যদি আমার এই দেহ বিনাশ হয়, তবে আমি মরিলাম; কিন্তু জ্ঞানীগণ জানেন যে আত্মা অবিনাশী তাই দেহের মৃত্যুতেও তাহারা প্রকৃত পক্ষে কোনরূপ দুঃখিত ও অভিভূত হন না।

শ্রীমোক্ষদাচরণ সামধ্যায়ী।

---

# মানবের ইতিবৃত্ত।

( ৩য় সংখ্যায় ১০৬ পৃষ্ঠার পর হইতে )

৬। ক্ষেত্র ( Field of Evolution. )

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্‌যো বেত্তিতং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥
মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্ত মেবচ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চচেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনাধৃতি।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্॥

১৩শ অঃ। গীতা।

যে ক্ষেত্রে থাকিয়া জীবগণ উন্নতি সাধন করিতেছে, এখন সেই ক্ষেত্র সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে কথঞ্চিৎ বলা যাইতেছে। স্থূল দেহের বর্ণনা সময়ে

ক্ষেত্র সম্বন্ধে যথা সম্ভব বলা যাইবে। "ক্ষেত্র" এই কথা দ্বারাই সবিশেষ রূপে বাহ্য জগৎকে বুঝায়। এক এক গ্রহরাজ এক এক ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত আছেন। যে গ্রহরাজ আমাদের এই বিশ্বের অধীশ্বর, কেবল তাঁহার সম্বন্ধেই আমাদের এই প্রবন্ধের বক্তব্য সীমাবদ্ধ থাকিবে। ক্ষেত্র বলিতে আমাদের এই বিশ্বকেই বুঝিতে হইবে।

এই ক্ষেত্র সম্বন্ধে অত্যাবশ্যক কয়েকটা স্থূল বিষয়ের প্রতি মনোযোগ করিতে হইবে। প্রথমতঃ, ক্ষেত্রের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা। এই অবস্থাগুলির প্রতি সবিশেষ মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য। এই বিশ্বে কথিত ঘটনাগুলি পুনঃপুনঃ সংঘটিত হইতেছে। তাহা একবার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, আলোচ্য বিষয় বুঝিতে সহজসাধ্য হইবে। জীবের উন্নতির ও অবনতির সপ্তাবস্থা। প্রথম অবস্থাত্রয়ে পুরুষ বা আত্মা অধোগামী হইয়া প্রকৃতির সংস্পর্শে আইসেন এবং তাহাতে শক্তি সঞ্চার করিয়া গুণবৈষম্য উৎপাদন করেন। স্থূল পদার্থে এইরূপ গুণ ও শক্তি সঞ্চার করাই আত্মার অধোগতির এই অবস্থাত্রয়ের বিষয় এবং কার্য্য। তৎ পরে চতুর্থ অবস্থা। অন্যান্য অবস্থা হইতে এই অবস্থাটির একটু বিশেষত্ব আছে। এই অবস্থায় পুরুষ ( আত্মা ) প্রকৃতিতে প্রবেশলাভ করিয়া তাহার সঙ্গে বহুবিধ সম্বন্ধে সংবদ্ধ ও গ্রথিত হন। তখন প্রকৃতি পুরুষের বিষম যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ( Great conflict between Spirit and Matter. ) ইহাই বিশ্বের প্রকাণ্ড যুদ্ধ। এই যুদ্ধ নানা ধর্ম্মে নানা রূপকের ভাষায় বর্ণিত আছে। ইহাই দেবাসুর যুদ্ধ, ইহাই কালানলসন্নিভ ভয়ঙ্কর কুরুক্ষেত্র সমর। পরস্পর বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন উভয়-পক্ষীয় সৈন্যগণ মধ্যে তুমুল সংগ্রাম। এই ক্ষেত্রে পুরুষ ( আত্মা ) প্রথমতঃ প্রকৃতি ( স্থূল বাহ্যপদার্থ ) কর্তৃক পরাভূত হন। তাহার পর পুনরায় পরস্পর মধ্যে মহা সমরানল প্রজ্বলিত হয়। ঘোরতর যুদ্ধের পর উভয় পক্ষের বিষম পরিশ্রান্তি বোধ, তদনন্তর বিশ্রাম লাভ। তখন সাম্যাবস্থা, কেহই কাহাকে পরাভব করিতে পারেন না। তৎপর পুরুষ প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার আরম্ভ করেন, ক্রমশঃ এই চতুর্থ অবস্থা অতিক্রান্ত হইলে পুরুষ প্রকৃতির ( স্থূল জগতের ) অধীশ্বর হইয়া পরবর্ত্তী অবস্থাত্রয়ে উর্দ্ধোত্থিত হন। এইরূপে সপ্তাবস্থা পূর্ণ হয়। শেষোক্ত তিন অবস্থায় পুরুষ প্রকৃতিকে স্বীয়

বশে আনিয়া ইচ্ছামত গঠিত ও পরিচালিত ও স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত যদৃচ্ছাক্রমে নিয়োগ করিয়া থাকেন। তাহাতে আত্মার সমস্ত শক্তিপুঞ্জ প্রকাশিত, প্রস্ফুটিত ও কার্য্যকুশল হয়। মোটামোটি বলিতে গেলে, শত অবস্থার মধ্যে প্রথম তিনটী গুণদায়িনী এবং অধোগামিনী। মধ্যেরটীতে যুদ্ধবিগ্রহ এবং পুরুষ প্রকৃতির মধ্যে পরস্পর নানারূপ সম্বন্ধের সৃষ্টি। শেষোক্ত তিনটী উর্দ্ধগামিনী। তাহাতে পুরুষ স্বয়ং প্রকাশিত হইবার জন্য প্রকৃতিকে স্ববশে আনিয়া তাহাকে বাহনস্বরূপ নিযুক্ত করেন। এই সপ্তাবস্থাকে নিম্ন লিখিত ভাবে শ্রেণিবদ্ধ করা যায় ; যথা :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| সপ্তাবস্থা | তিনটী অধোগামিনী | গুণসঞ্চার | প্রকৃতি-প্রাধান্য। |
| | একটী সম | সম্বন্ধ বিধান | সংগ্রাম। |
| | তিনটী উর্দ্ধগামিনী | বাহন প্রতিষ্ঠা | আধ্যাত্মিকতা। |

এই অত্যাবশ্যক বিষয়টী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে, তাহা হইলে মণ্ডল ( Chain ), চক্র ( Round ), গ্রহ (Globe) এবং মানবজাতি (Race) বিভাগ ইত্যাদি দুরূহ বিষয়গুলি বুঝিতে কোনরূপ গণ্ডগোলের আশঙ্কা থাকিবে না।

৭। গ্রহমণ্ডল। ( Planetary Chain ) সমষ্টিতে গ্রহমণ্ডল গ্রহদেবের উপাধি। এই দেহেই ইনি জন্মগ্রহণ করেন। জীবের পূর্ব্ব কথিত সপ্তাবস্থা অতিক্রম করিতে হইবে, এজন্য এক এক বিশ্বে সাতটী মণ্ডল। তন্মধ্যে প্রথম তিন মণ্ডলে জীবাত্মা ( পুরুষ ) অধোগামী হয় ; চতুর্থ বা মধ্য-মণ্ডলে পুরুষ-প্রকৃতির একত্র সমাবেশ হয়। তাহাতে পরস্পর মধ্যে নানারূপ ও অসংখ্য সম্বন্ধের সৃষ্টি হয় অবশিষ্ট তিন মণ্ডলে পুরুষ ( জীবাত্মা ) উর্দ্ধোত্থিত হয়, এবং পরিণামে আহৃত ও সঞ্চিত সংস্কারসহ পিতা ঈশ্বরের হৃদয়ে বিলীন হয়। তজ্জন্যই প্রত্যেক গ্রহমণ্ডলকে তদধিষ্ঠাতা ঈশ্বরের অবয়ব বলা হয়। পূর্ব্ব জীবনের লব্ধ ও সঞ্চিত সংস্কারসহ তিনি ( ঈশ্বর ) পরবর্ত্তী দেহ ধারণ করেন। এইরূপে এক একটী করিয়া সপ্তমণ্ডলে তিনি সাতবার জন্মগ্রহণ

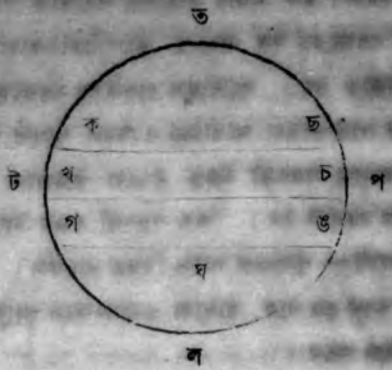
করিয়া থাকেন। এইরূপ এক একটি মণ্ডলের অবস্থিতি কালকে গ্রহমন্বন্তর কহে। এক একটী মন্বন্তরের পর আবার তৎপরিমাণকালব্যাপী এক এক গ্রহ প্রলয়ের আবির্ভাব হয়। সর্ব্বোন্নত সাধকগণ মন্বন্তরের অবসানে পরম শান্তিপ্রদ নির্ব্বাণ-পদ লাভ করিয়া অবিচ্ছিন্ন ও বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে থাকেন। পরে ইচ্ছামত পরবর্ত্তী উন্নত মণ্ডলে জন্মলাভ করিয়া তাঁহারা আরও উন্নত হইতে যত্নবান হন। কিন্তু পরবর্ত্তী মণ্ডল উন্নত এবং উপযোগী না হওয়া পর্য্যন্ত নির্ব্বাণীগণ পুনঃজন্ম লাভে বিরত থাকেন। যাহারা সবিশেষ উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হয় নাই, তাহারা এতাবৎকাল শান্তিদায়িনী সুগভীর নিদ্রার ক্রোড়ে শায়িত থাকে।

এই গ্রহমণ্ডল কিরূপ স্তরেস্তরে নির্ম্মিত, তাহা এখন দ্রষ্টব্য। এক একটী মণ্ডল এক একটী প্রকাণ্ড শৃঙ্খল বিশেষ, এক একটী চক্র ( Round ) উক্ত শিকলের এক একটী কড়া স্বরূপ। একটী জীবন তরঙ্গে ( Wave of Life ) পূর্ণ এক চক্র ( Round ) হয়। পূর্ব্বোক্ত নিয়মপ্রণালীতে তাহারও সপ্তাবস্থা। প্রথম অবস্থাত্রয়ে জীবনতরঙ্গ অধোগামী হয় ও প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হইয়া নানারূপ বাহ্য বস্তুর সৃষ্টি করে। মধ্যাবস্থায় ইহা প্রকৃতির সঙ্গে ঘোর বিবাদে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে উভয়ের সংস্পর্শে বিবিধ সম্বন্ধের সৃষ্টি হয়। শেষের তিন অবস্থায় এই জীবনতরঙ্গ উন্নতির পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া অধিকতর অধ্যাত্মভাবে পূর্ণ হইতে থাকে। এক এক চক্র প্রকৃতির এক এক জীব রাজ্যের উৎকর্ষ সম্পাদন করে। এইরূপ সপ্তচক্র। তন্মধ্যে তিনটী ভৌতিক, একটী স্থাবর, একটী উদ্ভিদ্‌রাজ্যের, একটী প্রাণী-জগতের এবং একটী মনুষ্য-রাজ্যের উৎকর্ষ বিধান করে। এইরূপ সপ্ত জীবনতরঙ্গে ( চক্রে ) এক গ্রহমণ্ডল হয়। মোহজালে জড়িত, অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন সংসারী জীবকে এই অতি-গুহ্য গ্রহমণ্ডল ও তাহার পরিভ্রমণ রহস্য বুঝাইবার জন্যই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনে রাসলীলার অবতারণা করিয়াছিলেন।

৮। গ্রহচক্র ( Round)।

( ক ) জীবনচক্র ( Life-circle, Life wave )।

এখন একটী জীবনচক্র সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।




মনে কর ট ত প ল নামক একটী বৃত্ত আমাদের এই বিশ্ব বা সৌরজগৎ। ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, তন্মধ্যস্থিত সপ্তগ্রহ। গ্রহচক্রের ন্যায় এই জীবন-চক্রেরও সপ্তাবস্থা। ইহার এক একটী অবস্থা এক একটী গ্রহ। প্রথম তিন অবস্থায় রূপের বিকাশ। মধ্যাবস্থায় পুরুষ (আত্মা) সেইরূপে প্রবেশলাভ করিয়া তাহাদিগকে উজ্জীবিত করেন। শেষ অবস্থাত্রয়ে পুরুষ কথিত রূপকে ইচ্ছামত পরিচালিত করেন।

ক, খ, গ, এই তিন গ্রহে আত্মা (পুরুষ) ক্রমশঃ নিম্নগামী হন। মধ্যের ঘ গ্রহে তাহার সাম্যাবস্থা। ঘোরতর যুদ্ধ বিগ্রহের পর সমতা আইসে, পরে তাহা হইতে ঙ, চ, ছ, এই তিন গ্রহে পুরুষ (জীব) ক্রমশঃ উন্নত হইতে থাকে। ক, খ, গ এবং ঙ, চ, ছ, এই ছয় অবস্থার পরস্পর সামঞ্জস্য আছে। ক, খ, গ, গ্রহে যাহা সত্ত্বামাত্রেজাত এবং ছায়া-রেখার ন্যায় নিতান্ত অস্পষ্ট থাকে, তাহা শেষোক্ত ঙ, চ, ছ, গ্রহে বিকশিত, পরিপক্ক এবং সম্পূর্ণ পরিণতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। বিশ্বে যাহা কিছুর উদ্ভব হইবে, মানব রাজ্যের সূক্ষ্ম উপাদানে তাহার প্রতিকৃতি মাত্র ক গ্রহে প্রথমে প্রতিবিম্বিত হয়। খ, গ্রহে তাহা অপেক্ষাকৃত ঘনীভূত ও নির্দ্দিষ্ট আকার ধারণ করে। এই খ ও চ গ্রহ পরস্পর সমক্ষেত্রে থাকায় ও একে অন্যের অনুরূপ হওয়ায় কথিত প্রতিকৃতি চ গ্রহে গিয়া উৎকৃষ্ট ও সুমার্জ্জিত হয়। সেইরূপ ক, ছ গ্রহের অনুরূপ এবং গ, ঙ গ্রহের অনুরূপ। প্রথম তিনটীতে যাহা উদ্ভূত হয়, শেষ তিনটীতে তাহার পরিণতি ও উৎকর্ষ হয়। ঘ গ্রহ আমাদের এই পৃথিবী। এখানে

প্রকৃতি পুরুষের ঘোর বিরোধ, ভয়ানক বাদ বিসংবাদ। শেষে পুরুষ প্রকৃতিকে পরাস্ত করিয়া ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হয়। জীব-তরঙ্গ ও জীব-স্রোত ক গ্রহে প্রথমে উদ্ভূত হইয়া সপ্তগ্রহে ক্রমশঃ নপ্তাবস্থা অতিক্রম করিয়া ছ গ্রহে গিয়া উন্নতির চরমে পদার্পণ করে। পুরাণাদিতে এই গ্রহ গুলিকে দ্বীপ বলা হইয়াছে। "অনন্তান্তস্থিমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপাচ মেদিনী।" তন্মধ্যে জম্বু দ্বীপই আমাদের পৃথিবী।

## ( খ ) ক্ষেত্র সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ।

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার রাজ্য বর্ত্তমানে চতুর্থ বা মধ্যমাবস্থায় উপনীত হইয়াছে। সপ্তমণ্ডলের মধ্যে আমরা এখন চতুর্থ গ্রহ মণ্ডলে ( Planetary Chain ) এ পৌছিয়াছি। প্রথম মণ্ডল সম্বন্ধে আমরা কিছুই পরিজ্ঞাত নহি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে এই মাত্র জানি, যে ইহাকে ব্রহ্মার প্রথম দেহ, অর্থাৎ তমোময় বা রাত্রি-দেহ কহে। এই দেহ হইতে অসুরগণের উৎপত্তি হইয়াছিল।

দ্বিতীয় অর্থাৎ ক্রিয়াশীল মণ্ডল সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু জানিনা বলিলে চলে; তবে এইমাত্র জানি যে ইহাকে লোক পিতামহ ব্রহ্মার জ্যোতিঃ বা দিবাদেহ কহে। এই দেহ হইতে অগ্নিম্বত্ত পিতৃগণ জাত হইয়াছেন।

তৃতীয় মণ্ডলে অবয়ব বা রূপের সৃষ্টি। ইহাকে সোমমণ্ডল কহে। আমাদের চন্দ্র সেই মণ্ডলের পৃথিবী বা চতুর্থ গ্রহ ছিল। ইহাকে ব্রহ্মার সান্ধ্য বা প্রদোষদেহ কহে। এই দেহ হইতে প্রথমে বর্হিষৎ পিতৃগণ, পরে তাহাদের স্থলবর্ত্তী সপ্ত শ্রেণীর জীবের উদ্ভব হইয়াছে।

চতুর্থ টাকে পার্থিব মণ্ডল কহে। ইহার চতুর্থ বা ঘ গ্রহ আমাদের বর্ত্তমান পৃথিবী। ইহাকে ব্রহ্মার প্রত্যূষ দেহ কহে। ইহাতে জন্মধারণ করিয়া মানবজাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

সপ্তমণ্ডল মধ্যে চতুর্থ মণ্ডলটী যেমন মধ্যস্থলে, সেইরূপ এক এক মণ্ডলের সপ্তগ্রহ মধ্যে এই চতুর্থ গ্রহ বা আমাদের এই পৃথিবী ঠিক্ মধ্যস্থলে। কাজেই চতুর্থ মণ্ডলের চতুর্থ গ্রহে বর্ত্তমানে পুরুষ প্রকৃতির পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহের বেগ চূড়ান্তসীমায় উঠিয়াছে। তাই জীবের দুঃখ কষ্টের আর অবধি নাই। অসংখ্য নরনারী আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই

ত্রিতাপানলে অহরহঃ দগ্ধ হইয়া অসহ্য যন্ত্রনায় ছটফট করিতেছে। ইহাই প্রকৃত কুরুক্ষেত্র সংগ্রাম, এবং গ্রহের অন্তে যুদ্ধের অবসান হইবে। তাহার পর হইতে পুরুষের জয় এবং প্রকৃতির পরাজয় আরম্ভ হইয়া মানব সমাজে ধর্ম্মজীবনের ও আধ্যাত্মিক ভাবের সবিশেষ স্ফূরণ ও উন্নতি হইবে। (ক্রমশঃ)

যুগল সেবক

# পরলোকগত মানব।

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর )

শিও নারায়ণ সিংহের বাটীর সহিত সংলগ্ন একটী উদ্যান ছিল। সেই উদ্যানে জীবিতাবস্থায় শিও নারায়ণ প্রত্যহ প্রত্যুষে ভ্রমণ করিতেন। শিও নারায়ণের মৃত্যুর পর এই উদ্যানটী তাঁহার প্রতিবেশী গিরিধারী লাল নামক জনৈক ভদ্রলোক ক্রয় করেন। উপরি উক্ত ঘটনা ঘটিবার প্রায় একমাস পরে গিরিধারী লালের প্রজা হরকিষণ এক দিন অতি প্রত্যুষে গ্রামান্তরে এক হাটে যাইতেছিল। তাহার যাইবার পথেই এই উদ্যান। উদ্যানের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া সে দেখিল যে একজন লোক তাহার ভিতরে পাদচরণ করিতেছে। তাহার মনে হইল গিরিধারী লাল বাবু বেড়াইতেছেন। তাহার সত্বর গমনের প্রয়োজন থাকাতে সে বাবুর সহিত কোনও কথাবার্ত্তা না বলিয়া দ্রুত গতিতে তাহার গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল। সেই দিন বেলা দ্বিপ্রহরের সময় সে হাট হইতে ফিরিল এবং অপরাহ্নে গিরিধারী বাবুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। প্রথমেই সে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু আপনি আজ অত ভোরে উঠিয়া বাগানে বেড়াইতে ছিলেন কেন?" গিরিধারী বাবু শুনিয়া অবাক! তিনি বলিলেন, "সে কি! আমিতো আজ অনেক বেলায় বিছানা হইতে উঠিয়াছি" হরকিষণ চমকাইয়া বলিল, "সে কি বাবুজী! আমি তাহা হইলে আজ সকাল বেলা আপনার বাগানে কাহাকে দেখিলাম?" এই কথা শুনিয়া গিরিধারী বাবুর মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি তৎপর দিন প্রত্যুষে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তাঁহার গৃহের যে বাতায়ন হইতে তাঁহার বাগানটী স্পষ্ট দেখা যাইত সেই বাতায়ন পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এক কোয়াটার কাল অতীত হইতে না হইতে তিনি দেখিলেন যে একটী আম্র বৃক্ষের তলে এক ভদ্রলোক পাদ-চারণ করিতেছে। বেশ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে সে মূর্ত্তি মৃত শিও নারায়ণের ভিন্ন আর কাহারও নহে। তিনি তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিয়া উঠিলেন, কিন্তু মূর্ত্তিও মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল। গিরিধারী বাবু আর সে বাটীতে থাকা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না এবং অল্পকাল পরে অন্য বাটীতে উঠিয়া গেলেন। সেই বাটি ও উদ্যান পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিল। ( ক্রমশঃ )

ওঁ

# পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ।

১২শ ভাগ } ভাদ্র, ১৩১৪ সাল। { ৫ম সংখ্যা।

## শান্তি-শতক।

( শিহ্লন-বিরচিত )

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

১৯

চিত্ত-মাতঙ্গের অহ ! দুরন্ত দুর্ব্বার মদ উথলে যখন,
সে উদ্দাম উদ্দমে তাহার
ধৈর্য্য-বাঁধ শিথিলায়, ভেঙ্গে যায় কুলাচার-নিগড় তখন
লজ্জা-রজ্জু হয় ছিন্ন তার ;
বিবেক অঙ্কুশ-মরি ! কঠোরতা পরিহরি হয় তেজ-হীন,
সামালিতে নারে আর বিজ্ঞান-মাহুত তার বারণ স্বাধীন !

২০

ভিক্ষান্ন ভোজন যার, ভবন মন্দির-দ্বার, শয্যা ভূমিতল
পরিজন নিজ দেহ-ভার,

জীর্ণ পট-খণ্ডে বাঁধা বিমলিন কন্থা অহো। বসন কেবল,
পান তরে পাণি পাত্র যার,
সংসার শ্মশান-জ্ঞানে সন্ন্যাসী সেজেছে যেবা অবনী ভিতর,
হা ধিক্! তাহারো বুকে বিষয় বসতি, কামনা-নিগড়!

২১

হা উদর! তুই সাধু, সন্তোষ সামান্য শাকে লভিস্ যখন,
শ্রেষ্ঠ তুই হইতে হৃদয়,
এ হৃদি অধিকাধিক বাঞ্ছা শত নাহি পারে করিতে পূরণ,
চিত-কুক্ষি কি বিপুল হয়!
আশা বাত-বিক্ষোভিত, কাম-ঊর্ম্মি তরঙ্গিত জীবন-জলধি,
নাহি কূল, নাহি পার, সীমাহীন অন্ধকার ঘিরি' নিরবধি!

২২

নিস্ব চায় শত মুদ্রা, শতী চায় দশশত লক্ষ সহস্রেশ,
লক্ষপতি বাঞ্ছা করে আশ,
বাঞ্ছা সে সম্রাট্ হ'তে পুষে বাঞ্ছা সদা চিতে, সম্রাট্ সুরেশ,
ব্রহ্মত্বে ইন্দ্রের অভিলাষ,
ব্রহ্মা চায় বিষ্ণুপদ, এইরূপে থরে থরে সজ্জিত বাসনা,
আশার অবধি অহ! কে কোথা পেয়েছে কহ? অনন্ত কামনা!

২৩

অশেষ শোকের খনি, পবিত্রতা-বিরহিত, পঞ্চভূত ময়
এ দেহের কিবা পরিণাম।
ক্ষণ বিভঙ্গুর অহো! এছার দেহের প'রে উচিত কি হয়
ক্ষণতরে আস্থা-সমাধান?
কিন্তু এই ছার দেহ না হেরি এমন কেহ না করে মমতা,
এ নশ্বর কলেবর "আমি, আমি" বলি' নরে করয়ে মিত্রতা!

২৪

শুক্র ও শোণিতে গড়া এই নর-দেহ মরি! মরণ অধীন,
গুরু শোকে সদা অভিভূত,

রোগের আরাম-ভূমি, জেনে শুনে তবু জীব বিবেক-বিহীন
মায়াম্বুধি মাঝারে মজ্জিত
হইয়ে সতত চায় ডুবিতে শৃঙ্গারে হায়। বনিতা সংহতি,
তনয় কামনা করে, বিষয়-সম্পদ তরে বিচলিত মতি।

২৫

খট্টাঙ্গের প্রান্তভাগে ওই যে হেরিছ তুমি কঙ্কাল-কপাল,
পকটি৩ ধবল দশন,
বায়ু, তা'র মাঝে পশি', অট্টহাসে উপহসি' অন্ধমায়া-জাল,
শোন, শোন কহে কি বচন :—
"কোথা সে বদন বিধু ? কোথা সে অধর মধু ? মৃদুল আলাপ ?
"কোথা কাম-ধনু সম ভ্রূভঙ্গ মনোরম, কটাক্ষ-কলাপ ?'

২৬

মুনি-অনুকরনীয় একটি রহস্য-কথা শোন্ তোরে বলি,
আরে মোর দুরন্ত হৃদয়।
যেওনা নারীর পাশ পরোনা প্রণয়-ফাঁস কামনায় গলি',
কামিনীরে ক'রোনা আশ্রয়,
হানিয়া নয়ন-বান শান্তিরূপ তনু-ত্রাণ করি বিদারণ,
ক্ষিপ্রবেগে পশি' চিতে প্রাণমন হরিণাক্ষী করয়ে হরণ।

২৭

পরশ-রসিক যত পুরুষ বাসনা হত মাতি' কাম-মদে
করে কাণা পাগলের প্রায়,
মাংস-পিণ্ড অতি তুচ্ছ, ভাব' তাহা কুচউচ্চ, মদন-সম্পদে
আলিঙ্গনে ধরে বুকে তায়।
লালা-ক্লিন্ন নারী-মুখে চুম্বন করয়ে সুখে ভাবি সুধাধার,
অমেধ্য ক্লেদার্দ্র পথে রমে পুন হৃষ্ট চিতে,—একিরে বিকার !

[ "বিবেকোদয়" নামক প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত। ]

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

# কর্ম্মভোগ।

আমরা জানিয়াছি যে কর্ম্ম করিলেই তাহার ফলভোগ করিতে হয়। কর্ম্ম দ্বিবিধ, পুণ্য ও পাপ। পুণ্যের ফল সুখ, পাপের ফল দুঃখ। সেই জন্য পতঞ্জলি যোগ সূত্রে বলিয়াছেন,—

তে হ্লাদ পরিতাপ ফলাঃ পুণ্যাপুণ্য হেতুত্বাৎ।

[সাধন পাদ, ১৪]

ইহার ব্যাস ভাষ্য এইরূপ,

তে জন্মায়ুর্ভোগাঃ পুণ্য হেতুকাঃ সুখফলা অপুণ্যহেতুকা দুঃখ ফলা ইতি।

অর্থাৎ 'জীবের ভোগাদি পুণ্যজনিত হইলে সুখফল এবং পাপজনিত হইলে দুঃখ ফল।'

মহাভারতের শান্তি পর্ব্বে উক্ত হইয়াছে,—

যথা যথা কর্ম্মগুণং ফলার্থী করোত্যয়ং কর্ম্মফলে নিবিষ্টঃ।
তথা তথায়ং গুণ সংপ্রযুক্তঃ শুভাশুভং কর্ম্মফলং ভুনক্তি॥

[মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২০১।২৩]

ফলাসক্ত জীব ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া যেমন যেমন কর্ম্ম করে, তাহার কর্ম্মের প্রকৃতি অনুসারে সে সেইরূপ শুভাশুভ ফল ভোগ করে।' অর্থাৎ, সুকৃতের ফলে তাহার সুখভোগ হয়, এবং দুষ্কৃতের ফলে দুঃখভোগ হয়।

অতএব, সুখলাভের একমাত্র উপায় ধর্ম্মাচরণ, এবং দুঃখ অধর্ম্মাচরণের অবশ্যম্ভাবী ফল। সেই জন্য প্রাচীনেরা বলেন,

সুখং হি জগতামেকং কাম্যং ধর্ম্মেন লভ্যতে।

'জগতের একমাত্র কামনার বস্তু যে সুখ, তাহা ধর্ম্মের দ্বারাই লাভ হয়।'

মহাভারতকারও এই মর্ম্মে বলিয়াছেন,—

নাবীজাজ্জায়তে কিঞ্চিৎ নাকৃত্বা সুখমেধতে।
সুকৃতৈর্বিন্দতে সৌখ্যং প্রাপ্য দেহময়ং নরঃ।

[মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২৯১।১২]

'বীজ না হইলে অঙ্কুর হয় না, সুকৃত ব্যতিরেকে সুখ হয় না। দেহধারী জীব সুকৃতেরই ফলে সুখ ভোগ করে', এবং দুষ্কৃতের ফলে দুঃখ ভোগ করে।

এই কর্ম্ম-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিলে মানুষ আর সুখলাভে উৎফুল্ল এবং দুঃখ লাভে উদ্বিগ্ন হয় না। কারণ, সে তখন বুঝিতে পারে যে, সে আপনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে স্বহস্তে যে বীজ রোপণ করিয়াছিল ইহ জন্মে তাহারই ফল ফলিতেছে মাত্র। ভোগ ভিন্ন যখন কর্ম্মের ক্ষয় নাই—( শুভাশুভঞ্চ যৎ কর্ম্মং বিনা ভোগাৎ ন তদ্ক্ষয়ঃ - ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ), তখন দুঃখভোগে ধার শোধ হইল বলিয়া প্রফুল্ল হওয়াই উচিত, কারণ, যাহার যে ঋণ আছে, উত্তমর্ণ সুদ সমেত তাহার শেষ পাই অবধি উশুল করিবেই করিবে।

এই যে সুকৃত দুষ্কৃত, ইহার ফলভোগ কখন হয়? যে জন্মে সেই সমস্ত পুণ্য পাপের অনুষ্ঠান করা যায়, সেই জন্মেই হয়, অথবা জন্মান্তরে? এ প্রশ্নের সাধারণ উত্তর এই যে, সে জন্মে হয় না, পরজন্মে হয়। সেইজন্য যাহাকে ক্রিয়মাণ কর্ম্ম বলা হয়, অর্থাৎ ইহজন্মে কৃত কর্ম্ম, তাহার আর একটী নাম 'আগামী'। আগামী অর্থে যাহার ফল এখন হইবে না, পরে হইবে। ভগবান মনুও বলিয়াছেন 'ফলতি গৌরিব'। কর্ম্ম ফলে কিরূপ? গৌরিব। গো অর্থে পৃথিবী। পৃথিবীতে যেরূপ বীজ বপন করিলে তাহা সদ্যসদ্যই ফলবান্ হয় না, কিন্তু কালসহকারে সেই বীজ অঙ্কুরিত বর্দ্ধিত, পুষ্পিত ও মুকুলিত হইয়া পরে ফল প্রসব করে, কর্ম্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ। কর্ম্মের ফল সাধারণতঃ ইহজন্মে ফলে না, পরজন্মে ফলিয়া থাকে। তবে কর্ম্ম যদি উৎকট হয়, তবে তাহার ভোগ ইহজন্মেই ভুগিতে হয় তা' সেকর্ম্ম পুণ্যই হউক আর পাপই হউক। সেইজন্য শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন,

অত্যুৎকট পুণ্য পাপৈ রিহৈব ফলমশ্নুতে।

'পুণ্য কিম্বা পাপ উৎকট হইলে, তাহার ফল ইহজন্মেই ভোগ করিতে হয়।'

এই মর্ম্মে পতঞ্জলিও বলিয়াছেন,

ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্ট জন্ম বেদনীয়ঃ।

[যোগসূত্র, সাধনপাদ, ১২]

কর্ম্মাশয় অর্থে ধর্ম্মাধর্ম্ম। এই ধর্ম্মাধর্ম্ম রাগ দ্বেষ, মোহাদি মূলক; এবং ইহাদের ফল দৃষ্ট ( ইহ ) জন্মে কিম্বা অদৃষ্ট ( পর ) জন্মে প্রকাশিত হয়।'

এই সূত্রের ব্যাসভাষ্য এইরূপ,—

তত্র পুণ্যাপুণ্য কর্ম্মাশয়ঃ কামলোভমোহক্রোধপ্রভবঃ স দৃষ্ট জন্ম বেদনীয়শ্চা দৃষ্ট জন্ম বেদনীয়শ্চ। তত্র তীব্র সংবেগেন মন্ত্র তপঃ সমাধিভিঃ নিবর্ত্তিত ঈশ্বর দেবতা মহর্ষি মহানুভাবানাম্ আরাধনাদ্ বা যঃ পরিনিস্পন্নঃ স সদ্যঃ পরিপচ্যতে পুণ্যকর্ম্মাশয় ইতি। তথা তীব্র ক্লেশেন ভীতব্যাধিত কৃপণেষু বিশ্বাসোপগতেষু বা মহানুভাবেষু বা তপস্বিষু কৃতঃ পুনঃ পুনরপকারঃ স চাপি পাপকর্ম্মাশয়ঃ সদ্য এব পরিপচ্যতে।

অর্থাৎ, 'এই যে ইহজন্মকৃত পাপ পুণ্য যাহাদের মূলে কাম ক্রোধ লোভ মোহ ইত্যাদি— তাহার ফল ইহজন্ম বা জন্মান্তরে জানা যায়। উৎকট পুণ্য সদ্যই ফলবান্ হয়; যেমন আত্যন্তিকভাবে মন্ত্র তপস্যা সমাধির অনুষ্ঠান অথবা ঈশ্বর, দেবতা, ঋষি কিম্বা মহাত্মার আরাধনা। এইরূপ উৎকট পাপের সদ্য ফল ভোগ হয়, যেমন পীড়িত ভীত আর্ত্ত শরণাগতের প্রতি অত্যাচার অথবা ঋষি তপস্বীর প্রতি অপকার।

এই তত্ত্ব বিশদ করিবার জন্য ব্যাসভাষ্যে দুইটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে; নহুষ ও নন্দীশ্বর। নহুষ ইন্দ্রত্ব পদ লাভ করিয়া অভিমানে এরূপ অন্ধ হইয়াছিল যে সে অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষিদিগকেও নির্য্যাতিত করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। সেই উৎকট পাপের ফলে তাহার সদ্য অজগর দেহ লাভ হয়। এইরূপ নন্দীশ্বর দেবদেব মহাদেবের এরূপ উৎকট আরাধনা করিয়াছিল, যে তাহার মনুষ্য দেহের পরিবর্ত্তে ইহজন্মেই দেবত্ব লাভ ঘটিয়াছিল। প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে এইরূপ অন্যান্য দৃষ্টান্তের বিবরণ পাওয়া যায়। যেমন রামায়ণে দশরথ ও সিন্ধুমুনি ঘটিত বৃত্তান্ত। দশরথ মৃগভ্রমে শব্দভেদী বাণে অন্ধমুনি-দম্পতির একমাত্র সম্বল বালক সিন্ধুকে বধ করেন, এই উৎকট পাপের ফল সেই জন্মেই তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল। তিনি পুত্র রামচন্দ্রের বনগমনের শোকে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। রামায়ণে লিখিত আছে যে, এরূপ হইবার কারণ, তাঁহার সিন্ধুবধ জনিত উৎকট পাপ। এইরূপ মহাভারতের বনপর্ব্বোক্ত সাবিত্রীর উপাখ্যানে আমরা উৎকট পুণ্যের সদ্য ফল ইহজন্মেই ফলিতে দেখিতে পাই। সাবিত্রী যখন সত্যবান্‌কে মনে মনে বরণ করিবার পর পিতার অনুমতি লইবার জন্য রাজধানীতে প্রতিগমন করেন, তখন দেবর্ষি

নারদ ঘটনাক্রমে তাঁহার পিতার নিকট উপস্থিত ছিলেন। ঋষি সত্যবানের নাম শুনিয়া সাবিত্রীকে এই বিবাহ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য সবিশেষ অনুরোধ করেন। তিনি বলেন যে, সত্যবান্ অশেষগুণে গুণান্বিত হইলেও অল্পায়ুঃ; তাহাকে বিবাহ করিলে বৎসরান্তে সাবিত্রীর বৈধব্য অনিবার্য্য। কিন্তু সাবিত্রী তাঁহার কথায় প্রতিনিবৃত্ত হন নাই। তিনি দৃঢ়তা সহকারে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে যখন মনে মনে বরণ করিয়াছি, তখন তিনিই আমার পতি; আর কাহাকেও এ শরীর দিতে পারিব না। পরে সত্যবানের সহিত সাবিত্রীর বিবাহ সম্পন্ন হয়। কিন্তু ঋষির দৃষ্টি অভ্রান্ত, তিনি দিব্য চক্ষে সাবিত্রীর যে বৈধব্য দেখিতে পাইয়াছিলেন, বৎসরান্তে তাহাই ফলিল। অকালে সত্যবান্ কালের কবলিত হইলেন। যম তাঁহার অঙ্গুষ্ঠমাত্র কারণ-দেহ পাশে আবদ্ধ করিয়া লইয়া চলিল। কিন্তু সাবিত্রী এই বৎসরের মধ্যে যে তীব্র ব্রত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া অত্যুৎকট পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা তো নিষ্ফল হইতে পারে না। সেই পুণ্যপুঞ্জের ফলে তাঁহার অদৃষ্ট জনিত বৈধব্যের খণ্ডন হইয়া গেল। সত্যবান্ পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া সাধ্বীর সহিত মিলিত হইলেন।

বিষ্ণুপুরাণোক্ত ধ্রুব চরিত্রেও আমরা এই সত্যের সাক্ষাৎ পাই। ধ্রুব বিমাতার বশ পিতার আদর হইতে বঞ্চিত ছিলেন। একদিন পিতা তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া বিমাতার গঞ্জনার ভাগী করিয়াছিলেন। ইহাতে শিশু ধ্রুব মর্ম্মাহত হইয়া আপন মাতার সদনে যান। মাতা অনেক সান্ত্বনা করিয়া বুঝাইয়া দেন যে জীব ইহজন্মে জন্মান্তর-কৃত পাপপুণ্যের ফল ভোগ করে। যাহার পুণ্য আছে সেই সিংহাসনে বসিতে পায়। দুর্ভাগার পুণ্যহীন পুত্রের এ দুরাকাঙ্ক্ষা কেন? ইহাতে ধ্রুব গর্ব্ব সহকারে বলিয়াছিলেন, যে যদি পুণ্যের ফলেই উত্তম স্থান লাভ হয়, তবে তিনি এমন পুণ্যপুঞ্জ অর্জ্জন করিবেন এবং তাহার ফলে এমন সর্ব্বোত্তম স্থান অধিকার করিবেন যে তাঁহার পিতাও সে স্থান কখন পান নাই।

ইচ্ছামি তদহং স্থানং যন্ন-প্রাপ পিতা মম।

ধ্রুব কার্য্যে তাহাই করিলেন। তিনি পদ্মপলাশলোচন হরির ঐকান্তিক ভাবে আরাধনা করিয়া সর্ব্বোত্তম ধ্রুবলোক, যাহা দেবতাদিগেরও চিরবাঞ্ছিত,

তাহাই প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে উৎকট পুণ্যের ফল ইহ জন্মেই ফলিল। অবশ্য এ সকল দৃষ্টান্ত সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ও ইহারা অত্যুৎকট পুণ্য পাপের নিদর্শন। সাধারণ নিয়মে এক জন্মের পাপ পুণ্যের ফলভোগ পর জন্মেই হয়।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

---

# প্রতিভা।

কয়েক বৎসর অবধি সূক্ষ্ম জগতের কতকগুলি অলৌকিক ঘটনাবলীর প্রতি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। বিলাতে, আমেরিকায় ও অন্যান্য স্থানে Society for Psychical Researches নামক অনুসন্ধান-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। পণ্ডিতবর মায়ার্স (Myers) এই সমিতি-সংগৃহীত ঘটনাবলী হইতে প্রতিভা সম্বন্ধে যে তত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন, তাহারই কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

মায়ার্স বলেন মানব মাত্রের এক একটি আত্মা আছে—এই প্রাচীন মত আমি স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি। দেহ ও মনের উপর ইহার আধিপত্য অসম্পূর্ণ ও অস্থির। দুইটী দ্বার দিয়া ইহার শক্তিস্রোত প্রবাহিত হয়। প্রথম দ্বার আমাদের জাগ্রৎ চৈতন্য (Supraliminal consciousness) এবং দ্বিতীয় দ্বার প্রচ্ছন্ন চৈতন্য (Subliminal consciousness)। অর্থাৎ মানবের দুইটি চৈতন্য আছে—জাগ্রত ও প্রচ্ছন্ন বা প্রকট ও অপ্রকট। জাগ্রৎ চৈতন্য ক্ষুদ্র। প্রচ্ছন্ন চৈতন্য বিশাল। এই বিশাল চৈতন্যের যে ক্ষুদ্র অংশটুকু আমাদের স্থূল মস্তিষ্কের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে তাহাই আমাদের জাগ্রৎ চৈতন্য। মানবের আত্মা এই উভয় চৈতন্যকেই নিয়মিত ও পরিচালিত করে। (1)

---

(1) "For my part, I feel forced to fall back upon the old world conception of a soul which exercises an imperfect and fluctuating control over the organism, along two main channels that of ordinary consciousness and that of subliminal consciousness." Myer's Human Personality vol. 1

এই প্রচ্ছন্ন চৈতন্যের কোন অংশ যদি অলক্ষ্যভাবে ও অজ্ঞাতসারে জাগ্রৎ চৈতন্যে ভাসিয়া উঠে—জাগ্রৎ চৈতন্যের বিষয়ীভূত হয়, তাহাকেই আমরা প্রতিভার উদয় ( inspiration of genius ) বলি। আমাদের চেষ্টা বিনা কত সুন্দর সুন্দর ভাব, কত উচ্চতর জ্ঞান এই প্রচ্ছন্ন চৈতন্যে সঞ্চিত হইতেছে তাহা আমরা জানিতে পারি না, কিন্তু সময়ে সময়ে তাহাদের দুএকটি ফোয়ারার ন্যায় জাগ্রৎ চৈতন্যে উত্থিত হয়। ইহারই নাম প্রতিভার উদয়। (2) প্রচ্ছন্ন চৈতন্যের শক্তি সকল মানবেই কতক পরিমাণে আছে। এই শক্তিকে যিনি যতদুর জাগ্রৎ জীবনের কার্য্যে লাগাইতে পারেন তিনি ততই প্রতিভাবান্। অতএব প্রচ্ছন্ন শক্তিনিচয়কে জাগ্রৎ জীবনের কার্য্যে লাগাইবার সামর্থ্যকেই প্রতিভা বলা যায়। (3)

শুভ্র আলোক বিশ্লেষণ করিলে বিভিন্নবর্ণাত্মক একটি আলোকস্তর (Spectrum) পাওয়া যায়। এই স্তর অবিচ্ছিন্ন নহে। ইহার মধ্যে মধ্যে অনেক আলোকশূন্য রেখা (dark lines) থাকে। এই আলোক-স্তরের সাতটি বর্ণ সাধারণ মানবের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে ঐ সাতটি বর্ণ ভিন্ন আর বর্ণ নাই। বাস্তবিক ঐ দৃশ্য আলোক-স্তরের উপরে ও নিম্নে নানাবিধ অসংখ্য বর্ণ রহিয়াছে। সাধারণ মানবের প্রত্যক্ষীভূত না হইলেও ইহার কতক অংশ কোন কোন মানুষের দৃষ্টিগোচর হইতে দেখা যায়। আবার আর এক শ্রেণীর মানব আছেন যাঁহারা আলোক-স্তরের অদৃশ্যাংশ দেখিতে পান না বটে, কিন্তু দৃশ্য অংশটুকু সাধারণ মানবাপেক্ষা অনেক উজ্জ্বল দেখেন এবং আলোক শূন্য রেখার স্থানে

(2) "An inspiration of genius will be in truth a subliminal uprush, an emergence into the current of ideas which the man is consciously manipulating, of other ideas which he has not consciously originated, but which have shaped themselves beyond his will in profounder regions of his being *Ibid.*

(3) "Genius should rather be regarded as a power of utilizing a wider range than other men can utilize of faculties in some degree, innate in all, a power of appropriating the results of subliminal mentation to subserve the supraliminal stream of thought" *Ibid.*

আলোকরেখা দেখিতে পান। মায়ার্স বলেন "মনে করুন এই দৃশ্য আলোক-স্তর আমাদের জাগ্রৎ চৈতন্যের বিষয়ীভূত জগৎ, অদৃশ্য আলোক-স্তর প্রচ্ছন্ন চৈতন্যের বিষয়ীভূত জগৎ,—প্রথমোক্ত অসাধারণ মানব (যিনি অদৃশ্যাংশ দেখিতে পান) সূক্ষ্মজগদ্দর্শী (clairvoyant) এবং শেষোক্ত অসাধারণ মানব প্রতিভাশালী।" অতএব clairvoyant এবং Genius এর মধ্যে প্রভেদ এই যে একজন জাগ্রৎ চৈতন্যের অতীত বা অবিষয়ীভূত প্রদেশ দেখেন অপর এই জাগ্রৎ চৈতন্যের বিষয়ীভূত পদার্থই দেখেন বটে, কিন্তু গভীর ভাবে নূতন আকারে। অলক্ষ্যে ও অযাচিত ভাবে প্রচ্ছন্নচৈতন্য হইতে আলোক-বন্যা আসিয়া তাঁহার মনকে প্লাবিত করিয়া দিতেছে এবং সেই আলোকে সাধারণের অন্ধকারময় স্থানগুলিও তাঁহার নিকট সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল। clairvoyant জ্ঞাতভাবে প্রচ্ছন্নজগতের ক্রিয়া দেখিতে ও শক্তি ব্যবহার করিতে পারেন, Genius অজ্ঞাত ভাবে তাহা করেন।

উদাহরণ স্বরূপ তিনি কতকগুলি বালকের উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহারা কঠিন কঠিন অঙ্ক অসাধারণ রূপে কসিতে পারিতেন। দশ বর্ষীয় বালক বিদারকে (Bidder) প্রশ্ন করা হইল "সতর হাজার আট শত একষট্টির (১৭৮৬১ র) উৎপাদক (factors) কি কি?" বালক তৎক্ষণাৎ বলিল "৩৩৭ এবং ৫৩।" ডেস্ (Dase) নামক এক ব্যক্তির যাবজ্জীবন এই শক্তি ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তিনি এরূপ স্থূলবুদ্ধি ছিলেন যে সহস্র চেষ্টা করিয়াও তিনি গণিতের যোগ বিয়োগ পর্য্যন্ত শিখিতে পারেন নাই, অথচ সত্তর লক্ষ হইতে আশি লক্ষ (৭০০০০০০ হইতে ৮০০০০০০) পর্য্যন্ত যাবতীয় সংখ্যার ফ্যাক্টর নির্ণয় করিয়া গিয়া গণিত শাস্ত্রের পরম উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। সিসিলি দ্বীপ নিবাসী এক মেষপালকের দশ বর্ষীয় পুত্র মাঞ্জিয়ামিল্ (Mangiamele), গণিতজ্ঞ আরাগোর নিকটে আনীত হইলে, আরাগো নিম্নলিখিত প্রশ্ন করিলেন। ১ম—"সাইত্রিশ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার চারি শত ষোল'র (৩৭৯৬৪১৬ র) ঘনমূল কত?" আধ মিনিটের মধ্যে বালক উত্তর করিল "১৫৬।" ২য় প্রশ্ন—"সেই রাশিটি কত যাহার ঘন এবং বর্গের পাঁচগুণ একত্রে তাহার ৪২ গুণ এবং ৪০ এর সমষ্টির সমান হইবে?" অর্থাৎ বালককে প্রকারান্তরে অ৩+৫অ২−৪২অ−৪০=০ এই ঘন সমীকরণটি

সমাধান করিতে বলা হইল। এক মিনিটের মধ্যেই বালক বলিল "৫"। তয় প্রশ্ন। আটাশ কোটি চব্বিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার দুশো উনোপঞ্চাশের (২৮২৪৭৫২৪৯'র) দশম মূল কত? উত্তর—"৭" ইত্যাদি। কিরূপে উত্তর করিত জিজ্ঞাসা করিলে কিছুই বলিতে পারিত না। এই পর্য্যন্ত জানা যায় যে মস্তিষ্কের চালনা ব্যতীত কোন অজ্ঞাত উপায়ে তাহাদের মনোমধ্যে উত্তর উদিত হইত।

পূর্ব্বোক্ত বালকগণের মনে অজ্ঞাত উপায়ে যেমন উত্তর উদিত হইত, সেইরূপ কেহ কেহ "কালের" ও "ভারের" যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারেন। হিগ্‌টন (Higton) একদিন ভ্রমণ করিতেছিলেন। সময় কত তাঁহার জ্ঞান ছিল না। হঠাৎ তাঁহার মানস-চক্ষু সমীপে এক বৃহদাকার ঘড়ী উদিত হইল এবং ইহার বড় বড় কৃষ্ণবর্ণ কাঁটা দ্বারা দেখিলেন ঠিক ১১।২৫ মিনিট হইয়াছে। তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল ইহাই ঠিক সময় এবং নিজের ঘড়ী খুলিয়া দেখিলেন তাহাই প্রকৃত বটে। তাঁহার পিতার চর্ম্মের ব্যবসায় ছিল। চর্ম্মের বস্তাগুলি ওজন করিয়া হাটে পাঠাইতে হইত। অনেক সময় ওজন করিবার পূর্ব্বেই উহার ভার হিগ্‌টনের মনে স্বতঃই উদিত হইত। একদিন একটা বস্তা দেখিবা মাত্র তাঁহার মনে হইল (কে যেন বলিয়া দিল) ইহার ভার ৮৭¾ পৌণ্ড এবং পরে ওজন করিয়া দেখা গেল তাহাই যথার্থ বটে।

কলাবিদ্যা (arts) যথা কাব্য, সঙ্গীত-বিদ্যা, চিত্রবিদ্যা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য প্রভৃতিকে অবশ্য মায়ার্স প্রতিভার বিকাশ বলিয়াছেন। প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ প্রচ্ছন্ন জগতের যে সকল সৌন্দর্য্য দর্শন, শ্রবণ বা অনুভব করিয়া, ভাষা, স্বর বা তুলি, বাটালি প্রভৃতির সাহায্যে প্রকাশ করেন তাহাই প্রকৃত কলা (arts)। ঘসে মেজে যেমন রূপ হয় না, তেমনি খেটে খুটে কেহ কবি, চিত্রকর বা সঙ্গীতজ্ঞ হইতে পারেন না। (4) কবি Wordsworth এক স্থানে বলিয়াছেন "Some lovely image in the song rose up, full-

(4) "It is not from careful poring over the mutual relations of musical notes that the master-pieces of melody have been born. They have come, as they came to Mozart, in an uprush of unsummoned audition, of unpremeditated and self revealing joy". *Ibid*

formed, like venus rising from the sea." মায়ার্স বলেন ইহাই প্রকৃত artists দিগের লক্ষণ—বিনা চেষ্টায়, বিনা ক্লেশে, কোন এক অজ্ঞাত প্রদেশ হইতে সৌন্দর্য্য গুলি পূর্ণভাবে সজ্জিত হইয়া মানস-পটে উদিত হইবে।

জড়বাদী ও নাস্তিকদিগের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা বলেন "জীবন-সংগ্রামের ঘাত প্রতিঘাতেই জীবাণু ( protoplasm ) ক্রমোন্নত হইয়া মনুষ্যে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া থাকিবার জন্য যে সকল শক্তি ও গুণের প্রয়োজন তাহাই একমাত্র সার বস্তু। কবিত্ব, সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যা জীবন-সংগ্রামে কিছুই সহায়তা করেনা। অতএব ইহাদের কোন প্রয়োজন নাই। ইহারা bye-products মাত্র অর্থাৎ আবশ্যকীয় বস্তু প্রস্তুত করিবার সময় যেমন তৎসঙ্গে কতকগুলি অনাবশ্যকীয় বস্তুও স্বতঃই উৎপন্ন হয়, ইহারাও তদ্রূপ।" ইহার উত্তরে মায়ার্স বলেন, "কোন উড্ডয়নশীল প্রাণী মৃত্তিকার উপরে একটি ডিম্ব প্রসব করিয়া গেল। এ ডিম হইতে একটি কীট জন্মিল। কীটটি অন্যান্য কীটের ন্যায় মাটির উপর বুকে হাটিয়া বেড়াইতে লাগিল। ক্রমশঃ তাহার পিঠের উপর ছোট ছোট দুইখানি ডানা দেখা দিল। এখনও কিন্তু সে উড়িতে পারেনা, অন্যান্য কীটের ন্যায় বুকে হাটিয়া জীবন-সংগ্রাম করিতেছে। কীটগণ হয়ত ভাবিবে 'পিঠের উপর এই দুখানা আবার কি? জীবন-সংগ্রামে ইহাদের তো কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই, অতএব ইহারাই ঐ bye-products.'। কিন্তু ইহারাই এ কীটের গগন-বিহারের পূর্ব্ব সূচনা করিতেছে। ঠিক সেইরূপে এই পার্থিব জীবনে প্রয়োজনীয় না হইলেও কলাবিদ্যা ( arts ) কোন উচ্চতর জীবনের পূর্ব্বাভাস দিতেছে ইহা কি অসম্ভব? যাঁহারা পূর্ব্বে কখনও দাবা খেলা দেখেন নাই এবং সবে ইহার প্রথমাবস্থা দেখিতেছেন, তাঁহারা মনে করিতে পারেন বড়ে গুলি লইয়াই খেলা এবং পশ্চাতে যে গুলি অবস্থিত ( রাজা দাবা প্রভৃতি ) তাহাদের কোন চাল নাই, কেবল শোভা সম্পাদনার্থ রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু খেলা অগ্রসর হইলে দেখিতে পাইবেন তাহাদের দ্বারা কত গুরুতর কার্য্য সাধিত হয়। আমাদের জীবনেও সেইরূপ যে সকল শক্তি আপাততঃ নিষ্প্রয়োজনীয় বোধ হইতেছে কালে তাহাদের দ্বারাই সুগভীর ও উচ্চতর উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।"

মায়ার্স বলেন মনুষ্য মাত্রের এক একটি আত্মা আছে এবং সমগ্র জগতের এক বিরাট আত্মা আছে। জীবাত্মা জগদাত্মা হইতে জ্ঞান, শক্তি, সৌন্দর্য্য প্রভৃতি গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু জীবাত্মার জ্ঞান ও শক্তির পরিমাণ কি, জগদাত্মা হইতে কি পরিমাণে গ্রহণ করিতে পারে বা তাহার সীমা আছে কিনা আমরা জানিনা। ( 5 ) এই জীবাত্মার দুইটি অংশ—প্রকট এবং অপ্রকট ( Supraliminal and Subliminal )। এই প্রকটাংশ আমাদের জাগ্রৎ চৈতন্য এবং ক্ষুদ্র। অপ্রকট অংশটি বিশাল এবং ইহার শক্তি কতদূর আছে এবং কিরূপেই বা তাহার উৎপন্ন হইল আমরা জ্ঞাত নহি। (6) কিন্তু যাঁহারা বলেন মনুষ্যের যাবতীয় শক্তি জীবন সংগ্রামে টিকিয়া থাকিবার জন্য উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহাদের সহিত মায়ার্স একমত নহেন। তাঁহারা বলেন, "জীবের ইতিহাস হইতে দেখা যায় যে, যোগ্যতমেরা সর্ব্বদাই কোন না কোন নূতন শক্তি বা অভূতপূর্ব্ব কৌশলের দ্বারা নিকৃষ্টের উপর প্রাধান্য স্থাপন ও প্রতিযোগীর পরাজয় সাধন করিয়া থাকে। জীব ঘটনাক্রমে যে অবস্থায় পতিত হয় সেই অবস্থায় টিকিয়া থাকিবার জন্য সে প্রাণপণে চেষ্টা করে এবং সেই চেষ্টার ফলস্বরূপ তাহার এক নূতন শক্তি জন্মিয়া থাকে। অবশ্য এই শক্তির বীজ তাহার মধ্যে বরাবরই ( protoplasm অবস্থা হইতে ) ছিল, ( নচেৎ অভাব হইতে ভাব হইতেছে এই আপত্তি আসিতে পারে ), কিন্তু ঐ শক্তিটি জগতে নূতন জন্মিল, ইহা পূর্ব্বে ছিল না।" এতদুত্তরে মায়ার্স বলেন, "ইহা আদৌ নূতন নহে। ইহা জীবাত্মার প্রচ্ছন্নাংশে ছিল ; এখন প্রয়োজন হওয়াতে ইহা প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র। (7)"

---

( 5 ) "I assume in the man a soul which can draw strength and grace from a spiritual universe and conversely I assume in the universe a spirit accessible and responsive to the soul of man ...Still less can we predict or limit the possible variations of the soul the fulness which it may receive from the World-soul, its possible heritage of grace and truth." *Ibid*

( 6 ) "My view assumes a subliminal self with unknown faculties originated in some unknown way" *Ibid.*

(7) "I differ from those who hold that the faculty itself thus manifested is for the first time initiated in that stock by some chance combi-

আচ্ছা, এই শক্তিগুলি জীবাত্মার মধ্যে কি অবস্থায় আছে? যে অবস্থায় তাহারা প্রকাশ পাইতেছে ঠিক সেই অবস্থায় আছে কি? মায়ার্স বলেন, ঠিক তাহা নহে। ইহা জীবাত্মাতে খুব সাধারণ বিশাল ভাবে আছে, কিন্তু মস্তিষ্কের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইবার সময়, ইহা ক্ষুদ্র ও বিশেষভাব ধারণ করিতেছে, কারণ আমাদের শরীরের (উপাধির) পরমাণুগুলি ঐ অভ্যন্তরীণ শক্তির বিকাশের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে উপযোগী নহে। (৮) উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেন ডেস্ শুনিবামাত্র কঠিন কঠিন অঙ্ক কসিতে পারিতেন, এই শক্তি পুরুষানুক্রমে যে তাঁহার বংশে উৎপন্ন হইয়াছিল তাহা নহে। ইহা পূর্ব্বাপরই আত্মাতে আছে এবং কোন সময়ে তাঁহার শরীরের উপাদানগুলি ঐ শক্তির বিকাশের পক্ষে ঘটনাক্রমে উপযোগী হওয়ায়, উহা প্রকাশ পাইয়াছিল। (৯)

ত্রিকালজ্ঞ আর্য্য ঋষিগণ যোগবলে বিশ্বের যে সকল নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন; মায়াস, অধ্যাপক জেম্‌স্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এখনও তাহা ধরিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু কেবলমাত্র পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে তাঁহারা যে এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, ইহা তাঁহাদের পক্ষে অল্প শ্লাঘার বিষয় নহে। মায়ার্স সত্যের কত নিকটে আসিয়াছেন, পাঠক ভক্তিভাজন শ্রীমতী আনি বেসান্তের নিম্নোদ্ধৃত কয়েক পঙ্‌ক্তি পাঠে কতক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। 'আত্মাই একমাত্র সৎপদার্থ। ইহা ব্যতীত আর কিছুই নাই। ইনি স্বরূপতঃ নিষ্ক্রিয়। কিন্তু উপাধিযুক্ত হইলে ক্রিয়াবান্ হন্। উপাধিগুলির স্বাধীন সত্তা নাই, তাহারা আত্মা হইতেই সমুদ্ভূত (যেমন

---

nation of hereditary elements. I hold that it is not initiated, but only revealed, that the 'short has not called a new faculty into being, but has merely raised an existing faculty above the threshold of supraliminal consciousness.' Ibid

(8) "The specialised forms of terrene perception were not real novelties in the universe but imperfect adaptations of protoplasm to the manifestation of the in-dwelling general perceptive power" Ibid

(9) "The mathematical faculty, for instance, (we may, perhaps, say with Plato) pre-existed. When Dase solved all these sums in his head, his power of solving them was not a fresh development in his ancestral stock, but depended on the accidental adaptation of his organism to the manifestation of the in dwelling computative power" Ibid

সমুদ্র হইতে জল, পৃথিবী হইতে বৃক্ষলতা, মানব-দেহ হইতে কেশ লোম)। এক আত্মাই স্বকৃত নানা উপাধিতে নানারূপে ও নানা নামে বিরাজ করিতেছেন। উপাধির বিভিন্নতা হেতু আত্মা বিভিন্ন ভাব ধারণ করিয়াছেন বোধ হয়। উপাধি যত বিশুদ্ধ হয়, আত্মার শক্তি ও তত অধিক প্রকাশ পায়, যেমন স্বভাবতঃ শুভ্র ও নির্ম্মল সূর্য্যরশ্মি গোময়ে ও উজ্জ্বল দর্পণে পতিত হইয়া ভিন্ন বিধ প্রতিবিম্ব উৎপাদন করে, যেমন একই তড়িৎ-শক্তি উপাধিভেদে কখনো আলোকে, কখনো উত্তাপ এবং কখনো বা রাসায়নিক ক্রিয়া রূপে প্রকাশ পায়।" (10)

কলিকাতা,
৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৭। } শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী বি, এ,

---

# মানবের ইতিবৃত্ত।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

৯। মনুষ্য।

গুপ্ত-বিদ্যার সাধন মার্গে "মনুষ্য" শব্দ কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা দেখা কর্ত্তব্য। এই বিশ্বে যে প্রাণীতে সর্ব্বোন্নত আত্মা (পুরুষ) সর্ব্বাপকৃষ্ট ও অনুন্নত বস্তু (প্রকৃতি) বুদ্ধি যোগে একত্র সম্মিলিত হইয়া পরিণামে দৃশ্যমান সগুণ ব্রহ্মে (ঈশ্বরে) উপনীত হয়, তাহাকেই মানুষ বলা যায়। বর্ত্তমানে দুই হাত, দুই পা, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাদি বিশিষ্ট নির্দ্দিষ্ট আকৃতি-যুক্ত জীব বিশেষকে মানুষ বলা যায়। কিন্তু তাহারাই যে কেবল মনুষ্যপদবাচ্য হইবে,

---

(10) One Self—Atma, in Itself inactive, sheaths of Its substance in which It is going to act (The self and its sheaths, Page 20) In Its own nature changeless, unacting, in the sheaths It is the Actor, in the sheath that for the purpose It has brought out of Itself into manifestation. there is but one Reality, out of Itself by will all goes forth...in one sheath It is will, in another It is desire, in another It is living activity, in another It is chemical attraction and repulsion. the difference is in the sheaths and not in the one that is, etc (vide page 16 and 17).

এমন নহে। যে জীবে প্রকৃতি পুরুষের একত্র সম্মিলন হইয়া পরস্পর মধ্যে প্রাধান্য নিয়া ঘোর বিরোধ উপস্থিত হয়, পরে পুরুষের জয় হইয়া প্রকৃতির পরাজয় হয় তাহাকেই প্রকৃত পক্ষে মানুষ বলা যায়।

একটু পরিষ্কার করিয়া বলা যাউক। পূর্ব্বে কথিত মানবাত্মা বিশ্বকর্ম্মা শ্রেণির মধ্যে আমরা সাধারণতঃ মনুষ্য পদবাচ্য জীব অতি সামান্য। প্রত্যেক প্রাণীরই এই মনুষ্যাবস্থা অতীত হইয়াছে বা ভবিষ্যতে অতীত হইবে। যদি এই অবস্থা অতীত হইয়া থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে জীব পূর্ব্ব পূর্ব্ব জীবনে মানুষ ছিল, ক্রমশঃ উন্নত হইয়া তাহা অতিক্রম করিয়াছে। অপর পক্ষে, যদি এই অবস্থায় কোন জীব উপনীত না হইয়া থাকে বা অতিক্রম না করিয়া থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে ভবিষ্যতে একদিন নয় একদিন তাহাকে এই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইবে, এবং ক্রমোন্নতির নিয়মানুসারে কালে তাহা অতিক্রম করিতে হইবে। আমাদের এই পৃথিবীস্থ বর্ত্তমান মানব জাতি সম্বন্ধেই যে কেবল মাত্র এই "মনুষ্য" শব্দ প্রযোজ্য, তাহা নহে। প্রকৃত মনুষ্যে আত্মা ও বস্তুর, পুরুষ ও প্রকৃতির বিষম সমর। ধর্ম্মাত্মা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ন্যায় প্রত্যেক জীবকেই কুরুক্ষেত্র সমরে প্রবর্ত্ত হইতে হইবে, এবং তাহার ন্যায় স্বর্গলাভের উপযুক্ত ও স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ লাভ করার অধিকারী হওয়ার পূর্ব্বে প্রত্যেকেরই শত্রু সৈন্যরূপ কাম ক্রোধাদি ষড় রিপুকে সম্পূর্ণ রূপে দমন ও নির্ম্মূল করিয়া পরিণামে সমর বিজয়ী হইতে হইবে। এই হইল প্রকৃত মানুষ।

---

## ১০। জীব ও ঈশ্বর।

### ( ক ) "জীব"। Monad. )

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥ গীতা।

জীব ঈশ্বরের অংশ। ঈশ্বর অর্থাৎ ব্রহ্ম বহ্নি স্বরূপ, জীব তাহার স্ফুলিঙ্গ বা কণা। অংশাংশিনির্ভেদস্মাৎ ব্রহ্মবহ্নি স্ফুলিঙ্গবৎ। এই স্ফুলিঙ্গ সমূহ ঈশ্বরে সংশ্লিষ্ট হইয়া আছে।

## ( খ ) ঈশ্বর।

ঈশ্বর কাহাকে বলে ?

ক্লেশ কর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্ট পুরুষ বিশেষ ঈশ্বরঃ।
স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনাবচ্ছেদাৎ প্রণবস্তস্তবাচকঃ॥ পাতঞ্জল যোগশাস্ত্র।

ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক এবং আশয় কর্ত্তৃক যিনি পরামৃষ্ট ( লিপ্ত ) হন না এরূপ পুরুষ বিশেষের নাম ঈশ্বর। তিনি জগতের আদি গুরু, কাল কর্ত্তৃক তাঁহার অবচ্ছেদ হয় না। প্রণব ( ওঁ ) তাঁহার বাচক।

ঈশ্বর প্রথম পুরুষ। একোঽহম্ বহুস্যাম। আমি এক আছি, বহু হইব। এই যে ঈশ্বরের বহু হইবার ইচ্ছা, সেই ইচ্ছা দ্বারা স্ফুলিঙ্গ গুলি পরিচালিত হইয়া নীচে নামিয়া আসিয়া প্রকৃতির রাজ্যে প্রবেশ করে, করিয়া দ্বিতীয় পুরুষে অবস্থিতি করে। কিরূপে অবস্থান করে ? এই দ্বিতীয় পুরুষ পিতা স্বরূপ, এবং এই জীব সমূহ পুত্রবৎ তাহার ক্রোড়ে অবস্থান করে। তৃতীয় পুরুষে অবতরণ করিয়া এই অসংখ্য জীব সমূহ তাহাদের পৃথক সত্বা লাভও অনুভব করে। প্রকৃতি রাজ্যে আসিয়া তাহারা তাহাদের পরম পিতা হইতে পৃথক এবং পরস্পর হইতে বিভিন্ন হইয়া পড়ে। তাহারা যে স্রোতে প্রবেশ করে, তাহা পূর্ব্বে তিনভাগে বিভক্ত হয়, পরে তিন হইতে সাত ভাগে বিভক্ত হইয়া প্রত্যেকে এক একটী গ্রহরাজে গিয়া মিশে, এবং যে গ্রহদেবের যে বর্ণ, তাহারা ও সেই সেই বর্ণে অনুরঞ্জিত হয়। তৎপর এই সপ্ত বর্ণের একত্র সমাবেশে এক অতি অপূর্ব্ব ও অতি মনোহর জ্যোতিঃ প্রতিভাত হয়। ইহাই সমতানলয় বিশিষ্ট সৌর রাসলীলার অপূর্ব্ব নৃত্য। এই গুহ্যাতিগুহ্য ভাবের পরিস্ফুটন ও প্রচার করার জন্যই বাহ্য জগতে বৃন্দাবনের যমুনা-পুলিনে শারদ্বৎফুল্লমল্লিকাযুক্ত রাকি পূর্ণিমায় গোপীগণ সহ শ্রীকৃষ্ণের মধুর রাসলীলার অভিনয়। প্রত্যেক গ্রহ দেবের স্ব স্ব বর্ণ পৃথক পৃথক ভাবে উদ্ভাসিত হয়; পরে এই বর্ণ সমূহ একে অন্যে পরস্পর প্রতিফলিত ও অনুরঞ্জিত হইয়া অত্যাশ্চর্য্য ও অতি কমনীয় দৃশ্যের অবতারণা করে। তাই বলা হয়, প্রত্যেক মানুষ, এক একটী গ্রহের অধীনে জন্মগ্রহণ করে। যেহেতু এক একটী গ্রহ-মণ্ডলের প্রত্যেক গ্রহে সপ্ত শ্রেণীর জীব আবির্ভূত হয় এবং তাহারা প্রত্যেকে তাহাদের জন্ম নক্ষত্রের বর্ণে অনুরঞ্জিত হয় ও সেই বর্ণই

লাভ করে। তখনও জীবের মন বহির্মুখী না হওয়াতে জীব তাহার সুদীর্ঘ পরিভ্রমণ ব্যাপার আরম্ভ করে নাই। ঈশ্বরের যে শক্তিত্রয় জীবে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহারা পরস্পর মধ্যে মাত্র ক্রিয়াশীল, এই ক্রিয়া তখনও বাহিরে প্রকাশ পায় নাই। বিশ্বকর্ম্মাদেবগণের সাহায্যে তাহারা অধোগামী হইতে আরম্ভ করিল। প্রথম শ্রেণীর দেবগণ হইতে ইচ্ছা বা আত্মশক্তির বিকাশ হইল। দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে জ্ঞান বা বোধ শক্তির অবতারণা হইল। তৃতীয় শ্রেণী হইতে ক্রিয়া মানস শক্তির আবির্ভাব হইল। এইরূপে জীবে এই তিন শক্তির স্ফুরণ হওয়াতে তাহারা অধোগামী হওয়ার উপযুক্ত হইল।

তৎপর যাহারা মানুষরূপে পরিণত হইবে, সেই অসংখ্য জীব সমূহ বাসো-পযোগী এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে অসংখ্য বৎসর কাল ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিল। তাহারাই চতুর্থ শ্রেণীর বিশ্বকর্ম্মা দেবগণ। তাহারা এখন সুদীর্ঘ পরিভ্রমণ ব্যাপারের জন্য প্রস্তুত। এই পরিভ্রমণ ব্যাপারটী কি? জীবাত্মা তাহার শুদ্ধ সত্ত্ব দেবত্ব পরিত্যাগ করিয়া অধোগামী হয় পরে প্রকৃতিতে প্রবেশ করিয়া গুণযুক্ত হয়, শেষে তমোগুণের পরাকাষ্ঠা স্থাবরে পরিণত হয়। তাহা হইতে পরে ক্রমশ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়, স্থাবর হইতে উদ্ভিদে, উদ্ভিদ হইতে প্রাণী জগতে, পরে তাহা হইতে মানব-জাতিতে পরিণত হয়। তৎপর সংস্কার আহরণ করিতে করিতে উন্নতি মার্গে অগ্রসর হইয়া পুনরায় সেই দেবত্ব লাভ করে। ইহাই চিরযাত্রীর সুদীর্ঘ পরিভ্রমণ ব্যাপার। এই রহস্যের সংসামান্য একটী অংশ অবলম্বনে বিলাতি গ্রন্থকার জন বুনিয়ান (John Bunyan) "চিরযাত্রীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত" (Pilgrim's Progress) নামক তাহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই চতুর্থ শ্রেণীর বিশ্বকর্ম্মাগণ যাহারা মনুষ্যরূপে পরিণত হন, তাহারা প্রকৃত পক্ষে প্রত্যেকে এক এক জন ধ্যান চোহান—মহাযোগী, মহাজ্ঞানী দেবতা। কিন্তু তাহারা এত উচ্চ এবং তাহাদের মহত্ব এতই অধিক যে পঞ্চভৌতিক পার্থিব জগতে প্রবেশ করার পক্ষে তাহারা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

### (গ) আত্মা-বুদ্ধি-মনঃ।

নবাবিষ্কৃত ঈথারই আমাদের স্থূলাকাশ। ইহা সূর্য্যমণ্ডলকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে। ঠিক সেইরূপ আত্মা, বুদ্ধি এবং মানস রাজ্যের মৌলিক

পদার্থ জীবকে বেষ্টন করিয়া আছে। সৌর মণ্ডলের প্রকাণ্ড প্রকম্পনে সেই আকাশ বা ব্যোম নামক মহাভূত রশ্মিরূপ অনুকম্পনে পরিণত হয়। সেইরূপ জীবের প্রকম্পনে তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ কথিত মৌলিক পদার্থ সমূহ অনুকম্পন ( Vibrations ) রূপে পরিণত হয়। এই অনুকম্পন গুলিও ভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট হইয়া প্রত্যেকে এক একটীর রশ্মিরূপে পরিণত হয়। এ সম্বন্ধে অসুরগণ এবং অগ্নিষাত্ত পিতৃগণ হইতে ও জীব সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যেহেতু এই উভয় শ্রেণী পূর্ব্বে এই অবস্থা অতিক্রম করিয়া তৎসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। অসুরগণ এই প্রকম্পন তরঙ্গকে ইচ্ছা শক্তির অবস্থা হইতে আত্মার মৌলিক অনুরূপে পরিণত করেন। আত্মতত্ত্বের সেই মৌলিক অনু, ইচ্ছাশক্তির বলে অনুকম্পিত হওয়ায় তাহা আত্মা নামে অভিহিত। অগ্নিষাত্ত পিতৃগণ উক্ত প্রকম্পন তরঙ্গকে জ্ঞান শক্তির অবস্থা হইতে বুদ্ধির মৌলিক অনুরূপে পরিণত করেন। বুদ্ধি তত্ত্বের সেই মৌলিক অনু জ্ঞান শক্তি বলে অনুকম্পিত হওয়াকেই বুদ্ধি কহে। তাহারা কথিত প্রকম্পনের তরঙ্গকে ক্রিয়া শক্তির অবস্থা হইতে মানসরাজ্যের মৌলিক অনুরূপে পরিণত করেন। সেই মানসরাজ্যের মৌলিক অণু, ক্রিয়াশক্তি বলে অনুকম্পিত হওয়ায় তাহা মনঃ নামে অভিহিত।

এইরূপে আত্মা, বুদ্ধি, মনঃ এই পরিদৃশ্যমান জগতে আবির্ভূত হইল। এই তিনের সমষ্টিকেই জীব ( Monad ) কহে। পঞ্চকোষময় স্থূল জগতের বাহিরে বা উর্দ্ধে যে প্রকৃত জীব স্বীয় স্বরূপে অবস্থিত আছেন, এই শক্তিত্রয় বিশিষ্ট জীব তাহারই একটী রশ্মিমাত্র। আত্মা দ্রষ্টা, অক্রিয়, সাক্ষী স্বরূপ। তিনি ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া, এই শক্তিত্রয় সম্পন্ন হইয়া স্বীয় অপ্রাকৃত নিত্যধামে বিরাজমান আছেন। নশ্বর দেহধারী জীবগণের হৃদয়ে তিনি তাহার এক একটি রশ্মিকণা প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে সজীব ও সচেতন রাখিয়াছেন। এই জগতে জীবের পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ কার্য্যগুলি আত্মার ছায়ার ন্যায়। অতি প্রাচীন শাস্ত্রে আছে ঃ—'বহ্নি তাহার স্ফুলিঙ্গকে বলিলেন, "তুমি আমারই স্বরূপ, আমারই প্রতিবিম্ব এবং তুমি আমারই ছায়া। আমি তোমা দ্বারা আমার নিজকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছি। তুমি আমার উপাধি, তুমি আমার বাহন। পরিণামে তুমি আমার সামিপ্য লাভ করিয়া আমার সঙ্গে

মিশিয়া এক হইবে। তখন তোমাতে আমাতে আর কোন প্রভেদ থাকিবে না"। এখানে বহ্নিই আত্মা; তিনি দ্রষ্টা, সাক্ষী স্বরূপ, তিনি আমাদের পরম পিতা পরমেশ্বর। স্ফুলিঙ্গই রশ্মি, এই রশ্মিই জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখ ভোগী জীব। জীব পরম পিতা পরমেশ্বরের প্রতিকৃতি, আত্মবৈজায়তে পুত্রঃ। জীবের এক এক জন্মকেই এখানে এক একটী ছায়া বলা হইয়াছে। এইরূপ জীবের অসংখ্য জন্ম, অসংখ্য মালা স্বরূপ। স্বয়ং জীব উক্ত মালা সমূহের সূত্র স্বরূপ। এই সূত্রের দেহের নাম কারণ শরীর। ক্রমশঃ

যুগল সেবক

---

# রূপসনাতন ও জীবগোস্বামী।

## শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রভুর সহিত মিলন।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

শ্রীরূপ গোস্বামী সনাতন গোস্বামীর কারাবাস বিদিত ছিলেন, কারা-মুক্তির বিষয় বিদিত হইতে পারেন নাই। তিনি কনিষ্ঠ বল্লভের সহিত অবিশ্রান্ত চলিয়া প্রয়াগে উপনীত হইলেন। তিনি প্রয়াগে আসিয়াই দেখিলেন, প্রভু ত্রিবেণীতে স্নান করিয়া মাধব দর্শনে গমন করিতেছেন। শতশত লোক তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া চলিতেছে। প্রভু শ্রীমাধবকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন। প্রণাম করিয়াই প্রভুর প্রেমসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। তিনি প্রেমাবেশে বিহ্বল হইয়া নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। সহস্র সহস্র লোক আসিয়া প্রভুর কীর্ত্তনে যোগদান করিতে লাগিল। প্রয়াগ ক্ষেত্র প্রভুর প্রেমোচ্ছাসে কাঁপিতে লাগিল। গঙ্গা ও যমুনা মিলিত হইয়াও প্রয়াগকে ডুবাইতে পারেন নাই, প্রভুর প্রেমের বন্যায় উহাকে প্লাবিত করিতে লাগিলেন। রূপগোস্বামী লোকের ভিড় ঠেলিয়া প্রভুর শ্রীচরণ দর্শনে সমর্থ হইলেন না, নর্ত্তন কীর্ত্তনের বিরাম প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই কীর্ত্তন কোলাহল মন্দীভূত হইল। এক দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ আসিয়া প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ গৃহে লইয়া গেলেন। প্রভু ঐ ব্রাহ্মণের

গৃহে যাইয়া একটী নির্জ্জন স্থানে উপবেশন করিলেন। রূপগোস্বামী ঐ ব্রাহ্মণের বাসস্থান জানিয়া লইয়া স্নানানন্তর কনিষ্ঠ বল্লভের সহিত অতি দীন হীন অকিঞ্চণের বেশে দন্তে তৃণগুচ্ছ ধারণ পূর্ব্বক প্রভুর চরণ সমীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দূর হইতেই প্রভুর অপরূপ রূপমাধুরী দর্শন করিয়া প্রেমে পুলকিত হইয়া দণ্ডবৎ ভূমিতলে পতিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রভুর চিত্ত প্রসন্ন হইল। প্রভু বলিলেন, "রূপ উঠ উঠ, শ্রীকৃষ্ণের করুণার কথা কিছুই বলা যায় না, তোমাদিগের দুই জনকে বিষম বিষম কূপ হইতে উদ্ধার করিলেন।" এই কথা বলিয়া প্রভু ভ্রাতৃদ্বয়ের মস্তকে চরণ দিলেন এবং তাঁহাদিগকে আপনার নিকটে বসাইয়া সনাতন গোস্বামীর সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন। রূপগোস্বামী বলিলেন, "তিনি কারাগারে বন্দী, আপনি উদ্ধার করিলেই তাঁহার উদ্ধার হইতে পাবে।" প্রভু বলিলেন, "সনাতনের বন্ধন মোচন হইয়াছে, সত্বরই তাঁহার আমার সহিত মিলন হইবে।" এই কথা বার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ আসিয়া রূপ ও বল্লভকে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রভুকে ভিক্ষা করাইলেন। রূপ ও বল্লভ প্রভুর ভোজনাবশেষ পাইয়া কৃতার্থ হইলেন। প্রভুর বাসস্থান ত্রিবেণী সঙ্গমের উপরিভাগেই। রূপগোস্বামী যাইয়া প্রভুর বাসার নিকট বাসা করিলেন। প্রভুর সহিত কৃষ্ণ কথাতেই তাঁহাদিগের পরমানন্দে কাল যাপন হইতে লাগিল।

প্রয়াগের অদূরে যমুনার পর পারে আম্বুলী নামে একটী গ্রাম আছে। ঐ গ্রামে বল্লভ ভট্ট নামক এক বৈষ্ণব পণ্ডিত বাস করিতেন। একদিন ঐ বল্লভ ভট্ট আসিয়া প্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণতি করিলেন। প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বসাইলেন। প্রভুর ভট্টের সহিত কিছুক্ষণ কৃষ্ণ কথার আলোচনা হইল। কৃষ্ণ কথার আলোচনা করিতে করিতে প্রভুর প্রেম উথলিয়া উঠিল। ভট্ট থাকায় প্রভু কিন্তু কিছু সঙ্কুচিত হইলেন। অন্তরের প্রেম অন্তরেই রহিল, বাহিরে প্রকাশ হইল না। প্রকাশ না হইলেও বল্লভ ভট্ট প্রভুর অদ্ভুত প্রেমাবেশ বুঝিয়া তাঁহাকে ভিক্ষার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রভু রূপ ও বল্লভকে লইয়া ভট্টের সহিত মিলন করাইলেন। রূপ ও বল্লভ দূর হইতেই ভট্টকে প্রণাম করিলেন। ভট্টের ইচ্ছা, দুই ভাইকে আলিঙ্গন করেন, কিন্তু তাঁহারা

"আমরা অস্পৃশ্য পামর" বলিতে বলিতে আরও দূরে পলায়ন করিলেন। তদ্দর্শনে ভট্টের বিস্ময় ও প্রভুর আনন্দ হইল। প্রভু ভট্টকে বলিলেন, "আপনি একজন প্রবীন কুলীন এবং বেদজ্ঞ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ, ইহাঁদিগকে স্পর্শ করিবেন না, ইহাঁরা হীন জাতি"। বল্লভ ভট্ট প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিয়া বলিলেন, "ইহাঁদিগের দুইজনের মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম শ্রবণ করিতেছি, ইহাঁরা কখনই অধম হইতে পারেন না পরন্তু সর্ব্বোত্তম।" প্রভু শুনিয়া ভট্টকে যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন, এবং শাস্ত্র বচন পাঠ সহকারে কৃষ্ণ ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। বল্লভ ভট্ট প্রভুর অদ্ভুত রূপমাধুর্য্য ও অলৌকিক ভাবাবেশ সকল দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন। পরে তিনি প্রভুর সঙ্গিদ্বয় এবং রূপ ও বল্লভের সহিত প্রভুকে নিজ গৃহে লইয়া যাইবার নিমিত্ত নৌকায় উঠাইলেন। প্রভু নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক কালিন্দীর কৃষ্ণ সলিল সন্দর্শনে প্রেমাবিষ্ট হইয়া হুঙ্কার সহকারে জলে ঝাঁপ দিলেন। প্রভুর সঙ্গিদ্বয় শশব্যস্ত হইয়া প্রভুকে ধরিয়া আবার নৌকায় উঠাইলেন। প্রভু নৌকায় উঠিয়া নাচিতে লাগিলেন। তাঁহার পদভরে নৌকা টলমল করিতে লাগিল। দুই এক ঝলক জল ও নৌকায় উঠিল। নাবিকেরা কোন মতে নৌকা লইয়া পর পারে লাগাইল। প্রভু দেশকাল বুঝিয়া কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধারণ করিলেন। বল্লভ ভট্ট প্রভুকে বাটীতে লইয়া গিয়া প্রথমতঃ পাদপ্রক্ষালন করাইলেন। পরে ঐ পাদোদক সবংশে গ্রহণ করিয়া প্রভুকে নূতন কৌপীন ও বহির্বাস পরাইয়া গন্ধাদিদ্বারা অর্চনা করিলেন। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য পাক করিতে লাগিলেন। পাক সমাধা হইলে, বল্লভ ভট্ট প্রভুকে লইয়া ভিক্ষা করাইলেন। রূপ ও বল্লভ প্রভুর অবশেষ পাইলেন। প্রভু ভোজনান্তে আচমন পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। বল্লভভট্ট স্বয়ং প্রভুর পাদ সম্বাহন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে রঘুপতি উপাধ্যায় নামক একজন ত্রিহুতীয় পণ্ডিত আগমন করিলেন। তিনি আসিয়া প্রভুর চরণ বন্দনা করিলেন। প্রভু তাঁহাকে "কৃষ্ণে মতিরস্তু" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। আশীর্ব্বাদ শুনিয়া পণ্ডিত সন্তোষ লাভ করিলেন। পরে উপাধ্যায় উপবেশন করিলে, প্রভু তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক শ্লোক পাঠ করিতে বলিলেন। উপাধ্যায় নিজকৃত নিম্ন লিখিত শ্লোকটী পাঠ করিলেন।

"শ্রুতিমপরে স্মৃতিমপরে ভারত মন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহনন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম ॥"

সংসার ভয়ে ভীত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ শ্রুতি কেহ স্মৃতি এবং কেহ ভারতের সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের যিনি যাহা করেন করুণ, আমি কিন্তু যাঁহার আসনে পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করেন, সেই গোপরাজ নন্দকেই বন্দনা করি।

প্রভু বলিলেন "আরও কিছু পাঠ করুণ" উপাধ্যায় পাঠ করিলেন,—

"কংপ্রতি কথায়িতুমীশে সম্প্রতি কোবা প্রতীতিমায়াতু
গোপতি তনয়াকুঞ্জে গোপ বধুটী বিটং ব্রহ্ম ॥"

আমি একথা কাহার নিকট বলিব এবং বলিলেই বা সম্প্রতি কে বিশ্বাস করিবে যে, যমুনাতীর কুঞ্জে যিনি গোপীগণের সহিত রমণ করেন, তিনিই পরব্রহ্ম? উপাধ্যায়ের শ্লোক শুনিয়া প্রভু বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। উপাধ্যায় প্রভুর অদ্ভুত ভাবাবেশ দর্শন করিয়া তাঁহাকে নিজ প্রভু বলিয়াই অবধারণ করিলেন। অনন্তর,—

প্রভু কহে, "উপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠমান কায়?"
"শ্যামমেব পরং রূপং' কহে উপাধ্যায় ॥
"শ্যাম রূপের বাসস্থান শ্রেষ্ঠমান কায়?"
"পুরী মধুপুরী বরা" কহে উপাধ্যায় ॥
"বাল্য পৌগণ্ড কৈশর শ্রেষ্ঠমান কায়?"
"বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং' কহে উপাধ্যায় ॥
"রসগণ মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠমান কায়?"
"আদ্য এব পরোরসঃ" কহে উপাধ্যায় ॥

প্রভু আনন্দ সহকারে বলিলেন, "উপাধ্যায় আমাকে ভাল তত্ত্ব শিখাইলেন।" এই বলিয়া প্রেমাবেশে উপাধ্যায়কে আলিঙ্গন করিলেন। উপাধ্যায় প্রভুর স্পর্শে প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। বল্লভভট্ট দেখিয়া সবিস্ময়ে নিজের পুত্র দুইটিকে আনিয়া প্রভুর চরণে সমর্পণ করিলেন। প্রভুও তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিলেন। ক্রমে লোকের সংঘট্ট হইতে লাগিল। অনেকেই প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

বল্লভভট্ট ভাবিলেন, প্রভু আসিবার সময় প্রেমে উন্মত্ত হইয়া জলে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, আবার কখন কি করিবেন, অতএব আমি ইঁহাকে যে স্থান হইতে আনিয়াছি, সেই স্থানেই বাখিয়া আসিব। অতঃপর যাঁহার ইহাকে নিমন্ত্রণ করিতে ইচ্ছা হইবে, তিনি প্রয়াগে যাইয়া লইয়া আসিবেন। এই প্রকার বিবেচনা করিয়া তিনি নিমন্ত্রণ কারীদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়া প্রভুকে লইয়া প্রয়াগে বাখিয়া আসিলেন। প্রভু ত্রিবেণীতে প্রভূত লোক সমাগম হইতেছে দেখিয়া দশাশ্বমেধের ঘাটে যাইয়া বাসা করিলেন। তিনি ঐ দশাশ্বমেধের ঘাটে থাকিয়াই রূপগোস্বামীর প্রার্থনানুসারে তাঁহাকে শিক্ষা প্রদান ও শক্তি সঞ্চার করিলেন।

## শ্রীরূপ শিক্ষা।

প্রভু বলিলেন,—"রূপ তোমাকে সংক্ষেপে ভক্তি রসের লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। ভক্তিরসসিন্ধু অপার ও গভীর। তোমাকে উহার এক বিন্দু বলিতেছি। এই ব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য জীবের নিবাস ভূমি। প্রত্যেক জীবই চতুরশীতি লক্ষ যোনিতে পরিভ্রমণ করিতেছে। ঐ জীবের স্বরূপ কেশাগ্রের শত শত ভাগের একভাগ যেরূপ সূক্ষ্ম তদপেক্ষা সূক্ষ্ম। ঈশ্বর বিভূচিৎ, জীব অণুচিৎ। জীব অণু না হইয়া বিভু হইলে, নিয়ম্যনিয়ন্তৃভাব থাকে না। ঈশ্বর কারণ, জীব কার্য্য। কারণ যেরূপ কার্য্যের নিয়ন্তা হয়, ঈশ্বর ও সেই রূপ জীবের নিয়ন্তা, অর্থাৎ প্রবর্ত্তক। জীবকে কার্য্য বলা হইলেও, জীবের স্বরূপতঃ উৎপত্তি নাই, জীব অনাদি ঈশ্বর শক্তি। বায়ুর সহযোগে জল হইতে বুদ্বুদের ন্যায়, পুরুষের সহযোগে প্রকৃতি হইতে জীবের প্রাণাদি উপাধি সকল উৎপন্ন হয় এবং পুনশ্চ প্রলয়ে সমুদ্রে নদী সকলের ন্যায় বা মধুর রসে অপর সকল রসের ন্যায় পুরুষেই লীন হইয়া থাকে। নাম ও রূপের সহিত উপাধির উৎপত্তিতেই জীবের উৎপত্তি এবং উপাধির লয়েই জীবের লয় জানিতে হইবে। উপাধিতে অভিমান ও অভিনিবেশ বশতই উপাধির উৎপত্তিতে জীবের এবং উপাধির নাশেই জীবের নাশ স্বীকৃত হয়। এইরূপে উৎপন্ন জীব সকল স্থাবর ও জঙ্গম ভেদে দ্বিবিধ। জঙ্গম আবার খেচর জলচর ও ভূচর ভেদে ত্রিবিধ। ভূচরের মধ্যে মনুষ্যের ভাগ অতিশয় অল্প। ঐ

অল্প মনুষ্যের মধ্যে বৌদ্ধ ও ম্লেচ্ছাদিই অনেক, বেদনিষ্ঠের ভাগ অল্প। বেদনিষ্ঠের মধ্যে আবার মৌখিক বেদনিষ্ঠই অধিক। প্রকৃত বেদনিষ্ঠের মধ্যে আবার কর্ম্ম নিষ্ঠের ভাগই অধিক, জ্ঞাননিষ্ঠের ভাগ অল্পই। কোটি কোটি জ্ঞানীর মধ্যে একজন মুক্ত পাওয়া যায়। কোটি মুক্তের মধ্যে প্রকৃত কৃষ্ণভক্ত দুর্ল ভ। প্রকৃত কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত। ভুক্তি মুক্তি-সিদ্ধি কামী লোক সকল অশান্ত। কৃষ্ণভক্তের সংসার ভয় থাকে না। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে একমাত্র ত্রাতা জানিয়া তাঁহাতে ভক্তি করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তপালক, অভক্তকে রক্ষা করেন না, এই নিমিত্তই অভক্তের সংসার ভয় উৎপন্ন হয়। শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত ভক্তের কোন ভয়ই উৎপন্ন হয় না।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে করিতে যে ভাগ্যবান জীবের শ্রীগুরু লাভ হয়, তিনিই তৎপ্রসাদে ভক্তিলতার বীজ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ঐ বীজ রোপণ পূর্ব্বক শ্রবণ কীর্ত্তনাদিরূপ জল সেচন করিলে, উহা অঙ্কুরিত ও দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া সত্যলোক ও বিরজা পার হইয়া পর-ব্যোম পর্য্যন্ত উত্থিত হয়। পর-ব্যোমের পর গোলক-বৃন্দাবন। ঐ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ চরণ-রূপ কল্পবৃক্ষ অবস্থিত। ভক্তিরূপালতা যাইয়া উক্ত শ্রীকৃষ্ণচরণ-রূপ কল্পবৃক্ষকে আশ্রয় করে। তদনন্তর শাখাপল্লবাদি বিস্তার পূর্ব্বক প্রেমরূপ ফল প্রসব করিতে থাকে। মালী এই সংসারে থাকিয়াই লতার মূলে যতই শ্রবণ কীর্ত্তনাদিরূপ জল সেচন করিতে থাকেন, লতাও ততই বাড়িতে থাকে। মালীর একটী প্রধান কর্ত্তব্য এই যে, যত্ন সহকারে লতাকে আবরণ করিয়া রাখা। অন্যথা বৈষ্ণবাপরাধরূপ মত্তহস্তী উত্থিত হইয়া লতার মূলো-চ্ছেদ করিলে লতার শুকাইয়া যাইবার সম্ভাবনা। বৈষ্ণবেরা সংসারকে চিদা-নন্দময় বোধ না করিলেও, কল্পনাময় বোধ করেন না, অতএব তিনি সংসারে বস্তুতঃ আসক্ত না হইলেও, বাহ্যতঃ আসক্তের ন্যায় থাকায়, তদ্দর্শনে তাঁহাদিগের প্রতি দোষদৃষ্টি হইলেই বৈষ্ণবাপরাধ ঘটে। এই অপরাধ যাহাতে না ঘটে, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকাই উচিত। আবার বৈষ্ণবাপরাধের ন্যায় ভোগ বাঞ্ছাদি উপশাখার প্রতি ও দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। সংসারকে সত্য মনে করিয়া ভোগবাঞ্ছা বা মিথ্যা মনে করিয়া মোক্ষ বাঞ্ছা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ভোগবাঞ্ছা, মোক্ষবাঞ্ছা, জীবহিংসা, নিষিদ্ধাচার, লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি

উপশাখা সকল বৰ্দ্ধিত হইতে থাকিলে, মূল শাখার বৃদ্ধি স্থগিত হইয়া যায়। উপশাখা উৎপন্ন হইতে না দেওয়াই উচিত। যদি অনবধানতা বশতঃ কখন কোন উপশাখা জন্মে, তবে তখনই তাহাকে ছেদন করিয়া ফেলা কৰ্ত্তব্য। উপশাখা ছেদন করিয়া দিলে, মূলশাখা বৰ্দ্ধিত হইয়া কল্পবৃক্ষকে আশ্রয় করে। ভক্তিলতা কল্প বৃক্ষকে আশ্রয় করিলে, মালী তদবলম্বনে অনায়াসেই কল্পতরুতে আরোহণ পূৰ্ব্বক সুপক্ক প্রেমফল পাড়িয়া আস্বাদন করিতে পারেন। একবার কল্পবৃক্ষ লাভ হইলে, ঐ কল্পবৃক্ষের সাক্ষাৎ সেবন ভিন্ন মালীর আর কোন কৰ্ত্তব্য থাকে না। কল্পবৃক্ষের সেবা দ্বারা প্রেম ফলের আস্বাদন হইয়া থাকে। প্রেমই পরম পুরুষার্থ। ধৰ্ম্মাদি অপর পুরুষার্থ সকল প্রেমের তুলনায় অতি তুচ্ছ।

"ঋদ্ধা সিদ্ধিব্রজ বিজয়িতা সত্যধৰ্ম্মা সমাধিব্রহ্মানন্দো গুরুরপি চমৎকারয়েত্যব তাবৎ। যাবৎ প্রেম্ণাং মধুরিপুবশীকারসিদ্ধৌষধীনাং গন্ধোঽপ্যন্তঃ-করণ সরণী পান্থতাং ন প্রয়াতি।" যে পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ বশী করণের সিদ্ধৌষধ রূপ শাস্ত্রাদি যে কোন প্রেমের লেশ ও অন্তঃকরণ পথের পথিক না হয়, সেই পর্য্যন্তই সিদ্ধি সমূহের সম্পূর্ণা বিজয়িতা এবং সত্যধৰ্ম্মরূপ সাধন সমন্বিতা সমাধি ও তৎফলভূত গুরুতর ব্রহ্মানন্দ চিত্তের চমৎকারিতা সম্পাদন করিয়া থাকে।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

---

# বিচার সাগর।

(২য় সংখ্যার ৭৯ পৃষ্ঠার পর হইতে)

ঐ মত ও অজ্ঞানরূপ আনন্দময় কোশ প্রতিপাদন করে। কারণ, অজ্ঞান রূপত্রয়ে প্রতীত হয়। অদ্বৈত শাস্ত্রে জগৎরূপ পরিণাম প্রাপ্ত অজ্ঞান সংস্কার-রহিত মূর্খেরই সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। অদ্বৈত শাস্ত্রে বিচক্ষণ যুক্তিনিপুণ পণ্ডিতগণ অজ্ঞান ও তৎকাৰ্য্য জগৎকে সদসৎ হইতে বিলক্ষণ অনির্ব্বচনীয় বলিয়া জানেন। জ্ঞান নিষ্ঠাপ্রাপ্ত জীবন্মুক্ত পুরুষের সম্মুখে কার্য্য সহিত

অজ্ঞান তুচ্ছরূপে ভাসমান হয়। তুচ্ছ, অসৎ ও শূন্য শব্দ একই অর্থবোধক। এই রীতিতে তুচ্ছরূপে জীবন্মুক্ত পুরুষের প্রতীত অজ্ঞান বিষয়ে মুগ্ধ শূন্যবাদী পরম পুরুষার্থ না জানিয়া তুচ্ছ আনন্দময় কোশকেই আত্মা কহে।

আনন্দময় কোশআত্মা—প্রভাকর ও নৈয়ায়িক মত :—

পূর্ব্ব মীমাংসার একদেশী প্রভাকর ও নৈয়ায়িক মতে—আত্মা শূন্যরূপ নহে। যিনি আত্মা শূন্যরূপ কহেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাস্য এই যে তিনি শূন্যরূপ অনুভব করিয়াছেন কিনা? যদি উত্তর দেন যে "শূন্যরূপ অনুভব করি নাই," তবে সিদ্ধ হইল যে শূন্য নাই। যদি কহেন যে "শূন্য অনুভব করিয়াছি" তবে যিনি শূন্য অনুভব করিয়াছেন, সেই আত্মা শূন্য হইতে বিলক্ষণ ইহা সিদ্ধ হইল। এই রীতিতে আত্মা শূন্য হইতে বিলক্ষণ। এই আত্মা বিষয়ে মনসংযোগে জ্ঞান হয়। সেই জ্ঞান গুণ বলিয়া আত্মাকে চৈতন্য কহে। আত্মা স্বরূপতঃ জড়। সেইরূপ আত্মাবিষয়ে সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন ধর্ম্ম, অধর্ম্ম আদিগুণ বিদ্যমান। এই মতে আনন্দময় কোশই আত্মা; এবং বিজ্ঞানময় কোশস্থ বুদ্ধি আত্মার জ্ঞানগুণ মাত্র। কারণ আনন্দময় কোষ চৈতন্য গূঢ়ভাবে থাকে বলিয়া অবিবেকীর প্রতীতি হয় না। প্রভাকর ও নৈয়ায়িক সুষুপ্তিকালে আত্মাকে জ্ঞানহীন স্বীকার করিয়া স্বরূপতঃ জড় কহে। সুতরাং গূঢ় চৈতন্যের আনন্দময় কোষেই তাহাদের আত্মা ভ্রান্তি হয়, এবং জীববিষয়ে আত্মস্বরূপ নিত্যজ্ঞান স্বীকার করে না, কিন্তু অনিত্য-জ্ঞান স্বীকার করে। সিদ্ধান্ত মতে সেই অনিত্য জ্ঞান বুদ্ধিরূপ অন্তঃকরণ বৃত্তি। এই রীতিতে প্রভাকর ও নৈয়ায়িকগণ আনন্দময় কোশকে আত্মা, ও বুদ্ধিকে সেই আত্মার গুণ কহে। এ মতও সমীচীন নহে। * কারণ—জ্ঞান হইতে ভিন্ন ঘটাদি বস্তু অনিত্য। সেইরূপ যদি আত্মা জ্ঞানস্বরূপ হয়, তবে ঘটাদির ন্যায় জড় হইলে অনিত্য হইয়া যায়। যদি আত্মা অনিত্য হয়, তবে মোক্ষসাধন নিষ্ফল। এই রীতিতে বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসহীন অনেক মূর্খ ব্যক্তি কোষপঞ্চকের কোন একটি পদার্থে আত্মা স্বীকার করে, এবং মুখ্য আত্মাস্বরূপ সাক্ষীকে জানিতে পারে না। অন্নময়াদি আত্মার আবরক বলিয়া তাহাদিগকে কোষ কহে।

* পূর্ব্বাপর মত খণ্ডন পঞ্চদশী গ্রন্থে বিশদরূপে করা হইয়াছে।

যেরূপ জীবের পঞ্চকোশ জীবের প্রকৃতস্বরূপ সাক্ষীকে আচ্ছাদন করে সেইরূপ ঈশ্বরের সমষ্টি কোষপঞ্চক তাঁহার যথার্থ স্বরূপকে আবরণ করে। ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপ তৎপদের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য স্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া কেহ কেহ মায়ারূপ আনন্দময় কোশবিশিষ্ট তৎপদবাচ্য অন্তর্যামীকেই পরমতত্ত্ব কহে। সেইরূপ, হিরণ্যগর্ভ, বৈশ্বানর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, গণেশ, শক্তি, সূর্য্য হইতে অসি, কোদাল বট অট বংশ পর্য্যন্ত পদার্থ সমূহে লোকে পরমাত্মা ভ্রান্তি করে। যদিও সর্ব্বপদার্থে লক্ষ্যভাগ পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নহে, তথাপি তত্তৎ উপাধিসহিতকে পরমাত্মা কথন ভ্রান্ত মাত্র। এই রীতিতে জীব-ঈশ্বরের পরমার্থ স্বরূপ হইতে বিমুখ হইয়া লোকে পাপপুণ্য কর্ম্ম করে, এবং অন্তর্যামী হইতে বংশ পর্য্যন্ত ঈশ্বর জ্ঞানে আরাধনা করিয়া সুখ বাসনা করে। সেই আরাধনা অনুসারে ফল পাইয়া থাকে। কারণ, সূর্য্য স্থূল প্রপঞ্চসমূহ ঈশ্বরের শরীরত্রয়ের অন্তর্ভূত। সুতরাং সেই সকল হইতেই উপাসনা অনুসারে ফল হইয়া থাকে পরন্তু ব্রহ্মজ্ঞান বিনা মোক্ষ হয় না। যেমন মুঞ্জতৃণ মধ্যস্থিত ইষীকা। পণ্ডিত মুঞ্জের উপরস্থ আবরণ ছিন্ন করিয়া পৃথক্ করে, সেইরূপ মোক্ষেচ্ছা হইলে বিবেক দ্বারা কোষপঞ্চক হইতে জীব ঈশ্বর স্বরূপ পৃথক করে।

স্বপ্নকালে স্থূল দেহ না হয় প্রতীত
আত্মার প্রতীতি সেই সময়ে সুনীত॥
নাহি সূক্ষ্ম দেহজ্ঞান সুষুপ্তিতে হয়
সুখের স্বরূপ আত্মা ভাসে সে সময়॥
না ভাসে কারণ দেহ সমাধি সময়।
আবরণ শূন্য আত্মা প্রতীতি হয়।
এইরূপে ব্যভিচারী সেই দেহত্রয়।
তাহাতে পৃথক আত্ম অনুগত রয়। ১৫৮

[ টীকা :—স্বপ্নাবস্থায় স্থূল দেহের প্রতীতি হয় না, আত্মার প্রতীতি হয়। সেইরূপ সুষুপ্তিকালে সূক্ষ্ম শরীরের প্রতীতি হয় না পরন্তু সুখস্বরূপ আত্মা স্বয়ং প্রকাশরূপে ভাসমান হয়। সুষুপ্তিতে সুখের জ্ঞান না হইলে, নিদ্রান্তে

"আমি সুখসুপ্ত ছিলাম এইরূপ স্মৃতি হইত না। সুতরাং সুষুপ্তিতে সুখ-জ্ঞান হয়।

সুষুপ্তিকালের সেই সুখ বিষয় জন্য নহে, পরন্তু আত্ম-স্বরূপই। সেই আত্মা স্বয়ম্ প্রকাশ, সুতরাং সুষুপ্তকালে সুখস্বরূপ আত্মা স্বয়ম্ প্রকাশরূপে প্রতীত হয়। নিদিধ্যাসনের পরিণাম নির্ব্বিকল্প সমাধি অবস্থায় অজ্ঞানকৃত আবরণ রহিত আত্মা প্রতীত হয়, অজ্ঞানময় কারণ শরীর প্রতীত হয় না। এইরূপে দেহ এরই ব্যভিচারী, অর্থাৎ এক অবস্থা ছাড়িয়া অবস্থান্তর প্রতীত হয় না। আত্মা অনুগত অর্থাৎ সকল অবস্থাতেই প্রতীত হয়। সুতরাং আত্মা ব্যাপক। এই বিবেক দ্বারা শরীরত্রয় হইতে আত্মা পৃথক বলিয়া জান। স্থূল শরীর অন্নময় কোষ। সূক্ষ্ম শরীর প্রাণময় মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ। কারণ শরীর আনন্দময় কোষ। সুতরাং শরীরত্রয়ের বিবেক হইতে কোষপঞ্চকের বিবেক হয়। যেমন জীবের স্বরূপ পঞ্চকোষ হইতে পৃথক সেইরূপ ঈশ্বরের স্বরূপ ও সমষ্টি পঞ্চকোষ হইতে পৃথক। চতুর্থ তরঙ্গে চতুর্ব্বিধ আকাশের দৃষ্টান্ত দ্বারা জীব ঈশ্বরের লক্ষ্য স্বরূপের বিবেক সবিস্তার কথিত হইয়াছে। ষষ্ঠ তরঙ্গে অস্তিভাতিপ্রিয়রূপ" নিরূপণে ও মহাবাক্য সমূহের অর্থনিচয়ে আত্মার পরমার্থ স্বরূপ প্রতিপন্ন করা যাইবে। এস্থলে আত্মবিবেক সংক্ষেপে কথিত হইল।

কোষপঞ্চক হইতে আত্মা পৃথক জানিয়াও কৃতকৃত্য হয় না। জীব ব্রহ্মের অভেদ নিশ্চয়ক বিচার আবশ্যক। সুতরাং মহাবাক্য অর্থ উপদেশ দিতেছি :—

পঞ্চকোষ হতে ভিন্ন জানি আত্মরূপ।
সেই আত্মা দেখ শিষ্য ব্রহ্মের স্বরূপ॥
আত্মা হতে ভিন্ন সব দেখ শুন যাহা।
সকলি অলীক শিষ্য ভ্রমমাত্র তাহা॥
মিথ্যা হতে অধিষ্ঠান নাপায় বিকার।
স্বপ্নে ভিক্ষা মাগি দৈন্য না হয় রাজার॥
সর্ব্ব কর্ম্মকর্ত্তা যদি অক্রিয় তবুও।
এহেন অনূনরূপ তোমার জানিও॥ ১৫২

[ টীকা :—হে শিষ্য ! পঞ্চকোষ হইতে আত্মা পৃথক জানিয়া, সেই আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ জানিবে। এরূপ সংশয় হইতে পারে যে "আত্মা পুণ্য পাপ করে, তাহাতে স্বর্গ নরক ও মৃত্যু লোকে নানা প্রকার সুখ দুঃখ ভোগ করে। সুতরাং ব্রহ্ম সহিত তাহার একতা অসম্ভবে না। সেই সংশয়ের সমাধান করিয়া বলা হইতেছে যে সেই ব্রহ্মরূপ আত্মা হইতে যাহা দেহ, অথবা শাস্ত্র হইতে স্বর্গনরক পুণ্য পাপ যাহা শ্রবণ কর তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা ভ্রম বলিয়া জানিবে। মিথ্যা বস্তু অধিষ্ঠানের বিকার সম্পাদন করে না। যেমন স্বপ্নে মিথ্যা ভিক্ষাকরণ হেতু রাজার দৈন্যদশা হয় না। মরুস্থলের মিথ্যা জলে ভূমি আর্দ্র হয় না। মিথ্যা সর্প হইতে রজ্জু বিষাক্ত হয় না। সুতরাং সমগ্র মিথ্যা শুভাশুভ ক্রিয়া করিলেও, পরমার্থে কর্ত্তা নহে এইরূপ তোমার অদ্ভুত অনুপরূপ জানিবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন তোমার স্বরূপ বিষয়ে স্থূল সূক্ষ্ম শরীর ও তাহাদের শুভাশুভ কর্ম্ম ও সেই কর্ম্মফল জন্ম মরণ, স্বর্গনরক সুখ দুঃখ সকলই অবিদ্যা কল্পিত। সেই অবিদ্যা কল্পিত পদার্থ হইতে তোমার ব্রহ্মভাব বিকার প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং, জ্ঞানের আদিতেই আত্মা নিত্য ব্রহ্মস্বরূপই। আত্মার ত্রিকালেও শরীর ও তদ্ধর্ম্মের সম্বন্ধ নাই। আত্মা সদাই নিত্যমুক্ত, ব্রহ্ম হইতে তাহার কদাপি ভেদ নাই।

যাঁহার এরূপ সংশয় হয় যে আত্মা সদাই নিত্যমুক্ত ব্রহ্মস্বরূপ হইলে, শ্রবণাদি জ্ঞানের সাধন নিষ্ফল হয় তাঁহার সংশয়ের সমাধান এই :—

নাহিক প্রপঞ্চ মিথ্যা খপুষ্প যেমন।
কোথা ঈশ স্রষ্টা যারে কহে সর্বজন॥
সাক্ষ্যের অভাবে সাক্ষী রহেনা কখন।
দৃশ্য নাই দ্রষ্টা কারে করিবে জ্ঞাপন॥
থাকে বন্ধ তবে মোক্ষ সম্ভবে তাহার।
অজ্ঞান থাকিলে জ্ঞানে তাহার সংহার॥
জানি এই ত্যজে সেই কর্ত্তব্য সকল।
নিশ্চল বিদেহ মোক্ষ পায় সে নিশ্চল॥ ১৬০॥

[ টীকা—জীবন্মুক্ত পুরুষের দৃষ্টিতে অজ্ঞান ও তাহার কার্য্য তুচ্ছ ও এই প্রপঞ্চ আকাশকুসুমবৎ সত্তা শূন্য। সুতরাং তাহার স্রষ্টা ঈশ্বরও নাই।

সাক্ষীর বিষয় অজ্ঞান আদিকে সাক্ষ্য কহে। সেই সাক্ষ্যও নাই, সুতরাং সাক্ষীও নাই। প্রকাশযোগ্য দেহাদিকে দৃশ্য কহে, দৃশ্য প্রকাশকে দ্রষ্টা কহে। সেই দেহাদি দৃশ্য নাই সুতরাং দ্রষ্টাও নাই। যদিও কেবল কূটস্থ চৈতন্যকে সাক্ষী ও দ্রষ্টা কহে, এবং তাহার নিষেধ সম্ভবে না, তথাপি সাক্ষী নাম, সাক্ষ্য সাপেক্ষ ও দ্রষ্টা নাম দৃশ্য সাপেক্ষ। সুতরাং সাক্ষ্য ও দৃশ্যের অভাবে সাক্ষী ও দ্রষ্টা নামের নিষেধ, স্বরূপের নহে। বন্ধ থাকিলে তাহার নিবৃত্তিরূপ মোক্ষ সম্ভবে সেই বন্ধ নাই, সুতরাং মোক্ষও নাই। যদি অজ্ঞান থাকে তবে জ্ঞানদ্বারা তাহার বিনাশ সম্ভবে সেই অজ্ঞান নাই, সুতরাং তাহার নাশক জ্ঞানও নাই। ইহলোক তথা পরলোক তুচ্ছ তাহাদের নিমিত্ত কিছুই কর্ত্তব্য নাই। আত্মার বন্ধ নাই, সুতরাং মোক্ষের নিমিত্ত কোনই কর্ত্তব্য নাই। এইরূপ স্থির নিশ্চয়ে আত্মা নিত্যমুক্ত বন্ধরূপ জানিয়া যিনি সকল কর্ত্তব্য ত্যাগ করেন, অর্থাৎ "আমার ইহা করণ যোগ্য" এইরূপ বুদ্ধি পরিহার করেন, তিনি তখন নিশ্চল হইয়া নিশ্চল অর্থাৎ অক্রিয় ব্রহ্মস্বরূপ বিদেহ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন। ইহার তাৎপর্য্য এই

যদিও আত্মা জ্ঞানের আদৌ নিত্যমুক্ত ব্রহ্মস্বরূপই বটে, পরন্তু জ্ঞানের পূর্ব্বে আত্মা কর্ত্তা ভোক্তা এই মিথ্যা ভ্রমে সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখনিবৃত্তি নিমিত্ত অনেকে বহু সাধনা করিয়া ক্লেশই প্রাপ্ত হয়। যখন সদ্গুরু সাক্ষাৎ হয়, তখন বেদান্ত বাক্যের উপদেশ পায়। বেদান্ত বাক্য শ্রবণে এইরূপ জ্ঞান হয় যে "আমি কর্ত্তা, ভোক্তা নহি, পরন্তু বন্ধস্বরূপ। সুতরাং আমার কর্ত্তব্য কিছুই নাই।" এই জ্ঞানই শ্রবণাদির ফল। ব্রহ্মপ্রাপ্তি বেদান্ত শ্রবণের ফল নহে। কারণ, ব্রহ্ম আপন স্বরূপ সুতরাং নিত্যপ্রাপ্ত। ]

যে মানে কর্ত্তব্য সেই অজ্ঞানী নিশ্চয়।
নাহিক কর্ত্তব্য যার, তারে জ্ঞানী কয়॥ ১৬১॥

[ টীকা—যে কর্ত্তব্য স্বীকার করে সে অজ্ঞানী। যাহার কোন কর্ত্তব্য নাই, তাহাকে জ্ঞানী কহে। ]

অদ্বয় অখণ্ড ব্রহ্ম দৃষ্টির অতীত।
নাম রূপ সঙ্গ আর জনম রহিত॥,

নহে মূল সূক্ষ্ম স্থূল মায়া দেহ তাঁর।
সমষ্টি কি ব্যষ্টি ভাব নাহিক যাঁহার॥
নহে ঈশ, নহে প্রাজ্ঞ, সূত্রাত্মা* কি মায়া।
তৈজস কি বিশ্বরূপ নহে যাঁর কায়া॥
বন্ধ ভোগ মোক্ষ যোগ নাহিক যাঁহাতে।
কিছু নাই, আছে সব আবার তাঁহাতে॥ ১৬২॥
জাগ্রতে প্রপঞ্চ যাহা হয় ভাসমান।
সে সব বুদ্ধির খেলা জান মতিমান॥
স্বপনে যে নাহি হয় ভোগ্য যত ভোগ।
এক চিত্তে সে কেবল বিচিত্র সংযোগ॥
সুষুপ্তি সময়ে শিষ্য মতি হয় লীন।
এক ব্রহ্ম হতে নহে প্রভেদ বিহীন॥
মাত্র মনোরথ বুদ্ধি করয়ে বরণ।
"বুদ্ধি প্রকাশক ব্রহ্ম" শাস্ত্রের বচন॥ ১৬৩॥
যাহার হৃদয়ে হয় জ্ঞানের প্রকাশ।
পায় তম অন্ধকার সমূলে বিনাশ॥
সদা একরস আত্মা, সঙ্গ নাই যার।
স্বয়ম প্রকাশ ব্রহ্ম-স্বরূপ অপার॥
যা কিছু হয়েছে শিষ্য আছে কিম্বা হবে।
মনোরথ মাত্র জান সকলি এ ভবে॥
সে ভব বিলাস প্রাপ্তি, নিবৃত্তি তাহার।
নাহি চায় জ্ঞানীজন করিয়ে বিচার॥ ১৬৪॥
ইন্দ্রিয় রমণ করে বিষয়ে আপন।
নিষ্কাম সাধয়ে কাজ জ্ঞানী যেই জন॥
সাধয়ে সকল কর্ম্ম লিপ্ত তাহে নয়।
পদ্ম পত্রে জল যথা লিপ্ত নাহি রয়॥

* হিরণ্যগর্ভ।

সকলি ইন্দ্রিয় কার্য্য শয়ন গমন।
ঘ্রাণ, শ্বাস, স্পর্শ, ত্যাগ, গ্রহণ, কথন॥
দেখে চক্ষু, শোনে কর্ণ, আস্বাদে রসনা।
নহেত এ সব শিষ্য আত্মায় যোজনা॥
সম্ভোগে যুবতী সদা যে হয় সন্ন্যাসী।
নহে সে আসক্ত কিম্বা ফল অভিলাষী *॥ ১৬৫॥
ইন্দ্রিয় সাধয়ে কাজ বিষয়ে আপন।
তাহাতে নাহিক মোর সংযোগ কথন॥
আমিত ইন্দ্রিয় নাই, নাহিত ইন্দ্রিয়।
কুটস্থ অসঙ্গ সাক্ষী, আমিত নিষ্ক্রিয়॥
ইন্দ্রিয় বিষয় ত্যাগে, করে তার সঙ্গ
আমার সহিত নাই বিষয়ের বঙ্গ॥
জ্ঞানীর হইলে শিষ্য এ হেন নিশ্চয়।
"আমি কর্ত্তা" হেন চিন্তা তার নাহি রয়॥ ১৬৬॥

ক্রমশঃ
শ্রীবিজয়কেশব মিত্র।

## কবির

মহাত্মা কবির একজন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন সাধক ও ভক্ত ছিলেন। এককালে তাঁহার ভক্তি ও প্রেমের আধিক্যে সকলেই বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইয়াছিল। মহাত্মা তুলসীদাসের ন্যায় তাঁহারও অনেকগুলি দোঁহা আছে, ইহার প্রত্যেকটীই ভাবপূর্ণ উচ্ছ্বাসময়ী। এই প্রসঙ্গে সেইগুলিই ক্রমে ক্রমে অনুবাদ সহ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

রামানুজাচার্য্যের আবির্ভাবের সার্দ্ধ এক শতাব্দীপর রামানন্দ নামধেয় এক ব্যক্তি দ্বারা আর একটী নূতন সম্প্রদায় সংস্থাপিত হয়। তাহার নাম

* অর্থাৎ, নিষ্কাম, অনাসক্ত, কর্ম্মফলত্যাগী গৃহস্থ জ্ঞানী স্ত্রী তথা বিষয়ে শাস্ত্ররীতি অনুসারে রমণ করে।

রামানন্দী সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় হইতে পরে দ্বাদশটী পৃথক সম্প্রদায় সংগঠিত হয়। কবির, রামানন্দের শিষ্য ছিলেন। তিনি যে সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা, তাহার নাম কবিরপন্থী। এই সম্প্রদায়ের সকলেই একেশ্বরবাদী এবং তাঁহাদের গুরু রামানন্দের ন্যায় ঈশ্বর সাকার এবং সগুণ বলিয়া স্বীকার করিতেন। কালক্রমে এই সম্প্রদায় হইতে পুনরায় দ্বাদশটী শাখা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে বারাণসীর কবিরচৌর সম্প্রদায়ই সমধিক প্রসিদ্ধ।

ভক্তমাল গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে কবির একজন বিধবা ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। পাছে তিনি জারজ সন্তান বলিয়া লোকের উপহাসের পাত্র হন এই আশঙ্কায় তৎসম্বন্ধে অনেক উপাখ্যান প্রচলিত আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তৎসমুদয় আলোচনা করা অসম্ভব আমি পরে কবিরের জীবনীতে তাহা আলোচনা করিতে সচেষ্ট হইব।

কবিরের দোঁহার প্রায় শতাধিক শ্লোক 'অনুসন্ধান' পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলাম। উক্ত পত্র অনিয়মে ও বিলম্বে প্রকাশ হওয়ায় এবং সমগ্র দোঁহাবলী প্রকাশ হইতে কিছু অধিক সময়ের প্রয়োজন বলিয়া 'পন্থা'তে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। ভরসা করি পাঠকগণের নিকট ইহা অপ্রীতিকর বোধ হইবে না।

১। কবির তে নর্ অধ হায়্ গুরুকোঁ কহতে আওর।
হরি রুঠে গুরুস্মরণ হায়্ গুরু রুঠে নহি ঠওর॥

কবির বলেন, যে গুরুকে গুরু না ভাবিয়া অন্য কিছু ভাবে সে অধম। হরি অসন্তুষ্ট হইলে গুরুর চরণ লওয়া যায়, কিন্তু গুরু অসন্তুষ্ট হইলে আর নিস্তার নাই।

২। কবির গুরু মাথেতে উৎরে শব্দ বিহুনা হোয়।
তাকো কাল ঘসেটি হৈ রাখি শকে নাহি কোয়॥

কবির বলেন, গুরু মাথা হইতে নামিলে শব্দ শূন্য হয়। তাহাকে কাল টানিয়া লইয়া যায় কেহ রাখিতে পারে না।

৩। কবির অহং অগ্নি হৃদয় দাহ্ গুরুতে চাহে মান্।
তিন্‌হকো যম নেওতা দিয়া তোম্ হৌহুমেরে মেজ মান॥

কবির বলেন, যাহার অহংরূপ অগ্নি হৃদয় দগ্ধ করিতেছে, আর গুরুর

নিকট সম্মান চাহিতেছে তুমি আমার প্রিয়পাত্র, বলিয়া যম তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে।

৪। কবির গুরু পারশ গুরু পারশ হায় গুরুচন্দন সুবাস্।
সৎগুরু পারশ জীউকে যিন্‌হো দিন্‌হোমুক্তি নিওয়াস্॥

কবির বলেন, গুরুস্পর্শমণি, গুরুই স্পর্শমণি গুরুই সুবাস যুক্ত চন্দন। সদ্‌গুরুই জীবের স্পর্শমণি, তিনিই মুক্তি নিবাস দান করেন।

৫। কবির গুরু পারশমে ভেদ্ হায় বড়ো অন্তরো জান্।
যোহি লোহ কাঞ্চন করে ওএ করিলেহ আপু সমান্॥

কবির বলেন, গুরুতে আর স্পর্শমণিতে ভেদ আছে, বহু অন্তর আছে জানিবে। স্পর্শমণি কেবল লৌহকে কাঞ্চন করে কিন্তু গুরু শিষ্যকে আপন সমান করেন।

৬। কবির গুরুকো কিজিয়ে দণ্ডবৎ কোটি কোটি পর্‌ণাম্
য্যায়ছে ভৃঙ্গী কীটকো করলে আপুসমান

কবির বলেন, গুরুকে দণ্ডবৎ করি, কোটি কোটি প্রণাম করি। ভৃঙ্গী যেমন কীটকে আপনার সমান করে গুরুও তেমনি শিষ্যকে নিজের সমতুল্য করিয়া লন।

৭। কবির সুরতি টেকুরিলো লেজুরি মন নিতি ডার নিহার।
কৌলকু আমি প্রেম রস পিওয়ে বারম্বার॥

কবির বলেন, স্থির চিত্তে টেকুয়ার সূত্র নাহিব কর ও তাহাতেই সর্ব্বদা মন দাও। কমলের মধ্যস্থিত প্রেম রস সিক্ত যে কুয়া আছে তাহাই বারম্বার পান কর।

৮। কবির গঙ্গ যমুনকে অন্তরে সহজ শূন্য হায় ঘাট।
তাঁহা কবিরা মট রচো মণিবান জোওয়ে বাট॥

কবির বলেন, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যে সহজরূপ শূন্য মাঠ আছে, কবির তথায় একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন মুনিরা সেইস্থানে যাইতে ইচ্ছা করে।

৯। কবির যেহি বনসি ঘন সঞ্চরৈ রায়্ পন্‌ছি না উড়ি আয়।
মোটা ভাগ্ কবিরকা তাঁহা রাহা লো লায়॥

কবির বলেন, যখন বংশীতে রব সঞ্চার হয় তখন রাইরূপ পক্ষী আর উড়িয়া যায় না। কবিরের মোটা ভাগে লয় লাগাইয়া রহিয়াছে।

১০। কবির লওলাগি তব জানি যে কবঁহু ছুড়ি ন যায়।
জীয়ৎ তোলাগি রহে মুয়ে মাহি সমায়॥

কবির বলেন, যখন কিছুতেই ছাড়া যায় না তখনই লয় লাগিয়াছে জানিবে। জীবদ্দশায় ত লাগিয়াই থাকে, দেহত্যাগ করিলেও লয় ছাড়ে না।

১১। কবির যাঁছি লাগিয়ো রসো ত্যাঁছি নিম হায় ছোড়।
কোটী কোনী জোরিকে কিয়া লাখ করোর॥

কবির বলেন, যে ভাবে রস পাইতেছে সেই ভাবে নিম স্বরূপ তিক্ত মায়া ছাড়িতেছে। এইরূপে কোটী কোটী বার, লক্ষ বার একত্রে জড় করিলে তবে অনেক স্থায়ী হয়।

১২। কবির য্যায়ছি উপজে পেড সোঁ ত্যোছি নিম হায় জোর।
আপনে তন কি ক্যা কহৈ তারে পরিবার করোর॥

কবির বলেন, এইরূপ বৃক্ষ যেমন বাড়িতেছে, নিমেরও সেইরূপ তেজ বর্দ্ধিত হইতেছে। আপন শরীর সম্বন্ধে আর কি বলিবেন, কত কোটী পরিবারকে ত্রাণ করিতেছেন।

১৩। কবির য্যাছি প্রথমে লৌলমৈ ত্যায়ছি ধুবলে যায়।
যাকে হির্দয়ে লৌ বসৈ সো মোহি মাহি সমায়॥

কবির বলেন, প্রথমে যেমন লয়ের আবেগ হয়, সেই আবেগে যতদূর পার যাও। যার হৃদয়ে লয় স্বরূপ আবেগ বসে, সে আমিই এবং আমাতে মিশিয়াছে।

১৪। কবির জবলগি কথনি হম কথো চুরি রহো জগদীশ।
লৌ গি পলনা পরে অব বোলনা নহি দীশ॥

কবির বলেন, যে পর্য্যন্ত আমি কথা কহিতেছি, সে পর্য্যন্ত জগদীশ দূরে আছেন। যখন লয় লাগে তখন একপল ছাড়া থাকে না, আর কোন কথা কহিবারও বাসনা হয় না।

১৫। কবির সৎগুরু তত্তু মথাইয়া গ্রন্থ হিমাহি মূল।
লৌলাগি নিরমল ভয়া মেটি গয়া সংশয় শূল॥

কবির বলেন, সদ্গুরু তিনি ত দেখাইয়া দিলেন, কিন্তু মূল গ্রন্থিই রহিয়াছে, কেবল লয়ের জন্য নিস্ফল হইয়াছে, আর সংশয় শূলও চলিয়া গিয়াছে।

১৬। কবির নোবৎ আপনি দিন দশ লেহু বজায়।
এহ পুর পাটন এহ গ'ল বহুরিন দেহাছে আয়॥

কবির বলেন, যে নহবৎ বাজিতেছে তাহা দিন দশ খুব বাজাইয়া লও। ইহা পূর্ণ নহে, এ পথে একবার গেলে আর কিছু দেখাও যায় না, শোনাও যায় না।

১৭ কবির কেহি ঘর নওবৎ বাজ্‌তি সায় গল্ বাঁধে দোয়ার।
এঁকে হরিকে নাম বিনু গয়ে বজা ওান হার॥

কবির বলেন, যে ঘরে নহবৎ বাজিতেছে তাহা শুনিবার জন্য গলা ও দরজা বাঁধিয়া রাখিয়াছি অর্থাৎ একাগ্রচিত্তে শব্দ শুনিতেছি। কিন্তু তাহাতে কি হয়? এক হরিনাম ব্যতীত পারত্রাণের আর উপায় নাই।

১৮। কবির যিন্‌হ ঘব নওবৎ বাজ্‌তি হোত ছতিশো রাগ।
তে মান্দল্ খালি পড়ে বৈঠ্‌ন লাগে কাগ॥

কবির বলেন, যে ঘরে ছত্রিশ রাগিনীর সঙ্গে নহবৎ বাদ্য হয়, পরে সে ঘর খালি হইয়া যায়, আর কাক আসিয়া তাহার উপর বসে।

১৯। কবির ঢোল দামামা দুন্দুভি সহনাই আরু ভেরী।
অও সব চলে এজোইকে হার কোই ল্যাওয়ে ফেরি॥

কবির বলেন, ঢোল দামামা, দুন্দুভি, সানাই এবং ভেরী এবং আরো বিবিধ প্রকারের শব্দ যাহা শ্রবণে পশে, তাহা বাদ্য করিয়া যাইতেছে। কিন্তু কে এমন ক্ষমতাবান্ পুরুষ যে একবার হইয়া গেলে পুনরায় ফিরাইয়া আনিতে পারে।

২০। কবির থোরা জীওনা মাড়ে বহুৎ মণ্ডাণ।
সবহি উভা মেলগি কেয়া রঙ্ক্ কেয়া সুলতান॥

কবির বলেন, জীবন সামান্য তাও আবার বহু ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহ ফকির ও সুলতান উভয়ের মধ্যেই আছে।

২১। কবির একদিন য়্যায়ছা হোয়েগা সভতে পরে বিছো।
রাজা রাণা ছত্রপতি সাবধান কোঁ নহি সো॥

কবির বলেন, এমন একদিন হবে যে দিন সকলের সহিত বিচ্ছেদ হবে। কি রাজা কি ছত্রপতি সকলেরই আছে, কেবল যাহারা সাবধান তাহাদের নাই।

২২। কবির উজব্ খেডা ঠীক্‌রি গডি গড়ি গায় কুঁভার।
রাওয়ণ সবিথা চলি গয়া লঙ্কাকে সরদার॥

কবির বলেন, কুমার উজ্জ্বল বর্ণের প্রভূত খাপরা প্রস্তত করেন। লঙ্কার সর্দ্দারের ( রাবণের ) প্রভূত ক্ষমতাশালী বহু খাপরা চলিয়া গিয়াছে, কেবল কুমাররূপী আত্মা সমভাবেই আছেন।

২৩। কবির উচা মহাল বানাইয়া চূর্ণ কলি চেরায়ে।
একে হরিকে নাম বিনু সব তব পরে ভূলায়ে॥

কবির বলেন, একটী উচ্চ মহল প্রস্তত করিয়া তাহাতে চূণকাম করিয়া কলি ধরাইলাম, কিন্তু হরিনাম ব্যতীত যখন তখন ঐ অবস্থা ভুলিয়া যায়।

২৪। কবির কাঁহা গবিয়ো চাম লপেটা হাড়।
হায়ওর উপর ছত্রপতি তেভি দেখা খাড॥

কবির বলেন, তোমার গর্ব্ব কোথায়? কেবল চর্ম্ম ও অস্থি দ্বারা শরীর ঢাকা রহিয়াছে। উপরের যিনি ছত্রপাত তিনি খাড়া হইয়া দেখিতেছেন।

২৫। কবির কাঁহা গবিয়ো উচা দেখি আওয়াস।
কগ্‌হি পড়েই ভূঁহ লোট্‌না উপর জামে ঘাস॥

কবির বলেন, কোথায় তোমার গর্ব্ব? তোমার আবাস উচ্চে দেখিতেছি, কালই যে ভূমিতে ঘাস জন্মায় সেই ভূমিতে লোটাইতে হইবে।

২৬। কবির কাঁহাঁ গবিয়ো কাল গঁহে শির কেশ।
না জানি কাঁহাঁ মারি হায় কি ঘর কি পরদেশ॥

কবির বলেন, কোথায় তোমার গর্ব্ব? কাল তোমার কেশ ধরিয়া আছেন। ঘরে মারিবেন কি বিদেশে মারিবেন কিছুই তাহার স্থিরতা নাই।

২৭। কবির উত্তিম্ ক্ষেতি দেখিকে গর্বে কাঁহা কিষাণ।
অজহু ঝোলা বহুৎ হায় ঘর আওয়ে ভবজান॥

উত্তম ক্ষেত দেখিয়া কৃষক কোথায় গর্ব্ব করিয়া থাকে ?

কবির বলেন, আজ দেখিতেছ অনেক ফসল, কিন্তু বহু বিঘ্ন আছে। ফসল ঘরে আসিলে উত্তম ক্ষেত্র জানিও।

২৮। কবির যেহি ঘর প্রীতি ন প্রেমরস আও রসনা নহি নাম।
তে নর আয়ে সংসার মে উপজে ক্ষপেবেকাম॥

কবির বলেন, যে ঘরে প্রীতি ও প্রেমরস নাই এবং যে রসনাতে হরিনাম নাই, সে মনুষ্য কর্ম্ম বিনা সংসারে যাতায়াত করিতেছে।

২৯। কবির য়াছা এহ সংসার হায় য্যায়ছা মালতী ফুল।
দিন দশকে বেওহার মে ঝুঁটে রঙ্গন্ ভুল॥

কবির বলেন, মালতী ফুল যেমন দিন দশেক সুগন্ধ দ্বারা লোককে মোহিত করে পরে শুকাইয়া ঝরিয়া যায়, এ সংসারও তদ্রূপ দুই দশ দিন মিথ্যা রং চংঙে ভুলাইয়া রাখে।

৩০। কবির ধূরি সাকেলিকে পোট বাঁন্ধি এহ দেহ।
দেওয়স্ চারিকা পেক্না অন্ত্ খেহকি খেহ॥

কবির বলেন, ধূলির পুটুলির ন্যায় এ শরীর দুই দিনের জন্য সংসারে প্রেরিত হইয়াছে এবং বাহার দিতেছে, শেষে যে ধূলা সেই ধূলা হইবে।

৩১। কবির চারি পহর ধন্ধে গয়া তিন পহর বহু শোয়।
এক পহর বন্দেগি করো যো জন্ম সওয়ারথ হোয়॥

কবির বলেন, চারি প্রহর বাজে কাজে গেল, তিন প্রহর নিদ্রায় কাটিল, বাকি যে এক প্রহর তাহা বৃথা নষ্ট না করিয়া ভগবানকে ডাক। তাহা হইলেই জন্ম সার্থক হইবে।

৩২। কবির রাতি গোয়াই শোই করি দেওয়স্ গোঁয়াই খায়।
হীরা জন্ম আমাল্ হায় কৌড়ি বদলেঁ যায়॥

কবির বলেন, রাত্রি নিদ্রায় ও দিবা আহার করিতেই অতিবাহিত হইল। হায়! হীরার ন্যায় এমন অমূল্য জীবন কড়ির ন্যায় অতিবাহিত হইতেছে।

৩৩। কবির মন্দিল্ থাক্কা, জড়িয়া হীরা লাল।
দেওয়স্ চারিক্ বোখ্না বিনশি যায়গা কাল॥

কবির বলেন, এ দেহ-মন্দির পুড়িয়া ছাই হইবে, হীরা, মতির অলঙ্কার

পরিয়া বৃথা গর্ব্ব করিতেছ তাহা দিন চারিকের জন্য শোভা পায়। তাহার পর কাল সকলি বিনাশ করে।

৩৪। কবির স্বপ্নাবৈয়ন্ কা উঘরি গয়া যব নয়ন।
জীউ পড়া বহুলুট্যম না কছু লেন ন দেন॥

কবির বলেন, স্বপ্নের পর নয়ন ঘুরিয়া গেল, জীব তখন বিষম চিন্তায় পড়িল। অথচ কিছু দেয়ও নাই কিছু পায়ও নাই, কোন দিকেই কিছু হইল না। ক্রমশঃ

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

---

## রহস্যময় ঘটনাবলী।

### অসাধারণ বালক।

আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লিও উইনার ( Leo Wiener ) সাহেবের পুত্র নরবার্ট উইনারের ( Norbert Wiener ) বয়স মোটে ১১ বৎসর মাত্র। কিন্তু এই বয়সেই তাহার বুদ্ধির পরিপক্কতা ও প্রবীণতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। সে যখন মোটে ১৮ মাসের শিশু ছিল তখন সে সমস্ত বর্ণমালা মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিল। ৩ বৎসর বয়ক্রমের সময় সে পড়িতে আরম্ভ করে এবং ৮ বৎসর বয়সে সে ডারউইন ( Darwin ) হাক্সলি ( Huxely ) রিবো ( Ribot ) হেকেল ( Haeckel ) প্রভৃতি প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদিগের গ্রন্থ সমূহ আয়ত্ত করিয়া ফেলে। এখন তাহার বয়স ১১ বৎসর। এখন সে স্কুলের পাঠ সমাপন করিয়া মেড ফোর্ডের টাফ্‌টস্ ( Tufts College, ) কলেজে অধ্যয়ন করিতেছে। এবং আশা করা যায় শীঘ্রই উপাধি লাভ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিবে। বালকটীর মানসিক শক্তির প্রবলতা সত্ত্বেও তাহার দৈহিক শক্তির কোনরূপ অভাব নাই। সে বেশ সুস্থকায় ও সবল এবং সন্তরণ, হকি প্রভৃতি শক্তি-সাধ্য ক্রীড়ায় বেশ পারদর্শী। বালকটী শৈশবাবস্থা হইতে তাহার পিতা ও পরিবারস্থ ও অন্যান্য ব্যক্তির ন্যায় নিরামিষাশী।

ওঁ

# পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ।

১১শ ভাগ | আশ্বিন, ১৩১৪ সাল। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

## জীবাত্মা।

জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদন জন্য এই প্রবন্ধ লিখিবার ভার গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু বিষয়টী এতাদশ কঠিন এবং নিজের বিদ্যা ও জ্ঞান এত সামান্য ও সীমাবদ্ধ যে আমার দ্বারা ইহা সম্যক প্রতিপাদিত হওয়া অসম্ভব। পাঠক নিতান্ত কঠিনরূপে সমালোচনা করিবেন না সেই ভরসায় এই গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করিলাম।

প্রমাণ তিনরূপে হইতে পারে (১) প্রত্যক্ষ দ্বারা ২) অনুমান দ্বারা, এবং (৩) আগম—বাক্যসমূহ দ্বারা জীব ব্রহ্মের একত্ব, সাধনাদ্বারা আর্য্যঋষিগণ স্ব স্ব হৃদয়ে সম্যকরূপে অনুভব করিয়াছিলেন। আমাদের জানিতে হইলে তাঁহাদের কৃতগ্রন্থ সমূহের অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে।

"তত্ত্বমসি" উপনিষদের একটী মহাবাক্য। তুমিই (জীবই) সেই ঈশ্বর, সকল উপনিষৎই এই সত্য প্রচার করিতেছেন। শঙ্করাচার্য্য কহেন—"ত্বং"

পদ জীববাচক এবং "তৎ" পদ ঈশ্বরবাচক—ঈশ্বর ও জীবে উপাধিগত ভেদ। জীবের ব্যষ্টি উপাধি এবং ঈশ্বরের সমষ্টি উপাধি। ("জহদজহৎ" লক্ষণা দ্বারা) উপাধি ত্যাগ করিয়া কেবল সত্য ব্রহ্মভাব গ্রহণ করিতে হইবে। অল্পমাত্র সাম্য অবলম্বন করিয়া একত্ব কল্পনাকে "সম্পৎ" বলে। (আনন্দ-গিরি)। এ প্রবন্ধে যাহাতে উক্ত 'সম্পৎ' দোষ না পড়ে, আমাদের সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বহু প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হইবে।

স্বভাবের নিয়মানুসারে আমরা বিবিধ ইন্দ্রিয় এবং সর্ব্বেন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ মন দ্বারা—বহির্জগতের উপলব্ধি করিয়া থাকি। এবং যে পরিমাণে অভ্যন্তর হইতে বাহ্যস্পন্দনের প্রতিধ্বনি বা প্রতিস্পন্দন হয়, সেই পরিমাণে ঐ জ্ঞানেরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। জ্ঞাতব্য বিষয়ের অংশ কিঞ্চিৎ পরিমাণে আমার ভিতরে বর্ত্তমান থাকিলেই, কেবল বহির্জগতস্থ সেই বিষয়ের জ্ঞান আমাতে উপচিত হইতে পারে। বহির্জগতে যে আকাশের (Ether এর) স্পন্দন হইতে আলোক উৎপন্ন হইতেছে আমার চক্ষের ভিতর সেই আকাশ বর্ত্তমান থাকিয়া স্পন্দিত হইতেছে বলিয়াই আমি দেখিতে পাইতেছি। বাহিরে যে বায়ুর স্পন্দনে শব্দ উৎপন্ন হইতেছে, আমাদের কর্ণের মধ্যে সেই বায়ুর অংশ বর্ত্তমান থাকিয়া স্পন্দিত হইতেছে বলিয়াই আমরা শুনিতে পাইতেছি। যখন দেখা যাইতেছে যে বহিঃ বস্তুর অংশ কিয়ৎপরিমাণে আমাদের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান থাকিলেই পরস্পর পরস্পরের স্পন্দনে স্পন্দিত হইয়া জ্ঞান উৎপাদন করে, এবং কোন ইন্দ্রিয়ে জ্ঞাতব্য বিষয়ের অভাব থাকিলে বহির্জগতের সহিত সমস্পন্দনের অভাব হেতু সেই ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন জ্ঞান উপার্জ্জন হয় না, তখন যে বিরাটচৈতন্যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অনুপ্রাণিত রহিয়াছে, সেই অখণ্ড চৈতন্যের অংশ আমাদের মধ্যে নিহিত না থাকিলে কিরূপে আমাদের সেই চৈতন্যের উপলব্ধি হইবে? ব্রহ্ম যেরূপ আমাদের বাহিরে তদ্রূপ আমাদের ভিতরেও অবস্থিত। উপনিষদে প্রকাশ আছে যে ব্রহ্ম আকাশরূপী বা জগৎ-প্রাণরূপী হইয়া আমাদের অন্তরে বাহিরে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন—তাঁহাতেই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত। "মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপো সত্যসংকল্প আকাশাত্মা (all pervading) .. সর্ব্বমিদ মভ্যাত্তোহ বাকানাদরঃ ॥ ২ ॥ ছান্দোগ্য। (pervading over

all this, being without speech without confusion.) (ছান্দোগ্য)। সুতরাং যেখানে যেভাবে যে চৈতন্য দেখা যায় সকলই সেই ব্রহ্মের।

উপনিষদে দেখিতে পাই ব্রহ্ম নির্গুণ ও সগুণ, পর ও অপর উভয়ই—প্রশ্ন। ৫। ২,—"এতদ্বৈ, সত্যকাম। পরং চাপরংচ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ" মাণ্ডুক্য কহিতেছেন, পরিদৃশ্যমান এই সমস্তই ব্রহ্ম—যাহা পূর্ব্বে ছিল তাহাও ব্রহ্ম, এবং যাহা কিছু পরে হইবে তাহাও ব্রহ্ম—জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থা-ত্রয়েও ব্রহ্ম এবং এ সকল অবস্থার অতীত অবস্থাতেও ব্রহ্ম, চতুর্থ তুরীয় অবস্থা বর্ণনাকালে উহাতে দুইটী বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন—'একাত্ম প্রত্যয়সারং' ও 'প্রপঞ্চোপশম'—যাহাতে কেবল একই আত্মজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন জ্ঞান থাকে না, এবং যে অবস্থায় জাগ্রদাদি সকল অবস্থারই অভাব হয়। অ উ ম এই তিন অক্ষর লইয়া ওঁ। 'অ' শব্দে বৈশ্বানর বা বিরাট চৈতন্য যাহা সমগ্র স্থূল জগত ব্যাপিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছেন। জাগ্রত অবস্থায় এই চৈতন্য, তজ্জন্য ইহাকে "প্রাণাত্মাও" কহে। 'উ' শব্দে স্বপ্নাবস্থা—সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীর অধিকার করিয়া যে চৈতন্য সে চৈতন্য অপেক্ষাকৃত উচ্চতর—ইহাকে তৈজস বা হিরণ্যগর্ভ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। 'ম' শব্দ সুষুপ্তি-অবস্থা ব্যঞ্জক—ইহা সর্ব্বোচ্চ অবস্থা এবং সর্ব্বোচ্চ শরীরে—এখানে স্বয়ং ঈশ্বর চৈতন্য—যাহাকে ব্যষ্টি ভাবে 'প্রাজ্ঞ' বলা যায়। সমষ্টি ভাবে ঈশ্বর বা প্রত্যক্ চৈতন্য অর্থাৎ অন্তরাত্মা এই অবস্থায় জ্ঞানের ও সমগ্র-শক্তির পূর্ণ বিকাশ। এই বিবিধ চৈতন্যের সমষ্টি পূর্ণ নির্গুণব্রহ্মচৈতন্য—"সর্ব্বে বেদা যৎ-পদমামনন্তি, তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি, যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি" এই সেই পরমপদ। পুনশ্চ "এতদ্ধ্যেবাক্ষর ব্রহ্ম, এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরং" কঠ। ২। ১৬ ইহাই সগুণব্রহ্ম, ইহাই নির্গুণব্রহ্ম। নির্গুণব্রহ্ম শান্তং সমং সাম্যং অনবচ্ছিন্নং, একাকারং জ্ঞানং, দ্বন্দ্বাতীতং, নিরঞ্জনং প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা তিনি শাস্ত্রে বিবিধরূপে বর্ণিত হয়েন। ঈশ্বর সমগ্রচৈতন্যের সমষ্টি, একমাত্র কেন্দ্ররূপে এবং মূল প্রকৃতি অব্যাকৃত অবস্থায় পরিণত বিবিধ মূর্ত্তা মূর্ত্তের সহিত মহাপ্রলয়ে নির্গুণ ব্রহ্মে প্রবেশ করেন এবং সৃষ্টিকালে সগুণব্রহ্ম-ঈশ্বর, মূল প্রকৃতি সহিত তাঁহা হইতে বাহির হয়েন। পরব্রহ্ম মূল প্রকৃতিকে গ্রহণ করিয়াই ত্যাগ করিতেছেন। যেকালে তিনি "অহমিদমস্মি" সংকল্প করিতে-

ছেন তখনই সৃষ্টি, এবং যখন "অহমেতৎ ন" সংকল্প করিতেছেন তখনই প্রলয়, এইরূপে অনাদি কাল হইতে চক্রবৎ অবিচ্ছিন্নরূপে একবার প্রকাশ ও একবার প্রলয় হইয়া আসিতেছে—ইহাকেই ব্রহ্মচক্র কহে। অপর অপর সকল চক্রই এই মহাব্রহ্ম চক্রের অন্তর্নিহিত। বিকাশের সময় উপস্থিত হইলেই ব্রহ্ম, মূলপ্রকৃতি, ঈশ্বর বা শব্দব্রহ্ম এবং আত্মাশক্তি বা দৈবীপ্রকৃতি ( Light of the Logos বা Fohat ) এই ত্রিমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইলেন—ইহাই প্রথম ত্রিমূর্ত্তি। ঈশ্বর—প্রত্যগাত্মা, মূলপ্রকৃতি জড়, আত্মাশক্তি ঈশ্বরের স্বরূপ শক্তি ইনি উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন দ্বারা সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ করেন। নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মে ভেদ কিছুমাত্র নাই—"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎপূর্ণ মুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমিবাবশিষ্যতে"—বৃহদারণ্যক ॥ ইনিও পূর্ণ, উনিও পূর্ণ। অবিকাশিত সাম্যাবস্থায় নির্গুণ ব্রহ্ম—তিনি এক বিকাশ সগুণ ব্রহ্ম অবস্থায় তিন (Threefold) সচ্চিদানন্দ। প্রলয়াবস্থায় মূল প্রকৃতি গুণসাম্যাবস্থায়। সৃষ্টিকালীন ঈশ্বরের উপাধিরূপে বিবিধ নামরূপে প্রকাশিতা জীবভূতা দৈবী প্রকৃতি মূল প্রকৃতিতে প্রবেশ করিলে কালবশে মহদাদি সপ্ততত্ত্ব, সপ্তলোক প্রভৃতি বিকাশিত হইল। সগুণ ব্রহ্ম, সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর, তজ্জন্য তাঁহাকে মহেশ্বর বলা যায়। তাঁহার Evolution নাই।

এস্থলে আরও একটু বিশেষরূপে জানা আবশ্যক। সগুণ ব্রহ্ম। পূর্ব্বে সাম্যাবস্থাস্থিত সচ্চিদানন্দ ত্রিগুণ, পূর্ণভাবে ব্যক্ত হইয়া, ব্রহ্মা, বিষ্ণু রুদ্রাত্মক ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি রূপে কার্য্য করিতে থাকেন। ঈশ্বর হইতে মূল প্রকৃতিতে প্রবেশ কালীন দৈবী প্রকৃতি, বিশ্বরচনার চিন্তা বা কল্পনার যে চিত্রখানি ভাবরূপে ঈশ্বরে ছিল, তাঁহা হইতে উহা লইয়া মূল প্রকৃতিতে অর্পিত করিলেন। দৈবী প্রকৃতি জগৎপ্রাণ Theosophical পুস্তকে উহাকে Fohat কহে। Motion, Sound, Heat, Light, Cohesion, Electricity বা Electric fluid, এবং Nerve force or Magnetism এই সপ্ত শক্তিকে Sons of Fohat কহিয়াছে। আরও ঐ দৈবী প্রকৃতি দ্বারা ত্রৈণী সৎ, চিৎ, আনন্দ ত্রিভাব হইতে মূল প্রকৃতির রজ, সত্ত্ব, ও তমোগুণ স্পন্দিত হওয়ায় তাহার সাম্যাবস্থা অন্তর্হিত হইলে গুণ সকল তিন হইতে প্রথমে সপ্তধা এবং পরে বহুধা বিভক্ত হয়। Logoic Consciousness

ও উক্ত প্রকার সাত ভাগে প্রকাশিত—নতুবা পরস্পর পরস্পরকে কিরূপে পরে আন্দোলিত করিবে? এইরূপ গুণ বিভাগ বশতঃই সৃষ্টি উত্তরোত্তর নাম রূপে বৃদ্ধি পায়। ব্রহ্মা কর্তৃক সকল স্তরের অনু সমূহে প্রাণ সঞ্চারিত হইলে সপ্তধা বিভক্ত বিষ্ণুশক্তি দ্বারা আকৃষ্ট ও পরস্পর সংযোজিত হওয়ায় ক্রমশঃ পরমাণু পুঞ্জ, বিবিধ কোষ, ও ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি প্রস্তুত হইতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে স্থূল, স্থূলতর উপাধি গ্রহণ করায় নামরূপ মধ্যে জীবাত্মারূপে তিনি সগুণ। উপাধি শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই (উপ= সমীপে, আধীয়তে অনেনেতি=উপাধি) অর্থাৎ যে বস্তু যাহার নিকটে থাকিয়া নিজের ধর্ম্ম নিকটস্থের উপর আরোপ করে, সেই বস্তু তাহার উপাধি। যেমন যেমন উপাধি প্রস্তুত হইতে লাগিল ঈশ্বরও নানারূপে তাহাতে প্রবেশ করিতে লাগিলেন।

এক্ষণে জীবাত্মার অবতরণ দেখা যাউক। Secret Doctrine মধ্যে মহেশ্বরকেই এক মাত্র সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর বলা হইয়াছে অর্থাৎ সেই একই মূল Monad হইতে তাঁহার সঙ্কল্প মাত্র অসংখ্য অসংখ্য জীবাত্মা নিসৃত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বিবিধ উপাধি গ্রহণোন্মুখ হন। লিখিত আছে "The never resting Principle in the beginning of every new Cosmic activity—That Logos or Universal Monad which radiates from within Himself all those Cosmic Monads that become the centres of activity—Progenitors of the numberless Solar Systems as well as the yet undifferentiated Human Monads of Planetary Chains as well as everything thereon. স্বয়ম্ভুব Svayambhuba or Self-born is the name of every Cosmic Monad which becomes the Centre of force, from within which emerges a Planetary chain (of which chains there are seven in our system. And the radiations of this centre become again so many Manus, Svayambhuba (a mysterious generic name, meaning far more than appears) each of them becoming, as a Host., the creator of his own Humanity" মণ্ডূক

উপনিষদে ঠিক ঐরূপ একটী বর্ণনা আছে :–যথা "সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ। তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সোম্যভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি॥ ১, ১, শ্লোক। যেরূপ সুদীপ্ত অগ্নি হইতে সমানরূপ অগ্নিকণা সহস্রদিকে ধাবিত হয়, তদ্বৎ ব্রহ্ম হইতে বিবিধ জীবসমূহ নিসৃত হয়, এবং (কালে) তাঁহাতেই প্রত্যাগমন করে। শঙ্করাচার্য্য "বিবিধ" শব্দের তাৎপর্য্য দেখাইতেছেন যে, নানা স্তরে স্ব স্ব অবস্থানুযায়ী জীব নানা উপাধি গ্রহণ করে। উপাধি নাশ অর্থাৎ নামরূপের নিতান্ত ক্ষয়ে, সকলেই সেই পরম ধামে ফিরিয়া যায়। আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে ব্রহ্ম পূর্ণ সকলেই তিনি–চিদাংশ সমূহ বা স্ফুলিঙ্গ সদৃশ জীবাত্মাগণ তাঁহা হইতে পৃথক্ নহে, অবিচ্ছিন্ন ভাবে তাঁহাতেই সংলগ্ন, পৃথক পৃথক উপাধিগত ঘটাকাশবৎ অবস্থিত মাত্র।

নামরূপের গূঢ় অর্থ আমাদের জানা আবশ্যক—প্রত্যেক পরমাণুপুঞ্জ পৃথকরূপে স্পন্দিত হয় এবং সেই সেই স্পন্দন হইতে পৃথক পৃথক শব্দ উত্থিত হয়–সেই স্পন্দনের সমষ্টি হইতে যে শব্দ উৎপন্ন হয় সেই শব্দই সেই বস্তুর নাম। আমাদের দেহের নানা অঙ্গের বিবিধ পরমাণু সমষ্টির যোগে যে একটী বিশেষ শব্দ উৎপন্ন হয় এবং সেই দেহে জীবাত্মার জ্যোতি—যাহা হইতে পুনরায় একটী বিশেষ শব্দ উত্থিত হয়—এই উভয়ের একত্র যোগে পৃথক পৃথক দেহ হইতে যে পৃথক পৃথক এক একটী নির্দ্দিষ্ট শব্দ বাহির হয়, তাহাই আমাদের প্রত্যেকের নাম। সেই নাম জানিতে পারিলেই জীবাত্মাকে জানা যায়। রূপ আকৃতি বা মূর্ত্তি–প্রকৃতির তিন গুণের তারতম্য ও পরস্পর সংহতি অনুসারে পৃথক পৃথক অণু সমূহের পরস্পর সংযোগ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে—জীবের প্রয়োজন মতই ভিন্ন ভিন্ন উপাধি হইয়া থাকে—কাহারও সূক্ষ্ম, কাহারও স্থূল—এই প্রকার নানারূপ।

কিরূপে বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন স্তর ও ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা মূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়াছিল এবং কিরূপেইবা জীবাত্মা উচ্চ হইতে সকল স্তরের মধ্য দিয়া বিবিধ তত্ত্ব সমষ্টির গুণ বা সারাংশ সংগ্রহ করিয়া ক্রমে ক্রমে স্থাবর রাজ্যে অবতরণ করিলেন এবং পাঞ্চভৌতিক অতি কঠিনতম প্রাকৃতিক পদার্থ সমূহের সহিত স্বীয় সম্বন্ধ স্থাপন ও ধীরে ধীরে তাহাদের উপর স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া স্বকার্য্য

সাধনার্থে তাহাদিগকে উপাধিরূপে গ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ মানব দেহ নির্ম্মাণ করতঃ তথায় বিরাজ করিতেছেন, সে সমুদয় সবিশেষ বর্ণনা করিলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইবার আশঙ্কায়, সে সমস্ত সূক্ষ্ম বিবরণ পর প্রবন্ধের জন্য রাখিয়া দিলাম। এস্থলে এই পর্য্যন্ত জানিলেই হইবে যে, ব্রহ্মা ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছেন—তাঁহার জীবনীশক্তির পৃথক পৃথক অংশ ও পরিমাণ দ্বারা পঞ্চ তন্মাত্র অর্থাৎ যে যে পৃথক পৃথক পরমাণুর স্ফুরণ ও তজ্জাত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ যতদূর যে প্রকার যাইতে পারে, তাহা সীমাবদ্ধ করিয়া গুণ সন্নিবেশ করণ—এবং প্রত্যেক জাতীয় তন্মাত্রার সমষ্টিতে উপজাত সেই জাতীয় তত্ত্ব অর্থাৎ সেই সেই পৃথক স্তরের অণু সমূহ সেই সেই পৃথক পৃথক স্পন্দনের ক্ষমতা প্রদান ব্রহ্মা কর্তৃক হইয়াছে। এবং বিষ্ণুশক্তি প্রভাবে ও বিবিধ স্তরের বিবিধ দেবগণের সাহায্যে, বিবিধ স্তরের অণু সকল পরস্পর একত্র সংযোগ ও নানারূপে স্পন্দিত ও আন্দোলিত হইবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে। আরও একটু অবগত হওয়া প্রয়োজন যে ক্রমশঃ নিম্ন নিম্ন স্তরের অণু সমূহে তত্তৎ ঊর্দ্ধ স্তরের তাত্ত্বিক গুণও কিয়ৎ পরিমাণে প্রবিষ্ট আছে, সুতরাং স্থূল পার্থিব স্তরের নিম্ন বিভাগের প্রত্যেক অণুতে ক্ষিতি তত্ত্বের সহিত অপ্‌, তেজ, বায়ু ও আকাশ তত্ত্বের অংশ মিশ্রিত আছে। এইরূপে সংমিশ্রণ বশতঃই ক্রমাভিব্যক্তি সম্ভবপর। জীবও নিম্নাবতরণ কালে সকল স্তরের সকল বিভাগ হইতে সেই সেই স্তরের সারাংশ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে বলিয়াই সর্ব্বপ্রকারে স্পন্দনক্ষম হইয়াছে—তজ্জন্যই জীবের ক্রমোন্নতির পথ পরিষ্কৃত রহিয়াছে।

ক্রমশঃ

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গোস্বামী।

# সাধন-পন্থা।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

( ৫ )

আমাদিগের এই পৃথিবীর কোন কোন মানব, আপন আপন সাধন বলে, উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগের কথা পূর্ব্ব অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি। তাঁহারা এই পৃথিবীর মানব হইয়া, কঠিন তপস্যায় সাধারণ মানবকে অতিক্রম করিয়া মায়ার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছেন। যে উদ্দেশ্যে শ্রেষ্ঠ মানব জন্ম তাহা তাঁহারা সাধন করিয়াছেন। তাঁহারা এখন জীবনমুক্ত, এবং শুক্লাশ্রমের ব্রহ্মর্ষি সঙ্ঘভুক্ত; বর্ত্তমান মানবের উন্নতিকল্পে সদাই বদ্ধপরিকর। দেহধারী ও মুক্তদেহীদিগের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য, তাঁহারা স্বেচ্ছায় মানব দেহ ধারণ করিয়া জগৎগুরুরূপে বিরাজ করিতেছেন এবং যাহারা কতকগুলি বিশেষ গুণবিশিষ্ট তাঁহাদিগকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন। এই শিষ্যগণ আবার তাঁহাদিগেরই অনুকম্পায় উন্নত হইয়া জীবন্মুক্ত হন এবং সেই গুরুদেবদিগের সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া মানবের উন্নতির বিধায়ে গুরুদেবদিগের সহায়তা করিতে থাকেন।

আমরা যগুপি সংগুণ গুলি বর্দ্ধন করিতে থাকি, যদি পরার্থে আত্মোৎসর্গ করিতে শিখি, মানবের হিতার্থে যদি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তি অনুশীলন করিতে থাকি, আমরা যদি পবিত্রতায় ধর্ম্মশীলতায় এবং আন্তরিক ভক্তিতে সাধারণ মানব অপেক্ষা বিশেষত্ব লাভ করি, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদিগের বিশেষ অনুকম্পা পাইবার যে উপযুক্ত পাত্র হইব তাহাতে আর সংশয় নাই। সূর্য্যরশ্মি কুস্থান সুস্থান বিচার না করিয়া সর্ব্বস্থানে সমভাবে আলোক প্রদান করিয়া থাকে, কিন্তু যখন আতসী কাঁচের সাহায্যে সেই সমস্ত বিক্ষিপ্ত রশ্মিকে একত্রিত করা যায়, তখন সেই বিক্ষিপ্ত রশ্মি এক স্থানে কেন্দ্রীভূত হওয়াতে যেমন সেই স্থান একটী ক্ষুদ্র সূর্য্যের ন্যায় দেখায়, ঠিক সেইরূপ গুরুদেবদিগের প্রেম—তাঁহাদিগের নিকট হইতে আগত বিক্ষিপ্ত আধ্যাত্মিক শক্তিতরঙ্গ—যাহা মানব হইতে তৃণ অবধি সকল পদার্থতেই ছাড়াইয়া আছে, সেই প্রেম, সেই আধ্যাত্মিক তরঙ্গ, কিন্তু শিষ্য পূর্ব্বোক্ত

গুণাবলীতে ভূষিত হইলে তাহার উপর বিশেষ ভাবে কার্য্য করিতে থাকে। তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিশেষ অনুকম্পা পাইতে হইলে আমাদিগের ক্ষেত্রকেও তদনুযায়ী গঠিত করিতে হইবে।

যাহা আমরা আধ্যাত্মিক শক্তিতরঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করিলাম তাহারই সাহায্যে মানব ক্রমশঃ পূর্ব্ব কথিত উন্নতি সোপানে উঠিতে পারে। পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে এই শুক্লাশনের ঋষিসম্প্রদায় ব্রহ্মবিদ্যার রক্ষয়িতা। তাঁহারা জগতের মঙ্গলের জন্য আধ্যাত্মিক শক্তিতরঙ্গ পৃথিবীতে বর্ষণ করেন। তাই যখন তাঁহারা দেখেন যে কোনও লোক এরূপ গুণবিশিষ্ট হইয়াছে যে যদ্যপি তাহাকে বিশেষ শক্তির দ্বারা আরও উন্নত করা যায়, তাহা হইলে সে এই নবলব্ধ শক্তি মানবের হিতার্থেই প্রয়োগ করিবে, তখন তাঁহারা আপন আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা তাহারও শক্তি বর্দ্ধন করিতে থাকেন। তাঁহারা জানেন যেরূপ তাঁহাদের অনুকম্পায় সে উন্নত হইয়া উঠিতেছে যখন পরে সে আবার তাঁহাদের স্থান অধিকার করিবে অপর লোককে ঠিক তাঁহাদেরই মত অনুকম্পা করিতে সে পরাঙ্মুখ হইবে না। আধ্যাত্মিক জগতে স্বার্থপরতার বা আত্মা পূজার স্থান নাই, তাই সর্ব্বদেশে, সকল ধর্ম্মের আদিতে মহোৎসর্গের কথার উল্লেখ আছে।

সাংসারিক নিয়ম অনুসারে, শাস্ত্র অনুসারে, বেদের বিধি অনুসারে, যতদূর শিক্ষালাভ করিতে ও উন্নত হইতে পারা যায়, মনুষ্য যদ্যপি ততদূর উন্নত হইতে সক্ষম হয়, আত্মশক্তি ও উদ্যমের দ্বারা ক্রমোন্নতিশীল মানব তরঙ্গের যদ্যপি শীর্ষস্থান সে অধিকার করিতে পারে, যদ্যপি তাহার স্বভাবকে সদা প্রেমময়, স্বার্থ শূন্য এবং পরহিতৈষী করিতে পারে, তাহা হইলে সে ঋষিসম্প্রদায়ের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয়। এক্ষণ হইতে তাঁহারা তাহাকে শক্তিমান ও জ্ঞানবান করিবার জন্য তাহার জীবনের পথে কত সুযোগ আনিয়া দিতে থাকেন। এইরূপে যে পরিমাণে সে এই সমস্ত সুযোগ সুফলে পরিণত করিতে পারে সেই পরিমাণে সে তাঁহাদের নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হয়। এবং মধ্যে মধ্যে সে আত্মারামের আভাস সুখ অনুভব করিতে থাকে। এই রূপে অবশেষে এই পৃথিবীর অসারতা তাহার মনে ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া যায় এবং সে পৃথিবীর সুখে বিরাগমান হইয়া পার্থিবশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইতে

আগ্রহান্বিত হইয়া উঠে; ইহাই শিষ্যত্বের শিক্ষানবিশের প্রথম সোপান। এই পথে প্রবেশ অধিকার লাভ করিতে পারিলে সেই ঋষিসম্প্রদায়ের একজন আসিয়া তাহার অজ্ঞাতসারে তাহাকে সাহায্য করিতে থাকেন। যদিও সে তাঁহাকে কখনও দেখে নাই, হয়ত তাঁহার অস্তিত্ব উপলব্ধিও করে নাই, কিন্তু তিনি তাহাকে উত্তমরূপে জানেন; তাহার প্রতি-উদ্যম তিনি দেখিতেছেন, প্রতি পদক্ষেপে তাহাকে সুপথের দিকে অগ্রসর করাইতেছেন এবং যে উপায় অবলম্বন করিলে তাহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ হয় তাহাই তিনি করিয়া আসিতেছেন।

জননী যেরূপ সতর্কতার সহিত ও সস্নেহভাবে আপনার শিশু সন্তানের তত্ত্বাবধান করেন, পূর্ণ প্রেম ও জ্ঞানময় তিনিও তাঁহার প্রিয় শিষ্যের কল্যাণ কামনায় তাহাকে ঠিক সেইরূপ পর্য্যবেক্ষণ করেন। তাঁহারা স্থূল শরীর ধারণ করিয়া তত্ত্ব জিজ্ঞাসুর সম্মুখীন হয়েন না বলিয়া সে এই দুরূহ সাধন পথে মাঝে মাঝে আপনাকে নিঃসহায় মনে করে এবং হতাশ হইয়া বিবেচনা করে যে তাহার চতুর্দ্দিক নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারে ও নিরাশার কুহেলিকায় আচ্ছন্ন। কিন্তু সে ভাব শিষ্যের মনে অধিক্ষণ স্থায়ী হওয়া উচিত নহে। তাহার জানা উচিত যে তাহার সহোদর প্রাণের ভ্রাতার অপেক্ষা নিকটতর আর একজন বন্ধু তাহার পার্শ্বে সদাসর্ব্বদা দণ্ডায়মান এবং তিনি অহরহঃ জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থাতেই যে সাহায্য করিতেছেন তাহা তাহার এই নশ্বর দুদিনের দেহের উপর নহে, তাহা তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য।

৬

পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে মানব আপনার সাধ্যমত চেষ্টায় আপনাকে প্রস্তুত করিতে পারিলে—গুরুদেবের চরণকমল প্রত্যাশী হইয়া তাহার সমস্ত সময়, সমস্ত চিন্তা, সমস্ত উদ্যম তাঁহারি উদ্দেশে উৎসর্গ করিতে পারিলে, গুরুদেব তাহার সম্মুখে উপস্থিত হন,—স্থূলদেহ ধারণ করিয়া তাহার যে নয়ন সমীপে আপনাকে প্রকাশ করেন তাহা নহে, তিনি তাহার অন্তরে, তাহার অগোচরে, আবির্ভূত হন। আমরা মোহ-অন্ধ জীব তাহাই মনে করি যে "তাঁহার স্বভাবই আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখা।" আমরা মায়া-বিজড়িত হইয়া

ভাবি যে "মানবকে সাহায্য করিতে বা তাহাকে সুপথের দিকে লইয়া যাইতে তাঁহারা পরাঙ্মুখ। আমরা ভাবি "তাঁহারা যদ্যপি মানব-উন্নতি-প্রয়াসী হইতেন, তাহা হইলে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ লোক স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এই যে অধোগমন করিতেছে তাহা তাঁহারা নিবারণ করিতেছেন না কেন? তাঁহারাত মানবের সম্মুখীন হইয়া প্রতিপদস্খলনে তাহাকে ধরিয়া তুলিতে পারিতেন।" আমাদিগের জানা উচিত যে আমরা যত মনে করি না কেন যে আমরা শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণকমল-প্রয়াসী কিন্তু গুরুদেবের সৎশিষ্য পাইবার বাসনার সহিত আমাদিগের এই অভিলাষ তুলনা করিলে আমাদিগের এই অভিলাষ সামান্য বলিয়া মনে হয়। তিনি কাহার সাহায্য করিবেন, কে আত্মাভিমানটুকু ত্যাগ করিয়া তাঁহার সাহায্য লইতে প্রস্তুত, তিনি এইরূপ শিষ্য রাত দিন অন্বেষণ করিতেছেন। লক্ষ লক্ষ লোক মোহ ও বাসনার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া বিনষ্ট হইতেছে। কে তাহাদিগের মধ্যে থাকিয়া সেই একলক্ষের মধ্যে দশ জন লোকেরও নয়নের বারি মুছাইয়া, হৃদয়ের আঁধার ঘুচাইয়া, তাহাদিগকে বক্ষোপরি তুলিয়া লইয়া বলিতে পারে "ভাই ও দিকে যাইও না, ওই দেখ শান্ত প্রদেশ হইতে গুরুদেব ইঙ্গিত করিতেছেন, আমার সঙ্গে এস, আমি তোমাদিগকে তাঁহার চরণ প্রান্তে নিক্ষেপ করিব, তোমরা ও তাঁহার অনুগ্রহে ছিন্ন-সংশয় ও পবিত্র হইবে"। এইরূপ মানবহিতৈষী শিষ্যের বড়ই অভাব তাই বলিতেছি তাঁহারা এইরূপ শিষ্য লাভ করিতে সদাই লালায়িত। আমরা মুখে বলি "আমরা গুরুদেবের চরণ সমীপে যাইতে উৎসুক," কিন্তু ভাই, বাস্তবিক কি আমরা আত্মসুখ, আত্মতৃপ্তি, আত্ম-উন্নতি ভুলিয়া এইরূপে তাঁহাদিগের যথার্থ দাস হইতে প্রস্তুত? তাঁহারা চান এরূপ শিষ্য যাহারা পৃথিবীতে বাস করিয়া, মানবের মধ্যে থাকিয়া, তাহার ঝঞ্ঝা, তাহার দুঃখের তরঙ্গবেগ, হৃদয়ে ধারণ করিয়া মহর্ষি-দিগের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া, আপ্লুত জনের সহায় হইতে প্রস্তুত,—তিমিরাচ্ছন্ন মানসে গুরুলব্ধ জ্ঞান-শলাকা ধরিতে প্রস্তুত।

তাঁহারা পৃথিবীর দিকে তাকাইয়া আছেন; তাঁহারা খুঁজিতেছেন কে তাঁহাদিগকে হৃদয়ে লইবার জন্য হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া আছে। যে দ্বার মানবের স্বেচ্ছায় আবদ্ধ, তাহা সে নিজে না করিলে, কে তাহা উন্মুক্ত

করিবে ? আমরা বাসনা রূপ অর্গলে প্রাণের কপাট বন্ধ করিয়া রাখিয়াছি ; পার্থিব নশ্বর বস্তুর লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ের কপাট সুদৃঢ় ভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে , আমাদিগের দুর্ব্বলতা, আমাদিগের আলস্য, ঔদাসিন্য যাহা সেই দ্বার দৃঢভাবে অর্গলিত করিয়া রাখিয়াছি। আর গুরুদেব জ্ঞানের উজ্জ্বল দীপিকা হস্তে লইয়া বাহিরে দণ্ডায়মান হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন, কবে সে দ্বার উন্মুক্ত হইবে, কবে তিনি হৃদয়ের ভিতরে প্রবেশ অধিকার লাভ করিবেন এবং জ্ঞানের বিমল জ্যোতির দ্বারা শিষ্যের তমসাচ্ছন্ন মানসকে বিভাসিত করিতে পারিবেন। তোমার হৃদয়াভ্যন্তরে আলোক জ্বলিলে তবেত তিনি তোমায় দেখিতে পাইবেন ? ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন অমানিশা ; নিম্নে গিরিপাদ মূলে গভীর তমসাবৃত কুটীরশ্রেণী অন্ধকারে মিশিয়া রহিয়াছে , পথিক আশ্রয় তরে উচ্চ শৃঙ্গ হইতে দেখিতেছেন কোথায় লোকাবাস। যতক্ষণ না একটী কুটীরের দ্বার উন্মুক্ত হয় এবং তাহার ভিতর হইতে ক্ষুদ্র দীপের আলোক শূন্যে ছড়াইয়া পড়ে ততক্ষণ পথিক তাহার অস্তিত্ব বুঝিতে পারে না। ঠিক সেই রূপ তিনি যদিও পৃথিবীর পানে চাহিয়া আছেন, তোমার যতক্ষণ না ভক্তি ও আগ্রহে হৃদয় দ্রবীভূত করিবে, যতক্ষণ না সর্ব্বান্তঃ হইতে প্রাণ কাঁদিবে, ততক্ষণ তিনি তোমার নিকট আসিতে পারেন না, বা জটিল জীবন পথে পথ প্রদর্শক হয়েন না। গুরুদেব সদাই দূর হইতে আমাদিগকে নিরীক্ষণ করিতেছেন এবং কি করিয়া আমাদিগকে শ্রীচরণে আশ্রয় দিবেন তাহাই ভাবিতেছেন। তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া হৃদয়ে তাঁহার চরণ যুগল প্রতিষ্ঠা করা এই কার্য্য তোমার, তুমি ইচ্ছা করিলেই তাঁহাকে পাইতে পার। তিনি আসিয়া তোমার হৃদয়ের দ্বারে মাঝে মাঝে করাঘাত করেন, যেন বলেন "বৎস, ইহার ভিতরে আমাকে আশ্রয় দাও , দেখ চতুর্দ্দিকে কত শত্রু তোমাকে ঘেরিয়া আছে কেবল আমি তোমাকে তাহাদিগের হস্ত হইতে মুক্ত করিতে পারিব।" কিন্তু তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দেওয়া না দেওয়া তোমার অধিকারে। এই চিত্র মহা ভারতীয় উদ্যোগ পর্ব্বে বেশ সুন্দর ভাবেই বর্ণিত আছে। জগৎ গুরু বাসুদেব কুরুক্ষেত্রের মহা যুদ্ধের পূর্ব্বে দুর্য্যোধন ও অর্জ্জুন উভয়কেই আহ্বান করিয়াছেন ; উভয়ের বাসনা চরিতার্থ করা তাঁহার ইচ্ছা। পুরুষোত্তম শয়ান ও নিদ্রাভিভূত ছিলেন। দুর্য্যোধন আসিয়া উপস্থিত হইল,

এবং শ্রীকৃষ্ণের শিরোদেশে একখানি রত্ন সিংহাসন সজ্জিত দেখিয়া সেখানি তাহারি উদ্দেশে রক্ষিত হইয়াছে ভাবিয়া তাহাতে উপবেশন করিল। অহঙ্কার তাহাকে একেবারে মত্ত করিয়াছিল। তাহার পর অর্জ্জুন অতি সন্তর্পণে নিদ্রিত জগৎ-স্বামীর পদমূলে উপস্থিত হইল এবং তথায় উপবিষ্ট হইয়া প্রভুর সেবায় নিযুক্ত হইল। বীর বিশ্বজেতা অর্জ্জুনের অহঙ্কারের লেশ মাত্র ছিলনা। ভগবানের সেবাই তাঁহার জীবনের সার উদ্দেশ্য। আবার যখন ভগবান উভয়কেই বর দিতে প্রস্তুত হইয়া বলিলেন "আমার সম যোদ্ধা নারায়ণী নামে এক অর্ব্বুদ গোপ এক পক্ষের সৈনিক পদ গ্রহণ করুক, আর অন্য পক্ষে আমি সমরে পরাঙ্মুখ ও নিরস্ত্র হইয়া অবস্থান করি; ইহার মধ্যে যে পক্ষ যাহার লইতে অভিলাষ হইবে তাহাই অবলম্বন কর।" তিনি সমর পরাঙ্মুখ জানিয়াও অর্জ্জুন তাঁহাকেই বরণ করিল, আর দুর্য্যোধন তাঁহার নারায়ণী সেনা লাভে আপনাকে চরিতার্থ মনে করিল। দুর্য্যোধন যে ভগবানকে প্রত্যাখ্যান করিল ইহা কাহার অপরাধ। এইরূপ আমাদের জীবনের সন্ধিকালে আমরা প্রায়ই অহংকারের বশবর্ত্তী হইয়া শুভ অনুগ্রহে অবহেলা করি। ( ক্রমশঃ )

জনৈক বিদ্যার্থী।

---

# মানব নিজ অদৃষ্ট বিধাতা।

( ৪র্থ সংখ্যার ১৩৫ পৃষ্ঠার পর হইতে )

আমরা বিজ্ঞান বলে প্রাকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধে যাহা শিক্ষা লাভ করি তাহা যে এই কর্ম্মবিধান হইতে পৃথক নহে এক্ষণে তাহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব। বিজ্ঞান স্থূল জগৎ সম্বন্ধে যাহা শিক্ষা দেয় ধর্ম্মনৈতিক এবং মানসিক জগতে সেই একই শিক্ষা দিয়া থাকে। এক্ষণে দেখা যাউক কর্ম্মের বিধান ও তাহার ক্রিয়া সম্বন্ধে প্রাচীন শাস্ত্র সকল কি বলিয়াছেন। আমাদের নিকট যে ভাবে কর্ম্মপথ প্রদর্শিত হইয়াছে সেই পথ অবলম্বন করিয়া আমরা কর্ম্মের ক্রিয়া প্রণালী বুঝাইতে চেষ্টা করিব এবং দেখাইব কিরূপে মনুষ্য স্ব স্ব ভবিষ্যৎকে আপন আয়ত্বে আনিতে পারে। প্রথমতঃ কর্ম্মের সহিত বিজ্ঞানের

সম্বন্ধ কি ইহা জানা আবশ্যক। কর্ম্ম শব্দে কেবল যে আভিধানিক অর্থ ক্রিয়া বুঝায় এমত নহে ইহাতে কর্ম্মপ্রসূত ফলও বুঝাইয়া থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে জ্ঞানের দ্বারা কর্ম্মকে ভস্মীভূত করা যায় তিনি আরও শিক্ষা দিয়াছেন যে মনুষ্য সংসারী হইয়াও কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে। বাসনাই কর্ম্মের মূল, যিনি যেরূপ ফল প্রাপ্ত হইতে বাসনা করেন কর্ম্ম তাহাকে তাহাই আনিয়া দেয়। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে প্রাকৃতিক নিয়মের কখনও পরিবর্ত্তন হয় না; মনুষ্যের সহস্র চেষ্টায়ও তাহার অন্যথা হইবার নহে। যখন যাহা ঘটিবার তাহা অবশ্যই ঘটিবে। এই অলঙ্ঘনীয় নিয়ম আমাদিগকে বেষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে। আমরা তাহার মধ্যে থাকিয়া অর্থাৎ সেই প্রাকৃতিক নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া যতটা কার্য্য করিতে পারি, করিয়া থাকি, সুতরাং মনুষ্যের অন্তঃকরণে একটা ভাব স্বতঃই জাগিয়া উঠিতে পারে যে, যখন আমরা এই অলঙ্ঘনীয় প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্ত্তী যখন আমাদের কোন কার্য্যেই হাত নাই তখন পুরুষকারের মর্য্যাদা কোথায়? বাস্তবিক যদি বিধির পরিবর্ত্তন না হয়, যদি আমরা সকলদিকেই প্রাকৃতিক নিয়মে পরিবেষ্ঠিত হইয়া আছি, যদি আমাদিগের জীবনের প্রতি-কার্য্যই বিধি আজ্ঞায় নিয়ন্ত্রিত তাহা হইলে আমরা যন্ত্রস্বরূপ নিঃসহায়। আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আর নাই—অবস্থানুগত জীব। কর্ণহীন পোত যেমন বায়ুদ্বারা ইতস্ততঃ পরিচালিত হয়, আমরাও সেইরূপ বিধিদ্বারা পরি-চালিত হইয়া থাকি।

বিজ্ঞানের আলোচনায় যখন মনীষিগণ স্থির করিলেন যে প্রাকৃতিক নিয়ম অপরিবর্ত্তনশীল তখন পূর্ব্বোক্ত ধারণা প্রথমেই লোকের মনে উপস্থিত হইল। ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞানবিৎ শিক্ষকদিগের মুখে অনেকেই বোধ হয় শুনিয়া থাকি-বেন যে মনুষ্য তাহার অবস্থার একটী প্রতিকৃতি মাত্র। যে যেমন কাজ করে তাহার দেহও তদনুরূপ গঠিত হয়, যে যেরূপ সমাজে অবস্থান করে তাহার মনও সেই সমাজের অনুযায়ী অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাঁহারা আরও বলেন যে শিক্ষাই এই সমস্তের মূলিভূত কারণ এবং বিদ্যা মনুষ্যের কতকগুলি সহজাত গুণের পরিপুষ্টি, সেইগুণ মানব তাহার পিতৃ মাতৃ দত্ত দেহ হইতে প্রাপ্ত হয় এবং তাহা জন্ম ও অবস্থা ভেদে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কিছুকাল এইরূপ শিক্ষাই প্রচলিত হইয়াছিল এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে উহার বিশেষ আদর দেখা যাইত। কিন্তু বিজ্ঞান যতই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল ততই মনুষ্য এই প্রাকৃতিক বিধির রহস্য অপেক্ষাকৃত বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল; অর্থাৎ বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লোক বুঝিতে পারিল যে প্রাকৃতিক নিয়মের অপরিবর্তনীয়তা আমাদিগকে আবদ্ধ না করিয়া বরং সর্ব্বশক্তিমান করিয়া থাকে এবং আমাদিগের জ্ঞানের প্রসার যেমন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তেমনি প্রাকৃতিক বিধিও আমাদিগের দাস হইয়া আমাদিগের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। এখন আমরা কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলিতে পারি অর্থাৎ একটি বিধির প্রতিকূলে অপরটিকে করিয়া স্বকার্য্য সম্পাদন করিয়া লই। যখন ইহা স্থির নিশ্চয় প্রাকৃতিক নিয়মের লঙ্ঘন ও ব্যতিক্রম হইবে না তখন এই জ্ঞানদ্বারা যাবতীয় ক্রিয়ার একের সহিত অন্যের ফলাফলের অবশ্যম্ভাবিতা সম্যক উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই, এমন কি কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিলে আমরা পূর্ব্ব হইতেই তাহার ফলাফলের নিশ্চয়তা বুঝিতে পারি। এই বোধ শক্তির উপর এখন সমস্ত বিজ্ঞান নির্ভর করিতেছে। যদি প্রাকৃতিক নিয়মের পরিবর্ত্তন হইত তাহা হইলে বিজ্ঞানের অস্তিত্ব থাকিতনা সুতরাং কোন কার্য্য আরম্ভ করিলে তাহা কিরূপে কোনভাবে পরিণত হইবে কে বলিতে পারিত?

বিদ্যালয়ে অধীত রসায়ন শাস্ত্র হইতে একটী উদাহরণ দেওয়া যাউক। যদি প্রাকৃতিক বিধান সর্ব্বদা একরূপ ফল উৎপাদন না করিত তবে রাসায়নিক পরীক্ষার ফল কিরূপে প্রতিপন্ন হইত? কিরূপেইবা সেই পরীক্ষা নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহিত হইত? রাসায়নিক সংযোগের বিধি অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়াই মৌলিক পদার্থ সকলের প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন হয় না বলিয়াই এবং বিধাতার বিধান অলঙ্ঘনীয় বলিয়াই মানুষ আরব্ধ ক্রিয়ার ফল প্রাপ্তি বিষয়ে সর্ব্বদাই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। তাহার জানা আছে যে মৌলিক পদার্থ সকল পরস্পর মিলিত হইতে পারে এবং যদ্যপি প্রচলিত নিয়মে তাহাদিগকে মিলিত করা যায় তাহা হইলে সেই সংমিশ্রণে পূর্ব্ব পরীক্ষায় যে ফল পাওয়া গিয়াছে এখনও সেই অভিন্নরূপ ফল উৎপন্ন হইবে। সুতরাং উক্ত পরীক্ষা সম্বন্ধে তাহার কোন সন্দেহ বা আশঙ্কা উপস্থিত না হইয়া বরং প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মিয়া

থাকে। যদি ফলের কোনরূপ ব্যতিক্রম জন্মে তাহা হইলে বুঝিতে পারা যায় যে পরীক্ষাকার্য্য সুনিয়মে সম্পাদিত হয় নাই, নিশ্চয়ই কোনও না কোন ক্রটী হইয়া থাকিবে। এইরূপে প্রাকৃতিক নিয়মের নিত্যতার উপর বিজ্ঞানের অস্তিত্ব গঠিত হইয়াছে এবং এইজন্য রসায়নবেত্তা তাড়িত বেত্তা ও অপর সাধারণ লোকে কোনও কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই তাহার ফল হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়।

প্রাকৃতিক নিয়ম যেন জড় জগতে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, এক্ষণে উহা কিরূপে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে পারে,—অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়ম অপরিবর্ত্তনশীল, ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া আমরা কিরূপে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারি তাহার আলোচনা আবশ্যক।

রসায়ণবিৎ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে অম্লজান ও উদজান বায়ুকে মিলিত করিয়া উহাতে উপযুক্ত তাপ ও চাপ প্রদান করিলে একমাত্র জলই উৎপন্ন করা যায়, অন্য কোন পদার্থ উৎপন্ন হয় না সেইরূপ আধ্যাত্ম বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা স্থিরিকৃত করিয়াছেন যে মনুষ্য কোনও একটী নির্দ্দিষ্ট বিষয় চিন্তা করিলে তাহার চরিত্রের উপর কোন নির্দ্দিষ্ট ফল অনিবার্য্যরূপে ফলিবেই ফলিবে। কোন বিপরিত ফল ফলিবে না। আবার যদি কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতে বদ্ধপরিকর হও, তাহা হইলে সেই কার্য্যের ফল যাহা হওয়া উচিত তাহাই হইবে। এই জন্য আমাদিগের প্রতি-কার্য্যই বিজ্ঞানানুমোদিত। অর্থাৎ জড়জগতে কি মনোজগতে, নৈতিক জগতে কি স্থূল জগতে, ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই এই বিধির সাদৃশ্য বিদ্যমান রহিয়াছে। ঈশ্বরের বিধান নিত্য; কারণ ইহা তাঁহার প্রকৃতির স্ফুরণ মাত্র। কৃষক ক্ষেত্রে ধান্য বপন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে যে সেই বপন দ্বারা ধান্যই ফলিবে অন্য কোন শস্য উৎপন্ন হইবে না; সেইরূপ মনুষ্য গুণ, অবস্থা, এবং ভবিষ্য ভাগ্য বপন করিয়া শুভাশুভ ফল উপার্জ্জন করিতে পারে। অর্থা সদগুণ প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে আমাদিগের সেইরূপ কার্য্যের প্রয়োজন কেননা সমস্তই নিয়মাধীন।

এই বিধান সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহা অমূলক কি সমূলক ইহা সপ্রমাণ করিতে হইলে কার্য্যের প্রয়োজন। মনুষ্যের স্বভাব অতীব জটিল তবে উহাকে তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে যথা (১) বাহ্যবৃত্তি (২) বাসনা-

বৃত্তি (৩) মানসবৃত্তি। আমি প্রভুত্বকামনা করি, কোন বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করিতে চাই, অর্থ ও অন্যান্য স্থূল বস্তু হস্তগত করিতে লালায়িত হই, এই সকল বাহ্য জগতের ক্রিয়া, ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে মনুষ্যের একটী ভৌতিক বা স্থূলদেহ আছে এবং সেই সঙ্গে তাহার একটী আন্তরিক প্রকৃতিও আছে যদ্দ্বারা বাহ্যবস্তু উপভোগের বাসনা জাগরিত হয়। মানসবৃত্তি দ্বারা আমরা কোন বিষয় চিন্তা করিতে সমর্থ হই।

উপরোক্ত যে তিনটী বিভাগের প্রসঙ্গ হইল উহাই যে মানব প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিচায়ক তাহা নহে, তবে আমাদিগের বুঝিবার পক্ষে এই ত্রিবিধ বিভাগেই এক্ষণে যথেষ্ট এবং ইহা স্মরণ রাখিতে পারিলে কর্ম্ম বিধান বুঝিবার পক্ষে অনেকটা সহজ হইবে।

( ক্রমশঃ )

শ্রী আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

# পঞ্চীকরণ।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

গুরু। দেহাদি হইতে অহন্তা মমতা নিবৃত্ত করিবার জন্য বিবেক ও বিচার ব্যতীত ইহা ( উপরোক্ত জপ তপাদি ) কিছু মুখ্য সাধন নহে। কারণ যদি এই সাধন গুলি দ্বারা আত্মানাত্মার বিবেক ( পার্থক্য বোধ ) না হয়, তাহা হইলে, তদ্বিপরীত অহন্তা মমতা দ্বিগুণীকৃত হয়। উহার হেতু এই যে, প্রথমতঃ যে বর্ণ ও যে জাতিতে মনুষ্য অবস্থিত রহিয়াছে, তদভিমান তাহার হৃদয়ে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ ত আছেই, আরও তদুপরি অবিবেক দ্বারা যদি কোন পন্থের বেশ ধারণ করে, তবে তাহারও অভিমান হয়। তাহাতে বিবেকাদি সাধন ব্যতীত সংসার ত্যাগ করিলেও উহাতে অভিমান বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু যায় ( নষ্ট হয় ) না; আর যে সময়ে গৃহস্থাশ্রমে ছিল, সে সময়ে নম্রতা সহকারে বরং কোন মহাত্মার ( সাধুর ) সেবা করিবার জন্য উৎসুক হইত,

কিন্তু সংসার ত্যাগ করিবার পর, "আমি ত্যাগী হইয়াছি আর সকলেই আমাকে মানে, আর আদর সৎকার করে"—এইরূপ অবিবেক দ্বারা অভিমান ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। আর তাহাকে যদি কেহ কোন সদ্বিদ্যার উপদেশ দেয়, তবে তাহা শ্রবণ করে না; আর "আমি ত্যাগী"—এইরূপ মানিয়া বসিয়াছে। উহাতে কিরূপ হইয়াছে, না—নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তে যেমন, "বিড়াল নির্গমনে উষ্ট্রের প্রবেশ," দদ্রু আরাম করিতে গিয়া, শরীরে শ্বেত-কুষ্ঠ ব্যাধি বাহির করা হইল। তাৎপর্য্যার্থ এই যে, অল্প দুঃখ নিবারণ করিতে গিয়া মহৎ দুঃখের প্রাপ্তি হইল। এই দৃষ্টান্ত বিস্তারিত রূপে কহিতেছি, তুমি শ্রবণ কর।

কোন এক বৃদ্ধার গৃহের দালানে, একটী বিড়াল মরিয়া যাওয়াতে, সে উহাকে নিজেই বাহিরে ফেলিয়া দিবে, এইরূপ স্থির করিয়া ঘরের ভিতরের দ্বার বন্ধ ও দালানের দ্বার খুলিয়া রাখিয়া সেই মৃত বিড়ালকে ঝুড়িতে ধারণ করিয়া গ্রামের বাহিরে ফেলিয়া দিতে গেল। তৎপরে সেই বৃদ্ধা উহাকে ফেলিয়া দিয়া নদীতে স্নান ও বস্ত্রাদি ধৌত পূর্ব্বক গৃহাভিমুখে যখন আগমন করিল, তখন সে দেখিল যে, একটা মুমূর্ষু উষ্ট্র, তাহার দালানের ভিতর আসিয়া ঝটিতি মৃত্যুদশা প্রাপ্ত হইয়া পড়িল। তদ্দর্শনে সে মনে মনে বিচার করিতে লাগিল যে, হায়! আমি বিড়াল বাহির করিয়া ফেলিতে গেলাম, তাহাতে কিনা উল্টে উষ্ট্রের প্রবেশ হইল, অর্থাৎ তিল ছিল, তাল হইল। উহাকে আবার কেমন করিয়া ফেলা হইবে! এই এক নূতন ক্লেশের (চিন্তার) উৎপত্তি হইল।

তদ্রূপ বিচার ও বিবেক ব্যতীত, যে ব্যক্তি দেহাভিমান ছাড়িবার জন্য গৃহত্যাগ করে, তাহার অভ্যন্তরে ত্যাগের অভিমানরূপী যে উষ্ট্র, তাহা প্রবেশ করে; তাহার নির্গমন বড়ই কঠিন হইয়া থাকে। সেই জন্য জিজ্ঞাসা, অধিকার ও বিধি ব্যতীত কেবল বেশ ধারণ মাত্রই উহা দ্বারা, অথবা সকাম জপাদি কিম্বা অন্য সাধন দ্বারাও অহন্তা মমতা রূপ বন্ধনের নিবৃত্তি হয় না।

শিষ্য। তবে কোন সাধন দ্বারায় অহন্তা মমতার নিবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহা কৃপা করিয়া বলুন।

গুরু। বিবেকাদি সাধন সম্পন্ন হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্গুরুর শরণে যাইয়া

তাঁহার উপদেশ ধারণ পূর্ব্বক আত্মানাত্মার বিচার হইতে উৎপন্ন স্বরূপের জ্ঞানে অজ্ঞানের নিবৃত্তি দ্বারা সেই অহন্তা মমতার নিবৃত্তি হয়। তাহার বিচার এই যে, এই দেহে পঞ্চ ভূতের যে কার্য্য, তাহাই অনাত্মা, এবং উহা ঘটবৎ দৃশ্য হয়। আর যেমন ঘটের দ্রষ্টা ঘট হইতে পৃথক, তেমনি আমি দেহের দ্রষ্টা সেই জন্য দেহ হইতে পৃথক। আর দেহ জড়, আমি চেতন; দেহ বিকারী, আমি নির্ব্বিকার, দেহ ক্রিয়াবান্, সঙ্গবান, মলিন, আর আমি আত্মা অক্রিয়, অসঙ্গ, নির্ম্মল, তজ্জন্য আমি দেহ নহি। আর যেহেতু, দেহ আমি নহি, সেই হেতু দেহের কল্পিত ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ ও ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি আশ্রম, তথা বাল্য, যৌবন, বৃদ্ধ, স্থূল, কৃশ, হ্রস্ব, দীর্ঘ, শ্যাম, গৌর আদি যত দেহের ধর্ম্ম আছে, সে সকল আমার আত্মাতে নাই। এইরূপ বিচাব দ্বাবায় দেহ হইতে অহন্তা নিবৃত্ত হইয়া থাকে। আর দেবদত্ত, বিষ্ণুদত্ত, শিবদত্ত, আদি যে নাম, তাহাও দেহের ব্যবহার সিদ্ধির নিমিত্ত কল্পিত হয়, উহা আত্মাতে নহে। তথাপি' দেহ হইতে আত্মা পৃথক, এরূপ না জানিয়া দেহের কল্পিত নামে তুমি আত্মাতে অভিমান করিয়া থাক। তাহাকেও বিবেক পূর্ব্বক যুক্তি দ্বারা বিচার করিয়া নিবৃত্ত করা উচিত। যদ্রূপ, যদি কেহ তোমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, তুমি কে? তখন, তুমি এরূপ বল যে, আমি দেবদত্ত নামে অভিহিত হই। কিন্তু এখন তুমি বিচার করিয়া দেখ যে, এই তোমার স্থূল দেহ, ইহা দেবদত্ত, এরূপ নহে। এই দেহের জন্ম হইবাব পবে দশম অথবা দ্বাদশ দিবসে এই নাম দেওয়া হইয়াছে। যখন এই দেহ জন্মিয়াছে, তখন "দেবদত্ত" জন্মিয়াছে, এরূপ ঐ সময় বলা হয় না। আব যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, এই দেহে "দেবদত্ত" কে? তখন হস্ত স্পর্শ করিয়া নিদর্শন পূর্ব্বক এমন বলিতে পার না যে, এই "দেবদত্ত" আছে। যে স্থলে হস্ত দেও, সে স্থানে শির, মুখ, স্কন্ধ, পেট, পদ ইত্যাদি কহিতে হয়। এইরূপ বিচার হইতে যখন দেহের নাম দেহে ও বাস্তবিক সিদ্ধ হয় না, তখন দেহ হইতে পৃথক দ্রষ্টা যে তুমি আত্মা, তাহার "দেবদত্ত" নাম, ভাল। কোথা হইতে হইবে?

শিষ্য। আমি আত্মা, দেহ হইতে পৃথক্ কি প্রকারে হই? তাহার অনুভব যেরূপে স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারি, তদ্রূপ বর্ণন করুন।

গুরু। তুমি এরূপ বলিতেছ যে, আমার পূর্ব্ব জন্মের কৃতকর্ম্ম এই জন্মে আমি ভুগিতেছি, আর এখন যাহা করিব, তাহা অন্য জন্মে ভুগিব। তবে বিচার করিয়া দেখ, এই যে তোমার স্থূল দেহ, ইহা পূর্ব্বে ছিল না, এবং এখন বর্ত্তমানে মাতার উদর হইতে ইহার নূতন উৎপত্তি হইয়াছে। আর কর্ম্মের কর্ত্তা যে তুমি, পূর্ব্বে এই (বর্ত্তমান) দেহ হইতে কেহ পৃথক্ ছিলে, এবং ইহার নাশ হইবার পরে, ইহা (এই দেহ) ত থাকিবেই না, এবং এই দেহের কৃতকর্ম্মের ভোক্তা (যে তুমি, দেহ হইতে) পৃথক্ রহিয়াছে, এরূপ সিদ্ধ হইতেছে। তাহাতে স্থূল দেহ আত্মা নহে, এরূপ অনুভব তোমার হইতেছে কি না? আরও তুমি বলিতেছ যে, আমার দেহ, আমার হাত, পা, মাথা ইত্যাদি আমার আছে, কিন্তু আমি দেহ, আমি হাত, আমি পা, আমি মাথা ইত্যাদি কেহ বলে না। যেরূপ আমার গৃহ, আমার অট্টালিকা আমার গাড়ী ইত্যাদি সর্ব্ব বস্তু আমার আছে, এমন বলা যায়, কিন্তু আমি ঘর, আমি বাড়ী, আমি গাড়ী, এরূপ কেহ বলে না। তাহাতে- "আমার আছে"—এরূপ বক্তা পুরুষ নিজে সেই পদার্থ হইতে কোন কিছু পৃথক্ হইয়া থাকে। একপ বিচার দ্বারাও দেহ হইতে আত্মা পৃথক্, ইহা সিদ্ধ হয়। সে বিষয়ে অপর এক দৃষ্টান্ত বলিতেছি, তাহা বিচার করিয়া দেখ। দৃষ্টান্ত। যেমন, গৃহে "আড়কাটা" (কড়ি) ও "বরগা" দিতে হয়, থাম দ্বার জানালা করিতে হয়, ইট পাথর এবং কাদা হইতে ভিত প্রস্তুত করিতে হয়, তাহার উপর সাদা কালা কিম্বা লাল রং দেওয়া হইয়া থাকে, আর সেই চালা ঘর খড়ের হওয়ায় উহার চালের উপর ঘাসও জন্মিয়া থাকে, এরূপ গৃহে নিবাসকারী পুরুষ যেমন "গৃহরূপ" হয় না, গৃহ হইতে পৃথকই থাকে, আর আমি ঘর, এরূপ কখন বলেও না। তদ্রূপ, এই দেহরূপী ঘর, যাহাতে "আড়কাটারূপী" পিটের শিরদাঁড়া হাড় আছে, পাঁজররূপ "বরগা" আছে, হাত পা রূপী থাম আছে, আর অপর হাড় ও মাংসরূপী ইট পাথর এবং কাদা আছে, আর সাদা কাল অথবা লাল চামড়ারূপী রং আছে, চোখ, কাণ, নাকও মুখরূপী জানালা আছে, লোমরূপী ঘাস উদ্ভব হইয়াছে, এমন দেহরূপী ঘরের স্রষ্টা যে আত্মা তুমি, দেহরূপ নহ, সেই দেহ হইতে পৃথক্ হও। সেই জন্য উপরোক্ত

বিচারের দ্বারা আমি দেহ হই, এরূপ অভিমান বিনাশ হইতেছে। তাহা ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে যে বিনষ্ট হয়, এরূপ নহে।

শিষ্য। হে গুরো! আপনি যেরূপ বলিলেন, এই প্রকারে বিচার করিলে, এই "দেহ আমি নহি" এরূপ জানিলে দেহ হইতে অহন্তা নিবৃত্ত হয়, তথাপি "দেহ আমার"—এরূপ মমতা ত রহিল। আব দৃষ্টান্ত দ্বারা অনুভবেতেও আসিতেছে। যেমন, ঘটের দ্রষ্টা আমি, ঘট নহি, পরন্তু ঘট আমার, এরূপ বলা যায়। যেমন, গৃহ নিবাসী আমি, গৃহ নহি, কিন্তু গৃহ আমার, এরূপ বলা যায়, তেমনি, দেহের দ্রষ্টা আমি, দেহ নহি, কিন্তু "এই দেহ আমার"—এরূপ বলাতে মমত্বও দেখা যাইতেছে। সেই মমত্ব, যে বিচার দ্বারা নিবৃত্ত হয়, তাহা কৃপা করিয়া বলুন।

গুরু। হে ভাই! যেমন, "দেহ" তুমি নহ, তেমনি "দেহও" তোমার নহে। কারণ কি, সেই দেহত পঞ্চ মহাভূতের হয়। পরন্তু তুমি অজ্ঞান দ্বারা "আমার"—এরূপ বলিতেছ। যেমন, ঘট পৃথিবীর (মৃত্তিকার), আর তুমি বলিতেছ—"আমার"। যেরূপ ঘর পাথরের কাটের চুণের ইত্যাদির,—কিন্তু তুমি প্রমাদ দ্বারা "আমার"—এরূপ বলিতেছ। তেমনি, হাড়, মাংস, ত্বক্, রুধির ইত্যাদি হইতে রচিত ভৌতিক দেহ হয়, উহাকে তুমি "আমার" এরূপ বলিতেছ, উহা তোমার বড়ই প্রমাদ হয়। হাড় আর চামড়া "আমার" হয়, উত্তম জাতি ত এরূপ বলে না, আর তুমি ভুলিয়া (প্রমাদ বশতঃ) অস্থি চর্ম্মের দেহ আমার, আর সেই দেহ আমি হই, এরূপ স্বীকার করিতেছ। উহাই তোমার বন্ধনের কারণ। আরও পঞ্চভূতের দেহকে তুমি তোমার বল, তাহাতে পঞ্চভূত তোমাকে দুঃখ দিবে। যখন লোকে কল্পিত ভূতাবেশের সম্বন্ধে দুঃখ প্রাপ্ত হয়, তখন এই প্রসিদ্ধ পঞ্চমহাভূতের দেহে, যদি তুমি মমতা কর, তাহা হইলে, এই ভূত তোমাকে কেন ছাড়িবে? আর অন্যের বস্তুতে মমত্ব করিলে, কেহই সুখী হয় না। কেবল দুঃখী মাত্রই হইয়া থাকে। সে বিষয়ে, এক দৃষ্টান্ত বলিতেছি, তাহা বিচার করিয়া দেখ।

দৃষ্টান্ত। কোন এক ধনবান গৃহস্থ ছিল, তাহার "সপ্তাহ-কথা-যজ্ঞ" (ভাগবতের সপ্তাহ কথা) অথবা "ব্রাহ্মণ ভোজন" কিম্বা "স্বজাতি ভোজন"—

ইত্যাদি কিছু "শুভ-কাজ" করিবার ইচ্ছা হইল; কিন্তু নিজের গৃহ সমীপে যজ্ঞ স্থানের সংকীর্ণতা বশতঃ যজ্ঞ করিতে অসমর্থ হওয়াতে সুতরাং "পঞ্চের" বাড়ীতে (পাঁচ জনে মিলিয়া অর্থ ব্যয়ে নির্ম্মাণ করিয়াছে যে বাড়ী অথবা জ্ঞাতীর বাড়ীতে সুতরাং পাঁচ জনেরই বাড়ীতে) যজ্ঞ সম্পন্ন করিবার বিচার করিয়া—"পঞ্চ" হইতে বাড়ী সাময়িক ব্যবহারার্থ চাহিয়া লইল। আর উহাতে যাইয়া সহকুটুম্ব ও সপরিবারে নিবাস করিল। অল্পদিন গত হইলে পর, তাহার শুভ কার্য্য করিবার যে বিচার (সঙ্কল্প) ছিল, উহাতে (লোভাদি দুর্গুণ ভাব মনে আসিয়া, সেই বিঘ্ন দ্বারা প্রোক্ত "শুভ-বিচার" দূর হইয়া গেল, (অর্থাৎ যজ্ঞাদি সাধন কার্য্য হইল না)। আর বাড়ীর বিস্তৃত জায়গার সুখলাভে অনেক দিবস সেই বাড়ীতে থাকিল। তাহার পরে বাড়ীর মালীক যে পঞ্চ (জ্ঞাতি), সেই বাড়ী খালি করিয়া দিবার জন্য কোন লোকের দ্বারা তাহাকে সম্বাদ দিল। এরূপ করিলেও সেই "ভাই" (অর্থাৎ ধনী) উহাদের তদ্বাক্য কিছুই মনে গ্রাহ্য করে না, (অর্থাৎ শুনে না)। তখন "পঞ্চ" মিলিয়া তাহাকে ডাকিল। কিন্তু অনেক প্রকারের প্ররোচনা বচন (মিথ্যা বাক্য) বলিয়া উহাদের কাছে যায় না, আর উল্টা কথা বলিতে লাগিল যে, এই বাড়ীতে আমার, "পঞ্চের" কি সম্বন্ধ ইহাতে আছে? ইহা শুনিয়া "পঞ্চ" এইরূপ ধারণা করিল যে, আচ্ছা। এখন না দিউক্, তবে কিছুদিন পরে আমাদের বাড়ী ছাড়িয়া দিবে। এইরূপ মনে করিয়া তাহারা অনেক দিবস গত অতিবাহিত করিল, তথাপি বাড়ী সমর্পণ করিল না। তাহার পরে, "পঞ্চে"—সরকারকে ফরিয়াদি করিয়া ন্যায়াধীশ (বিচার কর্ত্তার) সম্মুখে, তাহাকে বন্ধন করিয়া আনাইল। তখন ন্যায়াধীশ বলিলেন যে, "পঞ্চের" বাড়ী, কার্য্যের অবশেষে উহা পঞ্চকে কেন খালি করিয়া দাও নাই? সে বলিল যে, বাড়ী আমার, উহাতে "পঞ্চের" কোন দাবি দাওয়ার সম্বন্ধ নাই। এ কথার উপর সরকার সাক্ষী ও খৎ পত্রের সিদ্ধতা (প্রমাণ প্রয়োগ) চাহিলেন। কিন্তু তাহা না দেওয়ায়, যাহা মনে হইল, তাহাই বলিতে লাগিল। তাহাতে সরকার (ন্যায়াধীশ) খেদ করিয়া আদেশ করিলেন যে, যে পর্য্যন্ত তুমি উহাকে

বাড়ী স্বাধীন করিয়া না দিবে, সে পর্য্যন্ত তুমি এই কারাগৃহ হইতে মুক্ত হইতে পাইবে না।

সিদ্ধান্ত। জীবরূপী ধনবান পুরুষের মোক্ষ সম্পাদন করণরূপী শুভকর্ম্ম করিবার ইচ্ছা হইল; কিন্তু নিজের যদি দেবগন্ধর্ব্বাদি শরীরে ভোগশক্তি হয়, তাহা হইলে, আত্মজ্ঞান হয় না এবং পশুপক্ষী আদি দেহে অতি মূঢ়তার যোগ (তমোগুণাক্রুষ্ট) হওয়ায়ও আত্মজ্ঞান হয় না, তাহাতে মোক্ষদ্বাররূপ এই মনুষ্য দেহ পঞ্চ মহাভূত হইতে যাচিঞ্চা করিয়া লইল। আর উহাতে আসিয়া নিবাস করিল, তথাপি মনুষ্য শরীরে ও অনেক বিষয়ের আসক্তিরূপী বিঘ্ন হওয়ায় আত্মজ্ঞান দ্বারা মোক্ষ হওয়ার বিচার করিতে ভুলিয়া গেল; আর তদ্বিপরীতে পঞ্চভূতের দেহ আমার হয়, এরূপ স্বীকার করিয়া বসিল তৎপরে পঞ্চভূতে শাস্ত্র দ্বারা সংবাদ দিল যে, এই দেহ পঞ্চভূতের হয়, তজ্জন্য ইহাতে অভিমান ও মমত্ব করিবে না, অথবা (অভিমান ও মমত্ব) করা উচিতও নয় তথাপি এইরূপ শাস্ত্র বাক্যতে তাহার প্রয়োজন হইল না, অর্থাৎ তদ্বাক মনে ধারণা করিল না। তাহাকে কোন স্নেহী, সৎপরুষ বা সন্মিত্র, বেদান্ত শ্রবণ করিবার উপদেশ করিলেন, তাহাতে সে যা' তা' বলিতে লাগিল, আর আমার সময় নাই, একপ কহিয়া তদ্বাক্যে অনাদর করিল।

এইরূপ (ব্যবহার) চলিলে, পঞ্চভূতে অনেক দিন পর্য্যন্ত উহার রায় (বাক্যের ও ব্যবহারের অপেক্ষা করিয়া) দেখিল যে, আজ না হয় কাল, আত্মবিচার করিয়া আমার দেহ আমাকে পুনঃ স্বাধীন করিয়া দিবে। কিন্তু সেই ব্যক্তি (অজ্ঞান জীব) কিছুমাত্র বিচার করিল না। তাহাতে পরে, পঞ্চভূত যমরাজের নিকট নালিশ করিয়া বলিল যে, এই অজ্ঞানী জীব, আমার কার্য্যরূপ (অর্থাৎ আমা হইতে উদ্ভব) মনুষ্য দেহকে মোক্ষের সাধন সম্পাদন করিবার জন্য লইয়াছিল, কিন্তু তাহার কিছুই করে নাই। বরং তদ্বিপরীতে দেহের মালিক (স্বত্বাধিকারীর অভিমানী) হইয়া বসিয়াছে। অতএব, আমার দেহ, আমাকে পুনরায় ফেরত দেওয়া হউক। তৎপরে যমরাজ নিজের দূতকে পাঠাইয়া সেই অজ্ঞানীকে ডাকাইলেন। তাহাতে সে ব্যাকুলতা সহকারে, পূর্ব্বভান রহিত হইয়া, যমরাজের নিকট যাইতে প্রস্তুত হইল। পরন্তু সে সময়ে, আমার এই কাজ আছে, এখন

আমি যাইতে পারিব না, এরূপ বলিতে সক্ষম হয় নাই এবং রোদনাক্রান্ত স্ত্রীপুত্রাদি সম্বন্ধীকে ত্যাগ করিয়া নিজে যম রাজার দূত সমভিব্যাহারে বাধ্য হইয়া যমলোকে গেল। তৎপরে যমরাজা বলিলেন, এই পঞ্চভূতের দেহ, পঞ্চভূতকে কেন স্বাধীন করিয়া দেও নাই? তখন সেই অজ্ঞানী বলিতে লাগিল যে, এই দেহ আমার ইহাতে পঞ্চভূতের কি সম্বন্ধ? তখন পঞ্চভূতে প্রমাণ দিল যে, এই স্থূল দেহ তথা সূক্ষ্ম দেহ আমাদের হয়, তাহাতে চারি বেদ, অষ্টাদশ পুরাণ আদি সর্ব্বশাস্ত্রের প্রমাণরূপী সাক্ষী দিল, এবং সেই অজ্ঞানী জীব হইতে, "আমার এই দেহ" হয়, এরূপ সিদ্ধ হইল না। তদ্ধেতু যমরাজ, সেই অজ্ঞকে অপরের দেহ নিজের বলিয়া মানায় ৮৪ লক্ষ যোনিরূপ কয়েদখানাতে প্রেরণ করিলেন। আর এইরূপ হুকুম করিলেন যে, পঞ্চভূতের দেহ, স্বাধীন করা ব্যতীত, তুমি উহা হইতে বাহিরে যাইবে না। তাহাতে, হে শিষ্য। পঞ্চভূতের দেহ, তাহাকে তুমি "আমার" বলিয়া জানিও না আর উহাকে স্বাধীন কর, অর্থাৎ "দেহ"--দৃশ্য হয়, তজ্জন্য উহা আমি নহি, আর উহা পঞ্চভূতের হয়, তজ্জন্য উহা আমার নহে, এরূপ বিবেক দ্বারা দেহ হইতে অহন্তা ও মমতা ত্যাগ করিয়া দাও। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅপূর্ণকৃষ্ণ শর্ম্মা।

---

# আমিষ ও নিরামিষ আহার।

( ৪র্থ সংখ্যার ১৩৮ পৃষ্ঠার পর হইতে )

পাশ্চাত্য ডাক্তারেরা বলেন, যে সকল খাদ্য দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিলে যবক্ষার ১ ভাগ, মেদ ১ ভাগ ও শ্বেতসার ২½ ভাগ পাওয়া যায় তাহাই পুষ্টিকর খাদ্য। কোন এক দ্রব্যে ঐ তিনটি উপাদান ঐ পরিমাণে বিদ্যমান দেখা যায় না—এই কারণে আমরা পাঁচ রকম খাদ্য দ্রব্য একসঙ্গে আহার করি।

বহু পরীক্ষার দ্বারা পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা দেখিয়াছেন যে কেবলমাত্র যবক্ষার অথবা শ্বেতসারময় পদার্থ আহার করিয়া কোন জীব অধিক কাল জীবন ধারণ করিতে পারে না।

প্রকৃত অনুসন্ধিৎসুর ন্যায় চরকঋষি প্রায় সর্ব্বপ্রকার মাংসের গুণবর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু পরিশেষে বলিয়াছেন, 'তত্রাহিংসা প্রাণিনাং প্রাণবর্দ্ধনানামুৎকৃষ্টতমং"। "বীর্য্যং বলবর্দ্ধানানাম্"। মনু যে তিন শ্লোকে (৫।২৮ ২৯।৩০) মাংস ভক্ষণ প্রশস্ত বলিয়া লিখিয়াছেন, তাহা অন্য ভোজ্যের অভাবে প্রাণ সঙ্কট কালে ব্যবহৃত হইতে পারে, এইরূপ মন্তব্যই প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র কারণ তাহার পরের শ্লোকসমূহে বলিয়াছেন যে যজ্ঞে ভিন্ন অন্য কোন সময়ে মাংস ভক্ষণ করিবে না। নিতান্ত লোভ হইলে ঘৃতময়ী বা পিষ্টকময়ী পশু প্রতিকৃতি করিয়া ভোজন করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। (৫।৩৭) "মধুপর্কে চ যজ্ঞেচ, পিতৃ দৈবত কর্ম্মণি, অত্রৈব পশবোহিংসা নান্যত্রেত্যব্রবীন্মনু" মধুপর্কের জন্য জ্যোতিষ্টোমাদি যাগের জন্য এবং পিতৃ ও দৈব ক্রিয়ার নিমিত্তই পশু হিংসা করিবে, অন্য কোন উপলক্ষে করিও না। অন্যত্র বলিয়াছেন "নাকৃত্বা প্রাণিনাং হিংসাং মাংসমুৎপদ্যতে ক্কচিৎ। নচ প্রাণিবধঃ স্বর্গস্তাম্মাংসাং বিবর্জ্জয়েৎ।" ইত্যাদি।

৫। নিরামিষ আহারে রত থাকিলে বংশনাশ বশতঃ মনুষ্য জাতির লোপ সম্ভাবনা হইতে পারে এ যুক্তির কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। নিরামিষাশী পশুপক্ষীই বহুপ্রজ ও অ তকামী। তবে এইপ্রকার আহার যে ইন্দ্রিয় সংযমের বিশেষ সহায়, ইহা অনেকেরই প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। অধিকন্তু যোগমার্গ প্রবেশোন্মুখ সাধক দিগকে শাস্ত্রে নিরামিষ ভোজন করিতে পরামর্শ দিয়াছেন।

৬। পৃথিবীর প্রায় সকল স্থাবর জঙ্গমই, প্রজাপতি, জীবের অন্নস্বরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন,—অচরতৃণাদি স্থাবর চরণশীল পশু পক্ষ্যাদি জঙ্গমের ভোজ্য, দন্তশালী প্রাণিগণ দন্তহীন প্রাণিদিগকে ভক্ষণ করে, হস্তহীন মৎস্যাদি হস্ত-বিশিষ্ট মনুষ্যাদির ভক্ষ্য এবং ভীরুজাবেরা চিরকালই বীরগণের অন্ন (মনু ৫।২৮।২০)। পশু সকল কেবলমাত্র মনুষ্যের আহারের নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছে, ইহা অন্ধদৃষ্টি নাস্তিকের কথা। জগতে দেখিতে পাই মৃত্তিকা স্বকীয় জীবন-রস উৎসর্গ করিয়া বৃক্ষ লতা প্রভৃতি উদ্ভিদ সকলকে পুষ্ট করিতেছে। বৃক্ষ, লতা, ফুল, ফল প্রভৃতি উদ্ভিজ্জেরা আপনাদের জীবন উৎসর্গ করিয়া (নিরামিষাশী) প্রাণি-বর্গকে পুষ্ট করিতেছে। বলবান জীব সকল দুর্ব্বলের উৎসর্গী-

কৃত দেহের দ্বারা জীবন রক্ষা ও বর্দ্ধন করিতেছে। ধাতু, উদ্ভিদ ও পশু জগতে প্রকৃতির নিয়ম বলবান এবং অলঙ্ঘনীয়, কিন্তু চিন্তাশীল মনুষ্য সর্ব্ব বিষয়েই ইষ্টানিষ্ট বিচার পূর্ব্বক কার্য্য করেন, তাঁহারা দেখেন যে প্রাণি সকল প্রাণ উৎসর্গ করিয়া প্রজাপতির যজ্ঞ পালন করিতেছে। এইরূপ যজ্ঞের দ্বারা ক্রমোন্নতি সাধিত হয়। কিন্তু চিন্তাশীল আদর্শ দেহধারী মনুষ্য ক্রমোন্নতি পদ্ধতি বিচার পূর্ব্বক স্থির করেন যে, তাঁহার দৈহিক উন্নতি কল্পে যে সকল প্রাণী সহায়তা করিয়াছে, তাহাদের ঋণ হইতে মুক্ত হওয়াই ধর্ম্ম এবং স্বার্থ ত্যাগরূপ যজ্ঞ বিধানই উক্ত ঋণ মুক্তির উপায়। প্রকৃতি অন্ধশক্তি সহায় পূর্ব্বক মনের ব্যবহার্য্য উপযুক্ত আদর্শ দেহ গঠন করিয়াই নিশ্চিন্ত; কিন্তু মনের প্রয়োগকর্ত্তা চিন্তাশীল জীব ক্রমোন্নতি সাধনেচ্ছু হইয়া উপরোক্ত প্রাকৃতিক যজ্ঞ রূপান্তরে পরিণত করিয়া থাকেন। তখন গৃহস্থের পক্ষে পঞ্চসূনা জনিত 'বধস্থান' ও ক্রিয়া দ্বারা যে পাপ উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য স্বার্থ ত্যাগরূপ পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান বিহিত হয়। ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, ( পশু পক্ষ্যাদিকে অন্নাদি প্রদানরূপ বলির নাম ) এবং মনুষ্যযজ্ঞ অতিথি সেবার নাম ) [ মনু ৩।৬৭।৭ ]। জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিয়া এই সকল যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা চিন্তাশীল মনুষ্য স্বার্থ ত্যাগ করিতে শিখে। তখন 'পরোপকারায় সত্যং জীবনং' এই জ্ঞান ফুটিয়া উঠে এবং সর্ব্বভূত হিতে রত হইয়া নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করাই মনুষ্যত্ব, চিন্তাশীল জীব বুঝিতে পারে। তখন 'স্বচ্ছন্দ বনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে, অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কঃ কুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ' এইরূপ যুক্তিচিন্তা মনে উদয় হয়। মানুষ বিচার করেন, স্থাবর জঙ্গম উভয়ই যখন খাদ্য, তখন অপেক্ষাকৃত উন্নত, সুখ দুঃখ আরাম যন্ত্রণাবোধ বিশিষ্ট জীবের বিকাশশীল দেহ ধ্বংস না করিয়া নিম্নস্তরস্থিত অল্পপ্রাণবিকাশসম্পন্ন উদ্ভিদাদি দ্বারাই দেহরক্ষা করা শ্রেয়। আবার ক্রমোন্নতি দ্বারা মানুষ দেবতাগামী হয়, এই স্থূল দেহ তখন অল্পাহারেই বিশেষ কার্য্যকরী হয়, কারণ মন ও ইন্দ্রিয় সকল অধিক সময় দেহাতীত চিৎ স্বরূপে অবস্থিত থাকা হেতু দৈহিক ক্ষয় অল্পই সাধিত হয়, কাযেই দিবসের মধ্যে একবার মাত্র এক মুষ্টি হবিষ্যান্ন ও মাতৃস্নেহবহুলা সামান্য গাভী দুগ্ধই তখন তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট ও প্রকৃষ্ট আহার।

আরও উচ্চ মার্গগামী মানুষ দুই চারিটা ফল খাইয়া স্বচ্ছন্দে দেহ ধারণ করিয়া থাকেন এবং ক্রমোন্নতি দ্বারা যখন মানুষ ঋষিত্ব লাভ করেন তখন আর দেহ রক্ষার জন্য পঞ্চ ভূতের আহুতি প্রয়োজন হয় না।

( ক্রমশঃ )

শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষাল।

# আমি ও আমার দেহ।

## মনোময় কোষ।

### কামময় দেহ।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

বুঝা গেল, স্থূল মস্তিষ্কের দ্বারা চিন্তার সকল ব্যাপার নিষ্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে, তাহার জন্য কোন সূক্ষ্মতর যন্ত্র আবশ্যক। মনুষ্যমাত্রেরই এইরূপ যন্ত্র আছে। বৈদান্তিকেরা ইহাকেই মনোময় কোষ নাম দিয়াছেন। মস্তিষ্ক যেমন সকলের সমান নহে, এই মনোময় কোষও সেইরূপ সকলের সমান নহে। কোথাও বীজমাত্র, কোথাও অর্দ্ধ অঙ্কুরিত, কোথাও পূর্ণ বিকশিত। কোথাও কুঁড়ি, কোথাও ফোটা ফুল। একজন অসভ্য বনচর কুকীর মনোময় কোষের ভিতর গঠনের কোন বিশেষ চিহ্ন লক্ষিত হয় না, তাহা কেবল কতকগুলি অগঠিত উপাদান সমষ্টিমাত্র। যেমন কতকগুলি লৌহকণার সমষ্টির দ্বারা কাটারির কাজ করা যায় না, সেইরূপ সেই মনোময় কোষের দ্বারা বিশেষ কোন কার্য্য হয় না। পক্ষান্তরে শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় মনস্বীবর্গের মনোময় কোষ অতি চমৎকার সুগঠিত যন্ত্র, বলিতে গেলে তাহা দ্বারা অসাধ্য সাধন করা যাইতে পারে। কোন্ মানুষ কতটুকু উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহার চিন্তাশক্তির কিরূপ স্ফূরণ হইয়াছে, অধ্যাত্ম জগতে তাহার কোথায় স্থান, তাহা তাহার মনোময় কোষের গঠন প্রণালী দেখিলেই কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। সুতরাং মনোময় কোষের গঠনের প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রত্যেক উন্নতি প্রয়াসী মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য।

এই মনোময় কোষের স্থূলাংশ যাহাকে আমরা "কামময় দেহ" নামে অভিহিত করিয়াছি, যাহা আমাদের ভুবর্লোকে বিচরণ করিবার যান, তাহা কিরূপে সুগঠিত ও কার্য্যোপযোগী করিতে হয়, আমরা এই অধ্যায়ে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব। পর অধ্যায়ে ইহার অপরাংশের কথা আলোচনা করা যাইবে।

ভূলোকের উপাদান লইয়া যেরূপ স্থূল দেহ গঠিত, ভুবর্লোকের উপাদান লইয়া সেইরূপ কামময় দেহ গঠিত। ভূলোকের পদার্থ সমূহের মধ্যে যেরূপ ক্ষিত্যপতেজাদি ভেদ আছে, ভুবর্লোকের পদার্থ সমূহের মধ্যেও সেইরূপ আছে। ভূলোকে যেমন কোন পদার্থ স্থূল, কোন পদার্থ অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম, ভুবর্লোকেও সেইরূপ। উপাদানের নির্ম্মলতার উপর যেমন স্থূল দেহের সংস্কার নির্ভর করে, কামময় দেহের সংস্কার ও সেইরূপ নির্ভর করে। কামময় দেহকে সুসংস্কৃত ও সুপরিষ্কৃত করিতে হইলে ভুবর্লোক হইতে বাছিয়া বাছিয়া উপকরণ লইয়া তাহাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে; যাহা অপবিত্র, যাহা অশুচি, তাহা দূরে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে, এ কার্য্য কি করিয়া সম্পন্ন করা যাইতে পারে? আহারের দ্বারা স্থূল দেহের উপাদান সংগৃহীত হয়, সুতরাং আহারের দিকে দৃষ্টি রাখিলেই স্থূল দেহের নির্ম্মলতা সাধন করা যায়। কিন্তু কি উপায়ে ভুবর্লোকের পবিত্র উপাদান সমূহ সংগ্রহ করিয়া কামময় দেহের পুষ্টিসাধন করা যাইতে পারে?

কামময় দেহের একদিকে স্থূল দেহ, অপর দিকে মনোময় কোষের উচ্চতর স্তর। এই উভয়ের সহিত কামময় দেহের বড়ই ঘনিষ্ট সম্পর্ক। এই উভয় দিক হইতে স্পন্দন সমূহ আসিয়া কামময় দেহে নিয়ত নানারূপ তরঙ্গ তুলিতেছে। সেই সকল তরঙ্গের প্রকৃতির উপর কামময় দেহের শুভাশুভ বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। সুতরাং কামময় দেহকে পরিষ্কার করিতে হইলে স্থূলদেহ ও মন উভয়ই পরিষ্কার করা প্রয়োজন।

যাঁহার স্থূলদেহ সুনির্ম্মল ও সুপবিত্র উপাদানে গঠিত, তাঁহার কামময় দেহে ভুবর্লোক হইতে কেবল পবিত্র উপাদান সমূহই আকৃষ্ট হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে যিনি অশুচি ও অপবিত্র আহারের দ্বারা স্বীয় স্থূলদেহের পুষ্টিসাধন

করিয়া থাকেন, তাঁহার কামময় দেহ ভুবর্লোকের অপবিত্র স্থূল উপাদান সমূহ স্বতঃই আকর্ষণ করিয়া থাকে। শুধু তাই নয়। অপবিত্র আহারে ভুবর্লোক হইতে আরও বিপদের আশঙ্কা আছে, সে কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। মাতাল লম্পট প্রভৃতি যে সব ব্যক্তি ইহলোকে হীন অপকৃষ্ট জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছে, তাহাদের অনেকেই এখনও ভুবর্লোকে অবস্থান করিতেছে। তাহাদের ইহজীবন শেষ হইয়াছে, কিন্তু ভোগ পিপাসা এখনও মিটে নাই, বাসনার এখনও অবসান হয় নাই। মদ্যাদির জন্য এখনও তাহাদের প্রাণ আকুল হয়, সুতরাং যেখানে এই সকল দ্রব্যের ছড়াছড়ি সেই খানেই তাহারা ছুটিয়া যায় এবং ইহলোকে তাহাদের অনুরূপ প্রকৃতি যে সকল ব্যক্তি আছে তাহাদের কামময় দেহ আশ্রয় করিয়া স্বীয় অদম্য তৃষ্ণা চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করে বলিতে হইবে না যে এই সকল জঘন্য জীবের সহবাস কোন উন্নতিপ্রয়াসী বুদ্ধিমানের প্রার্থনীয় হইতে পারে না।

কিন্তু শুধু আহার পবিত্র হইলেই হইবে না, মন পরিষ্কার করা চাই। ভুবর্লোকে দৃষ্টিপাত করিলে বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত বহুরূপধারী অসংখ্য পদার্থ সমূহকে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে দেখা যায়। এ গুলি আমাদের "সাকার চিন্তা"। "সাকার চিন্তার" কথা শুনিয়া অনেক পাঠকই চমকিয়া উঠিবেন সন্দেহ নাই। চিন্তার আবার আকার কি। কিন্তু বাস্তবিকই চিন্তার আকার আছে, সূক্ষ্মজগৎদর্শনক্ষম ব্যক্তি মাত্রেই তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। আমরা যে সকল চিন্তা করিতেছি তাহা প্রথমে আমাদের মনোময় কোষে স্পন্দন উৎপাদন করিতেছে, পরে বহির্গত হইয়া ভুবর্লোক বা স্বর্লোক হইতে নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী উপাদান সংগ্রহ করিয়া আকার ধারণ করিতেছে।

এক এক চিন্তার এক এক রূপ। যে চিন্তার যেমন ভাব ও প্রকৃতি, তাহার তেমনি বর্ণ ও আকৃতি। আধ্যাত্মিকতা নবজলধর শ্যাম, ভক্তি নীল, জ্ঞান পীত, প্রীতি গোলাপী, ক্রোধ লোহিত, সহানুভূতি হরিত,—এইরূপ এক এক ভাবের এক এক প্রকার বর্ণ। প্রত্যেক ভাবের আবার নানা মূর্ত্তি। কোনটা পুষ্পাকার কোনটা গোলাকার, কোনটা মুকুটাকার, কোনটা শুণ্ডাকার, এইরূপ অসংখ্য আকার। সে সকল অদ্ভুত অপার্থিব মূর্ত্তির বর্ণনা করা বা তাহাদিগকে চিত্রিত করা স্থূল পার্থিব লেখনী বা তুলিকার সাধ্য নহে।

মাননীয়া মিসেস বেসাণ্ট মহোদয়া ও মান্যবর মিষ্টার লেডবিটার মহোদয় তাঁহাদের রচিত "Thought Forms" নামক পুস্তকে এই সকল চিত্রের কিঞ্চিৎ আভাস দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, পাঠক ইচ্ছা করিলে তদ্দর্শনে কথঞ্চিৎ কৌতূহল নিবারণ করিতে পারেন।

উদাহরণ স্বরূপ আমরা সেই পুস্তকে অঙ্কিত দুই একটি চিত্রের উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইব। একটি চিত্র রক্তবর্ণ কৃপাণের ন্যায়, দেখিলেই বোধ হয় যেন কাহাকে মারিতে ছুটিয়াছে। এটি কোন ক্রোধোন্মত্ত ব্যক্তির চিন্তার মূর্ত্তি। আর একটি চিত্র ঠিক যেন নীল পদ্মের মত। কোন ভক্ত স্বীয় ইষ্ট দেবের নিকট আত্মসমর্পণ করিবার সময় তাঁহার মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল তাহা এই মনোহর আকারে সূক্ষ্ম জগতে প্রকট হইয়াছিল। ছবিটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গাপূজার কথা মনে পড়ে। শুনিতে পাই নীল পদ্ম দিয়া মায়ের পূজা করিয়া তবে তিনি বিজয় লাভ করিয়াছিলেন। সে নীলপদ্ম কি স্থূল নীলপদ্ম না আত্ম-বলিদান? তা বলিতে পারি না, তবে শেষোক্ত পদার্থটি যে পূজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ,—সিদ্ধি লাভের চরম উপায়—ইহা বোধ হয় সর্ব্ববাদী সম্মত। সে যাহা হউক আমাদের চিন্তার ফলে ভুবর্লোক কিরূপ ভাবে প্রতিক্ষণ আলোড়িত হইতেছে আশা করি পাঠকবর্গ এক্ষণে তাহা কতকটা বুঝিতে পারিতেছেন।

কিন্তু একটা কথা এখানে বলা আবশ্যক। পরহিতচিন্তা প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর চিন্তা সমূহ মূর্ত্তি ধারণ করিবার সময় স্বর্লোক হইতে স্বানুরূপ সূক্ষ্ম উপাদান সংগ্রহ করে, তাহাদের প্রকাশ স্বর্লোকে। কাম ক্রোধাদি নিম্ন শ্রেণীর ভাব সমূহই ভুবর্লোক হইতে উপাদান লইয়া নিজ অঙ্গ গঠিত করে। চিন্তা যত নিম্ন শ্রেণীর হয়, যত অধিক কামনা-বিজড়িত স্বার্থ-কলুষিত হয়,—তাহার অঙ্গও তত স্থূল হয়। এই সকল নিম্নশ্রেণীর চিন্তার লীলাক্ষেত্র কামময় দেহ। এই ভাবের যে চিন্তা আমাদের মনে যখনই উদয় হইতেছে তখনই তাহা আমাদের কামময় দেহে স্বমূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইতেছে।

কামময় দেহকে সংস্কৃত করিতে হইলে এই সকল চিন্তার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কামময় দেহের ভবিষ্যৎ ইহাদের উপরই নির্ভর করি-

তেছে। উপরে বলিয়াছি চিন্তা যত নিম্ন শ্রেণীর হয় তাহার অঙ্গও তত স্থূল হয়। নিজ প্রকৃতির অনুরূপ আধার খুঁজিয়া লওয়া চিন্তার স্বভাব। নীচ চিন্তা মনোময় কোষের উচ্চতর স্তরে কোন স্পন্দন উৎপন্ন করে না। পক্ষান্তরে উচ্চ চিন্তাতরঙ্গ ভুবর্লোকের অপেক্ষাকৃত স্থূল উপাদান দ্বারা বাহিত হওয়া সম্ভব নহে। শব্দতরঙ্গ, আলোকতরঙ্গ, তড়িৎতরঙ্গ প্রভৃতির কথা বিবেচনা করিলেই এ কথাটা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝা যাইবে। কেহ কোন শব্দ করিলে বায়ু তাহা স্বচ্ছন্দে বহিয়া লইয়া যায়, কিন্তু আলোক বা তড়িতের ন্যায় সূক্ষ্ম তরঙ্গ বহন করা স্থূল বায়ুর কর্ম নয়, তাহার জন্য ইথারের ন্যায় সূক্ষ্ম আধারের প্রয়োজন হয়। সেইরূপ চিন্তা যত উচ্চ হয়, তাহার যানও তত সূক্ষ্ম হয়। সুতরাং যিনি কেবল উচ্চ চিন্তা করেন, তাঁহার কামময় দেহের নিম্নতর স্থূল স্তর সমূহ অলস ভাবে পড়িয়া থাকে, অনুশীলনের অভাবে তাহারা ক্রমে ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতর ও সূক্ষ্মতর স্তরগুলি সর্ব্বদা স্পন্দিত হওয়াতে পুষ্ট হইতে থাকে। এইরূপে কামময় দেহ দিন দিন অধিকতর নির্ম্মল হইতে থাকে।

আমাদের কামময় দেহের উপর আমাদের নিজের চিন্তা ছাড়া অপরের চিন্তার প্রভাবও বড় কম নয়। আমরা যাঁহাদের মধ্যে বাস করি তাঁহাদের চিন্তা সমূহ আকার পরিগ্রহ করিয়া আমাদের চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা ভুবর্লোকে যে সকল তরঙ্গ উৎপাদন করিতেছে, সে গুলি আসিয়া অনবরত আমাদের কামময় দেহকে আঘাত করিতেছে এবং তাহা আন্দোলিত করিয়া তাহাতে স্বানুরূপ তরঙ্গ তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু যদি উপযুক্ত ক্ষেত্র পায় তবেই তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হয়, নতুবা নহে। যাঁহাদের কামময় দেহ নির্ম্মল ও সূক্ষ্ম উপাদান নির্ম্মিত, তাঁহাদের উপর নিম্ন শ্রেণীর চিন্তার আক্রমণে কোন ফল হয় না, আততায়ী চিন্তা দ্বারে মাথা কুটিয়াই প্রস্থান করে। কেবল উচ্চ শ্রেণীর চিন্তা তরঙ্গই মিত্ররূপে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের বল বৃদ্ধি করে। কিন্তু যাঁহাদের কামময় দেহ এখনও স্থূল ও আবিলতাপূর্ণ রহিয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে নিম্ন শ্রেণীর সাকার চিন্তা গুলি বিষতুল্য কার্য্য করে। এই সকল শত্রু হইতে তাঁহারা যত দূরে থাকেন ততই মঙ্গল।

দূরে থাকিবার উপায় অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ। বাস্তবিক অসৎ সঙ্গের প্রভাব আমরা যতটুকু দেখিতে পাই তাহা অপেক্ষাও অধিক। অসৎ লোকেরা শুধু প্রলোভন দেখাইয়া মিষ্ট কথায় আমাদের মন ভিজাইয়া যে আমাদিগকে নিম্নগামী করে তা নয়। তারা যদি আমাদের সঙ্গে কোন কথাও না কয় তথাপি তাহাদের সহবাস আমাদের পক্ষে অনিষ্টকর। তাহাদের নীচ চিন্তা সমূহ সাবয়ব হইয়া আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের সর্ব্বনাশ করে, আমাদের কলুষপূর্ণ কামময় দেহকে আরও কলুষিত করিয়া নিম্নগামী করে। তাই সাধুসঙ্গ এত প্রয়োজন। তাই রত্নাকর সঙ্গদোষে দস্যু হয়, আবার সঙ্গগুণে মুনি বাল্মিকী হয়। সাধকশ্রেষ্ঠ যবন হরিদাসের কথা স্মরণ করুন। পাপমতি জমিদার হরিদাসকে প্রলোভিত করিবার জন্য সুরূপা বেশ্যা পাঠাইয়া দিয়াছে। হরিদাস ধ্যানে মগ্ন। ধ্যান হইতে উঠিয়া বেশ্যার মনোভিলাষ পূর্ণ করিবেন বলিয়াছেন, কিন্তু ধ্যান আর ভাঙ্গে না! বেশ্যা অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে, কিন্তু দেখিতে দেখিতে তাহার পঙ্কিল হৃদয়ে কি এক বিষম ঝড় উঠিল, এবং ভাল করিয়া ব্যাপারটা বুঝিতে না বুঝিতে তুমুল আন্দোলনে আলোড়িত করিয়া তাহার হৃদয়স্থ সমস্ত আবর্জ্জনা রাশি উড়াইয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। আর সেখানে সাক্ষাৎ নরকের সহচরী পাপের সঙ্গিনী বারবিলাসিনী নাই তৎপরিবর্ত্তে অনুতপ্তহৃদয়া উচ্চতর জীবন লাভের জন্য ব্যাকুলপ্রাণা এক রমণী দণ্ডায়মান। কে এই অপূর্ব্ব অচিন্তনীয় ঘোর বিস্ময়কর বিপ্লব সংঘটিত করিল? পবিত্র হরিদাসের পবিত্র চিন্তা,—সে চিন্তা অগ্নির ন্যায় প্রবেশ করিয়া পাপ হৃদয়ের সমস্ত মলিনতা দগ্ধ করিয়া ফেলিল। চিন্তা যত উচ্চ, যত ঐকান্তিক, যত একাগ্র হয় ততই তাহার তেজ প্রখর হয় ততই তাহা অধিকতর কার্য্যকরী হয়।

( ক্রমশঃ )

শ্রীমন্মথ মোহন বসু।

# মৃত্যুর অভিজ্ঞতা।

ডাক্তার উইল্ট্‌স্ ( Dr. Wiltse ) সেণ্ট লুই ( St Louis ) নগরের মেডিকাল্ এণ্ড সার্জ্জিকাল জর্ণাল ( Medical and Surgical Journal) নামক পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক। কিছু দিন পূর্ব্বে ডাক্তার উইল্ট্‌সের টাইফাস ( Typhus ) জ্বরে "মৃত্যু" হয়,—অন্ততঃ তাহার মৃত্যু সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ ছিল না। গীর্জ্জায় শোকসূচক ঘণ্টা ধ্বনি হইয়াছিল, দেহে জীবনের কোনও লক্ষণ ছিল না, নাড়ী স্থির, পায়ে সূচিকা বিদ্ধ করিয়া কোনও সংজ্ঞার চিহ্ন দেখা যায় নাই। এইরূপে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল কাটিয়াছিল। সুতরাং তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে পরীক্ষার কোন ত্রুটী হয় নাই, উত্তম চিকিৎসকের দ্বারা যতদূর সম্ভব পরীক্ষা করা হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে সময় তাহার দেহ এই রূপে জীবনশূন্য অবস্থায় পতিত, সেই সময় তিনি আপনাকে বিশেষ ভাবে জীবিত বলিয়া অনুভব করিতেছিলেন। এই সময়ে তাহার মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল, তাহা তাঁহার কথা পড়িলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

## ডাক্তার উইল্ট্‌সের কথা।

"আমি আমার অবস্থা বুঝিতে পারিলাম এবং মনে মনে এইরূপ ভাবিতে লাগিলাম, 'আমি তো মরিয়াছি, অন্ততঃ লোকে যাহাকে মৃত্যু বলে তাহা আমার ঘটিয়াছে, কিন্তু আমি দেখিতেছি যে আমার জীবন যেন আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে! এইবার আমি আমার দেহ হইতে বাহির হইব; দেখা যাক্ কিরূপ উপায়ে, কি ভাবে, আমি আমার দেহ ছাড়িয়া যাই'।"

### দেহ-ত্যাগ।

"এইরূপ ভাবিতেছি এমন সময়ে যেন বাহির হইতে একটা শক্তি আসিয়া, যেমন শিশুকে দোলনায় দোল খাওয়ায়, সেইরূপ ভাবে আমাকে দোলাইতে আরম্ভ করিল এবং তাহার ফলে দেহের সহিত আমার সম্বন্ধ ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে দোলন থামিল এবং আমার বোধ হইল—শুধু বোধ কেন—আমি স্পষ্টই শুনিতে পাইলাম—যেন আমার পদতলে

অঙ্গুলি হইতে আরম্ভ করিয়া গোড়ালী পর্য্যন্ত অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্ধন-রজ্জু ছিন্ন করিয়া দেওয়া হইতেছে। যখন এ কার্য্য শেষ হইল, আমি যেন রবারের মত সঙ্কুচিত হইয়া আমার পা হইতে মাথার দিকে ক্রমে সরিয়া আসিতে লাগিলাম। এইরূপে আমি যখন আমার নিতম্ব দেশে আসিয়া পৌছিলাম, আমার বেশ স্মরণ আছে, তখন আমি আপনা আপনি বলিয়া উঠিলাম, 'এইবার আমার পায়ের জীবনী-শক্তি লোপ পাইল।' উদর এবং বক্ষাভ্যন্তর দিয়া যাইবার সময়ের কথা আমার কিছু স্মরণ নাই, কিন্তু আমি যখন মাথায় আসিয়া পৌছিলাম তখনকার কথা আমার বেশ মনে আছে। সে সময় আমার মনে এইরূপ চিন্তার উদয় হইয়াছিল 'এখন দেখিতেছি আমি মাথায় আসিয়া উপস্থিত। এইবার আমি মুক্ত হইব।' এই মনে করিয়া আমি আমার মস্তিষ্কের চারিধারে ঘুরিতে ঘুরিতে মস্তিষ্কের আবরক ঝিল্লি টিপিয়া কিয়ৎ পরিমাণে তাহা সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিলাম, এবং করোটির সন্ধি সমূহের ভিতর দিয়া বাহিরের দিকে উঁকি মারিতে লাগিলাম। তখন আমার আকার একটা রবার নির্ম্মিত শূন্য-গর্ভ গোলকের ন্যায় বলিয়া বোধ হইতেছিল। করোটি-সন্ধি গুলির ভিতর দিয়া বাহির হইবার সময় আমি যেন কিছু চেপ্‌টা হইয়া গেলাম। আমার তখনকার বর্ণ ও আকৃতি অনেকটা জেলি মৎস্যের (Jelly fish) সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।"

পরলোক পথে।

"মস্তক হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আমি কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কিন্তু তখনও আমার দেহের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয় নাই। সাবান জলের শূন্য-গর্ভ গোলক যেমন বায়ুভরে হেলিতে দুলিতে নাচিতে থাকে, আমিও দেহের উপর শূন্যে সেইভাবে হেলিতে দুলিতে নাচিতে লাগিলাম। অবশেষে আমি আমার দেহ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া গৃহতলে পড়িলাম এবং তথা হইতে ধীরে ধীরে উত্থিত হইয়া মনুষ্যাকার ধারণ করিলাম। এই সময়ে আমার কলেবর ঈষৎ নীলবর্ণ স্ফটিকের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল। পরিধানে আমার কোনও বস্ত্র ছিল না। গৃহের দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইতে গিয়া দেখি,

সেইখানে দুইটী মহিলা বসিয়া আছেন! কেমন করিয়া উলঙ্গ অবস্থায় তাহাদের চক্ষু এড়াইয়া যাইব সেই ভাবনায় আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম। কিন্তু দ্বার সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, আমি দিব্য বস্ত্র পরিহিত হইয়া রহিয়াছি। এই ঘটনায় সন্তুষ্ট হইয়া আমি গৃহস্থিত লোকদিগের দিকে একবার ফিরিলাম। ফিরিয়া দেখি আমার শবদেহ ঘেরিয়া আমার আত্মীয়বর্গ শোক করিতেছেন আমি যে তথায় উপস্থিত আছি যাহাতে তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারেন আমি তাহার জন্য অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু আমার সকল চেষ্টাই বৃথা হইল। তাঁহারা আমার উপস্থিতি কিছুতেই উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। আমি কিন্তু সে সময় যেরূপ সুস্থ বোধ করিতে ছিলাম, এমন জীবনে কখনও করি নাই।”

প্রত্যাগমন।

“যাহা হউক তখন আমি দ্বার দিয়া বাহির হইয়া শূন্যে উড়িয়া যাইতে লাগিলাম, কিন্তু কিয়ৎদূর যাইয়াই দেখিলাম সম্মুখে তিনটী প্রকাণ্ড শৈলখণ্ড আমার পথরোধ করিয়া রহিয়াছে। আমি কিছুতেই তাহা উল্লঙ্ঘন করিতে পারিলাম না। আমার কালপূর্ণ হয় নাই! আমি আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম, যখন পুনরায় জ্ঞান হইল তখন দেখি আমি আমার নিজশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছি। আমি শীঘ্রই রোগমুক্ত হইয়া উঠিলাম।”

ডাক্তার উইল্ট্‌স্‌ এই ঘটনা ঘটিবার আট সপ্তাহ পরে উক্ত বিবরণটী লিপিবদ্ধ করেন, কিন্তু জ্ঞান হইবার পরক্ষণেই সমস্ত ঘটনাটী পার্শ্ববর্ত্তী আত্মীয় স্বজনের নিকট বর্ণনা করিয়াছিলেন। যে চিকিৎসক তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তিনি ঘটনার সময় তাঁহার শয্যার পার্শ্বেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, তিনি বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়াও সে সময়ে রোগীর দেহে কোনও রূপ জীবনের লক্ষণ দেখিতে পান নাই। নিশ্বাস প্রভৃতির ক্রিয়া একেবারেই বন্ধ হইয়া ছিল।

---

# রহস্যময় ঘটনাবলী।

## উপকারী স্বপ্ন।

সম্প্রতি চিকাগো হইতে প্রকাশিত "সণ্ডে হেরাল্ড" (Sunday Herold) নামক সুবিখ্যাত পত্রিকায় কয়েকটা আশ্চর্য্য স্বপ্ন বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। স্বপ্ন গুলির অসাধারণত্ব এই যে সেগুলি দ্বারা স্বপ্নদ্রষ্টাদিগের বিশেষ উপকার হইয়াছিল। আমরা এইখানে তন্মধ্যে দুইটী স্বপ্নের কথা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

১। স্কটলাণ্ডের ডাম্‌ফ্রিজ্‌ নামক নগর সন্নিহিত কোনও স্থানে দুইটী শিশু সন্তান হারাইয়া যায়। তাহারা তথাকার এক কর্ম্মকারের কন্যা। ঘটনার দিবস সন্ধ্যাকালে তাহারা বেড়াইতে যায় এবং তাহার পর আর তাহাদিগকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাহাদিগকে অনুসন্ধান করিবার জন্য গ্রামস্থ একদল লোক বাহির হয়, কিন্তু সমস্ত রাত্রি চতুর্দ্দিক তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও তাহারা কৃতকার্য্য হয় নাই। অবশেষে দলের একজন লোক অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া প্রত্যূষে শয্যায় শয়ন করিতে গেল, কিন্তু তাহার ভাল নিদ্রা আসিল না। অর্দ্ধ নিদ্রিত অবস্থায় সে পড়িয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে স্বপ্ন দেখিল যেন সেই শিশুদ্বয় কোন বনের একাংশে একটী গর্ত্তের ভিতর শুইয়া আছে। পূর্ব্ব রাত্রে অনুসন্ধান করিবার সময় সে সেই বনের পাশ দিয়া গিয়াছিল, সুতরাং উক্ত বন তাহার অপরিচিত ছিল না। তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইলে সে দলের সকলকে ডাকিয়া সেই স্বপ্ন নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইল এবং দেখিল যে শিশুদ্বয় এক বোঝা কাষ্ঠের নীচে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া রহিয়াছে।

২। মার্কিন রাজ্যের সেণ্ট লুই (St Louis) নগরে থরনটন (Thornton) নামে এক সাহেব বাস করিতেন। তাঁহাকে কোনও লোকে হত্যা করে। পুলিস তাঁহার স্ত্রীকে হত্যাকারিণী সন্দেহে ধৃত করিল এবং বিচারাপেক্ষায় তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিল। একমাস এইরূপে কারাগারে কাটিল। তাহার পর সহসা একদিন রাত্রে রমণী স্বপ্ন দেখিলেন

যে জর্জ্জ রে ( George Ray ) নামক একজন লোক তাঁহার স্বামীকে হত্যা করিতেছে। হত্যাসংশ্লিষ্ট সমস্ত ঘটনা স্বপ্নাবেশে তাঁহার চক্ষে পড়িল। পরদিন প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পর তিনি বিচারকের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া স্বপ্নদৃষ্ট আমূল বৃত্তান্ত তাঁহার নিকট বর্ণনা করিলেন এবং জর্জ্জ রেকে অনুসন্ধান করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। অনুসন্ধানে রে ধৃত হইল। যখন তাহার সম্মুখে তাহার কৃত হত্যার বিবরণ সবিশেষে কথিত হইল, তখন সে একেবারে হতভম্ব হইয়া গেল, তাহার বোধ হইল যেন কেহ অন্তরালে থাকিয়া তাহার অজ্ঞাতসারে সমস্ত হত্যা ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করিয়াছে। নিরুপায়ে সে আত্মদোষ স্বীকার করিল। রমণীকেও তৎক্ষণাৎ নিষ্কৃতি দেওয়া হইল।

---

## অদৃশ্য-সহায়।

কলিকাতা, তালতলা ডাক্তার লেন ২৩নং বাটীর দ্বিতলের এক ক্ষুদ্র গৃহে শ্রীযুক্ত দীনদয়াল বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার বাসগৃহের উত্তরে একটি অতি অপ্রশস্ত বারান্দায় কয়েকটি তুলসী গাছ ছিল। তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে সেই তুলসীতলায় প্রদীপ ও ধুনা দিতেন। একদিন নিয়মিত সময়ে তিনি তুলসীতলায় প্রদীপ ও ধুনা দিয়া সন্ধ্যাবন্দনান্তে দেখেন যে, প্রদীপটি নির্ব্বাপিত হইয়াছে। আরতি করিবার মানসে, ধূপাধার গ্রহণ জন্য যেমন তিনি গৃহাভ্যন্তর হইতে হস্ত প্রসারিত করিলেন, বোধ হইল কে যেন তাঁহার হস্ত ঠেলিয়া ফেলিতেছে। এইরূপ বারংবার হওয়ায়, ব্যাপার কি দেখিবার জন্য গৃহ মধ্যস্থ প্রদীপ আনয়ন মানসে দাঁড়াইলেন, এমত সময়ে সেই দিকে ফোঁস ফোঁস শব্দ হইতে লাগিল। দুইটা বিড়াল ঝগড়া বাধাইবার উদ্যোগে ফোঁস ফোঁস করিতেছে, এই ভাবিয়া তিনি স্থির হইয়া শুনিতে লাগিলেন। একটু মনোযোগ সহকারে শুনিয়া তিনি বুঝিলেন, সে শব্দ বারান্দা হইতে আসিতে ছিল না, দ্বারের উপরিভাগ হইতে শ্রুত হইতেছিল।

তিনি যেমন প্রদীপ আনিতে গেলেন, তন্মুহূর্ত্তে একটা বৃহদাকার বিষধর সর্প কবাটের উপরিভাগ হইতে নিচে পড়িল। পতনবৎ শব্দ শুনিয়া তিনি তাড়াতাড়ি আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। সর্পের পূর্ব্বার্দ্ধ গৃহাভ্যন্তরে পড়িল, পশ্চাদার্দ্ধ বাহিরে রহিল এবং মধ্যদেশ কবাটে চেপটাইয়া ধরিল। তাঁহার চীৎকারে কয়েকজন লোক আসিয়া, তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সর্পটাকে মারিয়া ফেলিল। তিনি অনেক চিন্তা ও অনুসন্ধানেও হাত ঠেলিয়া ফেলার ন্যায় অনুভব হওয়ার কারণ নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইলেন না। আমাদের বিবেচনা হয় সম্ভবতঃ কোন দয়ালু ব্যক্তি জীবের উপকার মানসে লিঙ্গ শরীরে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তিনি দীনদয়াল বাবুকে আসন্ন সর্পদংশন হইতে রক্ষা করিবার জন্যই তাঁহার হস্ত ব্যাহত করিয়াছিলেন। ঘটনাটি প্রায় ছয় সাত বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

---

# প্রাচ্য ও প্রতীচ্য।

পূর্ব্ববারে গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহাতে অনেক শ্রদ্ধেয় বন্ধু লেখাটি বাহ্য ভাবাপন্ন বলিয়া দুঃখিত হইয়াছেন। বড়ই দুঃখের বিষয় সত্য কথা বলিলে লোকে বুঝে না এবং উহা খবরের কাগজের টিটকারী বলিয়া মনে করে। গুরুশক্তি বাহ্য না অন্তরঙ্গ? আমাদিগের মনে হয় উভয়ই। ভগবৎ স্বরূপে একেবারে মিশিয়া গেলে, জগতের জন্য বিশিষ্ট ভাবে প্রকাশ হওয়া অসম্ভব; অথচ কেবল ভেদাত্মক বাহ্যভাবে স্বরূপ ন্যস্ত করিলে অন্য জীবকে ভগবানের পথে লইয়া যাওয়া যায় না। তবে কি মহাপুরুষগণের ভিতরে এখনও বাহ্যভাব আছে? তাহাও সম্ভবে না। বাহ্যভাব অহঙ্কারের সৃষ্টি; অহঙ্কারের উপরে গিয়া তাহার মধ্যে আত্মার একত্ব দেখিতে সক্ষম না হইলে মুক্ত হওয়া যায় না।

মুক্তি দুই প্রকারের। সাংখ্যোক্ত ভাবে বাহ্য প্রকৃতিকে অহং হইতে ভিন্ন করিয়া দেখিতে পারিলে, এক প্রকারের মুক্তি হয়। বেদান্তোক্ত মুক্তি

আর এক প্রকার—সোঽহং জ্ঞান ইহার প্রথম স্তর। এই জ্ঞানে পরিপুষ্ট হইতে হইলে বাহ্যজ্ঞান ত্যাগ করিয়া অন্তরঙ্গ জ্ঞানের ভিতর দিয়া ঈশ্বরের ভাব লক্ষ্য করিতে হয়। এইরূপে যতই ভিতরে প্রবেশ করা যায় ততই জীব ও শিবের মধ্যে গূঢ় হইতে গূঢ়তম সম্যক্‌জ্ঞান প্রকটিত হয়, ও দাস্য, সাম্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি ভাবের মধ্য দিয়া জীব অবশেষে আপনাকে সোঽহং বলিয়া জানিতে পারে। ইহাই প্রেম বিলাস বিবর্ত্ত। কিন্তু অন্তরঙ্গ জ্ঞানে অবস্থিতি করিলেই হইবে না। সেই জন্য সর্ব্ব শাস্ত্রেই অবস্থানুযায়ী কর্ম্মের বিধান আছে।

কর্ম্মের দ্বারা বহিস্থিত রূপে প্রতীয়মান প্রকৃতির অন্তর্য্যামী সর্ব্বভূতস্থ ভাব শিক্ষা করিতে হয়। পরে এই ভাবে সংসিদ্ধ হইলে মহত্তের স্রষ্টাভাবে উপনীত হইতে পারা যায়। এইরূপে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ভাবের সাধনা করিতে হয়। এই জন্য নামে রুচির সহিত জীবে দয়া বিহিত হয়। কেবল অন্তরঙ্গ ভাবে অবস্থিতি করিলে সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী একতা লাভ করা যায় বটে, কিন্তু তাহার বিরোধী প্রকৃতি ভাব অসিদ্ধ রহিয়া যায়। সেই জন্য তৃতীয় স্তরে কেন্দ্রগত অন্তরঙ্গ সোঽহং ভাবের সহিত বৃত্তিগত প্রকৃতিস্থ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ভাবে সমাধান করিয়া মহত্তর একত্বব্যঞ্জক "অহং ব্রহ্মাস্মি" ভাব প্রকট হয়।

সত্য বটে যোগারূঢ় অবস্থায় অন্তরঙ্গ সমত্ব ভাবে জীব অবস্থান করে। কিন্তু প্রকৃত ব্রহ্মভাব লাভ না হইলে ঈশ্বরের কর্ম্ম সম্পাদন করিবার অধিকার জন্মায় না। সেই জন্য যোগারূঢ় অবস্থায় পরেও জীবকে আত্মসংসিদ্ধি ও লোকসিদ্ধির জন্য পুনরায় কর্ম্ম করিতে হয়। ভাবে ডুবিয়া থাক, সেও সুখেরই কথা। কিন্তু ভাই, ভাবিয়া দেখ, এ সুখ থাকিবে না। কারণ এ সুখ ও এ জ্ঞান এখনও সমগ্র মানবের জন্য ও সমগ্র মানব জাতির কর্ম্মের ফল বলিয়া বুঝিতে পার নাই। সমগ্র মানব জাতি যখন বহিরঙ্গে রহিয়াছে কোন অধিকার বা কর্ম্মবলে তুমি অন্তরঙ্গে থাকিতে প্রয়াস করিতেছ? তাই বলি, আপনাকে সমগ্র মানবজাতির প্রযত্ন, উদ্যম ও উৎকর্ষের ফল বলিয়া জানিও। কত লক্ষ লক্ষ প্রাণী অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অজ্ঞাতসারে যে ইন্দ্রিয় শক্তি নির্ভিন্ন করিয়াছে তাহার

ফলে, মানব, তুমি আজ দেখিতে পাইতেছ! ইহার কি প্রতিদান করিবে না?

শুধু অন্তরঙ্গের জন্য চেষ্টিত হইয়াই আমরা অলক্ষিতভাবে আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতায় কলুষিত হইয়াছি। তাই আজ ইংরাজ অধিকারে অন্তরঙ্গের মোহ ত্যাগ করিয়া বহিরঙ্গের দিকে চাহিতে শিখিতেছি। যে মধুর মুরলী নিস্বন একদিন ব্রজগোপীর প্রাণমন ভাসাইয়া দিয়া তাহাদিগকে অন্তরঙ্গ আনন্দ সাগরে ডুবাইয়াছিল, সেই প্রেমময় মুরলীধরের ইচ্ছাতেই আবার কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়। তবে ভাই প্রেমের বশে শুধু রাধা সাজিলে চলিবে না। সময়ে সময়ে সেই প্রেমের বশেই আবার পরন্তপ পার্থবেশ ধরিতে হইবে।

"গর গর বাজে বাঁশী নন্দের ভুবনে।
যার মনে যা হইছে, সে তইছে শুনে॥"

আনন্দময়ের মধুরবাণী আমরা অন্তরঙ্গভাবে আপন আপন নিজস্ব বলিয়া সকলেই শুনিতেছি। কিন্তু আপনার হৃদয়স্থ মধুরতা কিরূপে আর এক-জনের হৃদয়স্থ মহাশ্মশানের মহাবেদনারূপে প্রকাশিত হইতেছে ইহা বুঝিতে হইবে। কেবল আপনভাবে যশোদা প্রভৃতি গোপীগণ ভগবানকে দেখিয়া-ছিলেন বলিয়াই তাঁহাদিগকে প্রভাস যজ্ঞের কঠোরতা সহ্য করিতে হয়। 'অহং সঃ' বলিয়া 'সোঽহং' ভাব আসিলে বাহ্য জগৎকে আর ত্যাগ করা যায় না। ইহাই মহাপুরুষগণের একতা এবং ইহাই ভ্রাতৃভাবের মূলতত্ত্ব।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়।

ওঁ

# পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যান্নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

১১শ ভাগ } কার্ত্তিক, ১৩১৪ সাল। { ৭ম সংখ্যা।

## শান্তি-শতক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

২৮২৯

এ ভব-সংসার মরি! রমনীয় রূপ ধরি, ভাতে সে নয়নে,
বিবেক না বিকশিত যার;
জ্ঞান-নেত্র কিন্তু যার, ভেদকরি' বাহ্য তার, নেহারে মরমে,
বুঝে সে, নাহিক কিছু সার।
বুঝি কেহ করি ছল, সুতবন্ধুমিত্র দল করিলা সৃজন,
কেবা কার পরিজন? স্বপ্ন-ইন্দ্রজালসম সমগ্র ভুবন!

(৩০)

যে নারীর সহবাসে, সংশয় প্রথমে আসে, জাগে অবিনয়,
যার তরে দুঃসাহস নবে;

অবিশ্বাস শ্বাস যা'র, দোষানহ অনিবার যাহার হৃদয়,
কপটতা যাহার অন্তরে ;
সুরনরশ্রেষ্ঠযা'রে, সহজে ছাড়িতে নারে, মায়ার আধার,
গরল অমৃত ভরা হেন নারী কার গড়া পাপ-অবতার ?

( ৩১ ৩২ )

বিষয় মোহিত নরে বাসনা পাগল করে, প্রকৃতির বশে,
স্বতঃ হৃদে জাগে কামানল ,
কেন তবে কবিকুল, কুটিল কামের মূল, কবিতার রসে,
হব্যাহুতি দেয় অবিরল ?
কি কাজ চপলমতি, স্বপন মায়ার দ্যুতি, সঙ্গ অঙ্গনার ?
জানি শেষ বিষমাখা, তবু হৃদে রয় আঁকা ছবি ললনার।

( ৩৩ )

এ মূঢ়তা যতদিন, হৃদয়ে না হয় ক্ষীণ, রহয়ে প্রবল,
বিষয়েতে সুখ ততকাল ;
কিন্তু যবে বিচারণে তত্বজ্ঞান ফুটে মনে, কোথা সুখ-ছল ?
বিষয়ের কোথা মায়া-জাল ?
দুদণ্ডের তরে সুখ, পিছে তার বহু দুখ যদি বিজড়িত,
স্থায়ী সুখ পরিহরি, কেন তবে আশে মরি কাম-বিচলিত ?

( ৩৪ )

পঞ্চভূত-বিরচিত এই দেহ ছিলনাত, না রবে আবার,
মাঝে শুধু ক্ষণ পরিচয় ,
না ছিল মিলন হ'ল, বিনাশ, বিয়োগ ফল অবশ্য যাহার,
তার লাগি আরেরে হৃদয় !
কেন এত কাতরতা ? কেন এ প্রণয় ব্যথা ? কেন উচাটন ?
প্রেমের আধার কোথা, শোকের বিষয় কোথা, মাঝারে ভুবন।

( ৩৫ )

অশুচি-শূকর আর, সুরপতি অমরার, দোঁহার মাঝার
সুখে দুখে প্রভেদ কোথায় ?

মিটাতে জঠরক্ষুধা, হেয় বিষ্ঠা, পেয় সুধা, তুল্য দোঁহাকার,
তুলে মুখে উভয়ে স্বেচ্ছায় ;
ইন্দ্রে যথা তোষে শচী, শুকরীতে অভিরুচি শুকরে তেমন,
মরণে সমান ভয়, কর্ম্মভাব দোঁহে রয়, অভিন্ন দুজন।

( ৩৬ )

কৃমিকুল সমাবৃত, লালাকীর্ণ বিগন্ধিত, মাংসলেশহীন,
নর-অস্থি সতৃষ্ণ নয়নে,
নেহারে কুক্কুর যথা, মোহান্ধ মানব তথা, লোভের অধীন,
চেয়ে রয় বাঞ্ছিত বদনে,
সেই কুকুরের প্রায়, ভয়ে ভয়ে ফিরে চায়, পশ্চাতে আবার,
দেখিতে আছে কি কেহ, কাড়িতে অধিক বলে সে ধন তাহার।

( ৩৭ )

কিন্তু দোঁহে নাহি জানে, যেধন লভিতে প্রাণে বাসনা দোঁহার,
তুচ্ছ হতে অতি তুচ্ছ সেহ ;
যে দেহ ধারণ লাগি, উভয়েতে কামভাগী, জগত মাঝার,
নিতান্ত ভঙ্গুর সেই দেহ,
ক্ষণেকে উদয় হয় ক্ষণপরে পায় লয় পলক-পরাণ,
নদী গিরি পারাবার, কেহ নহে স্থির তার, স্বপন সমান।

( ৩৮ )

পুত্রের জনম আগে, নর-হৃদে দুখ জাগে, সন্তান কারণ,
ভাবে বসি' হবে কি তনয়।
জনমিলে পুত্র পরে তাহার পীড়ার তরে শশঙ্কিত মন,
পীড়াকালে আকুল হৃদয় ;
মূর্খ যদি হয় সুত তাহে দুঃখ উপজিত, গুণে মৃত্যুভয় ;
পুত্র নামধারী মরি ! নরের প্রধান অরি যেন নাহি হয়।

( ক্রমশঃ )

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

# মানবের ইতিবৃত্ত।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

**সূত্রাত্মা বা** কারণ শরীর। জীব জন্মে জন্মে যে সকল সংস্কার আহরণ করে, তাহা মণিগণের ন্যায় কারণ বা জীবরূপে সূক্ষ্মভাবে সেই কারণদেহে গ্রথিত থাকে।

জীবগণ স্থূল পদার্থে আবৃত এবং অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া এখন প্রথম গ্রহ মণ্ডলে ( First Planetary Chain এ ) প্রবেশ করার যোগ্য হইয়াছে। এই মণ্ডলে দেহের আদর্শ ( Archetypes ) প্রস্তুত হয়। অসুরগণই এই মণ্ডলে সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছে। অনুন্নত জীবগণ পরবর্ত্তী দ্বিতীয় মণ্ডলে জন্মলাভ করিলেন। তাহাদের মধ্যে অগ্নিষ্বাত্ত পিতৃগণই সর্ব্বোন্নতি লাভ করিলেন। অপেক্ষাকৃত অনুন্নত জীবগণ স্বীয় স্বীয় ক্রমবিকাশের জন্য পরবর্ত্তী তৃতীয় বা সৌমমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাহারা তিনভাগে বিভক্ত। (১) বর্হিষদ পিতৃগণ প্রথম শ্রেণীভুক্ত। তৃতীয় বা সৌমমণ্ডলে তাহারাই সর্ব্বোন্নত। এই মণ্ডলের অন্তিম সময়ে তাহারা বিশ্বকর্ম্মা দেবগণের সপ্তম শ্রেণীভুক্ত হইলেন। তাহাদিগকে "সৌমদেব" অথবা "বায়ুভূত দিব্য দেহধারী শশিপতি" ও সময় সময় বলা হইয়া থাকে। বর্ত্তমান চতুর্থ মণ্ডলে ( পার্থিব মণ্ডলে ) জীবের স্থূলদেহ নির্ম্মাণের ভার এই বর্হিষদ পিতৃগণের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। ইহারাই চন্দ্রলোকের বা পিতৃলোকের প্রকৃত পিতৃপুরুষ। এই মণ্ডলে বর্হিষদ পিতৃগণ অপেক্ষা অনুন্নত অপর দুই শ্রেণী আছে। এক শ্রেণীকে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত ধ্যানী ( Lower dhyanis ) এবং অপর শ্রেণীকে সৌর পিতৃগণ বলা হয়।

২য় শ্রেণী। আমাদের বর্ত্তমান চতুর্থ বা পার্থিব মণ্ডলের সার্দ্ধ ত্রিচক্রের সময় এই শ্রেণির চারটী বিভাগ উন্নত হইয়া মনুষ্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। সময় সময় তাহাদিগকে সৌমপিতৃগণ বলিলেও প্রকৃতপক্ষে তাহারা এই নামের যোগ্য নহে। তাহারা তৃতীয় অর্থাৎ সৌম্য মণ্ডল হইতে আগমন করিলেও তাহারা মানবের আদিপুরুষ নহে, বরঞ্চ ক্রমোন্নতিতে তাহারা

মনুষ্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই জন্যেই তাহারা পিতৃপদবাচ্য হইতে পারে না। পিতৃলোকের পিতৃদেবগণ হইতে তাহারা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন।

তৃতীয় শ্রেণি। সৌমমণ্ডলে যে বিভাগত্রয় সাধারণ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে না পারিয়া পশ্চাৎপদ হইয়াছিল, তাহারা এই শ্রেণিভুক্ত। বর্ত্তমান পার্থিব মণ্ডলের সপ্তম চক্রের অন্তিমে তাহারা মনুষ্যাবস্থায় স্পর্শ করিবে মাত্র। বর্ত্তমান চতুর্থ বা পার্থিব মণ্ডলের (Terrene chain এর) চতুর্থ চক্র (Round) চলিয়াছে। এখন আমরা এই চতুর্থ চক্রের মধ্যভাগে আসিয়া পড়িয়াছি। এই শ্রেণির জীবগণ ভবিষ্যৎ পঞ্চম মণ্ডলে প্রকৃত মনুষ্যাবস্থা প্রাপ্ত হইবে। সম্প্রতি তাহারা স্থাবর, উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতে পুনঃ পুনঃ জন্মলাভ করিয়া মনুষ্যগতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

নিম্নশ্রেণির ধ্যানীগণ এখন সৌমনির্ব্বাণ লাভ করিয়া ধ্যান মগ্নাবস্থায় আছেন।

প্রত্যেক গ্রহে সপ্তশ্রেণির জীবজগতের ক্রমিক অভ্যুদয় হইয়া থাকে। তন্মধ্যে তিনটী ভূতযোনী, একটী স্থাবর, একটী উদ্ভিদ, একটী প্রাণী ও একটী মনুষ্য, এই সপ্ত জীবজগৎ। তন্মধ্যে যাহারা পূর্ব্ববর্ত্তী বা সেই মণ্ডলের অন্তর্গত তাহারা পূর্ণমাত্রায় উন্নত ও বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অন্যেরা অঙ্কুররূপে আবির্ভূত হয়।

বর্ত্তমান পার্থিব মণ্ডলের পর ক্রমান্বয়ে পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম মণ্ডলের আবির্ভাব হইবে। এই সপ্তম মণ্ডলে অভূতপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক আভায় উদ্দীপ্ত ও অনির্ব্বচনীয় উৎকর্ষতা লাভ করিয়া ভাবাতীত সুদূর ভবিষ্যতে এই পৃথিবীতে যে মানবজাতির উদ্ভব হইবে, তাহাদের তুলনায় আমরা অতি সামান্য ও নবজাত অঙ্কুর বিশেষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

প্রত্যেক জীবজগৎ বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিভক্ত। যেমন মনুষ্য-রাজ্য সপ্ত মৌলিক জাতিতে বিভক্ত। জীবগণ প্রত্যেক জীবরাজ্যে সপ্তাবস্থা অতিক্রম করে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সাতটা জীবরাজ্য। তন্মধ্যে তিনটী ভৌতিক রাজ্য, স্থাবর, উদ্ভিদ প্রাণী ও মনুষ্য প্রত্যেকে একটি করিয়া চারটী, মোট সাতটি রাজ্য। এক এক গ্রহে এই সপ্ত রাজ্য অতিক্রান্ত হয়। এক

চক্রে সপ্ত গ্রহ। কজেই প্রত্যেক জীব এক এক চক্রে উনপঞ্চাশটি অবস্থা অতিক্রম করে।

বর্ণিত দ্বিতীয় বিভাগের প্রথম শ্রেণীর জীবগণ প্রথম চক্রে উনপঞ্চাশটী অবস্থা অতিক্রম করিয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর জীবগণ ৪২টী, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ শ্রেণীর জীবগণ ক্রমান্বয়ে ৩৫, ২৮, ২১, ১৪টী করিয়া অবস্থা অতিক্রম করিয়াছে। সপ্তম শ্রেণী মোটে সাতটী অবস্থা অতিক্রম করিয়াছে। শেষোক্ত শ্রেণীকে একক সংখ্যা ধরিলে, প্রথম শ্রেণীর জীবগণ তাহাদের অপেক্ষা সাতগুণ অধিক দ্রুতবেগে চলিয়াছে। সেইরূপ দ্বিতীয়, তৃতীয় চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ শ্রেণী ক্রমান্বয়ে ছয়, পাঁচ, চার, তিন ও দ্বিগুণ দ্রুত গতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। তাহাতেই দেখা যায়, উর্দ্ধ শ্রেণীর জীবগণ নিম্ন শ্রেণীর জীবগণ অপেক্ষা অধিকতর দ্রুত গতিতে ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

## এক মণ্ডলে সাতটী চক্র।

প্রথম চক্র —এই চক্রে স্থাবর রাজ্যের জীবগণের আদর্শ দেহ (archi-types) "ক" গ্রহে প্রস্তুত হইয়া ক্রমে "ঘ" গ্রহে পূর্ণতা লাভ করে। উদ্ভিদ প্রাণী ও মানব জগতের জীবগণ মানসিক অঙ্কুর রূপে অতি সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকে।

দ্বিতীয় চক্র।—এই চক্রে মনুষ্য রাজ্যের কথিত অঙ্কুর বর্দ্ধিত ও দৃঢ় হয়। অধিকতর উন্নত শ্রেণী সপ্তগ্রহে সপ্তাবস্থা অতিক্রম করিয়া থাকে।

তৃতীয় চক্র।—সৌম মণ্ডলস্থ সপ্তশ্রেণীর জীবগণ মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী এই চক্রে মনুষ্যাবস্থার উৎকর্ষতা সাধনে তৎপর হয়। তৃতীয় শ্রেণী এই রাজ্যের সপ্তাবস্থা অতিক্রম করে। চতুর্থ শ্রেণী এই রাজ্যের প্রান্তদেশ মাত্র স্পর্শ করে। পশ্চাৎপদ অবশিষ্ট তিন শ্রেণী মন্থর গতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। পরে চতুর্থ চক্রে সকলেই ভৌতিক রাজ্যত্রয় অতিক্রম করিয়া কোনও শ্রেণী প্রাণীজগতে, কোনও শ্রেণী উদ্ভিদ রাজ্যে এবং কোনও শ্রেণী স্থাবর রাজ্যে উন্নীত হইবে, কিন্তু এই মণ্ডলে তাহাদের মধ্যে কেহই মনুষ্যরাজ্য লাভ করিতে পারে না।

চতুর্থ চক্র।—ইহাকে কখন কখন মানবচক্রও বলা হইয়া থাকে। কারণ এই চক্রের প্রারম্ভে প্রত্যেক মানবজাতির আদর্শ-অবয়ব "ক" গ্রহে আবির্ভূত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই চক্রে স্থাবর রাজ্য উন্নতির চরমসীমায় উপস্থিত হয়, অর্থাৎ স্থাবররাজ্য সমধিক কাঠিন্য এবং ঘনত্বলাভ করিয়া থাকে।

উন্নত জীবগণ চতুর্থ বা পার্থিব চক্রে "ঘ" গ্রহে (এই পৃথিবীতে) উপস্থিত হইলেই তাহারা আদর্শ মনুষ্য হওয়ার যোগ্য হয়, কাজেই বর্হিষদ-পিতৃগণ-প্রদত্ত ছায়াবলম্বনে মানবের স্থায়ী স্থূলদেহ নির্ম্মিত হয়। কথিত ছায়া ঈথার বা আকাশিক পদার্থে নির্ম্মিত। জীব কিরূপে স্থাবর উদ্ভিদ ও প্রাণী জগৎ ক্রমশঃ অতিক্রম করিয়া মনুষ্যরূপে পরিণত হয় তাহা,—অর্থাৎ জীবের এই সুদীর্ঘ ভ্রমণ বৃত্তান্ত, সংক্ষেপে অথচ বিশদভাবে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এইরূপে বর্ণিত আছে :—"ওষধি ও বৃক্ষাদিতে প্রাণের খেলা দেখা যায়, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণকারী জীবে জ্ঞানের আবির্ভাব ও আত্মার অধিকতর বিকাশ দৃষ্টিগোচর হয়। তাহাদের মধ্যেও প্রাণের খেলা আছে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত জীবে জ্ঞানের বিদ্যমানতা পরিলক্ষিত হয় না। মানুষে আত্মার বিকাশ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিস্ফুট; মানুষ জ্ঞানের অধিকারী। মানুষ যাহা জানে, তাহাই দেখে। গত কল্য যাহা ঘটিয়াছে, তাহা মানুষ মনে রাখে ও জানে। দৃশ্য, অদৃশ্য সমস্তই অবগত হয়। নশ্বর বস্তুর অবলম্বনে মানুষ অবিনশ্বর হইতে চায়। এইরূপে মানুষ জ্ঞান বুদ্ধি প্রভৃতি শক্তি সম্পন্ন হয়।" তাহার উপরে শায়নের টীকা এইরূপ, :—"অচেতন ভূমি, প্রস্তর ইত্যাদিতে একমাত্র সৎই বিদ্যমান, আত্মা এখন পর্য্যন্ত জীবরূপে পরিণত হন নাই। স্থাবর জীবসমূহ যথা ওষধি এবং বৃক্ষ এবং জঙ্গম জীবসমূহ অর্থাৎ যাহাদের প্রাণাপানাদি পঞ্চবায়ু বিদ্যমান আছে, এই দুই শ্রেণির জীবের অবস্থাকে বাহ্যজগতে আত্মার প্রকাশিত হওয়ার পক্ষে কতক পরিমাণে উন্নত বলা যায়।"

(ক্রমশ)

যুগল সেবক।

# আমিষ ও নিরামিষ আহার।

( ৫ম সংখ্যার ২২৭ পৃষ্ঠার পর হইতে )

৭। মানব শরীর গঠনপ্রণালী, বিশেষতঃ তাহার পরিপাক ক্রিয়ার যন্ত্রগুলি মানবকে গরিলা শিম্পাঞ্জি প্রভৃতি ফলমূলাহারী জন্তুদিগের পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছে। কেবলমাত্র ঐ সকল জন্তুরই আকৃতি অনেকটা মানুষের মত। দেহতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, ফলাহারী, শাকাশী, মাংসাশী ও সর্ব্বভুক ( ) পশুদিগের মধ্যে কেবল ফলাহারী পশুর সহিতই মানুষের আকারগত অধিক সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এই সকল পশু মানুষের মত চর্ব্বণ করে, মানুষের মত তাহাদের মুখগহ্বরে লালাধার সকল স্থানে স্থানে সন্নিবেশিত আছে, দন্তগুলি ঠিক মানুষের মত এবং উভয় শ্রেণীরই পাকনাড়ীর দৈর্ঘ্যবিস্তারাদি আয়তনগত পরিমাণও প্রায় একরূপ।

স্বভাবতত্ত্ববিৎ লিনিয়াস লিখিয়াছেন মানবাবয়বের সহিত অন্য জন্তুর আকৃতিগত সাদৃশ্য বিচার করিয়া মানুষের খাদ্য নিরূপণ করিতে হইলে, ফল এবং রসাল উদ্ভিদই তাহার উপযুক্ত আহার স্থির করিতে হইবে।

দেহতত্ত্ববিৎ ব্যারণ কুবিয়ার বলেন মানুষের আকৃতি হইতে জানা যায় যে, ফলমূল এবং রসাল উদ্ভিদই তাহার স্বাভাবিক আহার।

মিঃ টমাস বেল, সার ইভায়ার্ড হোম প্রভৃতি মনীষীরাও এইরূপ মতাবলম্বী।

দৈহিক ক্রমোন্নতির ফলে মানুষের সকল প্রকার দন্তই বিদ্যমান আছে, কিন্তু মাংসাশী পশুর ন্যায় তাহার পার্শ্বের চারিটা দাত বড় বা বিশেষ ধারাল নয়; ফলাহারী-পশুদিগের ঐ সকল দাঁত ক্রমে আকারে ক্ষুদ্র হইয়া আসিয়াছে এবং মানুষে দাঁতের সহিত একত্র মিলিয়া সুন্দর দন্ত পঙক্তি সৃষ্টি করিয়াছে।

মাংসাশী পশুদিগের ( canine teeth ) শ্বাদন্ত প্রত্যেক মাড়িতে দুইটি করিয়া থাকে। সিংহ প্রভৃতি স্বনামখ্যাত মাংসৈকমাত্র ভোজী পশুদিগের এই দাঁতগুলি অতিশয় লম্বা এবং অন্য দাঁত হইতে দূরে পৃথকভাবে অবস্থিত। ভল্লুক প্রভৃতি প্রধানতঃ শাকাশী পশু সকলের উল্লিখিত দাঁত অপেক্ষাকৃত

অল্প ক্ষুদ্র। শিম্প্যাঞ্জি, গরিলা, ওরাংওট্যাং প্রভৃতি ফলাহারী পশুদিগের প্রত্যেক মাড়িতে ১৬টী দাঁত আছে। শূকর প্রভৃতি সর্ব্বভুক পশুদিগের দাঁত বড়ই অদ্ভুত। ইহারা সকল দ্রব্যই গ্রহণ করে কিন্তু প্রধানতঃ মলমূত্র প্রভৃতি আবর্জ্জনা রাশিই খাইয়া থাকে। ইহাদের সম্মুখস্থ দাঁতগুলি বাহির করা, শ্ব-দাঁত ( canine teeth ) লম্বা এবং নাসিকার পার্শ্বদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই দাঁতের দ্বারা তাহারা অন্য পশু সকল আক্রমণ করতঃ টুকরা টুকরা করিয়া কাটে এবং আবশ্যকমত জমি খুঁড়িয়া উদ্ভিদাদির মূল বাহির করতঃ আহার করে। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এই ৪ প্রকার পশুদিগের মধ্যে কেবলমাত্র ফলাহারী পশুর সহিত মানুষের দাঁতের বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

প্লুটার্কের হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।—"প্রকৃতি-দেবী কখনও মানুষকে মাংসখাদক হইতে ইঙ্গিত করেন নাই। কারণ পশুর ন্যায় মানুষের দীর্ঘ চঞ্চু নাই, ধারাল নখযুক্ত থাবা নাই, সক তীক্ষ্ণধার সূচ্যগ্রের ন্যায় দাঁত নাই, টাট্‌কা অসিদ্ধ মাংসের ন্যায় গুরুপাক দ্রব্য পরিপাক করিবার শক্তি নাই, অথবা কাঁচা রক্তাক্ত মাংসপিণ্ড চর্ব্বণ ও গলাধঃকরণ করিবার মত মোটামোটা তীক্ষ্ণ দাঁত ও বৃহৎ মুখ-গহ্বরও নাই। বরং মানুষের দাঁতগুলির মসৃণতা, মুখগহ্বরের ক্ষুদ্রতা, জিহ্বার কোমলতা এবং অন্ত্রের অল্পশক্তি দেখিয়া বেশ বুঝা যায় যে, স্বভাব তাহাদিগকে মাংস ভোজন করিতেই নিষেধ করিতেছে।" যদি এ সকল যুক্তি শুনিয়াও কেহ বলেন যে মাংসাহার মানব-প্রকৃতিসিদ্ধ, তবে প্লুটার্ক তাঁহাকে বলেন যে "খাইতে হয় যদি তবে আপনার হস্তপদ দ্বারা হত্যা করিয়া খান, ছোরা, কুড়াল, লাঠির দ্বারা হত্যা করিবেন না। যেমন ভল্লুক, সিংহ প্রভৃতি পশু সকল নিজ নিজ হত্যালব্ধ খাদ্যে পরিতৃপ্ত হয়, মানুষ ও সেইরূপ উপায়ে ও প্রকারে গাভী, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি পশু সকল আক্রমণ পূর্ব্বক আপনার হস্ত পদ মুখ ও দন্ত সাহায্যে তাহাদিগকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া আহার করুক। এ কাজ করিতে যদি প্রাণ কাঁপে, যদি জীবিত ও বুদ্ধিযুক্ত প্রাণী গতাসু না হওয়া পর্য্যন্ত আহারের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়, তবে এই স্বভাব বিরুদ্ধ ক্রিয়ায়, এই হত্যালব্ধ খাদ্যে প্রয়োজন কি? তাই কি মানুষ কসাইখানা হইতে আনীত মাংস তৎক্ষণাৎ ভোজন করে না, নানাবিধ

ছন্দে ও সুস্বাদু মসলা ও শাক সবজির সহযোগে সেই মাংস উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া রন্ধন পূর্ব্বক তাহার রূপ এবং আস্বাদ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত করিয়া রসনাকে ফাঁকি দিয়া ভুলাইয়া তবে ঐ অস্বাভাবিক খাদ্য ভোজন করে।"

৮। নিম্নে একটি তালিকা প্রদত্ত হইতেছে, তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে খাদ্যদ্রব্য সকল পরিপাক হইতে কত সময় লাগে।

| | ঘণ্টা | মিনিট | | ঘণ্টা | মিনিট |
|---|---|---|---|---|---|
| সুসিদ্ধ অন্ন | ১ | ০ | সিদ্ধ গো মাংস | ৩ | „ |
| „ সাগু | ১ | ৪৫ | ভাজা শূকর মাংস | ৪ | ১৫ |
| „ বার্লি | ২ | „ | সিদ্ধ মুরগি মাংস | ৪ | „ |
| „ দুগ্ধ | ২ | „ | „ হংস | ৪ | „ |
| তাজা দুগ্ধ | ২ | ৪৫ | মাখম | ৩ | ৩০ |
| সিদ্ধ ভেড়ার মাংস | ২ | ১৫ | বার্লি সূপ | ১ | ৩০ |
| „ ডিম্ব | ৩ | ১০ | মজ্জা প্রস্তুত সূপ | ৪ | ১৫ |
| অর্দ্ধ-সিদ্ধ ডিম্ব | ৩ | „ | বাচ্চা মোরগের সূপ | ৩ | „ |
| অসিদ্ধ „ | ২ | „ | রুটি টাট্কা | ৩ | ৩০ |
| ভাজা „ | ৩ | ৩০ | সিদ্ধ আলু | ৩ | ৩০ |
| „ টাট্কা গোমাংস | ৩ | ৩০ | তরকারি | ৪ | ৩০ |

এলেক্সিস সেণ্ট মার্টিন নামক একজন ইউরোপবাসীর পাকস্থলীতে একটি ছিদ্র হইয়াছিল, তদৃষ্টে ডাঃ বোমো স্বচক্ষে পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যাদি পরিপাক করিতে কত সময় লাগিত তাহা নিরূপণ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে দৃষ্ট হইবে যে, ভাত, সাগু দুগ্ধ প্রভৃতি পদার্থ কত সত্বর পরিপাক হয় এবং মাংস, আলু, তরকারি প্রভৃতি দ্রব্য তিন চারি ঘণ্টার কম সময়ে পরিপাক হয় না।

নিরামিষাশী ভারতবাসীর মধ্যে লম্বোদর (ভুঁড়ি) অধিক দৃষ্ট হয় সত্য, কিন্তু খাদ্য দ্রব্য তাহার কারণ নহে। পোষাক পরিচ্ছদ, শারীরিক পরিশ্রমের অভাব, আলস্য, যৌবনে খাদ্যাদি সম্বন্ধে অনিয়ম প্রভৃতিই উহার কারণ।

৯। (ক) ভগবান সর্ব্বভূতেই বর্ত্তমান, জগৎ তাঁহার একাংশে স্থিত এবং তিনি জগতে অনুপ্রবিষ্ট অথবা তিনিই জগৎ। মৃত্তিকাখণ্ডেও তিনি বিরাজ-

মান, কিন্তু অপ্রকাশাবস্থায়। উদ্ভিজ্জ রাজ্যে প্রাণ অতি অল্পই বিকশিত, কাযেই সুখ দুঃখ প্রভৃতি বেদনানুভূতিও অতি অল্প। কিন্তু পশু ও মনুষ্য-জগতে প্রাণ-স্পন্দন স্পষ্ট প্রতীয়মান—আত্মা প্রকাশশীল।

(খ) জীবাত্মা প্রকৃতি সংগ্রামে ঘাত প্রতিঘাত দ্বারা ক্রমোন্নতি লাভ করে। উদ্ভিদ্ জগতে প্রাণের ক্রিয়া অস্পষ্ট প্রতীত হয়, কিন্তু পশু জগতে অভিজ্ঞতা-লাভের চেষ্টা তীব্র বলবতী। বিশেষতঃ দেহের ক্রমোন্নতি সাধিত হইতে বিশেষ সময় ও সুবিধার আবশ্যকতা হয়, এরূপ অবস্থায় কোন জীবের দেহ ধ্বংস করিলে তাহার ক্রমোন্নতি পক্ষে বাধা জন্মান হয়।

(গ) বিশেষ যন্ত্রণা না দিয়া কোন পশুর প্রাণ নাশ করা যায় না। এরূপ নিষ্ঠুর ভাবে হত্যালব্ধ জীবের মাংস কখনও দেহের কল্যাণকর ও উত্তম এবং পবিত্র তেজ বিশিষ্ট হইতে পারে না। বিশেষতঃ হত্যাকালে বেদনা পাইলে মাংস বিষাক্ত হইয়া পড়ে।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষাল।

---

# কস্তুরী প্রকরণ।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

নো ভূয়াজ্জলনৈর্বিনা রসবতী পাকো যথা কর্হিচিৎ
সঞ্জায়েতে যথা বিনা মৃদুমৃদাং পিণ্ডং ন কুম্ভঃ কচিৎ।
তন্তূনাং নিচয়ান্বিনা সুবসনং ন স্যাৎ যথা জাতুচি
ন্নোৎপত্স্যেত বিনোৎকটেন তপসা নাশস্তথা কর্ম্মনাং ॥২২॥

যথা কর্হিচিৎ ( কস্মিন্নপি কালে ) জ্বলনৈঃ ( বহ্নিভিঃ ) বিনা ( ঋতে ) রসবতী পাকঃ ( রসবত্যাং পাকশালায়াং পাকঃ ) ন ভূয়াৎ ( ন জায়েত ) যথা, কচিৎ ( কুত্রাপি ) মৃদুমৃদাং ( কোমল মৃত্তিকানাং ) পিণ্ডং ( সমূহং ) বিনা (ঋতে) কুম্ভঃ (কলসঃ) না সঞ্জায়তে ( ন ভবেৎ ) যথা, চ জাতু চিৎ (কদাপি) তন্তূনাং ( সূত্রাণাং ) নিচয়ান্ ( সমূহান্ ) বিনা (ঋতে) সুবসনং ( সুবস্ত্রং ) ন স্যাৎ তথা উৎকটেন ( কঠোরেণ ) তপসা ( তপস্যয়া ) বিনা কর্ম্মণাং ( দুষ্কৃতাং)

নাশঃ ( ধ্বংসঃ ) নোৎপদ্যেত ( ন জায়েত )। দুষ্কৃতনাশার্থং তপস্যা অবশ্য কর্ত্তব্যা ইতি ভাবঃ। ২২।

যেমন কোথায়ও অগ্নি বিনা রন্ধনশালায় পাক হয় না এবং কোমল মৃত্তিকা পিণ্ড ভিন্ন কলসীর উৎপত্তি হয় না ও কোনও কালে যেমন সূত্র সমূহ ব্যতীত বস্ত্র নির্ম্মিত হয় না, সেইরূপ উগ্রতপস্যা ব্যতীত কর্ম্মের নাশ হয় না। ( কর্ম্মনাশ করিবার জন্য তপস্যা অবশ্য কর্ত্তব্য )। ২২।

কুশলকমল সূরং শীল শালাম্বুপূরং
বিষয় বিহগ পাশং ক্লেশ বল্লী হুতাশম্।
মদন মুখ পিধানং স্বর্গমার্গৈকযানং
কুরুত শিবনিদানং সত্তপো নির্ন্নিদানম্। ২৩।

কুশল কমল সূরং ( কুশলং কমলং মঙ্গলং এব পদ্মং তস্য সূরঃ সূর্য্যঃ তং ) প্রকাশকত্বাদিতিভাবঃ। শীল শালাম্বুপূরং ( শীলমেব চরিত্রমেব শালঃ বৃক্ষঃ তস্য অম্বুপূরঃ ( জলপ্রবাহঃ ) তং বর্দ্ধকত্বাদিতি ভাবঃ। বিষয় বিহগপাশং ( বিষয়া এব বিহগাঃ পক্ষিণঃ তেষাং পাশঃ বন্ধন রজ্জুঃ তং ) নিরোধকত্বাদিতি ভাবঃ। ক্লেশবল্লীহুতাশং ( ক্লেশএব বল্লী লতা তস্যাঃ হুতাশঃ বহ্নিঃ তং ) বিনাশকত্বাদিতে ভাবঃ। মদনমুখ পিধানং ( মদনস্যকামস্য মুখং তস্য পিধানং আচ্ছাদনং ) নিবারকত্বাদিতি ভাবঃ। স্বর্গমার্গৈক যানং ( স্বর্গলোকগমন-মার্গস্য যানরূপং ) শিবনিদানং ( মঙ্গলকারণং ) নির্ন্নিদানং (নিরবশেষং ইত্যর্থঃ) তপঃ কুরুত (আচরত)। ২৩।

মঙ্গলরূপ পদ্মের সূর্য্যসদৃশ, চরিত্ররূপ বৃক্ষের জলপ্রবাহ স্বরূপ, বিষয়রূপ পক্ষীর পাশ তুল্য, ক্লেশরূপ লতার বহ্নির ন্যায় কামবদনের আচ্ছাদন প্রায়, ও স্বর্গমার্গের তরণী বোধে মঙ্গল কারণ একমাত্র নিরবশেষ তপঃ আচরণ কর। ২৩।

মার্গং মনোরম মপাস্য যথাভিলাষং
অক্ষদ্বিপেষু বিচরৎসু তপঃ সৃণিঃ স্যাৎ।
তত্তদ্দমায় মহনীয় পদ প্রদায়
তস্মিন্ যত ধ্বম পহায় বসেষু মূর্চ্ছাং ॥২৪॥

মনোরমং ( সুন্দরং ) মার্গং ( পন্থানং ) অপাস্য ( ত্যক্ত্বা ) অক্ষাদ্বিপেষু

( ইন্দ্রিয় হস্তিষু ) যথাভিলাষং ( যথেচ্ছং ) বিচরৎসু ( গচ্ছৎসু সৎসু ) তপঃ ( তপস্যা ) সৃণিঃ ( অঙ্কুশঃ ) স্যাৎ। নিবারকত্বাদিতি ভাবঃ। তৎ (তস্মাৎ) দমায় (দমনায়, দমো বাহ্যেন্দ্রিয়ানাং বিষয়েভ্যো নিবর্ত্তনং, তস্মৈ ) অকাম্বিপানামিতিশেষঃ। মহনীয় পদপ্রদায় ( অর্হনীয়ৈশ্বর্য্যদান কারিণে ) দমস্য বিশেষণ মেতৎ রসেষু ( শৃঙ্গারাদিষু ) মূর্চ্ছাং ( মোহং ) অপহায় (ত্যক্ত্বা) তস্মিন্ তপসি যতধ্বং ( প্রযত্নং কুরুত )। ২৪।

মনোরম পথ পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয় হস্তিগণ যথেচ্ছাচার আরম্ভ করিলে তপস্যাই তাহাদের নিবারক অঙ্কুশ হয়। অতএব অত্যন্ত পূজনীয় সম্মানপ্রদ ইন্দ্রিয়নিগ্রহের জন্য শৃঙ্গারাদি রস বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া তপস্যায় যত্ন কর। ২৪।

নার্য্যো যুবানমিব বার্ধিমিবাব্ধিপত্ন্যো
বিদ্যা বিনীতমিব ভানুমিবাংশবশ্চ॥
বল্ল্যঃ ক্ষমারুহমিবেন্দুমিবোডবশ্চ
সল্লব্ধয়ঃ সমুপযান্তি তপশ্চরন্তম্॥ ২৫॥

সল্লব্ধয়ঃ ( সল্লাভাঃ ) তপশ্চরন্তং ( তপঃকুর্ব্বন্তং ) জনমিতিশেষঃ, নার্য্যঃ ( স্ত্রিয়ঃ ), যুবানং ( তরুণং ), পুরুষমিতি শেষঃ, ইব ( যথা ), অব্ধিপত্ন্যঃ (নদ্যঃ), বার্ধিং ( সমুদ্রং ) ইব, ( যথা ) বিদ্যা বিনীতং ( বিনয়যুক্তং ) জনমিতি-শেষঃ ইব, অংশবঃ ( কিরণাঃ ), ভানুং ( সূর্য্যং ) ইব, বল্ল্যঃ ( লতাঃ ), ক্ষমারুহং ( বৃক্ষং ) ইব, উডবঃ ( নক্ষত্রাণি ), ইন্দুং ( চন্দ্রং ) ইব, সমুপযান্তি ( সম্যক্ গচ্ছন্তি ) তথা সমুপযান্তি। ২৫।

নারীকুল যেমন যুবার নিকট যায়, নদী যেমন সমুদ্রে যায়, বিদ্যা যেমন বিনীত ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হয়, কিরণ যেমন সূর্য্যের অনুগমন করে, লতা যেমন বৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়া থাকে, নক্ষত্রগণ যেমন চন্দ্রের অনুগামী হয়, সেইরূপ উত্তম লাভ সকল তাপস ব্যক্তির সমীপবর্ত্তী হয়। ২৫।

ক্ষারৈরিবাম্বরমপাং প্রকরৈরিবাঙ্গং।
শাণৈরিবাশ্মমনলৈরিব জাতরূপম্॥
ভূমার্জ্জনৈরিব চ নেত্রমিবাঞ্জনৈশ্চ।
নৈর্ম্মল্য মাবহতি তীব্র তপোভিরাত্মা॥২৬॥

ক্ষারৈঃ ( ক্ষারবস্তুভিঃ ), অম্বরং ( বস্ত্রং ) ইব, অপাং ( জলানাং ) প্রকরৈঃ ( সমূহৈঃ ), অঙ্গং ( শরীরং ) ইব, শাণৈঃ ( অস্ত্রপ্রখরতাকারি প্রস্তর বিশেষৈঃ ) অস্ত্রং ইব, অনলৈঃ ( বহ্নিভিঃ ) জাতরূপং ( স্বর্ণং ) ইব, মার্জ্জনৈঃ ( লেপনৈঃ ), ভূঃ ( ভূমিঃ ) ইব, অঞ্জনৈঃ ( কজ্জলৈঃ ), নেত্রঃ ( চক্ষুঃ ) ইব যথা নৈর্ম্মল্যং ( নির্ম্মলতাং ), আবহতি ( প্রাপ্নোতি ) তথা তীব্রতপোভিঃ ( উগ্রতপস্যাভিঃ ), আত্মা নৈর্ম্মল্যং আবহতি। ২৬।

ক্ষার দ্বারা যেমন বস্ত্র, জলসমূহ দ্বারা যেমন গাত্র, শাণদ্বারা যেমন অস্ত্র, অগ্নি দ্বারা যেমন স্বর্ণ, মার্জ্জন দ্বারা যেমন ভূমি, অঞ্জন দ্বারা যেমন চক্ষু নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয় সেইরূপ উগ্রতপস্যা দ্বারা আত্মা নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয়।২৬।

অথ ভাবপ্রক্রমণং

ক্রমশঃ

---

# বিচার সাগর।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

## লয় চিন্তন।

এইরূপ আচার্য্য শিষ্যকে গোপ্যতত্ত্বের উপদেশ দিলেন। শিষ্যের মুখ অতি প্রসন্ন না দেখিয়া জানিলেন যে শিষ্য কৃতার্থ হয় নাই। সুতরাং, পুনরায় স্থূলরীতিতে উপদেশ জন্য লয় চিন্তন কহিলেন :—

মাটিতে গঠিত ঘট শিষ্য যেইরূপ।
অন্তর বাহিরে মাটি তাহার স্বরূপ॥
জলবিম্ব, ফেনা, আর তরঙ্গ যেমন।
জলেই উপজে, নহে পৃথক কখন॥
এইরূপ কার্য্য শিষ্য, হয় যে যাহার।
তাহাই কারণরূপ নহে ভিন্ন আর॥
"সেই আমি" যিনি ঈশ সকল কারণ।
লও জ্ঞান, কর শিষ্য এ লয় চিন্তন॥ ১৬৭॥

[ টীকা :—যেমন মৃত্তিকাগঠিত বস্তুর বাহির ভিতর সবই মাটি। সুতরাং, মাটির সব কার্য্যই মাটি স্বরূপই। জলের ফেনা আদি সব জলই। এইরূপ, যে যাহার কার্য্য, সে তাহার কারণস্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে। পরন্তু কার্য্য কারণেরই স্বরূপ। এই সকল প্রপঞ্চের মূল কারণ ঈশ্বর। সুতরাং সর্ব্ব প্রপঞ্চ ঈশ্বর স্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে, পরন্তু ঈশ্বরই সর্ব্ব প্রপঞ্চের স্বরূপ। "সেই ঈশ্বর আমি" এই নীতিতে লয় চিন্তন জানিয়া সাধন কর।

লয় চিন্তনের সংক্ষেপতঃ ক্রম :—সকল স্থূল ব্রহ্মাণ্ড প্রপঞ্চীকৃত ভূত সমূহের কার্য্য। তথায়, পৃথ্বীর কার্য্য পৃথ্বীস্বরূপ, জলের কার্য্য জলস্বরূপ, এই রীতিতে যে ভূতের যে কার্য্য তাহা সেই ভূতস্বরূপ। এই রীতিতে সকল স্থূলব্রহ্মাণ্ড প্রপঞ্চীকৃত ভূতস্বরূপ। সেইরূপ আবার পঞ্চীকৃত ভূতসমূহ অপঞ্চীকৃত ভূতসমূহের কার্য্য, সুতরাং অপঞ্চীকৃত ভূতস্বরূপ, ভিন্ন নহে। অন্তঃকরণাদি সূক্ষ্ম সৃষ্টিও অপঞ্চীকৃত ভূতসমূহের কার্য্য বলিয়া অপঞ্চীকৃত ভূতস্বরূপ। অন্তঃকরণ ভূতসমূহের সত্ত্বগুণের কার্য্য, সুতরাং সত্ত্বগুণস্বরূপ। সেইরূপ জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল ভূতসমূহের রজোগুণের কার্য্য, সুতরাং রজোগুণ স্বরূপ। এই রীতিতে সকল সূক্ষ্ম সৃষ্টি অপঞ্চীকৃত ভূতস্বরূপ।

এইরূপে প্রপঞ্চীকৃত ভূত সমূহের লয় চিন্তা করিয়া, অপঞ্চীকৃত ভূত সমূহের লয় চিন্তা করিবে। পৃথ্বী জলের কার্য্য সুতরাং জলস্বরূপ। জল তেজের কার্য্য, সুতরাং তেজস্বরূপ। তেজ বায়ুর কার্য্য, সুতরাং বায়ুস্বরূপ। বায়ু, আকাশের কার্য্য, সুতরাং আকাশস্বরূপ। আকাশ তমোগুণ প্রধান প্রকৃতির কার্য্য, সুতরাং প্রকৃতিস্বরূপ।

প্রকৃতি মায়ার অবস্থাবিশেষ, সুতরাং মায়াস্বরূপ। প্রধান, অব্যক্ত, মায়া, অজ্ঞান, অবিদ্যা, শক্তি এক পদার্থেরই নাম। কার্য্যসমূহ আপনাতে লীন করিয়া প্রলয়স্থিত উদাসীন স্বরূপকে প্রধান বা অব্যক্ত কহে। সৃষ্টির উপাদান যোগ্য তমোগুণ প্রধান স্বরূপকে প্রকৃতি কহে। যেমন ইন্দ্রজালে (মায়ামন্ত্রে) দেশ কালাদি সামগ্রী বিনা দুর্ঘট পদার্থের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ অসঙ্গ অদ্বিতীয় ব্রহ্মে দুর্ঘট ইচ্ছাদি উৎপন্ন করে বলিয়া মায়া কহে। স্বরূপ আচ্ছাদন করে বলিয়া অজ্ঞান কহে। ব্রহ্মবিদ্যাদ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয় বলিয়া অবিদ্যা কহে। কদাপি স্বতন্ত্র থাকেনা পরন্তু চৈতন্যের আশ্রিত হইয়া

থাকে বলিয়া শক্তি কহে। এই রীতিতে প্রকৃতি আদি প্রধানেরই ভেদমাত্র, সুতরাং প্রধানস্বরূপ। সেই প্রধান ব্রহ্ম চৈতন্যের শক্তি। যেমন পুরুষের সামর্থরূপ শক্তি পুরুষ হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ চৈতন্যের প্রধানরূপ শক্তি ব্রহ্ম চৈতন্য হইতে ভিন্ন নহে। এই প্রকারে ব্রহ্মবিষয়ে অনাত্মপদার্থ সমূহের লয় চিন্তা করিয়া "সেই অদ্বয় ব্রহ্ম আমি" এই চিন্তা করিবে।

## ধ্যান ও জ্ঞানের ভেদ।

মহাবাক্য বিচার শ্রবণেও, বুদ্ধিমন্দতা হেতু কোনরূপ প্রতিবন্ধক হইতে যাহার অপরোক্ষ জ্ঞান হয় না তাহার নিমিত্ত এই লয় চিন্তনরূপ ধ্যান কথিত হইল। ধ্যান ও জ্ঞানে প্রভেদ এই যে—জ্ঞান * প্রমাণ ও প্রমেয়ের অধীন, বিধি (নিয়ম) ও পুরুষের অধীন নহে। ধ্যান বিধি তথা পুরুষের ইচ্ছা, বিশ্বাস ও সংশয়ের অধীন। যেমন, প্রত্যক্ষজ্ঞানে, নেত্র প্রমাণ ও ঘটাদি প্রমেয়; সে স্থলে নেত্র ও ঘটের সম্বন্ধ হইলেই পুরুষের ইচ্ছা বিনা ঘটের প্রত্যক্ষজ্ঞান হয়। ভাদ্রপদশুক্লচতুর্থীতে চন্দ্রদর্শন নিষেধ, অর্থাৎ বিধি নাই। যদিও পুরুষের ইচ্ছা হয় "আজ চন্দ্রদর্শন করিব না", তথাপি কোন গতিকে প্রমাণ নেত্র সহিত প্রমেয় চন্দ্রের সম্বন্ধ হইলে, চন্দ্রের প্রত্যক্ষজ্ঞান অবশ্যম্ভাবী। এই রীতিতে জ্ঞান প্রমাণ ও প্রমেয়ের অধীন, বিধি ও ইচ্ছার অধীন নহে। "শালগ্রামবিষ্ণুরূপ" এই ধ্যানে লোকে সুফল প্রাপ্ত হয়। সে স্থলে শাস্ত্রপ্রমাণে বিষ্ণু চতুর্ভুজ মূর্ত্তি, শঙ্খ, চক্র, গদা, ও লক্ষ্মী সহিত। নেত্রপ্রমাণে শালগ্রাম শিলা। তথাপি বিধি বিশ্বাস ও ইচ্ছাবলে "শালগ্রাম বিষ্ণু" এইরূপ ধ্যান হইয়া থাকে। সেই ধ্যান নানাপ্রকার। কোথাও কোন বস্তুর অন্যরূপে ধ্যান, যেমন শালগ্রামের বিষ্ণুরূপে ধ্যান,—ইহাকে প্রতীক ধ্যান কহে। আবার বৈকুণ্ঠনাথ বিষ্ণুর শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী চতুর্ভুজ মূর্ত্তিরূপ ধ্যান,—এস্থলে ধ্যান ধ্যেয়রূপের অনুসার,—সেইরূপ প্রত্যক্ষ নহে, কেবল শাস্ত্র হইতে জানা যায়। শাস্ত্রে শঙ্খ চক্রাদি সহিত বিষ্ণুর রূপ উক্ত হয়, সুতরাং এই ধ্যান ধ্যেয় স্বরূপের অনুসার। বিধি, বিশ্বাস, ও ইচ্ছা বিনা ধ্যান হয় না।

---

* ভ্রম জ্ঞান, স্মৃতিজ্ঞান ও প্রমাজ্ঞান ভেদে জ্ঞান ত্রিবিধ।

"এইরূপে উপাসনা কর" এই প্রেরক বচনের নাম বিধি বা বিধান। সেই বাক্যে শ্রদ্ধার নাম বিশ্বাস। অন্তঃকরণের কামনারূপ রজোগুণবৃত্তির নাম ইচ্ছা। বিধি, বিশ্বাস ও ইচ্ছা ধ্যানের হেতু, জ্ঞানের নহে। সংশয়ে ও ধ্যান হয়, কিন্তু জ্ঞান হয় না। কারণ, নিরন্তর ধ্যেয়াকার চিত্তবৃত্তিকে ধ্যান কহে। সে স্থলে বৃত্তির বিক্ষেপ ঘটিলে সন্দেহ হইতে বৃত্তিস্থিতি হয়। জ্ঞানরূপ অন্তঃকরণ বৃত্তি দ্বারা তৎকালেই আবরণ ভঙ্গ হয় বলিয়া বৃত্তি স্থিতির উপযোগ হয় না। সুতরাং জ্ঞান সন্দেহ সাপেক্ষ নহে। বৈকুণ্ঠনাথ চতুর্ভুজ বিষ্ণুর ধ্যানের ন্যায় "আমি ব্রহ্ম" এই ধ্যানও ধ্যেয়ের অনুসার। ইহা প্রতীক ধ্যান নহে, কিন্তু অহংগ্রহ ধ্যান। ধ্যেয়স্বরূপকে আপনা হইতে অভেদ চিন্তনকে অহংগ্রহ ধ্যান কহে। যাহার অপরোক্ষ জ্ঞান হয় নাই এবং বেদাজ্ঞা বিধি বিশ্বাস করিয়া সন্দেহ যুক্ত হইয়াও "আমি ব্রহ্ম" এই বৃত্তিস্থিতিরূপ অহংগ্রহ ধ্যান করে, সে ব্যক্তিও জ্ঞান লাভ করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়।

প্রণব উপাসনা।

অহংগ্রহ উপাসনার রূপান্তর কথিত হইতেছে—

"অহংগ্রহ" ধ্যান শিষ্য প্রণব অক্ষর।
শ্রুতি অনুসারে কহে গুরু সুরেশ্বর॥
প্রণব অক্ষর সেই ব্রহ্মের স্বরূপ।
আমিত প্রণবরূপ সে ব্রহ্ম অনুপ॥
ক্ষণমাত্র কর স্থির নিজ মতিগতি।
ইহার সমান ধ্যান নাহিক সুখতি॥
মুনি সেই করে যেই এই উপাসন।
অপার সংসার নাশে ত্বরিতে সে জন॥ ১৬৮॥

[ টীকাঃ—হে শিষ্য! প্রণব অক্ষরের রূপ অর্থাৎ ওঁকার স্বরূপের অহংগ্রহ ধ্যান, মাণ্ডূক্য প্রশ্ন আদি শ্রুতি অনুসারে সুরেশ্বরাচার্য্য * যাহা কহিয়াছেন, তাহা তুমি সাধন কর। তাহার সংক্ষেপত প্রকার এই—প্রণব অক্ষর ব্রহ্ম

* সুরেশ্বরাচার্য কৃত পঞ্চীকরণ নাম গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। অহংগ্রহধ্যানের বিশেষ রীতি ঐ গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে।

স্বরূপ। "সেই প্রণবরূপ ব্রহ্ম আমি" এই রীতিতে ক্ষণমাত্র নিজ মতিগতি স্থির কর, ইহার সমান অন্য ধ্যান নাই।

## নির্গুণ ও সগুণ প্রণব উপাসনা ও তৎফল কথন।

প্রণব উপাসনার বিশেষ রীতি মাণ্ডূক্য উপনিষদে আছে। মাণ্ডূক্য ভাষ্যকার ও আনন্দগিরি সেই রীতি বিশদ করিয়া দিয়াছেন। সেই রীতি বার্ত্তিককার পঞ্চীকরণে লিখিয়াছেন। তথাপি ঐ সকল গ্রন্থ বিচারে যাঁহারা সমর্থ নহেন, তাঁহাদের নিমিত্ত প্রণব উপাসনার রীতি সংক্ষেপে লিখিত হইল। উপনিষদসমূহে প্রণবচিন্তন দ্বিবিধ কথিত হইয়াছে ঃ—(১) পরব্রহ্ম বা নির্গুণ ব্রহ্ম রূপে প্রণবচিন্তন ও (২) অপরব্রহ্ম বা সগুণ ব্রহ্মরূপে প্রণবচিন্তন। পরব্রহ্মরূপে প্রণবচিন্তনে মোক্ষলাভ হয়, এবং অপর ব্রহ্মরূপে প্রণব চিন্তনে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়।

ক্রমশঃ

শ্রীবিজয়কেশব মিত্র।

---

# কবির।

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর )

৩৫। কবির ইহায় চিতাওনা যো নিকয়াবী যায়।
যো পহিলেঁ সুখ ভোগিয়ে সো পাছে দুখ্ খায়॥

কবির বলেন, ঐরূপ অহংকার পরিহার পূর্ব্বক চৈতন্য না হইয়া যে প্রথমে সুখ ভোগ করে তাহার পশ্চাতে দুঃখ হয়।

৩৬। কবির আজুকি কাল্ নহমে জঙ্গল হোয়েগা বাস।
উপর উপরা কি বহেঙ্গে ঠোর চরণ তা ঘাস॥

কবির বলেন, আজ হউক বা কাল হউক তোমার বাসস্থান জঙ্গলে পরিণত হইবে, তখন উপরে উপরে ঘুরিয়া বেড়াইবে। ঐরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে ঠিকানা না পাইয়া ঘাস খাইতে হইবে।

৩৭। কবির মুঁয়ে হো মরি যাহুগে কইন লেগা নাও।
উজর যাই বসাই হো ছোড়ি মস্তা গাঁঔ॥

কবির বলেন, যদি মরিয়া থাক ত মরিয়াই যাইবে, কেহই তোমার নাম করিবে না। উজর হইয়া গেলে সাধুদিগের গ্রাম ছাড়া অন্ত একটা স্থানে বসিতে হইবে।

৩৮। কবিব হাড জরে যেঁও লকৃড়ি কেশ জরে যেঁও ঘাস।
সব জগ জরতা দেখিকে ভয়া কবির উদাস॥

কবির বলেন, যেমন কাষ্ঠ প্রজ্বলিত হয় তেমনি অস্থি জ্বলে, যেমন ঘাস জ্বলে তেমনি কেশ জ্বলিতেছে। সমগ্র জগত জ্বলিতেছে দেখিয়া কবির উদাস হইয়াছে।

৩৯। কবির রাথ নিহাবা বাহবা চিড়ীয়ন্ হনহ খায়া ক্ষেত।
আধা পবধা উববে চেতি শকে তো চেত॥

কবিব বলেন, বাহিবে দৃষ্টি রাখিয়া চিড়ীয়ারা ক্ষেত খাইয়া ফেলিয়াছে। অন্ধ-উপবে আরোহন করিয়া যদি চৈতন্য হইতে পাব তবে হও।

৪০। কবির যো জন্মে সো ভিখরে হম্‌ভি চল্ নেহার।
মেরে পিছে যো পবা তিন্‌হভি বাঁধা ভার॥

কবির বলেন, যে জন্মিয়াছে সেত মবিবেই। আমি চলিয়া যাইব, আমার পশ্চাতে যাহাবা পডিবে তাহারা ভার বাঁধিবে।

৪১। কবির মায় বুঢানী বাপ্ বুঢানা হম্‌ভি মাঝ বুঢায়।
কেওটিয়াকে নাও যেঁও সংযোগে মিলে আয়॥

কবির বলেন, মা ডুবিয়াছেন, বাবাও ডুবিয়াছেন, আমিও তাহার মাঝে ডুবিয়াছি। হঠাৎ এক খানি কৈবর্ত্তেব নৌকা পাইয়া রক্ষা পাইলাম।

৪২। কবিব দেওয়ল্ হাডকা মাসতে বাঁধা আন।
খড় খড় তা পায়া নহি দেওয়ল্ কা মহিদান॥

কবির বলেন, অস্থির মন্দির মাংসে বাঁধা। ইহাতে ভগবান অবস্থান করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া পাইলাম না, গুরু উপদেশ ব্যতীত তাঁহাকে পাওয়া যায় না।

৪৩। কবির দেওয়ল্ ঢহি-পরা ইট্ভয়ি সয়াকার।
চিতেরা চুনি চুনি গয়া মিলা না ছুজি দোর॥

কবির বলেন, মন্দির ভগ্ন হওয়ায় ইষ্টকগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। চৈতন্ত তাহা খুঁটিয়া খুঁটিয়া ভক্ষণ করিয়াছেন, সে খানে যাইবারও পথ পাইতেছি না।

৪৪। কবির রাম নাম জানেও নাহি বেমুখ আন্হি আন।
কি ভূষা কি কাতবা খাতে গয়া পরাণ॥

কবির বলেন, রামনাম জানিলে না, তাহাতে বিমুখ হইয়া অন্ত বস্তুতে আসক্ত হইলে, প্রাণটা ভূষো খাইয়াই নষ্ট করিলে।

৪৫। কবির রাম পিয়ারে ছোড়িকে করে আওর কো জাপ।
বিশ্যাকেরা পুত্র যো কহে চেন কো বাপ॥

কবির বলেন, প্রিয় রামকে ত্যাগ করিয়া অন্ত জপ করিয়া কি হইল? ঠিক যেন বেশ্যা পুত্র, পিতাব ঠিক নাই, বাপ বলিবে কাহাকে?

৪৬। কবির যিন্হি হরি কি চোরী করি গয়ে নাম গুণ ভুলি।
তেহি বিধনে বাদুর বচো বহে উৰ্দ্ধমুখ ঝুলি॥

কবির বলেন, যিনি হরিকে চুরি করিয়া হরিনাম মাহাত্ম্য ভুলিয়াছেন, বিধাতা তাঁহাকে বাদুড় করিয়াছেন,—সে সর্ব্বদা উর্দ্ধ মুখে ঝুলিয়া থাকে।

৪৭। কবিব রাম নাম জানিয়োনহি বাণি বিনাঠি মূল।
হরি ত্যজি ইহাই বহি গয়া অন্ত পরিমুখ ধূল॥

কবির রাম নাম জানিলে না, কথার মূল বিনাঠি হরিকে ত্যাগ করিয়া রহিলে। অন্তে তোমার মুখে ধূলা পড়িবে। (লাঠির দুই দিকে আগুণ জালিয়া মধ্যে ধরিয়া ঘুরাইয়া খেলাকে বিনাঠি বলে। রাজসাহীতে মুসলমানেরা ইহাকে বান্নুঠি বলে।)

৪৮। কবির রাম নাম জানেও নহি লাগি মোটি খোরি।
কায়া হাঁড়ি কাঠ কি না ওহচাড় বহোবি॥

কবির রামনাম জানিলেও না আর কাঠের হাঁড়ির ন্যায় শরীরেও চড়িতে পারিলে না।

৪৯। কবির রামনাম জানেও নহি চুকেয়ো অবকি ঘাত।
মাটি খিলন কুঁহার কি ঘান সহেগা লাত॥

কবির রামনাম জানিলেও না আর এখন সুযোগও অবহেলা করিলে। কুম্ভকারের মত হাঁড়ি প্রস্তুতের মাটি লাথি মারিয়া বুঝিয়া লইলে না!

৫০। কবির এই সংসারমে ঘনা মনিখ মত হীন।
রামনাম জানেয়ো নহি আয়ে বুঢ়াপা দিন্॥

কবির বলেন, এ সংসারে অনেক মনুষ্য মত হীন হইয়া আছে। বৃদ্ধাবস্থা হইয়া আসিল তবুও রামনাম জানিল না।

৫১। কবির কহে কিয়াতুম আইকে কহে করোগে যায়।
ইৎকে ভয়ে ন উত্তকে চলে জন্ম বাহড়ায়॥

কবির এখানে আসিয়াই বা কি করিলে, সেখানে যাইয়াই বা কি করিবে? জন্মটা বৃথা নষ্ট করিলে, এ দিক ও দিক কোন দিকেরই কিছু করিলে না।

৫২ কবির এক হরি কি ভক্তি বিনু ধৃক্ জীওয়ন সংসার।
ধূয়াকা ধৌর হবয়ো যাত ন লাগে বার॥

কবির বলেন, হরিনাম বিনা এ সংসারে জীবন ধারণ বৃথা। লাঙ্গলের ফালের যেমন মাটির নীচে যাইতে বিলম্ব হয় না, তেমনি সে জীবন যাওয়াই ভাল।

৫৩। কবির জগৎ মোহ মন বাঁচিয়া ঝুটে কুল কি লাজ।
তন্ বিন্শে কুল বিন্শে রটেন রাম জাহাজ॥

কবির জগতে মন নিবিষ্ট করিয়া আছ, মিথ্যা কুলের লজ্জায় শরীর নাশ করিলে। যখন কুলও নষ্ট হইবে তখন রামনামের জাহাজ আর কূলে ভিড়িবে না।

৫৪। কবির এহতন্ কাঁচা কুম্ভ হয় চোট লাগে কুটি যায়।
এক হরিকে নাম বিনু যব তব্ জীউ জহড়ায়॥

কবির এ দেহ মৃৎকুম্ভের ন্যায়, আঘাত লাগিলেই ভগ্ন হয়। এক হরি নাম বিনা জীব যখন তখন মরিয়া যাইবে।

৫৫। কবির এহ তন্ কাঁচা কুম্ভ হায় লিয়ে কি রত্ন হায় সাথ।
ঠব্কা লাগা কুটি গয়া কছু নহি আয়া সাথ॥

কবির মৃণ্ময় কলসীরন্যায় শরীরটা লইয়া বেড়াইতছ। অল্প চোটেই ভাঙ্গিয়া যাইবে তখন হাতে কিছুই থাকিবে না।

৫৬। কবির এহতন্ কাঁচা কুম্ভ হায় মূঢ় করে বিশ্‌ওয়াম।
কহে কবির বিচারিকে নহি বালক্ কি আশ॥

কবির মৃণ্ময় কলসীর ন্যায় এই শরীরকে মূর্খ ব্যক্তিরাই বিশ্বাস করে। কবির বিচার করিয়া বলিতেছেন এ শরীরের এক পলও আশা করা যায় না।

৫৭। কবির পাণি মর্হক' বুদ্‌বুদা দেখৎ গয়া বিলায়।
য়্যাছাহি জীয়াবা যায়েগা দিন দশ্ ঠোগরি লগায়॥

কবির জলবুদ্‌বুদ্ যেমন দেখিতে দেখিতে বিলয় হয়, এ জীবনও তদ্রূপ চলিয়া যাইবে, দশ দিনের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

৫৮। কবির এহতন্ যাৎ হায় শকে তো ঠোব লাগায়ো।
রাজা রাণা সভগয়া কাহুন রহিয়া ঠায়ো॥

কবির বলেন, এ জীবন চলিয়া যাইতেছে যদি পার তবে কিনারায় ল'গাও। রাজা রাণা সকলেই গিয়াছেন, কেহই তিষ্ঠিতে পারেন নাই।

৫৯। কবির এহতন্ যাৎহায় শকেতো লেহুবহোরি।
নংগী হাথেতে গয়ে যাকে লাখ করোর॥

কবির বলেন, এ শরীর ত চলিয়া যাইতেছে যদি পার এই বেলা ফিরাইয়া আন। শূন্য অবস্থায় খালি হাতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি চলিয়া গিয়াছে।

৬০। কবির বাসর সুখ নহি রয়েন সুখ না সুখ স্বপ্নেমাহ।
যোনর বিছুরে রাম সোঁ তিনহ্ কো ধূপ ন ছাঁহ॥

কবির বলেন, যাহারা রাম ভুলিয়া গিয়াছে তাহাদের দিবসেও সুখ নাই রাত্রেও শান্তি নাই, স্বপ্নেও সুখ নাই। তাহাদের রৌদ্রও নাই ছায়াও নাই।

৬১। কবির দিন গঁওয়ায়া মুপৎমে দুনিয়াঁ নলাগি সাথ।
পাও কুল্‌হাড়ি মারিয়া গাফীল অপনে হাথ॥

কবির দিন বৃথা নষ্ট করিলে, এ দুনিয়া তোমার সঙ্গে যাইবেনা। গাফেলি করিয়া নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করিলে!

৬২। কবির এহতন্ বন ভয়া কর্ম্ম যো ভয়া কুল্ হার।
আপনে আপ্‌কো কাটিয়া কহেঁ কবির বিছার॥

কবির এ শরীর জঙ্গলে পূর্ণ আর কর্ম্ম হইয়াছে কুড়াল। কবির বলেন, আপনি সে জঙ্গলরূপ কর্ম্ম কুড়াল দ্বারা কাটিয়া ফেল।

৬৩। কবির কুল খোয়ে কুল উব্‌রে কুল রাখে কুল যায়।
রাম অকুল কুল মেটিয়া সভ কুল গয়া বিলায়॥

কবির বলেন, কুল নষ্ট হইলে পুনরায় কুল হয়, কুল রাখিলে কুল যায়। রাম যখন অকুল কুল মিটাইয়া দিবেন তখন সব কুল বিলয় প্রাপ্ত হইবে।

৬৪। কবির দুনিয়াকে ধোঁখে মুয়া চলাযো কুল কি কাঁণ।
তব্‌কা কো কুল লাজ্‌সি যব লয় ধবে মশান॥

কবির বলেন, দুনিয়ার ধোঁকায় সকলেই এক রকম মরিল, কেবল কাণে শুনিয়াই মিথ্যা কাজ করিতেছে। কিন্তু যখন তোমাকে মশানে ধরিয়া লইয়া যাইবে তখন তোমার কুলের লজ্জা কোথায় থাকিবে?

৬৫। কবির কুল করণীকে কারণে, হংসা চলে বিগোয়।
তবকা কোকুল লাজসি যব চারি চরণকা হোয়॥

কবির বলেন, কুলকর্ম্ম করিবার জন্যই কি তোমার জন্ম? যখন তুমি চারি জনের স্কন্ধে চড়িয়া চলিবে তখন কোথায়ই বা কুল আর কোথাই বা লজ্জা থাকিবে?

৬৬। কবির কুল করণীকে কারণে হোয়ে রহা নল সুম।
তব কাকো কুল লাজসি যব যম ধুমাধুম॥

কবির কুলকর্ম্ম করিবার জন্য কৃপণ হইয়া বসিয়া আছ। যখন যম আসিয়া মহা ধুমধামের সহিত তোমায় লইয়া যাইবে, তখন কুল ও লজ্জা কোথায় পড়িয়া থাকিবে!

৬৭। কবির কুলকরণী কি পাথরী কুপ কঠোর তামাহি।
বাঁচি চলা সো উব্‌রা নহিতো বুড়াতাহি॥

কবির কুলকর্ম্মরূপ কুণ্ড কূপের মধ্যে আছে। যদি তাহা হইতে উঠে তবেই রক্ষা নচেৎ তলাইয়া যায়।

৬৮। কবির যেতা ডর হায় জাৎকি তেতা হরি কি হোয়।
ঢোল দামামা দেই চলে চলা ন পকরে কোয়॥

কবির জাতের জন্য যত ভয় কর হরির জন্য তত ভয় কর কি? যদি তত ভয় কর তবে লোকে ঢোল দামামা বাজাইয়া তোমার পশ্চাৎ চলিবে কিন্তু ধরিতে কেহই পারিবে না।

৬৯। কবির কেওয়ল রামকো তুমতি ছোড়ে ওট্।
নাতো অহরল্ ঘন বিথে ঘনি সহেগা চোট॥

কবির রামচন্দ্রই কেবল ধর্ম্ম, তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিও না। এই কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্মে মনোনিবেশ করিলে পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু ভোগ করিতে হইবে

৭০। কবির কেওয়ল রাম কহু সুজগরি বা ঝারি।
কুল বড়াই চুড়সী ভাবী পরসী মারি॥

কবির এ সংসারে থাকিয়া কেবলরূপী রামচন্দ্রের কার্য্য কর। তাহা হইলে তোমার কুলের বড়াই ঘুচিয়া যাইবে ও আর একটী প্রতাপশালী প্রতিবাসীকেও মারিতে পারিবে

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

---

# জীবাত্মা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ ঈশ্বরাংশ অথবা অতিসূক্ষ্ম বিবিধ উপাধিগত ঈশ্বর বা তদাভাসরূপ জীবাত্মাসমূহ ত্রিলোকী মধ্যে প্রবেশকরণ অভিপ্রায়ে অবতরণোন্মুখ হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে মুক্তাত্মা প্রভৃত তেজপুঞ্জ দেবগণ ও পিতৃগণ তাঁহাদের সম্পূর্ণ সহায়তা করিতে লাগিলেন। প্রথম তিনটী আদিত্য বা গণদেবতা দ্বারা কুমারগণের আত্মিক, বুদ্ধিক ও মানসিক ভাব জাগ্রত হইল। কুমারগণ মহাতেজস্বী, আমাদের ত্রিলোকী তাঁহাদের তেজ সহ্য করিতে পারিবে না বলিয়া তাঁহারা স্বীয় ভবনে (অনুপাদকস্তরে) থাকিয়া আভাস চৈতন্যরূপে

ত্রিলোকী মধ্যে প্রবেশ করিলেন—আত্মিকস্তরের একটী অণু, বুদ্ধিকস্তরের একটী অণু এবং উচ্চ মানসিকস্তরের একটী অণু—এই তিনটী অণু গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ অণুত্রয়কে উপাধিস্বরূপ করিয়া স্বীয় স্বীয় চৈতন্যের প্রতিবিম্বদ্বারা অর্থাৎ আভাস চৈতন্যের দ্বারা জীবাত্মারূপে মানবদেহে আগমন করিলেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে Monad ( আত্মাবুদ্ধি ) জীবগণ, প্রথমে স্থাবর-রাজ্যে, তৎপরে উদ্ভিদরাজ্যে এবং শেষে জান্তবরাজ্যের মধ্য দিয়া বহুকালে মানবরাজ্যে উপনীত হয়েন। পাঞ্চভৌতিক উপাদানসমূহ সুচারু গঠনক্ষম হইলেই সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গসহ মানবদেহ প্রস্তুত হয়—উপাধি যেরূপ ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট হইতেছে, প্রত্যেক নিহিত চৈতন্যকণাও সঙ্গে সঙ্গে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে—দেহ সকল পাঞ্চকৌষিক (বা সপ্তকৌষিক) স্থূলের মধ্যে সমস্তই সুপ্ত প্রায় আছে। পশুপক্ষীদিগের মধ্যেও দ্বিতীয়, তৃতীয় কোষগুলি কিছু কিছু বিকশিত হইয়া থাকে—অপরগুলি সুপ্তবীজবৎ। গৃহপালিত জীবজন্তু মধ্যে মানসিক ভাবগুলির ঈষৎ স্ফুরণ হয়—ক্রমে মানবে অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মানবদেহ উপযুক্ত হইলে অর্থাৎ নিম্নরাজ্যে জীবের মনোময় কোষ সামান্যরূপ দেখা দিলে দেহ প্রস্তুত হয়; এবং সেই সময়ই ঈশ্বর হইতে তৃতীয় জীবনীশক্তির স্রোত প্রবাহিত হইয়া মানবকুল যথার্থ মনুষ্যনামের উপযুক্ত হয়েন—তখন "মানস" মানবদেহে আবির্ভূত হয় এবং কারণশরীরও দেখা দেয়। এস্থলে সকলেরই একটু বিশেষ মনঃসংযোগ প্রয়োজন—কুমারগণ বা যাঁহারা প্রকৃত পক্ষে আমাদের জীবাত্মা (Manads who are the direct rays আদি প্রতিচ্ছায়া বা সাক্ষাৎ প্রতিবিম্ব from Paramatma the three fold সচ্চিদানন্দ) তাঁহারা এতাবৎকাল অনুপাদকস্তর হইতে নিম্নস্তরের সকলের উপর শক্তি সঞ্চালন করিয়া আসিতেছিলেন মাত্র এবং এখনও করিতেছেন—তাঁহাদের সহিত আমরা সূত্রাত্মা দ্বারা আবদ্ধ—এবং সেই হিরণ্ময় সূত্রাত্মা আমাদের উচ্চস্তরে আত্মিক অণু হইতে বুদ্ধিক অণু এবং বুদ্ধিক অণু হইতে মানসিক অণু এবং পুনরায় ফিরিয়া আত্মিক অণুতে সংযুক্ত হইয়া একটী উজ্জ্বল ত্রিভুজ সদৃশ ( a Triangle of Light ) বিরাজ করিতেছেন—আমাদের স্থূল দৃষ্টির অগোচর একটী সূক্ষ্ম সূত্রদ্বারা আমাদের Monad এর সহিত আমাদের সম্বন্ধ ক্রমে ঐ সূত্র স্থূল ও

স্থূলতর, সুদৃঢ় ও উজ্জ্বলতর হইতে থাকে "The Thread between the silent Watcher and His shadow becomes more strong and radiant S. D. I. 285. কিরূপে কারণশরীর প্রথমে প্রস্তুত হয় এবং কিরূপে মানসের আবির্ভাব হয় তাহা দেখাইবার জন্য আনি বেশান্তের Study in Consciousness হইতে নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম :—"This downflow of Monadic life is accompanied by much increased flow between the Buddhic and Manasic permanent atoms, and the latter seems to awaken, sending out thrills in every directions. Other manasic atoms and molecules gather round it, and a whirling vortex is seen on the three upper subplanes of the mental plane. A similar whirling motion is seen in the cloudy mass surrounding the attached mental unit below, enveloped in the remaining layer of the Group soul, as already described The layer is torn asunder, and caught up into the vortex above, where it is disintegrated, and the causal body is formed, a delicate filmy envelope as the whirlpool subsides. This downflow of life, resulting in the formation of the causal body, is called the Third Life Wave as is properly ascribed to the First Logos, since the Monads came forth from Him and represent His Time life."

এই উপাধি প্রস্তুত হইবার পর হইতেই প্রতিবিম্বিত জীবাত্মা বা Spiritual Triad অধিকতর শক্তির সহিত নিম্নস্থ অপরাপর উপাধিগুলিকে আয়ত্তাধীন করিয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু এখনও জীবাত্মার বাল্যাবস্থা—যেমন শৈশবাবস্থায় মানসের স ম্ভব সত্ত্বেও বালকের ক্রীড়াদি কার্য্যে তাদৃশ উচ্চ বুদ্ধির সংস্রব দৃষ্ট হয় না -ক্রমে বহু জন্মান্তরে কারণশরীরসহ মানস বিলক্ষণ পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইলে, তাহার স্পন্দনে বুদ্ধিক স্থায়ী অণু স্পন্দিত হইতে হইতে ধীরে ধীরে বুদ্ধিক শরীর গঠিত হয়। এখন মানস বুদ্ধিতে

সংলগ্ন হইয়া বুদ্ধিক শরীরে অবস্থিত হইয়া বুদ্ধি—মানসরূপে কার্য্য করিতে থাকে Spiritual Triad এর দুই অংশ এইরূপে ক্রমশঃ সম্যক্ পরিপুষ্ট হইলে, কালে বুদ্ধি—মানসরূপে আত্মার সহিত অভিন্নরূপে যুক্ত হইয়া আত্মা বুদ্ধি মানস তিনে এক হইয়া Monad এ মিলিত হইয়া যায়—তখন auric Eggs প্রকৃত জীবাত্মা ( Monad ) এর উপাধিস্বরূপে পরিণত হয় এবং জীবের আত্মজ্ঞান জন্মে। সপ্তস্তরই আমাদের দেহে আছে—অনুপাদক ও আদি সমস্তই ইহার মধ্যে—Monad সেই ঈশ্বরের বা মহাসূর্য্যের ছায়া স্বরূপ আমাদের দেহের অতি গূঢ়স্থানে আছেন।

"ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে, গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ॥"

কঠে ৩—১ শ্লোক।

দেহ মধ্যে পরমশ্রেষ্ঠ হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট হইয়া সুকৃত ফল যে দুই আত্মা ভোগ করিতেছেন—ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাঁহাদের ছায়া ও আতপ (সূর্য্য) বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন—কর্ম্মিগণ এবং পঞ্চাগ্নি গৃহস্থগণও ঐরূপ কহিয়া থাকেন।

ছায়া ও আতপ সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ ধারণার প্রয়োজন। আমাদের নিকট দেহ ছায়া—প্রাণাত্মা সূর্য্য, যিনি কথঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছেন মাত্র তাঁহার নিকট প্রাণাত্মা ছায়া—Spiritual Triad সূর্য্য ( কারণ তিনি Spiritual Triadকেই জীবাত্মা বলিয়া জানেন ), ঋষিগণের নিকট প্রকৃত জীবাত্মা ( Monad ) সূর্য্য এবং ঐ সূর্য্যের প্রতিবিম্ব Spiritual Triad ছায়া মহর্ষিগণ, মুক্তি যাঁহাদের করতলস্থ হইয়াছে, সগুণ ব্রহ্ম ঈশ্বরকে সূর্য্য এবং তাঁহার আভাস চৈতন্য Monadকে ছায়াস্বরূপ দেখেন। আবার নির্গুণ পরব্রহ্ম সূর্য্য এবং তাঁহার নিকট সগুণব্রহ্ম ঈশ্বর, ছায়াস্বরূপ ( এ স্থলে যদিও উভয়েই এক এবং পূর্ণ )—একই ব্রহ্ম নানা উপাধিভেদে সূর্য্য ও ছায়ারূপে প্রতিভাত।

ক্রমশঃ

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গোস্বামী।

# সাধন-পন্থা।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

৭

ব্রহ্মবিদ্যা সমিতির গ্রন্থ নিচয়ে যে "মহাত্মা' কথার উল্লেখ আছে তাহার অর্থ কি? যিনি মানব জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সুদীর্ঘ ও তীব্র সাধনা বলে "সোঽহম" ভাব হৃদয়ে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, —যিনি ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিক শক্তি উন্মেষ করিয়া বিজয়ী সেনানীর মত অটল ভাবে জীবন সংগ্রামের মাঝে অবস্থিত থাকেন,—সাধারণ মানব যে সংসার বিবর্ত্তনে বিচলিত হয়, যিনি সেই বিবর্ত্তে শৈলাধিপের ন্যায় স্থির থাকিতে পারেন, সেই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ "মহাত্মা" নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। যথাকালে আগত সুখে বা দুঃখে যাঁহার আনন্দ বা ক্লেশ হয়না— যিনি প্রিয় বা অপ্রিয় বস্তুতে ইচ্ছা বা দ্বেষ না করিয়া অনাসক্তভাবে কর্ম্ম করেন,—তিনিই জীবন্মুক্ত "মহাত্মা"। "আমি এই দেহে রহিয়াছি বলিয়া এই দেহাদি পদার্থে আমার হেয় উপাদেয় বুদ্ধি আছে" এই জ্ঞান যাহার অন্তরে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে—আনন্দ, দ্বেষ, ভয়, ক্রোধ ও অভিলাষ যাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারেনা,—সুষুপ্তিদশাগ্রস্থের ন্যায় যাঁহার চিত্তবৃত্তির কিছু মাত্র ক্রিয়া থাকেনা,—যিনি অন্তরে সর্ব্বদাই জাগরিত থাকেন এবং পূর্ণকলা চন্দ্রের ন্যায় স্বাভাবিক আনন্দের উদয়ে যাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা চিত্ত প্রসাদ আশ্রয় পায়—সেই জীবন্মুক্ত চরম উন্নত মানবদেবতাই "মহাত্মা" আখ্যা প্রাপ্ত হন। তিনি ব্যবহার বিষয়ে সুপ্তপ্রায় হইয়াও সদা প্রবুদ্ধ ও ব্যবহারে জাগরিত থাকিয়াও সদাই সুপ্ত, অর্থাৎ বাহিরে সকল কার্য্য করিয়াও অন্তরে কিছুই করেন না এবং অন্তরে সর্ব্বত্যাগী ও চেষ্টা মাত্রেই বিরহিত থাকিয়া বাহিরে সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন। বাহ্য সকল বিষয়েই যত্ন রাখিয়া উপস্থিত কর্ম্ম মাত্রেই ব্যাকুল হইয়া, পিতা পিতামহাদিক্রমে সম্প্রাপ্ত রাজ্য-যশ-মানাদির অনুসরণ করেন এবং সমস্ত ভোগ সুখাদির স্বয়ং আত্মস্বরূপী হওয়ায় সমস্ত বিষয় বাসনাদিতে আস্থাবান হইয়াই কর্ম্ম সমুদয়

করিয়া থাকেন, কিন্তু সাধারণের ন্যায় তাঁহার কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকেনা। তিনি সকল কার্য্যের উদ্যোগী হইয়াও সর্ব্বত্র উদাসীনের মত অবস্থান করেন, কিছুই বাঞ্ছা করেন না, কোন বিষয়েই তাঁহার দ্বেষ নাই এবং অপ্রিয় ঘটনায় শোক, বিপদে উদ্বেগ, ইষ্টলাভে আনন্দ হয় না। আমরা দেখি তিনি অনুকূল ব্যক্তিকে আনুকূল্য ও প্রতিকূল ব্যক্তিকে প্রাতিকূল্য করিয়া থাকেন, ভক্তজনকে বিশেষ অনুগ্রহ করেন ও শঠের প্রতি শঠতা আচরণ করিতেছেন। তাঁহাকে বালকেরা বালক বলিয়া বুঝে, বৃদ্ধেরা আপনাদিগের সমবয়স্ক বলিয়া জানে। তাঁহার আপনার দুঃখ না থাকিলেও দুঃখীজনে তাঁহাকে তাহার দুঃখে দুঃখিত দেখে; তথাপি তিনি কর্ম্মী হইয়া পুণ্যকথা কহেন ও তাঁহার সমীপে আসিলে দুঃখ ও দীনতা প্রস্থান করে। যদিও দেশকাল বা দূরত্ব তাঁহার কার্য্যে বাধা দিতে পারে না, তিনি সাধারণতঃ দেশকাল ও অনুষ্ঠানের ক্রমানুসারে কার্য্যক্ষেত্রে অবস্থান করেন। তাঁহার দেহ, দেহ-ধর্ম্ম দ্বারা গৃহীত হয়, কিন্তু তাঁহার চিত্ত পর্ব্বতবৎ নিশ্চল হইয়া অবস্থান করে। জীবন্মুক্ত, রাগিতা বা অরাগিতা এই দুই বিষয়েই কোনরূপ প্রয়োজন বোধ করেন না। যাহা যে প্রকারে সম্পন্ন হয়, সে বিষয় সে প্রকারেই সম্পন্ন করেন। তিনি সমর্থ হইলেও প্রাণীকর্ম্মবশোপগত জীব-ভাব ত্যাগ করেন না। আর এই বিষয় সকল রক্ষণ বা ত্যাগ করিলেই তাঁহার ক্ষতি বৃদ্ধি কি? মহামুনি জীবন্মুক্ত জনক রাজকার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক জগতে অনেক উগ্র যুদ্ধক্ষেত্রে জর্জ্জরতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। নল, মান্ধাতা সাগর, দিলীপ ও নহুষ প্রভৃতি রাজাগণ জীবন্মুক্ত হইয়াও আকুল চিত্তের ন্যায় কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। অজ্ঞ ও জ্ঞানবান এ উভয়ের ব্যবহার সমান, তবে বাসনা ও নির্ব্বাসনাই ইহাদের বন্ধমোক্ষের কারণ।

জীবন্মুক্ত মহাত্মা নির্ব্বাণের দ্বারদেশে গিয়াও জগতের তরে আবার মানবধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অবস্থিত আছেন; মানবদেহ ত্যাগ করিলে মানবকে পূর্ণভাবে সাহায্য করিতে পারিবেন না বলিয়া সেই দেহ রক্ষণ করিতেছেন। সংসার-মায়া-নদীগর্ভে পতিত অসহায় ভেদবুদ্ধিশালী মূঢ় মানবকে তিনি কি পরিত্যাগ করিতে পারেন? ভগবান যখন প্রহ্লাদের পরাভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে গিয়াছিলেন, তখন মহাভক্ত

কি বলিয়াছিলেন?—তিনি পাপীকে ত্যাগ করিয়া আপনার মোক্ষ চান নাই।

"নৈতান বিহায় কৃপণান বিমুমুক্ষ একো"

( ৮

"মহাত্মা" কাহাকে বলে?

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্দৃষ্টে পরাবরে॥

মুণ্ডকোপনিষৎ ২—২—৮

[ জীবাত্মার পরমাত্মার মিলনে হৃদয়-গ্রন্থির নাশ হয়, সমস্ত সংশয় নষ্ট হয় এবং সর্ব্বকর্ম্মের ক্ষয় হয়। ]

এই অবস্থা প্রাপ্ত মহা প্রেমবান যে মানবশ্রেষ্ঠ স্বেচ্ছায় নির্ব্বাণ মুক্তি পরিত্যাগ করিয়া আবার পৃথিবীর দিকে ফিরিয়াছেন—যিনি আপনার পরাজ্ঞান জীবের অজ্ঞানতা নাশ করিবার জন্য আনিয়াছেন—যিনি আপনার পবিত্রতা জগতের কলুষতা নাশ করিবার জন্য রাখিয়াছেন—যিনি জগতের অন্ধকার সরাইবার জন্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকা জ্বালিয়া রাখিয়াছেন—এবং মানবকে তাঁহারি মত মুক্ত করিবার জন্য স্বেচ্ছায় রুধির-মাংস-সমন্বিত মানব-দেহ ধারণ করিয়া আছেন। যতদিন না সমস্ত মানব মুক্ত হইবে, তিনি মানব-সম্বন্ধ ত্যাগ করিবেন না, পরে সমগ্র নর জাতির পিতার স্বরূপ হইয়া তাহাদিগের সকলকেই নির্ব্বাণের আনন্দ-অবস্থায় লইয়া যাইবেন। বহু জন্মের আত্ম বিসর্জ্জন-অভ্যাসের চরম ফল স্বরূপ তিনি সাধনার চরম অবস্থা—নির্ব্বাণের পরম সুখ - ত্যাগ করিয়াছেন।

পুরাণে ও শাস্ত্রে আমরা যে সাধারণ মুনি ঋষিদিগের বিবরণ পাঠ করি, তাঁহাদিগের অপেক্ষা জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণের স্থান অনেক উচ্চে। আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলিয়াছি যে তাঁহারা সনাতন ব্রহ্মবিদ্যার চিরন্তন রক্ষয়িতা; মানব-সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে আধ্যাত্মিক জগতে যে মহতী ক্রিয়া হইয়া আসিতেছে, সঞ্চিত-কর্ম্মের মত তাহা জগৎ ললাটে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে,—এই মহাপুরুষেরাই তাহা পাঠ করিতে সক্ষম, প্রাত সাধকের উত্থান-অয়নের প্রতি স্তরে যে সমস্ত দৈবী শক্তির ক্রীড়া হইয়া আসিয়াছে—তাহাতে যে

বিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে তাহা তাঁহাদিগেরই জানা আছে ; ভবিষ্যতে এই সমস্ত শিক্ষার বলেই নূতন যাত্রীরা তাঁহাদিগের সালোক্য-তীর্থে প্রবেশ করিতে পারিবেন। তাঁহারা জগৎ—গুরু শিষ্যকে সেই সমস্ত গুহ্য বিষয় শিখাইয়া উন্নত করিতে থাকেন। এক এক যুগে, এই মহাপুরুষদিগের মধ্যে কেহ কেহ বর্ণাশ্রম-সমন্বিত ধর্ম্ম বিস্তার করিবার ভার বিশেষ ভাবে গ্রহণ করেন। ভগবানের অন্তর্দ্ধানের পর, যখন কলির অন্ধকার-রাজত্ব আরম্ভ হইল তখন দুইজন মহাপুরুষ সেই ভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন দেবাপি ও অপর মহাত্মা মরু।

দেবাপিঃ শান্তনোর্ভ্রাতা মরুশ্চেক্ষ্বাকুবংশজঃ
কলাপগ্রাম আসাতে মহাযোগবলান্বিতৌ ॥
তাবিহেত্য কলেরন্তে বাসুদেবানুশিক্ষিতৌ
বর্ণাশ্রমযুতং ধর্ম্মং পূর্ব্ববৎ প্রথয়িষ্যতঃ ॥

ভাঃ ১২-২—৩৮

তাঁহারাই মেঘাচ্ছন্ন ধর্ম্ম-ভারতে অপ্রকট থাকিয়া তাহার ধর্ম্ম ভার গ্রহণ করিয়া আছেন, কলির অন্তে আসিয়া আবার বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রচার করিবেন। প্রকটই হন আর অপ্রকটই থাকুন আমরা গুরুদেবদিগকে উদ্দেশে প্রণাম করি, তাঁহাদিগের দর্শন লাভ করিয়াছেন যাঁহারা—তাঁহাদিগকেও প্রণাম করি।

যে কেহই হউক না কেন, একবার যদ্যপি সাগ্রহে সে, তাঁহাদিগের অনুগ্রহ পাইবার জন্য হস্ত উত্তোলন করে অমনি হস্ত প্রসারণ করিয়া তাঁহারা তাহাকে ধারণ করেন, যদি কেহ তাঁহাদিগের করুণা যাচ্ঞা করে, অমনি তাঁহাদিগের হৃদয় তন্ত্রী শিষ্যের আগ্রহ ক্রন্দনে বাজিয়া উঠে যতদিন না আমরা সকলেই মুক্তি-পিপাসু হইয়া নির্ব্বাণশৈলে অধিরোহণ করিতে পারিব, যতদিন না আমরা তাঁহাদিগের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া তাঁহাদিগের সকাশে উপস্থিত হইতে পারিব, ততদিন অবধি তাঁহাদিগের আর উপায়ন্তর নাই—সেই নির্ব্বাণ অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া মানব ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে। ইহাই জগতের পাপ গ্রহণ। "জীবন্মুক্ত" জিসাস্" মানবের পাপ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার অর্থও ইহাই। ক্রমশঃ

জনৈক বিদ্যার্থী।

# আমি ও আমার দেহ।

## মনোময় কোষ।

### কামময় দেহ। ভুবলোক।

শব্দ তরঙ্গের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে চিন্তা-তরঙ্গের কার্য্য প্রণালী কতকটা অনুমান করা যায়। স্বর যত উচ্চ ও স্পষ্ট হয়, শব্দ তত দূরে গমন করে। চিন্তা ও সেইরূপ যত প্রখর, যত পরিস্ফুট, যত একাগ্র হয়, তত দূর-গামী, শক্তিশালী ও ফলপ্রসূ হয়। আবার দেখা যায় যে শব্দ-তরঙ্গ অন্যমনস্ক ব্যক্তির শ্রুতিগোচর হয় না। চিন্তা-তরঙ্গও সেইরূপ চিন্তান্তরে লিপ্ত ব্যক্তির হৃদয়ে ঝঙ্কার উৎপন্ন করে না। জগতে মহদাশয় ব্যক্তির অভাব নাই, সুতরাং উচ্চ চিন্তারও অভাব নাই। সে সকল চিন্তা আমাদিগের চারি দিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু আমরা "যে তিমিরে সে তিমিরে"। আমাদের এরূপ দুর্দ্দশার কারণ এই যে আমরা আমাদের মনকে তদভিমুখী করি নাই, সে যে সুরের চিন্তা আমরা আমাদের হৃদয়কে সে সুরে বাঁধি নাই। সুতরাং সে আসে, আর দ্বার বন্ধ দেখিয়া প্রস্থান করে। দুই একবার যে কড়া নাড়া না দেয় তাহা নয়, কিন্তু তাহাতে কর্ণপাত করে কে? দোষ তাহার নয়, দোষ আমাদের। যদি উচ্চ জীবন লাভের বাসনা থাকে, তাহা হইলে এক দিকে এই সকল উচ্চ চিন্তার প্রবেশের জন্য হৃদয়কে উন্মুক্ত করিয়া দিতে হইবে, অপর দিকে নীচ চিন্তার প্রবেশ পথ সমূহ যতদূর সাধ্য রুদ্ধ করিয়া ফেলিতে হইবে। মনকে এমন একটি উন্নত যন্ত্রে পরিণত করিতে হইবে, যেন তাহা কেবল ধ্রুপদ সঙ্গীতেরই উপযোগী হয়, টপ্পা যেন তাহার কাছে না ঘেঁসিতে পারে।

তবে উচ্চ শ্রেণীর চিন্তামাত্রেই যে আমাদিগের নিকট ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায় তাহা নহে। আমরা একেবারে পশু নহি—আমাদের সকলেরই হৃদয়ে অন্ততঃ কিঞ্চিৎ পরিমাণে মনুষ্যত্বের বিকাশ হইয়াছে। এই টুকুই আমাদের উচ্চ-চিন্তা-প্রতিবোধী হৃদয়-দুর্গের দুর্ব্বল অংশ। কখন যদি কোন উচ্চ চিন্তা আসিয়া এই অংশে অতর্কিত ভাবে আঘাত করিতে পারে তাহা

হইলে সে একটি ছোট খাট বিপ্লব না বাধাইয়া ছাড়ে না। সময়ে সময়ে এমনও ঘটে যে, সে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দুর্গ-দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয় আর কোথা হইতে রাশি রাশি সম-প্রকৃতি সহচর জুটাইয়া আনিয়া দুর্গটাকে একেবারে অধিকার করিয়া বসে। জগাই মাধাইয়ের কথা স্মরণ করুন। জগাই মাধাই দস্যু, নরপিশাচ,—কিন্তু ব্রাহ্মণ-সন্তান। তাঁহাদের হৃদয় পুতিগন্ধময় অন্ধকারে ভরা, কিন্তু তাহার এক গুপ্ত কোণে বহুকালের ভস্মাচ্ছাদিত এক কণা অগ্নি পড়িয়াছিল। নিতাই আসিয়া যাই তাহাতে ফুৎকার দিলেন, অমনই সে অগ্নি দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠিল। অন্ধকার দূরে গেল, রাশীকৃত আবর্জ্জনা পুড়িয়া ছাই হইল, গৃহস্থিত অগ্নির প্রভায় দিগন্ত আলোকিত হইয়া উঠিল!

কিন্তু কবে নিতাই আসিবেন বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে হইবে না। গাছ পুঁতিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিলে চলে না। নিজে যাইয়া জলাশয় হইতে জল আনিয়া তাহার মূলে সিঞ্চন করিতে হয়, তবে গাছ বাঁচে। ঘটনাস্রোতের অনুকূল গতির প্রত্যাশায় যিনি চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, তাঁহার উন্নতি বহু দূরে। প্রতিকূল প্রবাহের সহিত সংগ্রাম করিয়া আমাদিগকে জয় লাভ করিতে হইবে। মধ্যে মধ্যে প্রবল তরঙ্গে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা সত্বেও যিনি সকল সময় মাথা তুলিয়া রাখিবার চেষ্টা করেন, তিনিই যথার্থ বীর। তাঁহাকে নিম্নগামী করা সহজ নয়, পরিণামে তাঁহার সাফল্যলাভ নিশ্চিত।

কিন্তু এরূপ বীর আমাদিগের মধ্যে কয়জন আছেন? আমরা স্বভাবতঃ এতই দুর্ব্বল যে সামান্য ঘটনা-স্রোতে জড় তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাই। আমাদের কামময় দেহের এতই প্রভাব যে তাহার তুষ্টি-সাধনই আমরা জীবনের প্রধান লক্ষ্য বলিয়া মনে করি। যে কার্য্য তাহার অতৃপ্তিকর তাহা যদি সহস্র বার শ্রেয় হয়, তথাপি সে কার্য্যে আমরা কিছুতেই অগ্রসর হইতে চাহি না।

এ দুর্ব্বলতা পরিহার করিবার উপায় কি? দেহের সহিত বিবাদ করিলে চলিবে না, কারণ দেহ বড়ই বলবান। এমন উপায় অবলম্বন করিতে হইবে যে যাহা "শ্রেয়" তাহাই যেন তাহার নিকট "প্রেয়" হইয়া দাঁড়ায়,

যাহাতে তাহার ভাল হয় তাহাই যেন তাহার ভাল লাগে। সে উপায় কি?

এক উপায়,—অভ্যাস। গীতায় ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,

"অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥" [৬ ৩৫]

'হে মহাবাহো, মন যে দুর্নিরোধ ও অস্থির, ইহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু হে কৌন্তেয়, অভ্যাস দ্বারা এবং বিষয়-বিরাগ দ্বারা মনকে নিগৃহীত করা যাইতে পারে।"

অভ্যাস বা পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানের অশেষ গুণ। অভ্যাস গুণে যাহা অপ্রিয় তাহা প্রিয় হয়, যাহা প্রিয় তাহা অ[illegible] হয়। ইহা নিত্য প্রত্যক্ষ ঘটনা। আজ যে তাম্রকূট বা সুরাকে বিষবৎ বোধ হইতেছে, দুই দিন তাহা সেবন করিতে অভ্যাস কর দেখিবে তাহাই অমৃত বলিয়া বোধ হইবে। আজ মৎসমাংস না হইলে তোমার খাওয়া হয় না, কিছু দিন তাহা ত্যাগ কর দেখিবে তোমার সেই অতি প্রিয় ভোজ্য দ্রব্য কত দুর্গন্ধময় হইয়া উঠিয়াছে! আমাদের দেশে বরেরা নিজে কন্যা পছন্দ করিয়া বিবাহ করে না। সুতরাং সকল সময় বর যে নিজের পছন্দ-মত কন্যা পায় তাহা বোধ হয় না, আর তাহার জন্য যে প্রথম প্রথম তাহার মনে কিঞ্চিৎ ক্রোধ ও বিরাগের সঞ্চার হয় না তাহাও বলা যায় না। তথাপি তন্নিবন্ধন আমাদের বিবাহিত জীবন বিশেষ অসুখকর হইতে দেখা যায় না। সে বাল্যসঙ্গিনী মূর্ত্তি ক্রমে এতই অভ্যস্ত হইয়া পড়ে, যে উত্তরকালে তাহাকে হৃদয়াসন হইতে অপসারিত করা এক রকম অসাধ্য হইয়া উঠে।

বাস্তবিক বিরাগকে অনুরাগে পরিণত করিবার এমন সুন্দর উপায় আর নাই। কোন বিষয়ে আমাদের মনে যতই বিরাগ থাকুক না কেন, সে বিষয় অভ্যাস করিলে তাহাতে আমাদের আসক্তি আপনা হইতেই আসিয়া পড়িবে। কেমন করিয়া অভ্যাস এ অঘটন ঘটায়, অভ্যাসের এ গুণ কিরূপে কোথা হইতে আইসে, তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখিলে ভাল হয়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি আমরা যখন যে চিন্তা করিতেছি, তাহা প্রথমে আমাদের মনোময় কোষে স্পন্দন উৎপাদন করিতেছে, তাহার পর আকার ধরিয়া

ভুবর্লোকে বা স্বর্লোকে প্রকাশ পাইতেছে। মনে করুন, সহসা আমার ভয়ানক ক্রোধ উপস্থিত হইল। ইহার পরক্ষণেই দেখা যাইবে যে, আমার কামময় দেহে একটা ঘোর ঝটিকা উত্থিত হইয়াছে এবং ক্রোধ-তরঙ্গের রক্তাভ বিদ্যুৎ-চ্ছটায় ক্ষণেকের জন্য সেই দেহের সমস্ত স্বাভাবিক বর্ণ ডুবিয়া গিয়াছে। তাহার পর দেখিবেন সেই তরঙ্গ আপন মূর্ত্তি ধরিয়া যাহার উপর আমার ক্রোধ তাহার দিকে ধাবমান হইয়াছে। আমাদের প্রত্যেক চিন্তা এই ভাবে কার্য্য করিয়া থাকে, তবে প্রত্যেকের গতি, প্রকৃতি আকার ও আধার বিভিন্ন প্রকারের। যখন যে চিন্তা প্রবল হয় তখন তাহাই মনোময় কোষ বা কামময় দেহকে নিজ বর্ণে রঞ্জিত করে। অবশ্য এ বর্ণ স্থায়ী হয় না, সে চিন্তা অপসৃত হইলেই দেহ আবার আপন স্বাভাবিক বর্ণ ধারণ করে। কিন্তু তাহা বলিয়া কোন প্রবল ভাব বা চিন্তার আগমন যে একেবারে নিষ্ফল হয় তাহা নহে - দেহের উপর কিছু না কিছু স্থায়ী চিহ্ন সে রাখিয়া যায়।

একটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে কথাটা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। মনে করুন, আপনি একজন ভক্ত ও জ্ঞানী—আধ্যাত্মিকতায় আপনার হৃদয় পরিপূর্ণ। আপনার কামময় দেহ স্বভাবতঃ নীলপীতাদি উচ্চভাবের বর্ণে রঞ্জিত। কিন্তু সহসা কোন কারণে প্রবল বিদ্বেষ আসিয়া আপনার হৃদয় অধিকার করিল এবং কিয়ৎক্ষণের জন্য সে নিজের ঘোর কৃষ্ণবর্ণের দ্বারা আপনার কামময় দেহকে রঞ্জিত করিয়া তদ্দেহস্থ আর সমস্ত বর্ণকে নিমজ্জিত করিয়া ফেলিল। তাহার পর সে ভাব অপসৃত হইল, সঙ্গে সঙ্গে তজ্জনিত কৃষ্ণবর্ণও অন্তর্হিত হইয়া গেল। এখন যদি আপনার কামময় দেহ বিশেষ সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে, তাহার স্বাভাবিক বর্ণের কিঞ্চিৎ বিকৃতি ঘটিয়াছে,—অলক্ষ্যে তাহাতে কালিমার কিঞ্চিৎ ছায়াপাত হইয়াছে। এই ছায়া টুকু সহজে যায় না, দ্বিতীয় বার সে ভাব মনে আসিলে তাহা আরও একটু গাঢ় হয়, তৃতীয় বার আর একটুকু, এই রূপে সে বর্ণ ক্রমেই ফুটিয়া উঠিতে থাকে, অবশেষে হয়ত তাহাই সকল বর্ণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে। এই কারণে একবার কোন ভাবকে নিজ চিত্ত অধিকার করিতে দিলে, দ্বিতীয় বারে আমাদিগকে আয়ত্ত করা তাহার পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ-সাধ্য হয়। প্রথম বারে তাহাকে যেরূপ কষ্ট করিয়া আপন পথ প্রস্তুত করিয়া

লইতে হইয়াছিল, এবার আর তাহাকে তত কষ্ট করিতে হয় না, কারণ পূর্ব্ব পথের চিহ্ন একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই, তাহা ধরিয়া এখন বেশ আসা যায়। পুনঃ পুনঃ ব্যবহারে এই পথ আরও সুগম, আরও প্রশস্ত হয়। এইরূপে ধীরে ধীরে অভ্যাসের সহায়তায় আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের স্বভাব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

কাহারও সংসর্গ আপনার ভাল লাগে, কাহারও সংসর্গ আপনার ভাল লাগে না। এরূপ প্রায়ই দেখা যায় যে কেহ আপনার পার্শ্বে আসিয়া বসিলে আপনি প্রফুল্ল হন, কেহ আসিয়া বসিলে আপনি বিরক্ত হন, অথচ তাহার সহিত হয়ত আপনার আলাপ পর্য্যন্ত নাই। এক্ষেত্রেও একের মনোময় কোষ কিরূপ অলক্ষ্যভাবে অপরের মনোময় কোষের উপর কার্য্য করিয়া থাকে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সকলের মনোময় কোষ এক ভাবে এক উপাদানে গঠিত নহে, সকলের চিন্তা স্রোতও একাভিমুখী নহে। আমার মনে যে তরঙ্গ খেলিতেছে তাহার গতি যদি আপনার মনের তরঙ্গ হইতে বিভিন্নমুখী হয়, তাহা হইলে উভয়ের সংঘর্ষণ পরস্পরের চিত্তের প্রীতিকর হয় না; পক্ষান্তরে যাঁহাদের সঙ্গে আমাদের 'মনের মিল' আছে, যাঁহাদের চিন্তা আমাদের চিন্তার অনুকূল, তাঁহাদের সহবাসে আমরা বিশেষ প্রীতি অনুভব করিয়া থাকি। এই জন্যই বোধ হয় এ দেশ পংক্তি ভোজনাদি ব্যাপারে এত বাছাবাছির নিয়ম হইয়াছে।

একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, প্রীতি ও অপ্রীতির অন্য অর্থ আর নাই। অনুকূল তরঙ্গ প্রীতি-উৎপাদক, প্রতিকূল তরঙ্গ অপ্রীতি-জনক। আমি কাঁঠাল খাইতে ভাল বাসি, কারণ তাহার রসের ভিতর যে সূক্ষ্ম তরঙ্গ প্রবাহমান, তাহা আমার রসনায় স্নায়বিক তরঙ্গের অনুকূল। কিন্তু তাহাই হয়ত পাকস্থলীতে যাইয়া কোন প্রতিকূল তরঙ্গ দ্বারা প্রত্যাহত হইয়া ঘোর অপ্রীতি উৎপাদন করিতে পারে। বাস্তবিক বিদ্বেষ নিবারণের প্রধান উপায়, আপনার ভিতর বিদ্বিষ্ট বিষয়ের অনুরূপ তরঙ্গ উৎপাদন করা। আমরা যাহার উপর ক্রোধ করি, যদি অনুমান বলে আমরা আমাদিগকে তাহার অবস্থায় পাতিত করিয়া দেখিতে পারি তাহা হইলে ক্রোধ দাঁড়াইতে পায় না। যাহা আমাদের শ্রেয় তাহা আমাদের ভাল লাগে না, তাহার কারণ আমরা

আমাদের চিন্তা-প্রবাহকে বিপরীতাভিমুখী করিয়া আমাদের উন্নতির পথে একটা প্রকাণ্ড বেড়া রচনা করিয়া বসিয়াছি। এ বেড়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইলে শ্রেয়াভিমুখী নূতন তরঙ্গ সমূহ সৃষ্টি করিয়া স্রোতের মুখ ফিরাইতে হইবে। যে সকল চিন্তা দ্বারা এই সকল তরঙ্গ সৃষ্ট হয়, সেই সকল চিন্তা মনোমধ্যে আনিতে হইবে অথবা যাহাতে সেই সকল চিন্তা মনোমধ্যে আসে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

যদি আমার ভিতর সকল প্রকার তরঙ্গই বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে জগতে আমার কিছুই অপ্রীতিকর থাকে না। যাঁহার এই অবস্থা হইয়াছে, তিনি "ন দ্বেষ্টি না কাঙ্ক্ষতি" দ্বেষ করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না। তিনি ব্যোমযানের ন্যায় কেবল শূন্যমার্গে বিচরণ করেন না। পরন্তু হিমালয়ের ন্যায়, এক দিকে তাঁহার মস্তক আকাশ ভেদ করিয়া থাকে অপর দিকে তাঁহার পাদমূল ভূমি স্পর্শ করিয়া থাকে। কি ব্যোমচারী খগরাজ আর কি মৃত্তিকা-বিহারী কীটাণু, সকলের সহিত তিনি সম্বন্ধ-বন্ধনে আবদ্ধ, সকলকেই তিনি চেনেন, জানেন, সকলেরই মরমের ব্যথা বুঝেন। তাঁহার সহানুভূতি সর্ব্বতোমুখী—সুতরাং তাঁহার প্রীতির সীমা নাই, কেহই সে অজস্র শীতল ধারা হইতে বঞ্চিত হয় না। বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, গো, হস্তী, কুকুর, সকলেই তাহার সমান আত্মায়।

( ক্রমশঃ )

শ্রীমন্মথমোহন বসু।

---

# রহস্যময় ঘটনাবলী।

## ( ভূতের গল্প, সত্য ঘটনা। )

শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিবাস কলিকাতা বহুবাজার। তিনি একজন জমিদার। বাদা অঞ্চলে তাঁহার এক তালুক আছে। তাঁহার সেই তালুকে তারক নামে এক গোমস্তা ছিল। খাজানাদি আদায়ের ভার তাহারই উপর ন্যস্ত ছিল। সে কাছারী বাড়ীতেই থাকিত কিন্তু তাহার স্বভাব চরিত্র বড় ভাল ছিল না।

একদিন তারকের এক আত্মীয় আসিয়া কালাচাঁদ বাবুকে সংবাদ দিল যে, সহসা তারকের মৃত্যু হইয়াছে। সেই সঙ্গে সে বলিল, "মহাশয়, তারক আপনার খাতা পত্র বিস্তর গোল করিয়া গিয়াছে এবং টাকা কড়িও কিছু ভাঙ্গিয়াছে, আপনি যদি আমাকে তারকের কাজে নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে আমি সকল উদ্ধার করিয়া দিতে পারি।" কালাচাঁদ বাবু উত্তর করিলেন "আমি স্বয়ং সেখানে যাইতেছি, যাইয়া যাহা হয় ব্যবস্থা করিব।"

কাছারী বাড়ীর মাঝখানে একটা বড় ঘর, আর দুই পার্শ্বে দুইটী কামরা। কালাচাঁদ বাবু আসিলে, ইহার ভিতরে একটা কামরায় তাঁহার শুইবার ব্যবস্থা হইল। সে কামরায় একটী জানালা ভাঙ্গা ছিল এবং দুইখানা তক্তা দ্বারা সেই জানালাটী আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছিল। রাত্রে আহারাদির পর কালাচাঁদ বাবু শয়ন করিতে গেলেন। সেই কামরায় আসিয়া প্রদীপটী নিবাইয়া শয্যায় শয়ন করিলেন, একটু পরেই তাঁহার তন্দ্রা আসিল, কিন্তু সহসা একটা শব্দে তাহার তন্দ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি এদিক ওদিক চাহিয়া কিছুই দেখিতে পাইলেন না। আবার তাঁহার তন্দ্রা আসিল, কিন্তু পরক্ষণেই পূর্ব্ববৎ শব্দ শুনিয়া চাহিয়া দেখিলেন যে, পূর্ব্বোক্ত ভগ্ন জানালার তক্তা দুই-খানা সরিয়া গিয়াছে এবং তাহার মধ্য দিয়া একটা আলো আসিতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আলোটী জানালার ভিত্তিটীকে আলোকিত করিতেছিল বটে কিন্তু গৃহের অন্যান্য অংশ পূর্ব্ববৎ অন্ধকারময় রহিল। সেই আলোকের মধ্য হইতে একটা কষ্ট ব্যঞ্জক দীর্ঘ শ্বাসের সহিত ফু ফু শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। কালাচাঁদ বাবু একটু অভিনিবেশ সহকারে নিরীক্ষণ করিয়া সেই আলোকের মধ্যে একটী মুখ স্পষ্টরূপে প্রতিফলিত দেখিতে পাইলেন এবং দেখিয়াই তাহা তারকের মুখ বলিয়া চিনিতে পারিলেন। সেই মুখ হইতেই উপরি উক্ত কষ্ট ব্যঞ্জক শব্দ নির্গত হইতেছিল। কালাচাঁদ বাবু সাহসী লোক ছিলেন সুতরাং প্রথমতঃ তাঁহার মন চঞ্চল হইলেও, তিনি পরক্ষণেই সুস্থির হইয়া "তারক, তারক" বলিয়া ডাকিলেন, অমনিই সে মুখ ও আলো অন্তর্হিত হইল - আর তাহা দেখা গেলনা। এই দৃশ্যের কথা আলোচনা করিয়া কালাচাঁদ বাবু বুঝিতে পারিলেন যে, মৃত্যুর পর তারকের সদ্গতি হয় নাই। সে সম্ভবতঃ সেই জন্যই প্রতীকার আশায়

তাঁহাকে ঐ ভাবে দর্শন দিয়াছিল। কালাচাঁদ বাবু অমায়িক ও উচ্চ অন্তঃকরণের লোক। জীবিতাবস্থায় তারক তাঁহাকে অনেক প্রকার ক্ষতি-গ্রস্থ করিয়াছিল তথাপি তাহার সদ্গতির জন্য গয়ায় গিয়া স্ব ব্যয়ে তাহার পিণ্ড দান করিয়াছিলেন। ইহা আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি। গয়ায় পিণ্ডদানের পর তারকের প্রেতমূর্ত্তির আর দর্শন পাওয়া যায় নাই।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

---

# বিজ্ঞান, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য।

পূর্ব্ববারে গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা উল্লিখিত হইয়াছিল তাহা একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে বস্তুর জ্ঞান বা মান প্রজ্ঞা বা তাহার ইন্দ্রিয় বিশেষ দ্বারা অবধারিত হয়, স্থূল জীব অপরিস্ফুট ভাবে 'আমি কে' জানে। বস্তুতঃ "আমি' কি সে তাহা জানে না, তবে ভেদজ্ঞানের সাহায্যে আপনাকে অন্য বস্তু হইতে বিভিন্ন করিয়া অল্পে অল্পে কেন্দ্রগত আমিত্বের স্থাপনা করে। 'আমি' কি এই জ্ঞান সমন্বয়-মূলক ও একতা-ব্যঞ্জক। কিন্তু এই জ্ঞান প্রকট হওয়া বড় দুরূহ। সেই জন্য 'আমি' কি নহি ইহাই অবধারণ করিয়া আমরা অল্পে অল্পে 'আমি কে' বুঝিতে পারি। কিন্তু এই জ্ঞান ভেদাত্মক বলিয়া প্রকৃত পক্ষে অজ্ঞান নাম বাচ্য।

আমরা সকলেই দেহকে 'আমি' বলিয়া বুঝি। কিন্তু দেহ ও 'আমি' এতদুভয়ের একতা কি প্রকারে সিদ্ধ হয় তাহা কি বুঝিতে পারি? কেহ বলিবেন কামনাই ইহার কারণ। কিন্তু কামনা-রূপ মানসিক শক্তি-বিশেষ দ্বারা মনো-বুদ্ধ্যাদির অতীত আত্মা ও জড়াত্মক দেহ কিরূপে সমন্বিত হইয়া দেহ ও 'আমি' মিশিয়া যায় তাহা কি আমরা জানি?

কেহ বলিবেন অধ্যাস। কিন্তু অধ্যাসেও সমান ধর্ম্মের আভাস পাওয়া যায়। সর্পে রজ্জু-ভ্রম হয় সত্য বটে কিন্তু তাহা বলিয়া টেবিলেতে সে ভ্রম হয় কেন? যে সৌসাদৃশ্যের সাহায্যে অধ্যাস সম্ভবে সে সৌসাদৃশ্যই আপা-

ততঃ বিভিন্ন বস্তুদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত কি এক অপূর্ব্ব একতার আভাস দিতেছে না? সাধারণ জ্ঞানে আমরা বিশিষ্ট ভাবাপন্ন, ও সর্ব্বদাই বিশেষকে প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছি। এই বিশেষ জ্ঞানের সাহায্যে সর্প রজ্জুর সৌসাদৃশ্য ভাবটী ত্যাগ করিয়া তাহাদের মধ্যে যে বিশিষ্ট পার্থক্যটুকু আছে সেই পার্থক্য জ্ঞানই আমাদের জ্ঞান বা বিজ্ঞান। যে ব্যক্তি সর্প ও রজ্জু উভয় পদার্থের বিশেষত্ব জানিতে পারিয়াছে তাহার আর ভ্রম হইবে না। কিন্তু বুঝিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, এই প্রভেদাত্মক জ্ঞান অপেক্ষা আর এক প্রকার উচ্চতর জ্ঞান আছে। এই জ্ঞানে সর্প ও রজ্জুর একতাভাবের মূলে অন্বেষণ করিতে করিতে তাহাতে আপাততঃ প্রতীয়মান সমস্ত বিশেষ বা প্রভেদ জ্ঞান লয় হইয়া যায়। একটী উদাহরণ সাহায্যে বিষয়টী অল্প পরিমাণে বুঝা যাইতে পারে। Weissmann সাহেবের মতে আমাদের স্থূল দেহের সমস্ত বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি একই অণুর অভ্যন্তরীণ বিস্তার ও বিকাশ দ্বারা প্রকাশিত। সুতরাং প্রত্যেক বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলিকে অনুলোম ও বিলোম ক্রমে সেই অণুতে লয় করা যায়, এবং যিনি এই রহস্যটী বুঝিতে পারিয়াছেন তিনি স্বেচ্ছায় আপনার অণু সাহায্যে অসংখ্য দেহ উৎপাদন করিতে সক্ষম হন। অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলির প্রভেদ জ্ঞান ও তাহারা যে ভাবে একই অণুর বিকাশ, সেই একত্ব জ্ঞান উভয়ই আমাদের নিকট জ্ঞান শব্দ বাচ্য। কিন্তু বস্তুতঃ প্রভেদ জ্ঞান অজ্ঞানের নামান্তর মাত্র। তদ্রূপ ব্রহ্মণ, গো, হস্তী, শ্বা, ও শ্বপাক এতৎ সমুদয়ের বিশেষাত্মক জ্ঞান যিনি লাভ করিয়াছেন অর্থাৎ যাঁহার জ্ঞানে উল্লিখিত প্রত্যেক বস্তুই বিশিষ্ট ও সুতরাং পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া প্রতীত হয় তাঁহাকেই আমরা পণ্ডিত বলিয়া মনে করি। কিন্তু শ্রীভগবান বলেন— বিদ্যা-বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ সুতরাং শ্রীভগবানের মতে একত্ব জ্ঞানই জ্ঞান। যেখানে বিশিষ্টতা বা প্রভেদ আছে তাহাই অজ্ঞান। গুরু সম্বন্ধেও এইরূপ। উহা বারান্তরে আলোচিত হইবে।

---

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

১১শ ভাগ | অগ্রহায়ণ, ১৩১৪ সাল। | ৮ম সংখ্যা।

## শান্তি-শতক।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

এই নর-কলেবর নিরন্তর বিনশ্বর, সতত চঞ্চল
এ সংসারে, প্রণয়ের সুখ ;
দেহেতে যতেক ভোগ ভুঞ্জে সদা মহাভোগ, স্বভাব-চঞ্চল
লক্ষ্মী কভু প্রসন্ন, বিমুখ ;
কুবলয়-নয়নারা ভুজঙ্গিনীসম তারা ; ক্লেশ গৃহাবেশ ;
বৈরীসম স্বৈরীযম, আত্মহিতে তবু মন না হ'ল নিবেশ !

( ৪০ )

ঘটয়ে বিপদ যদি, যাহে অর্দ্ধপ্রাণাবধি পড়য়ে শঙ্কটে,
ধন ছাড়ি চাহিপ্রাণ নরে ;
সে বিপদে হলে পার, মথি' গিরি পারাবার, ভ্রমি' গিরিতটে
ছুটে পুনঃ বিভবের তরে ;
নূতন বিপদরাশি ধনতরে ভালবাসি করে আলিঙ্গন,
কভু ধন, কভু প্রাণ, মাগে জীব অবিরাম অতি উচাটন।

( ৪১ )

মাণিক্যখচিত হর্ম্ম্য নহে কি নিবাস রম্য ? বেণুবীণা গান
নহে ! কি শ্রবণ সুখকর ?
প্রাণসম প্রিয়তমা সমাগম পূর্ণিমা তোষেনা কি প্রাণ ?
কিন্তু হায় ! নহে নিরন্তর !
দীপালোকে যবে হায় ! পতঙ্গ পতিতপ্রায়, পক্ষবাতে তার
দীপ ছায়া কাঁপে, আহারে চঞ্চল তথা সকলি ধরায় !

( ৪২ )

অকণ্টক বসুধার একচ্ছত্র অধিকার নাহি সাধ আর,
তৃণসম গণি ত্রিভুবন ;
ধাবিত হতেছে চিত্ত শৈল-বন যথাস্থিত, কন্দরে যাহার
বিরহিছে কুরঙ্গিনীগণ ;
সংসারের কোলাহল যথায় না পায় স্থল তিলেক কারণ,
মানবের কৃত্রিমতা লেশমাত্র নাহি যথা, শান্তি নিকেতন।

( ৪৩ )

পাগল হয়েছে প্রাণ লভিতে বিরামস্থান সেই বনভূমে
নির্ঝরিনী গায় যথা গান ;
যাহার উপান্ত মরি ! হরিণ-চরণ ধরি প্রেমভরে চুমে,
নবশষ্প যার তনুত্রাণ ,
পুষ্পিত বিটপিশির সুরভি পবনধীর দুলায় মৃদুল,
বিচিত্র বিহঙ্গ লক্ষ ধ্বনিত করয়ে বক্ষ আনন্দে অতুল।

( ৪৪ )

সীমন্তিনী ভুজলতা নিবিড় গহন যেথা করি অতিক্রম
শান্তিময় রহে তপোবনে,
না পরশে তারে আর দুর্জ্জনের তিরস্কার বাণ সুবিষম,
শান্তিসুধা রহে তার মনে ,
কাম ক্ষুধা নাহি দহে, আশা কাণে নাহি কহে, ভবিষ্যের সুখ ;
অন্তরে নিরাশা, নদী উথলায় নিরবধি, টুটে ভবদুখ।

# কর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি।

আমরা দেখিয়াছি যে, কর্ম্মবাদ মূলতঃ ধর্ম্মনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সুকৃতের ফলে সুখ ও দুষ্কৃতের ফলে দুঃখ—পুণ্যাত্মার পক্ষে সুখভোগ ও পাপীর পক্ষে দুঃখভোগ—ইহাই কর্ম্মের বিধান। এরূপ হওয়াই উচিত। কারণ, এ জগৎ বিধাতার সৃষ্টি, দৈত্যের রচনা নহে। ভগবানের রাজ্যে ন্যায়ের পথ, ধর্ম্মের পথ সুখদ হওয়াই সঙ্গত।

ইহা হইতে সহজেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, আমরা যে সুখভোগ করি, তাহা পুণ্যের ফলে এবং যে দুঃখ ভোগ করি তাহা পাপের ফলে। কেহ যে দুঃখ পায়, সে দুঃখ তাহার আত্ম-দুষ্কৃত-বৃক্ষের ফল—এরূপ ধারণা করা অসঙ্গত নহে। তাহাই যদি হয়, দুঃখ যদি কর্ম্ম-জন্য, তবে কিরূপে দুঃখীর দুঃখ মোচন উচিত হইতে পারে? এই যুক্তির বলে কেহ কেহ দুঃখীর দুঃখ মোচনে বিরত থাকেন। তাঁহাদের ভয়, পাছে তাঁহাদের কৃত সাহায্য কর্ম্ম-ফলের ব্যাঘাত উৎপাদন করে। একটু বুঝিয়া দেখিলেই দেখা যায় যে, এ ধারণা ভ্রমাত্মক। এ ধারণার মূলে অতি বৃহৎ স্পর্দ্ধা লুক্কায়িত রহিয়াছে। ক্ষুদ্র মানুষের সাধ্য কি বিধাতার কর্ম্ম বিধানের ব্যত্যয় করিবে। সে নিয়ম অকাট্য, অলঙ্ঘ্য। মানুষ সহস্র চেষ্টায়ও তাহার একতিল বিপর্য্যয় করিতে পারে না। যে দুঃখীর দুঃখ মোচন করিতে আমরা অগ্রসর হইলাম, যদি তাহার দুঃখের অবসান বা লাঘব বিধাতার অভিপ্রেত না হয়, তবে আমাদের সে চেষ্টা পণ্ড হইবে মাত্র। অতএব ইহাতে কর্ম্মফলের ব্যাঘাত ঘটিবার কোনই আশঙ্কা নাই। কিন্তু যদি তাহার দুষ্কৃতের শেষ হইয়া থাকে, যদি কর্ম্মের বিধান মতে তাহার দুষ্কৃত-রাত্রির প্রভাত হইয়া থাকে, তবে তাহার দুঃখ মোচনে সাহায্য করিয়া আমরা কর্ম্মের ব্যাঘাত করা দূরে থাকুক, সহায়তাই করিব। যাহার সাহায্য পাওয়া উচিত কর্ম্ম-বিধাতা তাহাকে সাহায্য দিবেনই দিবেন। আমরা যদি সেই সাহায্যের দ্বার হইতে অস্বীকার করি, তবে তিনি অন্যের দ্বারা সেই সাহায্য করিবেন। লাভের মধ্যে আমরা পরোপকাররূপ পুণ্য হইতে বিরত ও বঞ্চিত হইব। দুঃখীকে দেখিয়া তাহার দুঃখ মোচন না করিলে আমরা দুষ্কৃত অর্জ্জন করিব। সাধ্য থাকিতে

সাহায্য-প্রার্থীকে সাহায্য না করিলে আমরা নিজেদের ভবিষ্যৎ সাহায্যের পথে কণ্টক রোপণ করিব। আমরা যেন না ভাবি যে, আমরা অলস বা উদাসীন থাকিলে বিধাতার কর্ম্মবিধান অচল হইবে। সাহায্য যাহার প্রাপ্য সে পাইবেই; কেবল আমরা সাহায্য দাতার উচ্চ অধিকার হইতে বঞ্চিত হইব মাত্র। অবশ্য যদি আমরা সর্ব্বজ্ঞ হইতাম, যদি আমাদের অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখে সেই দুঃখীর অতীত জীবনের চিত্রপট উন্মুক্ত থাকিত, যদি আমরা নিশ্চয় জানিতে পারিতাম যে কর্ম্মের বিধান মতে সে দুঃখীর কালরাত্রির অবসান হইতে বিলম্ব আছে, তবে অবশ্য তাহার দুঃখমোচনের জন্য ব্যর্থ চেষ্টা হইতে বিরত থাকাই আমাদের উচিত হইত। কিন্তু আমরা অজ্ঞ, আমরা ত সর্ব্বজ্ঞ নহি। যাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ, যাঁহাদের ঐরূপ অন্তর্দৃষ্টি আছে, তাঁহারা অনেক সময়ে ব্যর্থ সাহায্যের বিফল চেষ্টা হইতে বিরত থাকেন বটে, কিন্তু আমাদের পক্ষে তাঁহাদের সে দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা বিড়ম্বনা মাত্র।

আর এক কথা। পাপের ফলে যদি দুঃখই সুনিশ্চিত, তবে পাপীর সমৃদ্ধি হয় কেন? কুচরিত্র, কুক্রিয়াসক্ত লোক ঐশ্বর্য্যশালী হয় কেন? এ দৃশ্য ত বিরল নহে যে, চরিত্রহীন দুষ্ক্রিয়ারত ব্যক্তি ধন রত্নের অধীশ্বর হইয়া সেই অর্থের অপব্যয় করিতেছে; আর সুশীল সদ্বৃত্ত ব্যক্তি অর্থাভাবে অশেষবিধ কষ্ট ভোগ করিতেছেন। এরূপ হয় কেন? কর্ম্মবাদের মূলে যদি ধর্ম্মনীতি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তবে এ দৃশ্য বিরল হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা ত নহে। ইহার সামঞ্জস্য কি?

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইহার এইরূপ সমাধান করিতে চান। ইহলোকে পাপপুণ্য ও সুখদুঃখের সামঞ্জস্য হয় না। সেই জন্যই পরলোকের প্রয়োজন। পরলোকে পুণ্য ও সুখ এবং পাপ ও দুঃখের যথাযথ সামঞ্জস্য হয়। তুলাদণ্ডের ওজনে পাপের সমান দুঃখ ও পুণ্যের সমান সুখ জীবকে সঠিক ভোগ করিতে হয়। ইহার একতিল, এক রতি ব্যত্যয় হয় না। ইউরোপে ক্যাণ্ট (Kant) ও নিউম্যান (Newman) এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। ক্যাণ্ট বলেন যে অনেক সময়েই দেখা যায় বটে যে জগতে পুণ্যের সহিত দুঃখ জড়িত রহিয়াছে, এবং পুণ্যের অভাব সুখলাভের অন্তরায় হইতেছে না,

অথচ জগতের নৈতিক বিধানের অনুসারে এরূপ হওয়া অনুচিত; এই বিরোধের সামঞ্জস্যের জন্য আমাদিগকে মানিয়া লইতে হয় যে দেহান্ত হইলেও আত্মা জীবিত থাকে এবং পরলোকে পুণ্য পাপ ও দুঃখ সুখের সামঞ্জস্য বিধান হয়। ক্যাণ্ট এই বিশ্বাসকে 'ব্যাবহারিক বুদ্ধির স্বতঃসিদ্ধ (Postulate of Practical Reason) এই আখ্যা দিয়াছেন।

পাশ্চাত্য দার্শনিকের এই উত্তর কি সদুত্তর? কর্ম্মবাদের সহিত ধর্ম্মনীতির কি অন্যরূপে সামঞ্জস্য করা যায় না? আমরা কর্ম্মের বিপাক আলোচনা করিবার সময় যে সকল কথা বলিয়াছি,- তাহা স্মরণ করিলে এ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যাইবে। যে জন্মান্তরে অপরকে সুখ দিয়াছে, কর্ম্মের বিধানে ইহজন্মে সুখ তাহার ন্যায্য প্রাপ্য। ইহার সহিত তাহার চরিত্রের বা আশয়ের (motive) কোন সম্বন্ধ নাই। আশয়ের ফলে যদি সে দুরাশয় হইয়া কাহাকেও সুখ দিয়া থাকে, তবে তজ্জন্য তাহার প্রকৃতি মলিন হইবে -কিন্তু সুখ প্রদানের বিনিময়ে সুখের আদানে সে কেন বঞ্চিত হইবে? এইরূপ যদি কেহ শুভ ইচ্ছা ও আশয়ের দ্বারা পরিচালিত হইয়াও ফলতঃ অপরকে দুঃখ দিয়া থাকে, তবে তাহার ফলে তাহার প্রকৃতি মলিন হইবে না বটে কিন্তু তাহার পক্ষে দুঃখভোগ অবশ্যম্ভাবী। মনে করুন দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। কত লোক অনাহারে মুমূর্ষু হইয়া হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছে। এমন সময়ে একজন দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া নহে, ধর্ম্মবুদ্ধির প্রেরণাবশে নহে, কিন্তু উপাধি-ব্যাধির তাড়নায় সেই সকল অনশনক্লিষ্ট অভুক্ত অনাথদিগকে ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল বিপুল পরিমাণে বিতরণ করিল। তাহার আশা যে, ঐরূপ করিলে সে রাজার নিকট হইতে উপাধি লাভ করিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। এই দুষ্ট আশয়ের বশবর্ত্তী হইয়া সে এই পুণ্য অর্জ্জন করিল। ইহার ফল কিরূপ হইবে? অবশ্যই এই দুরাশয় চালিত আচরণে তাহার স্বভাব আরও মলিন হইল, কিন্তু যে উদ্দেশ্যেই হউক সে যখন বহু লোককে পার্থিব সুখ দিয়াছে, তখন কর্ম্মের বিধানমতে সেও জন্মান্তরে পার্থিব সুখের উপকরণ সমূহের (ধন, রত্ন, ঐশ্বর্য্য, সমৃদ্ধির) অধিকারী হইবে। সে পরিমাণ লোককে যতটা পার্থিব সুখ দিয়াছে তাহারই অনুপাতে তাহার পার্থিব সমৃদ্ধির পরিমাণ

হইবে। একজন দুষ্ট, কারবারে লাভবান হইবে বলিয়া ধানের চাষ করিল। তাহার আশয় দুষ্ট বলিয়া কি ধান্তের বীজ অঙ্কুরিত হইবে না? কর্ম্ম সম্বন্ধেও ঐরূপ। যে ভাবেই ভাবিত হইয়া হউক, যে আশয়েই প্রণোদিত হইয়া হউক, অপরকে সুখদানরূপ বীজ জন্মান্তরে যে বপন করিয়াছে, ইহজন্মে তজ্জন্ত সুখফল তাহার অবশ্য প্রাপ্য। কারণ যে ভূমিকায় (plane) শক্তির ক্রিয়া হয়, তাহার প্রতিক্রিয়াও সেই ভূমিকাতেই হইবে। অপরকে পার্থিব সুখে সুখী করিলে নিজেরও পার্থিব সুখ মিলিবে উদ্দেশ্য আশয়—পার্থিব ভূমিকার বস্তু নহে। তাহার ক্রিয়া সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম জগতেই তাহার প্রতিক্রিয়া হইবে।

অন্যপক্ষে মনে করুন, একজন বৈজ্ঞানিক দেশে মারীভয় প্রবল হইয়াছে দেখিয়া অনেক চিন্তা ও গবেষণা করিয়া একটা ঔষধ আবিষ্কার করিলেন এবং সদাশয় প্রণোদিত হইয়া অনেককে সেই ঔষধ সেবন করাইলেন। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য শুভ হইলেও ফল বিপরীত ঘটিল। সেই ঔষধের ক্রমের ভুলে অনেক নিরীহ লোক অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিল। সেই বৈজ্ঞানিক অপরকে যে দুঃখ দিলেন, সদিচ্ছা প্রণোদিত হইলেও তাঁহাকে তাহার ফলভোগ করিতে হইবেই। একদিকে শুভ আশয় ও পরোপকার করিবার সদুদ্দেশ্যের ফলে তাহার স্বভাব উন্নত হইল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অপরকে পার্থিব দুঃখ দিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে পরজন্মে দুঃখ ভোগ করিতে হইবে।

একই কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন লোকে বিভিন্ন আশয়ে করিয়া থাকে। দুর্ভিক্ষ পীড়িতের দুঃখমোচন দুরাকাঙ্ক্ষা তাড়িত হইয়াও করা যায়, আবার অনাবিল করুণার বশবর্ত্তী হইয়াও করা যায়। এই দুই ব্যক্তি পার্থিব হিসাবে একই কাজ করিলেন। উভয়েই বহু দুঃখীর দুঃখ দূর করিয়া, বহু ব্যক্তিকে পার্থিব সুখ দিলেন। তাহার ফলে পরজন্মে উভয়েই পার্থিব সম্পদে সম্পন্ন হইবেন। কিন্তু একজনের শুভাশয়, আর অপরের দুরাশয়—ইহারও ফল সূক্ষ্ম ভূমিকায় ফলিবে একজন সুচরিত্র, আর একজন দুশ্চরিত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। উভয়েই সমৃদ্ধিশালী হইবে বটে, কিন্তু যে দুরাশয় সে পার্থিব সমৃদ্ধির মধ্যে থাকিয়াও সন্তোষ ও শান্তি লাভ করিতে পারিবে না।

আর যে শুভাশয় সে সমৃদ্ধির উপরে যে উচ্চতর সুখ—শান্তি ও সন্তোষ—সেই সুখের অধিকারী হইবে।

এইরূপ অপরকে পার্থিব দুঃখের ভাগী করিবার স্থলেও শুভাশয় ও দুরাশয়ের তারতম্য দৃষ্ট হয়। যে বৈজ্ঞানিক শুভাশয় প্রণোদিত হইয়া কেবল আকস্মিক ভ্রমের ফলে অপরকে পার্থিব দুঃখ দিয়াছে, আর যে বৈজ্ঞানিক দুরাশয়ের প্রেরণায় অপরকে নৃশংস ও নির্দ্দয় ভাবে পার্থিব যাতনা দিয়াছে—পরজন্মে এ দুই জনের অবস্থা তুল্য হইবে না। যে শুভাশয় সে পরজন্মে পার্থিব দুঃখ ভোগ করিবে বটে, কিন্তু শুভাশয় জনিত চরিত্রের উন্নতির ফলে সেই দুঃখের মধ্যেই সে সহিষ্ণুতা ও সন্তোষ অর্জ্জন করিয়া দুঃখকে অসহ্য গুরুভার মনে করিবে না। আর যে দুরাশয়, পার্থিব দুঃখত তাহার হইবেই; সঙ্গে সঙ্গে দুর্বৃত্ত ও দুশ্চরিত্রের ফলে সে দুঃখে অসহিষ্ণু হইয়া দুঃখভার আরও গুরু করিবে এবং তাহার ফলে তাহার প্রকৃতি মলিন হইতে মলিনতর হইতে থাকিবে। এই ভাবে কর্ম্মের সাম্য রক্ষিত ও সামঞ্জস্য বিহিত হয়।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

---

# রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামী।

## শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রভুর সহিত মিলন (ক্রমশঃ)

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

ঐ প্রেম শুদ্ধা ভক্তি হইতেই আবির্ভূত হইয়া থাকে। অতএব এক্ষণে শুদ্ধা ভক্তির লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতেছি—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

সর্ব্বৈশ্বর্য্য মাধুর্য্য-পূর্ণ, স্বীয় অত্যাশ্চর্য্য লীলা দ্বারা চরাচর বিশ্বের আকর্ষণ-কারী, পরম প্রেমাস্পদ, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত বা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধি আনুকূল্যময় অনুশীলনই ভক্তি বা ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ। যে বস্তু যাহা, তাহাই তাহার স্বরূপ। স্বরূপের পরিচায়ক যে লক্ষণ, অর্থাৎ যে লক্ষণ স্বরূপের

পরিচয় প্রদান করে, তাহাই স্বরূপলক্ষণ বা মুখ্য বিশেষণ। অনুশীলন শব্দটী শীল ধাতু হইতে উৎপন্ন। ক্রিয়াশব্দ দ্বারা যেমন কৃ ধাতুর অর্থ মাত্রই উক্ত হয়, অনুশীলন শব্দ দ্বারা তদ্রূপ শীল ধাতুর অর্থমাত্রই উক্ত হইয়া থাকে। শীলধাতুর অর্থ শীলন। ঐ শীলন দ্বিবিধ, প্রবৃত্ত্যাত্মক ও নিবৃত্ত্যাত্মক শারীর মানস ও বাচিক চেষ্টা এবং প্রীতি বিষাদাত্মক প্রাসিদ্ধ মানস ভাব। ভাববৃত্তি। মানসিভাব—মনোবৃত্তি প্রসিদ্ধ মানসভাব স্থায়ী ও সঞ্চার ভাব সকল। প্রীতি বিষাদাত্মক—বা দ্বেষাত্মক। বাচিক চেষ্টা—কীর্ত্তন। মানস চেষ্টা—স্মরণ। শারীর চেষ্টা শ্রবণাদি। নিবৃত্ত্যাত্মক চেষ্টা—ত্যাগ চেষ্টা। প্রবৃত্ত্যাত্মক চেষ্টা গ্রহণ চেষ্টা। আনুকূল্যময়—রুচিকর। অতএব সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত অথবা তৎসম্বন্ধি বলিয়া পরম্পরায় তন্নিমিত্ত যে কিছু শারীরাদি চেষ্টা ও ভাব, তাহা যদি তাঁহার অরুচিকর না হইয়া রুচিকর হয়, তাহা হইলে তাহা ভক্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। অরুচিকর চেষ্টার বা ভাবের ভক্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। ঐ ভক্তি সোপাধিকী ও নিরুপাধিকী ভেদে দ্বিবিধা। ভক্তির উপাধি দুইটা, একটী অন্য অভিলাষ, অপরটী অন্য মিশ্রণ। উপাধিবিশিষ্টা ভক্তির নাম সোপাধিকী বা গৌণীভক্তি এবং উপাধিশূন্যা ভক্তির নাম নিরুপাধিকী বা মুখ্যা ভক্তি। মূলোক্ত উত্তমা শব্দের অর্থ মুখ্যা অতএব পূর্ব্বোক্ত অনুশীলন যদি অন্যাভিলাষ শূন্য ও অন্যমিশ্রণ শূন্য হয়, তবে তাহাকে উত্তমা ভক্তি বলা যায়। এইটী ভক্তির তটস্থ লক্ষণ বা গৌণ বিশেষণ। অন্যাভিলাষ ভোগবাসনা ও মোক্ষবাসনা প্রভৃতি। অন্যমিশ্রণ—জ্ঞানকর্ম্মাদির আবরণ জ্ঞানকর্ম্মাদি জীব ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান, স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম, বৈরাগ্য, সাংখ্য ও অষ্টাঙ্গযোগ প্রভৃতি। অতএব পূর্ব্বোক্ত অনুশীলন যদি ভক্তি মুক্তিকামনারহিত হইয়া কেবল শ্রবণ কীর্ত্তনাদিময় হয়, তবে তাহাকে উত্তমা ভক্তি বলা যায়। এই উত্তমা ভক্তি নির্গুণা, শুদ্ধা, কেবলা, মুখ্যা, অনন্যা, অকিঞ্চনা ও স্বরূপ সিদ্ধা প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। জ্ঞানাদির মিশ্রণ ও ভক্তি ভিন্ন অন্য অভিলাষের সম্পর্ক না থাকাতেই ভক্তির উত্তমত্ব বা শুদ্ধত্ব। ভোগবাসনাযুক্ত ভক্তির নাম সকামা ভক্তি। মোক্ষবাসনাযুক্ত ভক্তির নাম নিষ্কামা ভক্তি। সকামা ভক্তি হয়

তামস নয় রাজস হয় বলিয়া উহাকে সগুণ ভক্তিও বলা হইয়া থাকে। আর্ত্ত ও অর্থার্থী ব্যক্তি সকল উহার অধিকারী এবং স্বর্গাদি ভোগ উহার ফল। ঐ সকামা ভক্তিই সাত্ত্বিকী হইলে, মোক্ষবাসনাযুক্ত হইয়া থাকে। তখন আর উহাকে সকামা না বলিয়া নিস্কামা বলা হয়। মুমুক্ষু ব্যক্তিসকলই উহার অধিকারী। এই মোক্ষবাসনাযুক্ত নিস্কামা ভক্তি প্রায়ই জ্ঞানযোগ বা কর্ম্মদ্বারা মিশ্রিত হইয়া থাকে। কর্ম্মদ্বারা মিশ্রিত হইলে, ইহাকে কর্ম্ম-মিশ্রা, যোগদ্বারা মিশ্রিত হইলে ইহাকে যোগ-মিশ্রা, এবং জ্ঞান দ্বারা মিশ্রিত হইলে, ইহাকে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি বলা যায়। কর্ম্ম-মিশ্রা ভক্তির ফল চিত্তশুদ্ধি, যোগ-মিশ্রা ভক্তির ফল পরমাত্ম সাক্ষাৎকারের অনন্তর ক্রমমুক্তি এবং জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তির ফল, ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের অনন্তর সদ্যো মুক্তি। কর্ম্ম-মিশ্রা ভক্তির অন্তর্গত নিস্কাম কর্ম্ম সকল সাক্ষাৎ ভক্তি না হইয়াও ভক্তির ফল চিত্ত-শুদ্ধির উৎপাদন দ্বারা ভক্তিত্বের আরোপে ভক্তিরূপে সিদ্ধ অর্থাৎ তদাকারে আকারিত হয় বলিয়াই উহাকে আরোপসিদ্ধা ভক্তি বলা হইয়া থাকে। তদ্রূপ যোগমিশ্রা ভক্তির অঙ্গীভূত আসন প্রাণায়ামাদি ক্রিয়া সকল এবং জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির অঙ্গীভূত জীব ব্রহ্মৈক্য জ্ঞান সাক্ষাৎভক্তি না হইয়াও ভক্তির সঙ্গ বশতঃ সিদ্ধ অর্থাৎ ভক্তির ফল মোক্ষ উৎপাদন দ্বারা ভক্তির আকারে আকারিত হয় বলিয়া উহাদিগকে সঙ্গসিদ্ধা বলা হইয়া থাকে। উত্তমা ভক্তি গুণ সম্বন্ধ রাহিত্য হেতু নির্গুণ এবং উক্ত অপরাপর ভক্তি সকল হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান ইঁহার অধীন, ইঁহার মুখাপেক্ষী। ইনি কর্ম্মজ্ঞানাদির অধীন বা মুখাপেক্ষী নহেন, পরন্তু সম্পূর্ণ স্বাধীন। ইনি স্বাধীন ভাবেই কর্ম্মের ফল চিত্তশুদ্ধি, যোগের ফল ক্রম মুক্তি এবং জ্ঞানের ফল সদ্যোমুক্তির সহিত নিজের ফল শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকার প্রভৃতি সমস্তই প্রদান করিয়া থাকেন। যদিও এই উত্তমা ভক্তির শ্রবণ কীর্ত্তনাদি অঙ্গ সকলকে আপাততঃ কর্ম্ম বলিয়া ভজনীয়ত্বানুসন্ধানাদি অঙ্গ সকলকে আপাততঃ জ্ঞান বলিয়া এবং ন্যাসমুদ্রাদি অঙ্গ সকলকে আপাততঃ যোগ বলিয়াই বোধ হয় বটে, কিন্তু উহারা কর্ম্মাদি নহে। ঐগুলি শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দময়ী স্বরূপ শক্তির পরমা বৃত্তি। নিত্য সিদ্ধ যে শ্রীভগবানের স্বরূপ শক্তি সকল তাঁহারই ঐ সকল বৃত্তির মূলাশ্রয়। সাধকের শ্রবণাদি

ইন্দ্রিয় সমূহ সিদ্ধ ও সাধকের একত্র সম্মিলনের ক্ষেত্ররূপেই নির্ম্মিত। সাধকের ইন্দ্রিয়গুলি ঐরূপে নির্ম্মিত না হইলে অসিদ্ধ অতএব সিদ্ধগণের সহিত একত্র সম্মিলনের অযোগ্য সাধক সকলের সিদ্ধত্ব লাভের সম্ভবনাই থাকিত না।

নিত্য সিদ্ধস্বরূপ শক্তির বৃত্তি সকল অসিদ্ধ সাধকের আকর্ষণার্থ তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয় বৃত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া উহার সহিত একীভূত হইয়া তত্তদাকারে আকারিত হইয়া শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। আনন্দময়ী বৃত্তির অবতারেই শ্রবণকীর্ত্তনাদি সাধকের সম্বন্ধে আনন্দদায়ক হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় বৃত্তিতে প্রকাশ দর্শনেই লোকে উহাদিগকে জ্ঞানকর্ম্মাদিরূপে অনুভব করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদি কর্ম্মজ্ঞানাদির অতীত আনন্দময় বস্তু। এই নিমিত্তই ভগবান কপিলদেব বলিয়াছেন—

"দেবানাং গুণ লিঙ্গানামানুশ্রবিক কর্ম্মণাম্।
সত্ত্ব এবৈক মনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা॥
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী।
জরয়ত্যাশু যা কোশং নির্গীর্ণ মনলো যথা॥"

গুণত্রয়োপাধিক ও শ্রুতি পুরাণাদিগম্য বচিত দেবগণের মধ্যে সত্ত্বে অর্থাৎ স্বরূপ শক্তিবৃত্তি ভূতশুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীবিষ্ণুতে একমনা পুরুষের যে ফলাভিসন্ধি-রহিতা স্বাভাবিকী বৃত্তি অর্থাৎ তদানুকূল্যাত্মক জ্ঞান বিশেষ, তাহাই ভক্তি। ঐ ভক্তি সিদ্ধি অর্থাৎ মুক্তি হইতেও গরীয়সী। জঠরানল যেমন ভুক্ত অন্নকে জীর্ণ করে, ঐ ভক্তি ও তদ্রূপ সত্বর জীবকোশকে জীর্ণ করিয়া থাকে।

ভক্তি লক্ষণোক্ত অনুশীলন শব্দের ভাবরূপ অর্থের ক্রোড়ীকরণে ভক্তির জ্ঞান বিশেষত্বই সিদ্ধ হইতেছে। ভক্তিকে একবার জ্ঞানাধরণ শূন্য বলিয়া আবার জ্ঞান বিশেষ বলা অযুক্ত হয় নাই। ভাবরূপ বৃত্তি জ্ঞানই। জ্ঞান অন্তঃকরণের বৃত্তি, ভাবও তাহাই। জ্ঞান দ্বিবিধ; বৃত্তিজ্ঞান ও ফলজ্ঞান। অন্তঃকরণ জ্ঞেয় বস্তুর আকারে আকারিত হইলেই, উহাকে বৃত্তিজ্ঞান বলা যায়, এবং তদনন্তর জ্ঞেয় বস্তুর প্রকাশে যে বিচারজনিত জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকেই ফল জ্ঞান বলা যায়। স্ব প্রকাশ বিষয়ী আত্মার জ্ঞানই বৃত্তি জ্ঞান

এবং আত্মপ্রকাশ্য ঘটপটাদি বিষয় সকলের বিচারজনিত জ্ঞানই ফল জ্ঞান। বৃত্তি জ্ঞান বিচার নিরপেক্ষ অতএব স্বপ্রকাশ বলিয়া স্বাভাবিক এবং ফল জ্ঞান বিচারসম্পন্ন অতএব পরপ্রকাশ্য বলিয়া কৃত্রিম। নির্ম্মল নির্বিষয় অন্তঃকরণ আত্মাকারে আকারিত হইলেই, তাহাকে আত্মজ্ঞান বা বৃত্তিজ্ঞান বলা যায়। আত্মার ফলজ্ঞান হয় না। অন্তঃকরণ ঘটপটাদি বিষয়ের আকারে আকারিত হইলে বুদ্ধিস্থ চিদাভাস কর্তৃক বিচারপূর্ব্বক ঘটপটাদি বিষয়ক অজ্ঞানের অপসারণ দ্বারা যে জ্ঞান উৎপাদিত হয়, তাহাকেই ফলজ্ঞান বলা যায়। ভাবরূপ অন্তঃকরণের স্বাভাবিকী বৃত্তি আবার পূর্ব্বোক্ত স্বপ্রকাশ আত্মজ্ঞান হইতেও বিশেষ। আত্মজ্ঞান অন্তঃকরণের চিৎসত্তারূপাবৃত্তি; ভাব উহার চিৎসত্তাসাররূপাবৃত্তি। উহা আনুকূল্যাত্মাত্মিকা সুখরূপা—আনন্দরূপাবৃত্তি বলিয়াই উহাকে চিৎসত্তাসাররূপা বৃত্তি বলা হয়।

শ্রীভগবানের গুণাদি শ্রবণ মাত্র তাঁহাতে যে অবিচ্ছিন্ন মনের প্রবাহরূপা গতি হয়, উহাই ভক্তি—উহাই ভাব। উহা শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মক অর্থাৎ হ্লাদিনী-সমবেত সম্বিতসার; উহা প্রেমরূপ অংশুমালীর অংশু; উহা প্রেমের অঙ্কুর; উহা আনুকূল্য অর্থাৎ রুচিদ্বারা চিত্তের স্নিগ্ধতা সম্পাদক। উহার অপর নাম রতি।

শ্রীকৃষ্ণবিষয়িনী রতি যখন শ্রবণাদি কর্তৃক উপস্থাপিত বিভাব অনুভাবও সঞ্চারীভাব দ্বারা ব্যক্তীকৃত হয়, অর্থাৎ আস্বাদ যোগ্যতা প্রাপিত হয়, তখন ঐ ভাবকে বা রতিকে ভক্তিরস বলা যায়। ভক্তিরস সাকল্যে বারটী। তন্মধ্যে সাতটি গৌণ ও পাঁচটি মুখ্য। বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, রৌদ্র ও বীভৎস, এই সাতটি গৌণ ভক্তিরস। আর শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, এই পাঁচটি মুখ্য ভক্তি রস।

প্রত্যেক রসেরই এক একটী করিয়া স্থায়ীভাব আছে। উৎসাহ, শোক, বিস্ময়, হাস, ভয়, ক্রোধ ও জুগুপ্সা, এই সাতটী বীরাদি সাতটী গৌণরসের স্থায়ী ভাব, এবং শান্তি, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও প্রিয়তা, এই পাঁচটি শান্তাদি পাঁচটি মুখ্য রসের স্থায়ীভাব। ঐ সকল স্থায়ী ভাবই শ্রবণাদি কর্তৃক উপস্থাপিত বিভাবাদি দ্বারা ব্যক্তীকৃত হইয়া রসরূপে পরিণত হয়। তন্মধ্যে যাহা দ্বারা ও যাহাতে স্থায়ী ভাবাদির আস্বাদন করা যায়, তাহার নাম

বিভাব। বিভাব দ্বিবিধ; আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন আবার বিষয় ও আশ্রয় ভেদে দুই প্রকার। শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিরসের বিষয়ালম্বন এবং তদীয় ভক্তগণ আশ্রয়ালম্বন। শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে রতি উৎসাবিত হয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বিষয়ালম্বন বলা হয়, এবং ঐ রতি শ্রীকৃষ্ণভক্তগণকে আশ্রয় করিয়া থাকে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণভক্তগণকে রতির আশ্রয়ালম্বন বলা হয়। যদ্দ্বারা ভাবের উদ্দীপন হয়, তাহার নাম উদ্দীপন বিভাব। আলম্বন বিভাবের চেষ্টা, রূপ ও ভূষণাদি এবং দেশকালাদি ভাবের উদ্দীপন করে বলিয়াই ঐ সকলকে উদ্দীপন বিভাব বলা যায়। যাহা অন্তরস্থ ভাবকে বাহিরে প্রকাশ করে, তাহার নাম অনুভাব। অনুভাব মিশ্র ও সাত্বিক ভেদে দ্বিবিধ। সত্বমাত্রোদ্ভব অর্থাৎ কেবল মানসিক অনুভাবের নাম সাত্বিক অনুভাব এবং কায়বাঙ্-মানসিক মিশ্রিত অনুভাবের নাম মিশ্র অনুভাব। নৃত্য, গীত ও হাস্য মিশ্র অনুভাব। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও মূর্চ্ছা এই আটটির নাম সাত্বিক অনুভাব। আর যে সকল ভাব স্থায়ীভাবে কখন উন্মগ্ন ও কখন নিমগ্ন হইয়া ঐ ভাবের অভিমুখে সঞ্চরণ করে, তাহাদিগকেই সঞ্চারী ভাব বা ব্যভিচারী ভাব বলা যায়। ব্যভিচারী ভাব নির্ব্বেদাদি ভেদে তেত্রিশটি।

স্থায়ীভাবাখ্যা রতি আবার ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা ও কেবলা ভেদে দ্বিবিধা। গোকুলে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্যা কেবলা রতি এবং পুরীদ্বয়ে ও বৈকুণ্ঠাদিতে ঐশ্বর্য্য জ্ঞানযুক্তা মিশ্রারতি। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্তা মিশ্রা রতিতে প্রেমের বৃত্তি সকল যথেষ্ট প্রসারতা লাভ করিতে না পারায় প্রেম সঙ্কুচিত হইয়া যায়। ঐশ্বর্য্য জ্ঞানশূন্যা কেবলা রতিতে প্রেমের বৃত্তি সকল পরাকাষ্ঠা লাভ করে বলিয়া ঐ প্রেমের সঙ্কোচ বা বিকাশ দৃষ্ট হয় না। উহা সদা একরূপেই অবস্থান করে। কেবলার রীতি এই যে, তিনি ঐশ্বর্য্য দেখিলেও মানেন না। মিশ্রারতিতে শান্ত ও দাস্যরসে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান কোন কোন স্থলে প্রেমের উদ্দীপন হয় এবং বাৎসল্যে, সখ্যে ও মধুর রসে কোন কোন স্থলে প্রেমের সঙ্কোচন হয়। শ্রীকৃষ্ণ যখন দেবকী ও বসুদেবের চরণবন্দন করিলেন, তখন তাঁহারা তাঁহার পূর্ব্ব দৃষ্ট ঐশ্বর্য্য স্মরণ করিয়া মনে ভয় পাইলেন। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যদর্শনে ভীত হইয়া নিজের ধৃষ্টতার নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

রুক্মিণী দেবী শ্রীকৃষ্ণের পরিহাস বাক্যে ত্যাগ ভয়ে ভীত হইলেন। গোকুলে কিন্তু এই প্রকার প্রেমের সঙ্কোচ বিকাশাদি দৃষ্ট হয় না। ব্রজবাসীরা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখিয়াও তাহা মনে স্থান দেন না। মাতা যশোদা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখিয়াও তাঁহাকে আত্মজ বোধে বন্ধন করিতেন। গোপবালক সকল শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখিয়াও তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করিতেন। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে কিতব অর্থাৎ শঠ বলিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধারোহণেও ইচ্ছা করিয়াছিলেন। 　ক্রমশঃ

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

---

# মানবের ইতিবৃত্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

## মৌলিক মানবজাতি।

### প্রথম মৌলিকজাতি।

পিতৃ শুক্রবিন্দু মাতৃগর্ভে পতিত হইয়া শোণিত সংযোগে ভ্রূণরূপে পরিণত হইয়া যেরূপে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রণী জীবগণ প্রথম মৌলিক জাতির বিন্দুরূপে অনন্ত কালগর্ভে পতিত হইয়া ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাহারা যেসকল উপাদানে আবৃত ছিল, তাহা কালসহকারে তাহাদের ইন্দ্রিয়রূপে পরিণত হইল। সর্ব্বাগ্রে শ্রবণেন্দ্রিয় নির্ম্মিত হইল। এই ইন্দ্রিয়দ্বারা শব্দানুভব হয়। এই শব্দ বাহ্যজগতের ধারাবাহিক আন্দোলন সমষ্টি মাত্র। এই আন্দোলন প্রবাহ কর্ণপটহে আঘাত করিলে যদ্দ্বারা জীব তাহা শব্দ বলিয়া অনুভব করে তাহারই নাম শ্রবণেন্দ্রিয়। প্রথমাবস্থায় এই শক্তি অতি ক্ষীণ ছিল। তখনকার জীবগণকে ইন্দ্রিয় বর্জ্জিত সংজ্ঞাবিহীন জন্তু বিশেষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না কারণ এই প্রথম প্রস্ফুটিত শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা অতি মৃদু ও অতি অস্পষ্টভাবে তাহারা বাহ্য-জগতের ব্যাপার অনুভব করিতে পারিত। বাহ্যজগতে তাহারা সর্ব্বপ্রথমে অগ্নির অস্তিত্ব অনুভব করিল।

## দ্বিতীয় মৌলিকজাতি।

*দ্বিতীয় মৌলিক জাতিতে জীবে স্পর্শেন্দ্রিয় সংযুক্ত হইল।* তখন তাহারা বায়ুর সংস্পর্শ অনুভব করিতে লাগিল। পঞ্চভূতের মধ্যে তেজ ও মরুতের অস্তিত্ব বুঝিতে তাহারা সমর্থ হইল। তাহারা স্পষ্টরূপে বাক্য উচ্চারণ করিতে পারিত না। কেবল স্বরবর্ণ যুক্ত বাক্য অস্পষ্ট ভাবে উচ্চারণ করিয়া তাহারা মনের ভাব ব্যক্ত করিত। তাহাদের মনোভাবব্যঞ্জক বাক্যাবলি ও ভাষা যেরূপ অস্পষ্ট, কর্কশ এবং কদর্য্য ছিল, তাহাদের দেহের আকার প্রকারও তদনুরূপ বিভিন্ন রকমের, কর্কশ ও কদাকার ছিল। তাহারা স্বপ্নাবস্থায় মানসিক শান্তিসুখ উপভোগ করিত, কিন্তু বাহ্যজগতের সুখ দুঃখ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইত না। এক রকম সংজ্ঞাহীন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে প্রথম মৌলিকজাতি অপেক্ষা তাহারা কিয়ৎ পরিমাণে উন্নত ছিল।

## তৃতীয় মৌলিকজাতি।

এই জাতিতে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে উন্নতি বৃদ্ধি হইতে লাগিল। শ্রবণ ও স্পর্শ শক্তির সঙ্গে সঙ্গে এই জাতির দর্শনশক্তি লাভ হইল। এই তিন শক্তির সংযোগে জীবের বাহ্যজগতের জ্ঞান অধিকতর পরিস্ফুট হইল। এই জাতির প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক অস্ফুট চীৎকারে মনের ভাব ব্যক্ত করিত। সুখ দুঃখ আনন্দ আশা ঘৃণা ক্রোধ-ভয় প্রভৃতি মানসিক বিভিন্নভাব সমূহ তাহারা অপরিস্ফুট উচ্চরবে প্রকাশ করিত। পরে তৃতীয় শ্রেণিতে এই অস্পষ্ট চীৎকার কতক পরিমাণে ভাষার আকার ধারণ করিল। অগ্নি ও বায়ুর অনুভব শক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের জলের অস্তিত্ব অনুভব করার শক্তি জন্মিল। কদাকার রূপের পরিবর্ত্তন হইয়া তাহারা প্রকৃত মানবাকার ধারণ করিয়া জ্ঞান লাভের উপযুক্ত হইল। এই জ্ঞানের আবির্ভাব হইলেই জীব প্রকৃত মনুষ্য পদবাচ্য হয়।

## জ্ঞানহীন নর পশু তুল্য।

আহার নিদ্রা-ভয় মৈথুনঞ্চ সম্যানমেতৎ পশুভির্নরাণাং।
জ্ঞানং নরাণানধিকং বিশেষো জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

কিন্তু তখনও বাহ্যজগতে তাহারা জড়ভরতবৎ নিরেট বোকা ও নির্জীব। কেবলমাত্র বাহ্য সুখ দুঃখের বোধে অন্ধের ন্যায় ইতস্ততঃ পরিচালিত হইত। হিতাহিত জ্ঞান শক্তি পরিস্ফুট না হওয়াতে তাহারা দেহের ক্রিয়া বোধ করিতে পারিত না। উর্দ্ধলোক হইতে যতই জীবন স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল, ততই তাহাদের পাশব ইন্দ্রিয়শক্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহাদের ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া প্রবল ও দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। তাহাতে বিপদের আশঙ্কাই অধিক। কারণ চা.কহীন বাষ্পীয় যন্ত্রে বাষ্পের বেগ বৃদ্ধি হইলে ঘোর বিপদেরই অধিক সম্ভাবনা থাকে। তৎপর মানবের কল্যাণ সাধন ও উন্নতি বিধানের নিমিত্ত মানসপুত্রগণ অগ্রসর হইলেন। মানসিক উন্নতির পথ মুক্ত হইল। কছুকালের জন্য আধ্যাত্মিক জ্ঞান তমসাচ্ছন্ন হইল। মানসিক শক্তি একাধিপত্য বিস্তার করিল। জীব জীবের, স্বকৌশলে মানসিক জ্ঞানকে সচেতন ও প্রবুদ্ধ করিতে লাগিল, নিকৃষ্ট বৃত্তি সমূহকে বশে আনিয়া ইচ্ছামত পরিচালনা করিতে লাগিল

এই খানেই আমরা জীবের আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের আখ্যায়িকার উপসংহার করিলাম।

ভবিষ্যতে এমন সময় আসিবে যখন এই মানস জ্ঞান আত্মায় মিশিয়া পরস্পর এক হইয়া যাইবে।

ইহাই জীবের আধ্যাত্মিক ইতিবৃত্ত। ইহা হইতে আমরা এই জানিলাম যে পরমপিতা পরমেশ্বর হইতে আমরা জন্মলাভ করিয়াছি, তাহার পর প্রভূত শক্তিশালী শ্রেষ্ঠ দেবগণ জীবের শৈশবাবস্থায় সযত্নে পরিপোষণ ও উন্নত করিয়াছেন। ইহাও দেখিলাম, যতই আমরা মণ্ডল হইতে মণ্ডলান্তরে, চক্র হইতে চক্রান্তরে, গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে অবতরণ করিতে লাগিলাম, ততই আমাদের উন্নতির অবস্থান্তর ঘটিতে লাগিল। কালক্রমে আমরা বর্ত্তমান পৃথিবীতে অবতরণ করিলাম। আমাদের ভাগ্যে ভূমি স্পর্শ লাভ ঘটিল। তাহার পর দেখিলাম, কিরূপে ব্রহ্মার রজনী নামক দেহ হইতে অপরা অর্থাৎ তামসবিস্তারী অসুরগণ আবির্ভূত হইল, এবং কিরূপে প্রকৃত মনুষ্যত্বের উপাদান অহঙ্কার আনয়ন করিল। তাহাতে ইহাও দেখিতে পাইলাম, তাহারা যেই, আমরাও সেই, পরস্পরে মূলতঃ কিছু প্রভেদ নাই। ইহা কি

এক অভিনব তত্ত্ব নহে? আর কি দেখিলাম? বোধ শক্তির (মানস জ্ঞানের) প্রভুত্ব এবং আত্মার বশ্যতা এবং মলিনতা ঘটিল। কিন্তু আত্মার গতি কতকাল রুদ্ধ থাকিতে পারে? শেষে এমন সময় আসিবে, যখন মানসজ্ঞানে তাহার সমরলব্ধ সমস্ত সত্তা (সংস্কার রাশি) ভক্তিভরে আত্মার পাদপদ্মে সমর্পণ করিবে। তখন দেবত্ব লাভ করিয়া এই পৃথিবীতে রাজত্ব করিতে পারিবে।

---

# চৈতন্য কথা।

ব্রহ্ম সূত্র

## প্রথম অধ্যায়, দ্বিতীয়পাদ।

### দ্বিতীয় অধিকরণ—(৯, ১০ সূত্র)

কঠবল্লী উপনিষদে 'যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চোভে ভবত ওদনঃ' এই বাক্যে সর্ব্বা চরাচর জগতের অত্তা বা সংহর্ত্তা ব্রহ্ম। জীব বা অগ্নি হইতে পারে না। কারণ ব্রহ্মেরই প্রকরণে একথা লিখিত হইয়াছে

### তৃতীয় অধিকরণ—(১১ ১২ সূত্র)

"ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ" কঠোপনিষদের এই বাক্যে জীব ও পরমাত্মার কথা বলা হইয়াছে।

### চতুর্থ অধিকরণ—(১৩, ১৭ সূত্র)

"য এষোঽক্ষিপুরুষো দৃশ্যতে এষ আত্মেতি" ছান্দোগ্য শ্রুতিতে এই অক্ষিপুরুষ পরমাত্মা

### পঞ্চম অধিকরণ—(১৮, ২০ সূত্র)

বৃহদারণ্যকে "স আত্মান্তর্যামী অমৃতঃ" ব্রহ্ম বাচক।

### ষষ্ঠ অধিকরণ—(২১, ২৩ সূত্র)

মুণ্ডক উপনিষদে "যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃ শ্রোত্রং ইত্যাদি বাক্য ব্রহ্ম বাচক।

সপ্তম অধিকরণ—( ২৪, ৩২ সূত্র )

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে "আত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে" এই বাক্যে বৈশ্বানর শব্দ অগ্নি কি জীব বাচক নহে, পরমেশ্বর বাচক।

প্রথম অধ্যায়—তৃতীয়পাদ।

প্রথম অধিকরণ—( ১, ৭ সূত্র )

"যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষমোতং" (মুণ্ডক) এই বাক্যে ব্রহ্মেরই কথা বলা হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধিকরণ—( ৮, ৯ সূত্র )

"ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ ( ছান্দোগ্য )। এখানে ব্রহ্মই ভূমা।

তৃতীয় অধিকরণ—( ১০, ১২ সূত্র )

"তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি" ( বৃহদারণ্যক )। এখানে "অক্ষর" বর্ণ নহে, ব্রহ্ম।

চতুর্থ অধিকরণ -( ১৩ সূত্র )

"এতদ্বৈ সত্যকাম পরং চাপরং চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারস্তস্মাদ্বিদ্বানেতেনৈবায়তনে নৈকতরমন্বেতি" এইরূপে প্রকরণের আরম্ভ করিয়া প্রশ্ন শ্রুতি বলিতেছেন, "যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণৈবোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত"।

প্রকরণে পরব্রহ্মের উল্লেখ আছে। অপর ব্রহ্মেরও উল্লেখ আছে। তাহা হইলে পরম পুরুষ বলিলে কোন্ ব্রহ্মকে বুঝিতে হইবে। কাহার অভিধ্যান করিতে হইবে। মীমাংসা এই যে পরব্রহ্মেরই ধ্যান করিতে হইবে।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধিকরণ—( ১৪, ২১ সূত্র )

ছান্দোগ্য শ্রুতির দহরাকাশ আকাশও নহে, জীবও নহে, কিন্তু ব্রহ্ম।

সপ্তম অধিকরণ—( ২২, ২৩ সূত্র )

"ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" ( কঠবল্লী )—এ কোন অন্য ভাস্বর পদার্থ নহে, স্বয়ং ব্রহ্ম।

অষ্টম অধিকরণ—( ২৪, ২৫ সূত্র )

কঠবল্লীর "অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ" বিজ্ঞানাত্মা নহে পরমাত্মা। মনুষ্যের শাস্ত্রে অধিকার। মনুষ্যের হৃদয় অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত। যদিও পরমেশ্বর সকলের হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন, তথাপি শাস্ত্রাধিকার সম্পন্ন মনুষ্যের হৃদয় অপেক্ষা করিয়া 'অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ' বলা হইয়াছে।

নবম অধিকরণ—( ২৬, ৩৩ সূত্র )

তবে কি মনুষ্যেরই কেবল শাস্ত্রে অধিকার আছে। দেবতার কি নাই ? বাদরায়ণ বলেন, দেবতারও অধিকার আছে। কারণ দেবতারও শরীর আছে। শরীর পরিমাণে হৃদয়ও আছে। অঙ্গুষ্ঠেরও সেইরূপ পরিমাণ।

## শূদ্রের বেদে অনধিকার।

## প্রথম অধ্যায় তৃতীয়পাদ।

দশম অধিকরণ—( ৩৪, ৩৮ সূত্র )

তবে শূদ্রের অধিকার নাই। কারণ শ্রুতি ও স্মৃতি বাক্য বিচার করিলে দেখা যায়, যে বেদের অধিকার ব্যতিরেকে বৈদিক জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। উপনীত না হইলে বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ। শূদ্রের উপনয়ন নাই। তৈত্তিরীয় সংহিতা সেই জন্য বলিতেছেন—"তস্মাচ্ছূদ্রো যজ্ঞেঽনবক্লৃপ্তঃ"।

গৌতম্ ঋষি জাবালকে ব্রহ্ম বিদ্যা শিখাইবার পূর্ব্বে তাহার সরল ব্যবহার ও সত্যবাদিতা দ্বারা ব্রহ্মকুলে জন্ম অবধারণ করিয়াছিলেন। পরে তাহাকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিয়াছিলেন। ইহাতেও অনুমান করা যায় যে শূদ্রের বৈদিক জ্ঞানে অধিকার নাই।

স্মৃতিতেও এ সম্বন্ধে নিষেধ বাক্য আছে। প্রথমতঃ মনু বলেন "ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিৎ ন চ সংস্কার মর্হতি।"

তাহার পর অন্য স্মৃতি বাক্য আছে যথা—"অথাস্য বেদমুপশৃণ্বত স্ত্রপুজতুভ্যাং শ্রোত্র প্রতিপূরণম্" বেদ শ্রবণকারী শূদ্রের কর্ণে সীসক ও জতু ভরিয়া দিবে।

"পদ্ব্যহবা এতৎ শ্মশানং যচ্ছূদ্রস্তস্মাৎ শূদ্রসমীপে নাধ্যেতব্যম্।"

শূদ্র শ্মশান তুল্য। এ জন্য শূদ্রের নিকট বেদধ্যয়ন করিবে না।

বেদোশ্চারণে জিহ্বাচ্ছেদ এবং বেদধ্যয়ণে শরীর ভেদও স্মৃতিতে শূদ্রের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। "ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ," "দ্বিজাতীনাধ্যয়নমিজ্যা দানম্"। এইরূপ বাক্যে বৈদিক ও বৈদিক কর্ম্ম দুইই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে।

এইরূপে নিজের ভাষ্যদ্বারা সঙ্করাচার্য্য ব্যাস সূত্রের অর্থ সুস্পষ্ট রূপে ব্যাখা করিলেন। শূদ্রের বেদাধ্যয়ন নিষেধের প্রমাণগুলি যত্নের সহিত স গ্রহ করিলেন কিন্তু জগতের শিক্ষাগুরু, পরম কারুণিক গৌতম বুদ্ধের দ্বিতীয় মূর্ত্তি শঙ্কর, ভেদজ্ঞান রহিত চিদানন্দরূপ শঙ্কর, শূদ্রের অনধিকারে ব্যথিত হৃদয় হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

"যেষাং পুনঃ পূর্ব্বকৃত সংস্কার বসাৎ বিদূর ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতীনাং জ্ঞানোৎপত্তি স্তেষাং ন সক্যতে ফলপ্রাপ্তিঃ প্রতিবন্ধুং জ্ঞানস্যৈকান্তিক ফলত্বাৎ।"

কিন্তু যে সকল শূদ্রের বিদুর, ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতির ন্যায় পূর্ব্ব জন্ম কৃত সংস্কার বশতঃ জ্ঞানোৎপত্তি হইয়াছে, তাহাদিগের ফলপ্রাপ্তি কে প্রতিরোধ করিতে পারে? কারণ জ্ঞানের ফল ঐকান্তিক। জ্ঞানের ফল কিছুতেই প্রতিহত হয় না। জ্ঞান অজ্ঞানের বিরোধী। শূদ্রের যদি জ্ঞান হয়, তবে কি তারা অজ্ঞান থাকে?

"শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্" ইতি চেতিহাস পুরাণাধিগমে চাতুর্বর্ণ্যাধিকার স্মরণাৎ।

ইতিহাস পুরাণ দ্বারা যে জ্ঞানের অধিগম হয়, সে জ্ঞানে চারি বর্ণেরই অধিকার আছে। স্বয়ং ব্যাসদেবই মহাভারতে বলিয়াছেন, "শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্।"

বেদ পূর্বকস্তু নাস্ত্যধিকারঃ শূদ্রাণামিতি স্থিতম্।

তবে বেদের কর্ম্মকাণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া, বৈদিক যজ্ঞদ্বারা দেবতাদের অনুগ্রহ লাভ করিয়া, মন্ত্রবর্ণ দ্বারা অগ্নিদেবকে দূত করিয়া সকল দেবকে হব্য দান করিয়া, সংস্কার ও আশ্রমের পথে পথিক হইয়া ঐ পথ লব্ধ জ্ঞানে শূদ্রের অধিকার নাই।

এখন সে সংস্কারও নাই, সে বৈদিক মার্গও নাই। এখন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কেবল মাত্র নামে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

ভাগবত পুরাণে এই জন্য লিখিত হইয়াছে, যে কলিকালে জাতিগত আচার ধর্ম্ম নাই, গুণগত আচার ধর্ম্ম। যদি কোন শূদ্রের স্বভাবগত ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে তাহার ব্রাহ্মণের কার্য্যে অধিকার হয়।

যে কালে শারীরক সূত্র লিখিত হইয়াছিল, সে কালে যাহার পাপ পুণ্যের জ্ঞান ছিল, সে সংস্কার দ্বারা বৈদিক জ্ঞান লাভ করিতে পারিত। সে কালে শূদ্রের পাপ পুণ্যের জ্ঞান ছিল না। তাহার সংস্কার অসম্ভব ছিল। যেমন পশুর পাপ পুণ্যের জ্ঞান নাই। তাহার সংস্কার অসম্ভব। সেইরূপ মনুষ্য-পশুকে ( Animal man ) চেষ্টা দ্বারা সংস্কৃত করিতে পারা যায় না। পুনঃ পুনঃ জন্ম লাভ দ্বারা, দুঃখ ও যাতনার কষাঘাত দ্বারা ক্রমশঃ মনুষ্য-পশুর পাপ পুণ্যের জ্ঞান হয়। তখন তাহার বর্ণাশ্রম নিয়ত দেশে দ্বিজাতিকুলে জন্ম হয়। তখন তাহার বৈদিক সংস্কার হয়। এবং সে বৈদিক কর্ম্ম দ্বারা ক্রমশঃ বৈদিক জ্ঞান লাভ করিতে পারে।

যে কালে ভগবান্ বৈবস্বত মনু মানব ধর্ম্ম নির্ণয় করিয়াছিলেন, সেকালে মনুষ্য-পশুকে শূদ্র বলিত। “ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিৎ”। সেইরূপ সিংহ ব্যাঘ্রেরও কোন রূপ পাপ নাই। যেরূপ সিংহ ব্যাঘ্রের পাতক নাই, সেইরূপ মনুষ্য-পশু শূদ্রেরও পাতক নাই। কারণ উভয়ই হিতাহিত জ্ঞান শূন্য।

*কিন্তু যখন শূদ্রের হিতাহিত জ্ঞান হয়, তখন কি শূদ্র থাকে। তখন* কি তাহার ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা হইতে পারে না? যদি কেহ পূর্ব্বজন্মে সংস্কার সম্পন্ন হইয়াও পরজন্মে শূদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করে, সেও কি জ্ঞানলাভ সম্বন্ধে শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হইবে? বিদুরের জ্ঞান কি ব্যাসের জ্ঞান হইতে নিকৃষ্ট হইবে? শঙ্করাচার্য্য বলেন বিদুরাদির ন্যায় সংস্কারসম্পন্ন লোক বৈদিক জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন এবং হিতাহিত জ্ঞানসম্পন্ন শূদ্র ইতিহাস পুরাণাদি দ্বারা জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইবেন। ব্যাসদেবও চতুর্বর্ণের জন্য মহাভারত ও পুরাণ সঙ্কলন করাইয়াছিলেন।

মন্ত্র বর্ণের জন্য এত মারামারি কেন? মন্ত্রব্যক্তির অধিকার অতি সাবধান-

তার সহিত দিতে হয়। মন্ত্রবাক্তির ব্যভিচার আছে। মান্ত্রবর্ণিক বেদে সংস্কারসম্পন্ন দ্বিজাতিরই অধিকার।

কিন্তু যখন সংস্কার লুপ্ত হইতে চলিল, তখন মান্ত্রবর্ণিক বৈদিক ক্রিয়াও অন্তর্হিত হইল, দেবগণও মনুষ্যের পরোক্ষ হইলেন।

এখন সেইদিন। এখন আর বৈদিক যজ্ঞও নাই। বৈদিক সংস্কারও নাই। উপনয়ন এখন নাম মাত্র। এখন আর গুরুকুলও নাই। গুরুকুলে বাসও নাই।

যে বেদে শূদ্রের অনধিকার, স বেদে আজকার জাত্যভিমানী ব্রাহ্মণেরও অনধিকার।

যে মান্ত্রবর্ণিক বেদ লুপ্ত হইয়াছে, তাহা বালক আর্য্যের সোপান স্বরূপ ছিল, আর্য্য বালককে কোলে পিঠে করিবার জন্য দেবতাদিগের অস্ত্র ছিল। সে বেদের আজ প্রয়োজন নাই। সে বেদের যে অবশেষ আছে, তাহা মোক্ষমূলরও নিরাপদে ঘাঁটিতে পারেন এবং যে কোন শূদ্রও তাহাকে প্রত্নতত্ত্ব জ্ঞানে ভিত্তি করিতে পারে।

রাজগৃহে জরাসন্ধের স্বর্ণ ভাণ্ডারে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া কেহ কিছু করিতে পারিবে না। প্রবেশদ্বার রহিত বেদভাণ্ডারের বহির্দেশে দণ্ডায়মান হইয়া কেহ কোন তথ্য জানিতে পারিবেন না। ঔপনিষদ জ্ঞান প্রকট আছে। ইতিহাস, পুরাণের সহায়তায় দ্বিজ শূদ্র সকলেই সে জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে। মান্ত্রবর্ণিক বেদের সোপান সে জ্ঞানলাভের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় নহে।

ব্যাসের সূত্র ও শঙ্করের ভাষ্য লইয়া শূদ্রের অনধিকার প্রসঙ্গ বিচার করা হইল। রামানুজাচার্য্যেরও এই অবকাশে মায়াবাদী শঙ্করকে কটাক্ষ করিবার সুযোগ হইল।

শ্রীভাষ্যকার বলেন, ব্যাসদেব যাহা বলেন বলুন, মায়াবাদী শঙ্কর কিরূপে বলেন শূদ্রের বেদে অধিকার নাই?

যে তু নির্বিশেষচিন্মাত্রং ব্রহ্মৈব পরমার্থঃ, অন্যৎ সর্ব্বং মিথ্যা তৎ, বন্ধশ্চ অপার মার্থিকঃ, ... ব্রহ্মজ্ঞানে শূদ্রাদেরনধিকারো বক্তুং ন বাক্যতে। অনুপনীতস্য অনধীতবেদস্য অশ্রুতবেদান্তবাক্যস্যাপি যস্মাৎ

কস্মাচ্চিদপি বাক্যাৎ বস্তুযাথাত্ম্যজ্ঞানোৎপত্তেস্তাবতৈব বন্ধনিবৃত্তেশ্চ নচ তত্ত্বমস্যাদি বাক্যেনৈব জ্ঞানোৎপত্তিঃ কার্য্যা ন বাক্যান্তরেণেতি নিয়ন্তুং সক্যং জ্ঞানস্য অপুরুষতন্ত্রত্বাৎ, সত্যাং সামগ্র্যাং অনিচ্ছতোঽপি জ্ঞানোৎপত্তেঃ, নচ বেদবাক্যাদেব বস্তু যাথাত্ম্যজ্ঞানে সতি বন্ধনিবৃত্তির্ভবতীতি বক্তুং সক্যং যেন কেনাপি বস্তু মাহাত্ম্য জ্ঞানে সতি ভ্রান্তিনিবৃত্তেঃ।

যাঁহারা বলেন নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মই পরমার্থ, আর সব মিথ্যাভূত, সংসার বন্ধনও অপারমার্থিক, তাঁহারা কিরূপে বলিতে পারেন যে ব্রহ্মজ্ঞানে শূদ্রের অধিকার নাই। অনুপনীত, অনধীতবেদ, অশ্রুতবেদান্তবাক্য ব্যক্তিও যে কোন প্রকারে, যে কোন বাক্যদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে তাহার বন্ধনিবৃত্তি হয়। তত্ত্বমস্যাদি বাক্য দ্বারাই যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে, তাহা নহে। যে কোন প্রকারে বস্তু মাহাত্ম্য জ্ঞান হইলেই ভ্রান্তি নিবৃত্তি হয়।

এই অদ্বৈত বস্তুজ্ঞানে ব্রাহ্মণেরও যেমন অধিকার শূদ্রেরও সেইরূপ অধিকার। তবে গরীব উপনিষদ্ একেবারে ব্যর্থ হইয়া গেল।

শূদ্রাদীনামেব ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারঃ সুশোভনঃ, অনেনৈব ন্যায়েন ব্রাহ্মণাদীনামপি ব্রহ্মবেদনসিদ্ধেঃ উপনিষচ্চ তপস্বিনী দত্তজলাঞ্জলিঃ স্যাৎ।

এইজন্য রামানুজ বলেন, মায়াবাদ মিথ্যা। শূদ্রের অনধিকারই সত্য।

আমি বলি মায়াবাদ সত্য হউক মিথ্যা হউক, শূদ্রের অনধিকার প্রসঙ্গ এ সম্বন্ধে অপ্রাসঙ্গিক।

এ বিষয়ে কোন সাধারণ নিয়ম চলে না। বিদুরের অধিকার রামানুজকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে।

বিদুরাদয়স্তু ভবান্তরাধিগতজ্ঞানা প্রক্ষেষাৎ জ্ঞানবন্তঃ প্রারব্ধকর্ম্মবশচ্চেদৃশ-জন্মযোগিন ইতি তেষাং ব্রহ্মনিষ্ঠত্বম্।

যে কোন কারণে হউক বিদুরাদি শূদ্র যদি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইতে পারে, তাহা হইলে অন্য শূদ্রেও হইতে পারে। জাতিগত অব্যর্থ বাধা নাই।

মধ্বাচার্য্য বলেন স্ত্রীলোকের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে। অনধিকার ত কেবল সংস্কারের অভাব লইয়া। স্ত্রীলোকের বিবাহই সংস্কার। স্মৃতি শাস্ত্রে বলে, যেমন মনুষ্যের পক্ষে উপনয়ন, সেইরূপ স্ত্রীলোকের পক্ষে বিবাহ।

দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ মনুরও রাজত্ব নাই, মনুর বংশোদ্ভূত রাজাগণও লুপ্ত হইয়াছেন। তাই ব্যাসের সূত্র লইয়া আজ এত মারামারি।

চৈতন্যদেবের জ্ঞান কৃষ্ণমূলক। শ্রীকৃষ্ণ বেদের অতীত। সে জ্ঞানে ব্রাহ্মণ, শূদ্র নাই। তিনি কেবল লোক সংগ্রহের জন্য, ধর্ম্মের সেতু রক্ষার জন্য, বর্ণাশ্রমের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেন। ভক্তিমিশ্রিত ভাগবত জ্ঞানে তিনি সকলকেই অধিকার দিয়াছিলেন।

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

---

# আমি ও আমার দেহ।

## মনোময় কোষ।

### ভুবর্লোক। কামময় দেহ।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর। )

কামময় দেহের সংস্কার সাধন করিতে হইলে উচ্চ চিন্তায় অভ্যস্ত হওয়া প্রয়োজন, একথা গতবারে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, সদুপদেশ শ্রবণ, সৎকথার আলোচনা, সৎসঙ্গে বাস, সৎকর্ম্মে যোগদান প্রভৃতি অভ্যাসের নানা উপায় আছে। ইহাদের মধ্যে প্রত্যেক উপায়েই কিছু না কিছু ফললাভ হইয়া থাকে, তবে যত অধিক উপায় অবলম্বন করা যায় ততই ভাল। একবার অভ্যাস করিতে আরম্ভ করুন, দেখিবেন ফল অনেকটা হাতে হাতে পাইবেন। দেখিবেন ক্রমেই যেন এক নূতন জগৎ ধীরে ধীরে আপনার চক্ষুর সম্মুখে খুলিয়া যাইতেছে—দিন দিন কত অননুভূতপূর্ব্ব তরঙ্গ চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া আপনার প্রাণ মাতাইয়া তুলিতেছে—আপনার হৃদয় এক অপূর্ব্ব আনন্দে ভরিয়া যাইতেছে! শিশুগণ যখন প্রথম ক, খ, শিখিতে আরম্ভ করে তখন তাহাদের কিছু কষ্ট হয় বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে তাহারা শিক্ষাজনিত আনন্দও উপভোগ করিয়া থাকে। তাহার পর যখন তাহারা বর্ণমালা শিক্ষা শেষ করিয়া গ্রন্থপাঠে অগ্রসর হয় এবং সাহিত্য-বিজ্ঞান-জগতে নিত্য নূতন রসের আস্বাদনে প্রবৃত্ত হয় তখন তাহাদের যে আনন্দ

হয় তাহা মূর্খকে বুঝান দুষ্কর। স্মরণ থাকে যেন ভূর্লোকে আমর যতই উন্নতি করিয়া থাকি না কেন, ভুবর্লোকে এখনও আমরা অনেকেই নিতান্ত শিশু, সেখানকার জ্ঞান আয়ত্ত করিতে হইলে এখন ও আমাদিগকে অনেকদিন গুরুমহাশয়ের দাগ বুলাইতে হইবে; প্রথমে হাত কাঁপিবে বটে কিন্তু একটু ধৈর্য্য ধরিয়া বুলাইতে বুলাইতে হাত “পেট” হইয়া যাইবে, তখন অন্যমনস্কভাবে লিখিলেও ঠিক লেখা হইয়া উঠিবে। এই বর্ণ পরিচয়ের সময় যিনি কষ্ট স্বীকার করেন তাঁহার বোধোদয় হইতে বিলম্ব হয় না, শীঘ্রই তিনি সূক্ষ্ম জগতের আখ্যানমঞ্জরী পাঠে অধিকারী হইয়া অতুল তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন।

এইবার আমরা ভুবর্লোকে কামময় দেহ কিরূপ ভাবে কার্য্য করিয়া থাকে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

আমাদের জাগ্রত অবস্থায় আমাদের কামময় দেহ যেরূপ ভাবে অবস্থিত থাকে, আমাদের নিদ্রিত অবস্থায় সেরূপ ভাবে থাকে না। জাগ্রত অবস্থায় কামময় দেহ আমাদের স্থূল দেহের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে, সুতরাং কামময় দেহে যে সকল তরঙ্গ উঠে তাহা স্থূল দেহের অভ্যন্তরে এবং তাহার অব্যবহিত বহির্ভাগে ছটার ন্যায় প্রকাশ পায়। কিন্তু যে সময় আমরা নিদ্রিত হই, সে সময় স্থূল-দেহ শয্যায় পড়িয়া থাকে আর কামময় দেহ অপর সূক্ষ্মতর দেহগুলির সহিত বাহির হইয়া আইসে। কামময় দেহ এইরূপে শৃঙ্খলমুক্ত হইয়া ভুবর্লোকে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারে, কিন্তু যে দেহ এখন ও ভাল করিয়া গঠিত হয় নাই তাহা স্থূল দেহ ছাড়িয়া অধিক দূরে যাইতে পারে না, তাহার উপরেই শূন্যে ভাসিতে থাকে। বলা বাহুল্য এরূপ অসম্পূর্ণ যন্ত্রের সাহায্যে ভুবর্লোকের বিশেষ কোন জ্ঞান সঞ্চয় করিতে পারা যায় না। যাহার এরূপ দেহ সে নিদ্রার সময় বাহ্যিকই একরূপ অচেতন থাকে, এ অবস্থায় ভুবর্লোক হইতে তরঙ্গ সমূহ আসিয়া তাহার দেহে আঘাত করিলেও তাহাতে কোন পরিস্ফুট সংজ্ঞা উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না। সদ্যঃপ্রসূত শিশু যেমন মাতৃগর্ভ হইতে মুক্ত হইলেও পরিপুষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অভাবে স্বাধীনভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে পারে না, মাতৃক্রোড় আশ্রয় করিয়া থাকিতে বাধ্য হয়, —অসম্পূর্ণরূপে গঠিত কামময় দেহও সেইরূপ স্থূল দেহ হইতে বিচ্যুত হইয়া স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিতে পারে না, বাহিরে আসিয়াও তাহার কাছে কাছে থাকে। এ সময় যদি

এমন কোন ঘটনা ঘটে যাহাতে উভয়েব মধ্যে ব্যবধান কিছু অধিক হইবার সম্ভাবনা হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ স্থূল-দেহ জাগিয়া উঠে আর কামময় দেহ ছুটিয়া গিয়া তাহাব ভিতব প্রবেশ কবে। কিন্তু যে কামময় দেহ সুগঠিত হইয়াছে তাহাকে এরূপ ভাবে স্থূল-দেহের অঞ্চল ধবিয়া থাকিতে হয় না। এরূপ দেহধাবী নিদ্রাকালে বেশ সচেতন থাকেন। বলিতে কি, জাগ্রত অবস্থাতে তাঁহাব এত অধিক চেতনা থাকে না,—এ সময় তাঁহাব বুঝিবার শক্তি ও কার্য্য কবিবাব শক্তি যেন সহস্রগুণে বৃদ্ধি পায়। তিনি এক্ষণে ইচ্ছা কবিলে বিদ্যুদ্‌বেগে শত শত ক্রোশ পবিভ্রমণ কবিয়া আসিতে পারেন, অথচ তন্নিবন্ধন তাঁহাব শয্যাস্থিত স্থূল-দেহেব কোন ক্ষতি হয় না।

কিন্তু সুধু জ্ঞান সঞ্চয় কবিলেই হইবে না, তাহা কার্য্যকাবী হওয়া চাই। কামময় দেহ ভুবর্লোক হইতে নানাবিধ জ্ঞান সঞ্চয় কবিয়া আসিয়া যদি তাহা স্থূল-দেহকে না দিতে পাবে তাহা হইলে ইহলোকে সে জ্ঞানে আমাদেব উপকাব কি? মানিলাম আমাব কামময় দেহ আমাব নিদ্রিত অবস্থায় সমগ্র ভুবর্লোক পর্য্যটন কবিয়া লক্ষ লক্ষ অপূর্ব্ব তথ্য সংগ্রহ কবিয়া আনিল, কিন্তু আমাব স্থূল মস্তিষ্ক যদি তাহাব কিছুই জানিতে না পাবে তাহা হইলে আমাব জাগ্রত অবস্থায় তাহা দ্বারা কোন ফল লাভ হয় না। আমি ঘুমাইবাব পূর্ব্বে যেরূপ বিজ্ঞ ছিলাম, ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিবার পবও সেইরূপ বিজ্ঞ থাকিব। সুতবাং কামময় দেহ কর্ত্তৃক সঞ্চিত জ্ঞানকে জাগ্রত অবস্থায় কার্য্যকাবী কবিতে হইলে, কামময় দেহ হইতে স্থূল-দেহে যাহাতে জ্ঞান স্বচ্ছন্দে আসিতে পাবে তাহাব জন্য একটা সেতু নির্ম্মাণ কবা আবশ্যক হয়।

এই সেতু ধীবে ধীবে নির্ম্মিত হয়। সাধনাব পথে অগ্রসব হইতে হইতেই ইহাব ক্রমবিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। সময়ে সময়ে ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বোধ হয় যেন কিছু দেখিয়াছি, কিন্তু সে যে কি তাহা মনে আনিতে পাবা যায় না। আবাব হয়ত এমনও ঘটে যে কামময় দেহ স্থূল-দেহে প্রবেশ কবিবাব সময় তাহার উপর নিজেব অভিজ্ঞতা ক্ষণেকেব জন্য মুদ্রিত কবিয়া দেয়, আমাদেব ঘুম ভাঙ্গিবার পরও সে কথা বেশ মনে পড়ে, কিন্তু পবক্ষণেই তাহাব স্মৃতি অন্তর্হিত হইয়া যায়। তাহার পর সহস্র চেষ্টা কবিয়াও তাহা স্মরণ-পথে আনা যায় না, ববং যত চেষ্টা করা যায় স্থূল মস্তিষ্কেব স্থূল তরঙ্গের তাড়নে তাহা আরও দূরে চলিয়া যায়।

আবার কখন কখন আমাদের মনে হয় যেন আমাদের ভিতর কোথা হইতে এক নূতন জ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছে, আমাদের বোধশক্তি যেন সহসা প্রখরতর হইয়া উঠিয়াছে, পূর্ব্বে যে প্রশ্নের মীমাংসা সহস্র চেষ্টা করিয়াও হয় নাই, আজ বিনা আয়াসে তাহার সমাধান হইয়া যাইতেছে,—অথচ এ নবোদ্ভূত শক্তি কেমন করিয়া কোথা হইতে আসিল, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এরূপ অবস্থা বড়ই আশাপ্রদ, এরূপ অবস্থা হইলে বুঝিতে হইবে যে কামময় দেহ যে শুধু সুগঠিত হইয়া ভুবর্লোকে কার্য্য করিতেছে তাহা নহে, অধিকন্তু তাহার সহিত স্থূল-দেহের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হইয়া আসিতেছে।

অধিকাংশ চিন্তাশীল ব্যক্তিই মাঝে মাঝে বেশ সুসঙ্গত সুস্পষ্ট "সত্য" স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন। জাগ্রত অবস্থাতেও সে সকল স্বপ্নের কথা তাঁহাদের বেশ মনে থাকে এবং সময়ে সময়ে সে সকলের দ্বারা তাঁহাদের সাংসারিক ব্যাপারে অনেক উপকার হইয়া থাকে। সাধারণতঃ আমরা যেরূপ স্বপ্ন দেখিয়া থাকি এই সকল স্বপ্ন সে প্রকৃতির নহে, উভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। বস্তুতঃ স্বপ্ন নানা কারণে উৎপন্ন হয়। কোন স্বপ্ন অজীর্ণতা প্রভৃতি দোষে স্থূল মস্তিষ্কের স্পন্দনের ফলে হইয়া থাকে, আবার কোন স্বপ্ন জাগ্রত অবস্থায় কামময় দেহে যে তরঙ্গ সৃষ্ট হইয়াছে তাহারাই পুনরাবৃত্তির ফলে হয়। বলা বাহুল্য এ উভয়বিধ স্বপ্নই অসার ও দুর্ব্বলতা-পরিচায়ক। কিন্তু উপরে যে "সত্য" স্বপ্নের কথা বলিলাম তাহার উৎপত্তি ভিন্ন প্রকারে হইয়া থাকে।* এ ক্ষেত্রে কামময় দেহ ভুবর্লোকের নানা স্থান হইতে যে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিয়া আনে তাহাই স্বপ্নরূপে প্রকাশ পায়। যাঁহাদের কামময় দেহ কার্য্যক্ষম হইয়াছে, তাঁহারা এরূপ স্বপ্ন নিত্য দেখিয়া থাকেন,—তবে যেগুলি তাঁহাদের স্থূলমস্তিষ্কে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া যায় কেবল সেইগুলির কথাই তাঁহাদের জাগ্রত অবস্থায় স্মরণ থাকে। যাঁহারা এরূপ স্বপ্ন দর্শন করেন এবং জাগ্রত অবস্থায় তাহা স্মরণ করিয়া রাখিতে পারেন, তাঁহাদের কামময় দেহ যে অনেকটা উন্নত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু স্মরণ না থাকিলেও হতাশ হইবার প্রয়োজন নাই। এমন অনেকে আছেন যাঁহারা প্রত্যহ নিদ্রিত অবস্থায় ভুবর্লোকে নানা সৎ ও প্রয়োজনীয় কার্য্যে

---

* স্বপ্ন আরও নানাবিধভাবে উৎপন্ন হইতে পারে। প্রবন্ধান্তরে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।—প্রঃ লেঃ।

লিপ্ত থাকেন, অথচ জাগ্রত অবস্থায় সে সকল কার্য্যের কথা একেবারেই ভুলিয়া যান। কিন্তু এরূপ বিস্মৃতি সত্ত্বেও তাঁহারা আধ্যাত্মিক জীবনের পথে দিন দিন অগ্রসর হন এবং পবিত্র জ্ঞানালোক আসিয়া যে তাঁহাদের হৃদয়স্থিত অন্ধকার ক্রমে ক্রমে দূরীভূত করিয়া দিতেছে তাহা তাঁহারা অন্তরে অন্তরে অনুভব করেন। ইহা স্থির নিশ্চয় যে, আমরা পরহিত-ব্রতে যত বেশী জীবন ঢালিয়া দি—সর্ব্ব-ভূতের জন্য যত বেশী আত্মোৎসর্গ করিতে শিখি—বিশ্বপ্রাণ-মহাপুরুষগণ-প্রদর্শিত পথে যত বেশী বিচরণ করিতে অভ্যাস করি—আমাদের কামময় দেহ ততই উন্নত হইতে থাকে। এ উন্নতির জন্য স্থূল শরীরে তাহার স্মৃতির অস্তিত্বের কোন আবশ্যকতা নাই।

( ক্রমশঃ )

শ্রীমন্মথমোহন বসু।

---

# প্রাচ্য-প্রতীচ্য।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

পাশ্চাত্য সভ্যতার বিলাস বৈভব, উহার প্রাকৃতিক শক্তি নিচয়ের উপর পূর্ণাধিপত্য, এবং উহার বহুল ও বহুবিধ সাধনোপকরণাদি সন্দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া নব্য ভারতবাসীগণ সময়ে সময়ে একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়েন, এবং তাঁহাদের নিজের যাবতীয় আদর্শ বর্জ্জন করিয়া অন্তরে বাহিরে পূর্ণ পাশ্চাত্য ভাব অবলম্বন করিতে সচেষ্ট হন। এই গেল আতিশয্যের এক প্রান্ত।

অপর ভারতবাসীগণ পাশ্চাত্য জগৎ অপেক্ষা প্রাচ্য জগতের উৎকর্ষ এত অধিকতর বলিয়া বিবেচনা করেন যে পাশ্চাত্য জগৎ প্রাচ্য জগতকে কোন বিষয়েরই শিক্ষা দিতে পারগ নহে। তাঁহাদের ঐ দুই জগতের কোনটীর সম্বন্ধেও কোন জ্ঞান না থাকাতে তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্ব গৌরব ও বিগত বৈভবের স্মৃতিমাত্র লইয়া বড়াই করেন এবং পাশ্চাত্য কার্য্যশৃঙ্খলা ও অনু-সন্ধানাদির প্রতি তরুণবয়সসুলভ অবজ্ঞার সহিত দৃষ্টিপাত করেন। এই হইল আতিশয্যের অপর প্রান্ত।

এরূপ অবস্থায়, এবং অন্য সর্ব্বত্রই, একটী মধ্যবর্ত্তী সুষ্ঠুপন্থা অবলম্বন করাই আমাদের আবশ্যক; আমাদের সেই পরিণাম দৃষ্টির আবশ্যক যৎ-সহকারে আমরা, আমাদের বিগত গৌরবের যথেষ্ট সমাদর করিলেও, বর্ত্তমান হইতেও শিক্ষা গ্রহণেচ্ছু হইতে পারি; যৎসহকারে আমরা, প্রধানতঃ প্রাচ্যই থাকিয়া পাশ্চাত্য চিন্তা ও চরিত্রের সারাংশ সকল স্বীয় প্রকৃতিভুক্ত করিয়া লইতে পারি; যৎসহকারে আমরা, স্বজাতীয়ত্ব মর্য্যাদা অব্যাহত রাখিয়া অন্যান্য জাতীয়ত্বে যাহা কিছু মূল্যবান আছে তাহা সংগ্রহ করিতে এবং অন্যান্য স্থান হইতে আনীত স্বর্ণ ও রজত সূত্র সমূহ নিজ প্রাচ্য দেশীয় শিল্পজবস্ত্রে সন্নিবেশিত করিতে পারি।

এজন্য, পাশ্চাত্য আদর্শসমূহের যে হৃদয়গ্রাহী ভাব পাশ্চাত্য নয়নে প্রতিভাত হইয়া থাকে, উহাদের যে ভাব পাশ্চাত্য জগৎকে অনুপ্রাণিত করে, আমরা ও উহাদিগকে সেই ভাবে দেখিতে অবশ্য চেষ্টা করিব। তোমাদের পক্ষে একটী অসুবিধা এই যে তোমরা এখানে ইংরাজকে তাহার সর্ব্বোত্তম ভাবে না দেখিয়া অধিকাংশ সময়েই তাহাকে কেবল তাহার অধমতম ভাবেই দেখ। ভারতবাসীগণ ইংলণ্ডে গমন করিয়া তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে পর ইংরাজচরিত সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত অনেক ন্যায়সঙ্গত ও শিষ্টতর মত প্রকাশ করেন। উঁহারা তথায় ইংরাজদিগকে আতিথেয়, সৌজন্যশীল, অনুকূল ও সন্তোষপ্রদ দেখিতে পান, তথায় উহাদিগকে কর্ম্মচারীত্বের কঠিন আবরণে আচ্ছাদিত না দেখিয়া উহাদিগকে স্বরূপে দেখেন। এখানে কর্ম্মক্ষেত্রের সম্বন্ধ ও শাসিতা শাসিতের ভাব এক পক্ষকে অপর পক্ষের সুগুণগ্রামের প্রতি অন্ধদৃষ্টি করে ও অকপট প্রতীতির প্রতিবন্ধ উৎপাদন করে। এক পক্ষ অপর পক্ষের কেবল বহিরাবরণটী মাত্র দেখিতে পায়, কেবল মাত্র উপরিভাগ, কিন্তু অন্তর নহে। দ্রুতভাষী, কর্ম্মতৎপর ও প্রায়ই ধৃষ্টাচারী ইংরাজকে ভারতবাসী যথেচ্ছাচারী, রূক্ষ ও অত্যাচারী বলিয়া বিবেচনা করেন। চিরন্তন অভ্যাস বশতঃ বিনীতাচারী, ধীরভাষী, মতভেদ স্থলে স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ না করিয়া সঙ্কেত মাত্র দ্বারা উহা জ্ঞাপনকারী ভারত-বাসীকে ইংরাজ ভীরু ও কপট বলিয়া বিবেচনা করেন; তাঁহার সৌজন্য নীচতা ও বাক্যমাধুর্য্য প্রতারণা বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। উভয়েই

কেবল উপরিভাগ মাত্র দেখেন, অন্তর্ভেদ করিয়া নিম্নে দৃষ্টি করেন না; একের সৌহার্দ্দ বিবর্হিত ব্যবহারের ও অপরের সুন্দর শিষ্টাচারের নিম্নে প্রচ্ছন্ন শ্রেষ্ঠ গুণরাজী লক্ষিত বা অনুভূত হয় না, এবং দুইপক্ষ, মধ্যস্থিত সুদীর্ঘব্যবধানবিভক্ত হইয়া, পরস্পর পার্শ্ববর্ত্তীভাবে বাস করে। সাধারণ সাম্রাজ্যের সেবায় ভবিষ্যতে ইংরাজদিগের সহিত যাহাদের একত্রে কর্ম্ম করিতে হইবে, সেই তোমাদিগের জন্য উক্ত সুদীর্ঘ ব্যবধান সংযোজনার্থে আমি আনন্দসহকারে একটী সেতুবন্ধ নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছুক আছি।

প্রাগুক্ত আদর্শাবলী অধ্যয়ন করিবার পূর্ব্বে, আদর্শ শব্দ দ্বারা কি বুঝায় তাহা আমরা বিশদরূপে দেখিব। প্রারম্ভে, ইহা জানিতে হইবে যে আদর্শ একটী মানসিক প্রতিকৃতি এবং মানসিক প্রতিকৃতি একটী ভাবনা মাত্র। কিন্তু আদর্শ ভাবনা হইতে আরও কিছু অধিক,—ইহা একটী সন্নিবদ্ধ ভাবনা, একটী স্থিরীকৃত প্রতিকৃতি।

তোমাদের অধীত বিষয় সকল, তোমাদের ক্রীড়া সমূহ, তোমাদের অধ্যাপকগণ, তোমাদের সহপাঠীবৃন্দ ইত্যাদি সম্বন্ধীয় যে সকল সাধারণ দৈনন্দিন চিন্তা তোমাদের মনোমধ্যে গমনাগমন করিতেছে সে সকল ইতস্ততঃ ভাসমান ও পরিবর্ত্তনশীল ভাবনা আদর্শ নহে। ঐ চিন্তা সমূহ আসিতেছে এবং যাইতেছে, কিন্তু আদর্শ একটী সংলগ্ন মানসিক প্রতিকৃতি যাহা মনোমন্দিরে সিংহাসনোপরি অধিষ্ঠিত। অধিকন্তু, এই স্থিতিশীল মানসিক প্রতিমূর্ত্তীর আদর্শপদবাচ্য হইবার পূর্ব্বে এরূপ একটী সামগ্রী হওয়া আবশ্যক যদ্দারা আমাদের আচরণাদি নিয়মিত হইতে পারে এবং যদ্দারা আমাদের জীবন সংগঠিত হইতে পারে, কারণ, মনুষ্য যে নিত্যবিদ্যমান ভাবনার অনুরূপ করিয়া আপন জীবন সংগঠিত করে সেই ভাবনাই তাহার আদর্শ। আমাদের মনে যে ভাবসমূহ নিরন্তর জাগরূক থাকে তাহাদেরই ভিতর দিয়া আমরা প্রত্যেক বস্তু সন্দর্শন করি। তোমাদের মধ্যে একজন এক খণ্ড নীল কাচ ও আর একজন এক খণ্ড সবুজ কাচ লইয়া যদি তাহাদের মধ্যদিয়া একটী শ্বেতবর্ণ প্রাচীরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে যেমন তোমাদের মধ্যে একজন ঐ প্রাচীরটীকে নীল ও অপর জন উহাকে সবুজ দেখিতে পাও, সেইরূপ আমরা সকলে আমাদের মনোমধ্যে নিত্য-

বিদ্যমান ভাবনারূপ রঞ্জিত কাচমধ্য দিয়া জগৎকে অবলোকন করি। এই কারণ বশতঃই সম্পূর্ণ সজ্জনগণ মধ্যেও সতত ভ্রমপ্রমাদ ঘটিয়া থাকে, কেন না তাহাদের প্রত্যেকে স্ব স্ব রঞ্জিত কাচ খণ্ডের মধ্য দিয়াই পদার্থজাত অবলোকন করে। আমাদের আদর্শ সকল সম্বন্ধে, যাহারা অন্যান্য সকল ভাবনা অপেক্ষা আমাদের মনোমধ্যে দৃঢ়তমরূপে সংলগ্ন, সেই আদর্শ সকল সম্বন্ধে এই প্রকার ব্যাপার প্রধানতঃ সত্য।

অধিকন্তু দেখ, আদর্শ কেবল একটী মাত্র নিত্যবিদ্যমান ভাবনা অপেক্ষা আরও বেশী, উহা সন্নিবদ্ধ ভাবনাসমূহের সমষ্টী, যাহারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া একটী মাত্র, অথচ মিশ্র, ধারণায় পরিণত হইয়াছে। এই ভাবনা সমবায়ই বিচিন্ত্যমান নিদর্শন সম্বন্ধে চিন্তাকারীর সাধ্যানুরূপ সর্ব্বোচ্চ ধারণা—চিন্তাকারী যে নিদর্শনের বিষয় চিন্তা করিতেছেন, ঐ আদর্শই তৎসম্বন্ধে তাঁহার সর্ব্বোত্তম ধারণা ও তন্মনপ্রসূত সম্পূর্ণাবয়ব প্রতিমূর্ত্তী। একটী সৈনিক পুরুষের আদর্শ দৃষ্টান্ত স্বরূপ লও এবং দেখ তুমি কিরূপে ইহার সংগঠন কর। কোন একটী নির্দ্দিষ্ট সৈনিক পুরুষ বর্ণনা করিতে গেলে তুমি তাহার উচ্চতা, তাহার বর্ণ, তাহার জাতি, সমরে তাহার সাহস, স্বদেশ প্রতি তাহার ভক্তি, তাহার সৈন্যাধ্যক্ষাদেশবশ্যতা, সমভিব্যাহারীদের প্রতি তাহার বিশ্বাস, তাহার কষ্টসহিষ্ণুতা, পরাভবে তাহার অটলতা, বিজয়ে তাহার শত্রুপ্রতি দয়া ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া থাক। এখন বল দেখি ইহার কতটা অংশ ঐ সৈনিকপুরুষাদর্শের অন্তর্গত? ঐ সৈনিক পুরুষের উচ্চতা, উহার বর্ণ ও উহার জাতি উহার আদর্শের অন্তর্ব্বর্ত্তী নহে, কারণ এ সমস্ত প্রত্যেক মনুষ্য কিম্বা প্রত্যেক দেশ ভেদে বিভিন্ন হইয়া থাকে, ইহারা ব্যভিচারী লক্ষণ মাত্র এবং ঐ আদর্শের সহিত ইহাদের কোনও সম্বন্ধ নাই। কিন্তু ঐ সৈনিক পুরুষ অবশ্য সাহসী, প্রভুভক্ত, আজ্ঞাবহ, বিশ্বস্ত, কষ্টসহিষ্ণু, অটল ও দয়াবান হইবে। এই গুণসমূহ আমাদের ঐ সৈনিকপুরুষের আদর্শে বর্ত্তমান আছে, এবং যে পরিমাণে কোন সৈনিক পুরুষে ঐ গুণরাশি প্রকাশ পায় সেই পরিমাণে ঐ সৈনিকপুরুষ আমাদের উক্ত আদর্শের অনুরূপ হন।

এই প্রকারে, একটী আদর্শ সংগঠন করিতে গেলে আমরা ব্যভিচারী লক্ষণগুলি মূলগত গুণগুলি হইতে পৃথক করি, এবং পূর্ব্বোক্ত গুলি বর্জ্জন

করিয়া কেবল মাত্র মূলগত গুণগুলি হইতেই আমাদের আদর্শের গঠন করি। এইরূপে দেখা গেল যে,যে সকল স্থায়ী ভাবনা দ্বারা কোন নিদর্শনের মানসিক প্রতিকৃতি সংগঠিত হয়, তাহাদের সমষ্টিই আদর্শ পদের অর্থ।

যে যে গুণ কোন নিদর্শনে মূলতঃ বিগুমান নাই সেই সেই গুণ ঐ নিদর্শনের উক্তরূপ মানসিক প্রতিকৃতিতেও কোন স্থান অধিকার করে না। পতি, ব্যবসায়ী, রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ, বিদ্বান ব্যক্তি প্রভৃতিতে যে যে ধর্ম্ম স্পষ্টতঃ বিগুমান আছে, তাহা লইয়া আমরা সৈনিক পুরুষের আদর্শ গঠন করি না। আদর্শ সৈনিক একজন কুপতি হইতে পারেন এবং তিনি ব্যবসা ও রাজনীতি অনভিজ্ঞ ও অনক্ষর হইতে পারেন। এই সকল বিষয়ে তাঁহার গুণাভাব তাঁহার সৈনিকত্ব অব্যাহত রাখিয়া দেয় এবং তৎকারণে ঐ সৈনিক আদর্শ ও স্পর্শ করে না। আদর্শ দ্বারা কেবল নিদর্শনের সম্পূর্ণত্ব সূচিত হইয়া থাকে এবং ঐ নিদর্শন যে যে বিষয়ের নিরপেক্ষ তাহা সমস্তই উপেক্ষিত হয়।

এক্ষণে দেখা যাউক যে ঐ আদর্শ কর্ত্তৃক আচরণাদি কিরূপে প্রবর্ত্তিত হওয়া কর্ত্তব্য সুবোধ বালক বা মনুষ্য মাত্রেই তাহার নিজের জন্য একটী আদর্শ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে; সে যাহার অনুরূপ হইতে চায় তাহা সে খুঁজিয়া লয় এবং প্রাপ্তব্য বস্তুস্বরূপ উহা তাহার সম্মুখে রাখিয়া দেয়। কাহার অনুরূপ সে হইতে চায় তাহা স্থির করতঃ সে ঐ নির্দ্দিষ্ট বাঞ্ছনীয় বস্তুর উৎকর্ষার্থে কি কি গুণ আবশ্যক তাহা অবগত হইতে সচেষ্ট হয়, এবং ঐ গুণগ্রাম হইতেই সে তাহার আদর্শের——তাহার অভীষ্ট বস্তুর পূর্ণাবয়ব নিদর্শনের——সংগঠন করিয়া লয়। অতঃপর সে ঐ গুণসমূহ নিজ প্রকৃতি-ভুক্ত করতঃ উহাদের উৎকর্ষ সাধনে প্রাণপণে চেষ্টা করে; সে উহাদের বিষয় প্রত্যহ চিন্তা করে এবং তাহার দৈনন্দিন সাধারণ কর্ম্মাদি অনুষ্ঠানে অহরহ উহাদের অভ্যাস করিতে যত্নবান হয়। এইরূপ সুস্পষ্ট দৃষ্টি তাহাকে অনেক উদ্যম অপব্যয় ও সময় অপচয় হইতে রক্ষা করে। যে ব্যক্তি আপন গন্তব্য পথ বিদিত থাকিয়া তাহা অবলম্বনে অবিচলিত ভাবে গমন করিতে থাকে, এবং যে ব্যক্তি গন্তব্য পথ অবিদিত থাকা হেতু প্রত্যেক উপমার্গ ও পার্শ্বপথ দিকে ধাবিত হয় ও বারম্বার প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ যাত্রা আরম্ভ করিতে

বাধ্য হয়, তাহাদের মধ্যে যতটুকু প্রভেদ তাহাই উক্তরূপ আদর্শ অবলম্বনে কার্য্যপ্রণালীর দ্বারা সূচিত হইয়া থাকে।

মনে কর তোমাদের একজন সৈনিক হইতে ইচ্ছা করে, এবং মনে কর যে সে প্রাগুক্তরূপ সৈনিক পুরুষের আদর্শ তাহার অনুকরণীয় প্রতিকৃতির স্বরূপ মনোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিল। প্রত্যহ প্রাতে সন্ধ্যাদি সমাপনান্তে, যে যে গুণসংযোগে তাহার ঐ আদর্শ সংগঠিত হইয়াছে, তাহাদের বিষয় চিন্তা করা এবং "আমি অদ্য এই গুণসমূহ প্রকটিত করিতে নিশ্চয় যত্নবান্ হইব" এইরূপ কৃতসংকল্প হওয়া তাহার কর্ত্তব্য। অবশ্যই তাহাকে সাহসী হইতে হইবে; বিদ্যালয়ে পাঠের সময় তাহার কোনও ভ্রম বা অপরাধ হইলে উহা লুকাইয়া রাখিতে চেষ্টা না করিয়া তাহাকে নির্ভীকচিত্তে উহা অবশ্যই জ্ঞাপিত করিতে হইবে; বিদ্যামন্দিরের সমর্থন ও উহা আক্রান্ত হইলে উহা রক্ষা করতঃ তাহাকে অবশ্যই প্রভুভক্ত ও আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতে হইবে, এবং সে অবশ্যই তাহার পিতামাতা ও শিক্ষকের বশতাপন্ন হইবে, তাহার সহপাঠীবর্গের সমক্ষে কথিত বাক্য তাহাকে বিশ্বস্ততার সহিত অবশ্যই পালন করিতে হইবে, এবং ভোগবিলাস ও আলস্য পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে সরলোপজীবী ও মিতব্যয়ী হইতে অবশ্যই অভ্যাস করিতে হইবে, ক্রীড়াস্থলে বা পাঠশ্রেণীতে পরাভূত হইলে তাহাকে অবশ্যই হৃষ্টচিত্ত ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ থাকিতে হইবে; জয়ী হইলে তাহাকে অবশ্যই বিনীত থাকিতে হইবে, এবং যাহারা তদপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ও অসহায় তাহাদিগের সংরক্ষণার্থে তাহাকে তাহার সামর্থ্য সর্ব্বসময়ে অবশ্যই প্রয়োগ করিতে হইবে। এইরূপে সে জন আদর্শসৈনিকোপযোগী গুণরাজী তাহার চরিত্রে গ্রথিত করিতে পারিবে এবং পরিণতবয়স্ক হইয়া তাহার স্বদেশস্থ সৈন্যদলমধ্যে সসম্ভ্রমে ও সগৌরবে কার্য্য করণার্থ প্রস্তুত হইতে পারিবে।

ক্রমশঃ

শ্রীসাধুসেবক।

# চণ্ডী-পাঠ।

আমাদিগের দেশে চণ্ডী-পাঠ বিশেষভাবে প্রচলিত ও আদরনীয়। চণ্ডী পাঠের মাহাত্ম্য-কথাও, আমরা অনেক শুনিয়াছি কিন্তু চণ্ডী-পাঠের ফল আমরা স্বচক্ষে বড একটা দেখি নাই। অনেকের বিশ্বাসের জন্য নিম্নে একটী সত্য ঘটনার অবতারণা করিতেছি।

চণ্ডীস্তোত্র ও তদন্তর্গত দুর্গাস্তোত্র নেপালেও খুব প্রচলিত। নেপালীদিগের মুখে চণ্ডীস্তোত্রগুলি যেরূপ সুন্দর লাগে, বাঙ্গালির মুখে সেরূপ সুন্দর আবৃত্তি প্রায় শুনি নাই।

যাহা হউক জেঠা মহাশয় চণ্ডীপাঠে খুব সিদ্ধ ছিলেন, তিনি পাঠ সমাপনান্তে যাহাকে যাহা বলিতেন, সকল তাহা ঠিক হইত, কেবলমাত্র চণ্ডী-পাঠ করিয়া তিনি অনেক দুঃসাধ্য রোগ আরোগ্য করিতেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে, আমাদের পাড়াতে একটী ভদ্রলোকের পেটের ভিতর ফোড়া হয়, তিনি প্রথমে মেডিক্যাল কলেজে গিয়া ডাক্তার চার্লস সাহেব ও বাবু সুরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে দেখান। তাঁহারা বলেন যে "অস্ত্র প্রয়োগ একান্ত আবশ্যক, ইহা কিছুতে সারিবে না, তবে অস্ত্র প্রয়োগের ফলাফল সম্বন্ধে পূর্ব্বে কিছু বলিতে পারিব না, ইহাতে সারিতেও পারেন না সারিতেও পারেন।"

ইহাতে ভীত হইয়া তিনি সম্প্রতি পরলোকগত সিমলার বিখ্যাত কবিরাজ গোপীমোহন রায় ও নেবুতলার এক কবিরাজের চিকিৎসাধীনে থাকেন। গোপী কবিরাজ মহাশয় স্পষ্ট বক্তা ছিলেন এবং রোগের উপশম সম্বন্ধে কোন আশাই দিতে পারিলেন না, অপরন্তু অন্য কবিরাজটী উজ্জ্বল ভাষায় আরোগ্য সম্বন্ধে অনেক আশাই দিতেন বলিয়া গোপী বাবুকে ছাড়িয়া এই দ্বিতীয় কবিরাজের চিকিৎসাধীনে থাকেন। ক্রমে বহু বটীকা, তৈল, অবলেহ, ও অরিষ্টের সহিত, অনেক ঔষধ ও অর্থের শ্রাদ্ধ করিবার পর, কবিরাজ মহাশয়ের ভবিষ্য উজ্জ্বল চিত্র, দিন দিন ম্লান হইতে রাগিল, ও জীবন প্রদীপের শেষ তৈলটুকু ফুরাইয়া আসিতে লাগিল, তখন আর তাঁহাকে কেবল আশ্বাস দিয়া রাখা সম্ভবপর নয় দেখিয়া তিনি একরূপ খোলা খুলি ভাবেই জবাব দিয়া ফেলিলেন।

এইরূপ অবস্থায় আমার পিতা তাঁহাকে স্কট টমসনের ডাক্তার ফেরিস সাহেবের কাছে লইয়া যান। ফেরিস সাহেব বলিলেন যে যখন চার্লস সাহেব বলেছিলেন তখন হয়ত রক্ষা হইলে হইতে পারিত, কিন্তু এখন আর কোন উপায় নাই।

পেটের ভিতর অনেকটা পচিয়া গেছে ও পুঁজে পূর্ণ হইয়াছে, এখন অস্ত্র প্রয়োগ করিলেই সমস্ত নাড়ী বাহির হইয়া আসিবে, সুতরাং আর কোন আশা নাই। তবে ডাক্তারেরা প্রথামত একেবারে না ফিরাইয়া দিয়া, একটা প্রলেপ ও একটা আরক দিয়া বলিলেন যে এই প্রলেপের ব্যবহারে ফাটিয়া গিয়া পুঁজ বাহির হইলেও হইতে পারে, কিন্তু সে আশা দুরাশা বলিয়াই জানিবেন কেন না বিনা অস্ত্র প্রয়োগে পেটের চামড়া ফাটা একরূপ অসম্ভব।

এই ঘটনায় ভদ্রলোকটী অত্যন্ত কাতর ও জীবন সম্বন্ধে হতাশ হইয়া জেঠা মহাশয়কে একবার চণ্ডী পাঠের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন। স্বীকৃত হইয়া জেঠা মহাশয় পরদিন চণ্ডীপাঠ করেন। তাহার চণ্ডীপাঠ অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়া আমরা ও পাড়ার অনেকে দেখিবার জন্য উপস্থিত ছিলাম। পাঠ আরম্ভ হইবার পর ঠাকুর দালানের ফাটল দিয়া বিস্তর সাপ বহির্গত হইয়া ঝুলিতে লাগিল। এরূপ প্রায়ই হইত।

কিছুক্ষণ পরে কুচকুচে কালো একটী ৮।৯ বৎসরের ছোট মেয়ে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তথায় ঈষৎ দ্রুতভাবে টুকটুকু করিয়া আসিয়া নৈবেদ্যের ফল মূলাদি সরাইয়া দিয়া, একটু মিষ্টান্ন গ্রহণ পূর্ব্বক মুখে দিয়া মুহূর্তের মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। জেঠা মহাশয়ও তৎক্ষণাৎ পুঁথি বন্ধ করিয়া ভদ্রলোকটীকে বলিলেন, যাও পাঠ সফল হইয়াছে, এই প্রসাদ গ্রহণ কর ও এই পূজার জল মধ্যে মধ্যে পান করিও ও পীড়িত স্থানে বুলাইয়া দিও।

আমরা কিন্তু ইত্যবসরে, অন্য সহজ পথ দিয়া দৌড়াইয়া গিয়া, বাড়ীর দরজা আগলাইলাম ও অন্যান্য স্থান তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম, কিন্তু কাহাকেও বাহির হইয়া যাইতে দেখিলাম না, কিম্বা বাটীর ভিতরেও কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত যাইয়া খুঁজিলাম, খুঁজিয়াও কিছু দেখিতে পাইলাম না। আমাদের বাটীর সম্মুখের ধারেই ছোট ঠিক ঐ প্রকারের একটী মেয়ে ছিল, তাহাকে সন্দেহ করিয়া সেখানে গিয়া দেখিলাম যে, মেয়েটী অনেকক্ষণ হইতে ঘুমাইতেছে। যাহা হউক, তাহার পর

দিন পেটের চামড়া ফাটিয়া পুঁজ বাহির হইয়া গেল ও ভদ্রলোকটী শীঘ্রই সারিয়া উঠিলেন ও এখনো জীবিত আছেন।

ঘটনা সংক্রান্ত অনেকেই প্রায় এখনো জীবিত আছেন, কেবল জেঠা মহাশয়ের সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে। ইহা শুনিয়া, চণ্ডীমাহাত্ম্য সম্বন্ধে যে সকল প্রবাদ প্রভৃতি প্রচলিত আছে, তাহা একেবারে অবিশ্বাস বলিয়া বোধ না হইলেও হইতে পারে।

শ্রীঅরূপ চাঁদ।

---

# ভোগ-সন্ন্যাস-সম্মিলন।

ধর্ম্মজিজ্ঞাসু হইয়া কতিপয় মহানুভব ঋষি একদা রাজর্ষি জনক সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে তাঁহার নিজ আচরিত ধর্ম্মবিষয়ে এই প্রশ্ন করেন, "হে মহারাজ, আপনি, উভয়বিধ কার্য্য রাজকার্য্য ও যোগক্রিয়া অর্থাৎ আত্মসাক্ষাৎকার, যে অবিচ্ছিন্নভাবে সমকালে কিরূপে আচরণ করেন তাহা আমাদিগকে বলিতে আজ্ঞা হয়।

"জীবন্মুক্ত পুরুষেরা বলেন যে আত্মবিস্মরণ অর্থাৎ সমাধি ব্যতীত মন কখন চির শান্তিতে বিরাজ করেনা। আপনি গৃহী ও রাজা—সংসার কার্য্য ও শত শত প্রজার তত্ত্বাবধান করতঃ কিরূপে আপনি যোগ আচরণে প্রবৃত্ত থাকেন। আমাদের ইহা যৎপরোনাস্তি কৌতুহলের বিষয় যে আপনি রাজকার্য্য প্রভৃতির পরিচালনে মনোযোগী থাকিয়া মনঃবৃত্তির বিকাশ সত্ত্বে—মনের বিক্ষেপ শক্তির অর্থাৎ মনের স্বভাবতঃ বহির্ম্মুখে গমন প্রবৃত্তিকে রুদ্ধ রাখিয়াছেন, এইরূপে আপনি ভগবানের ইচ্ছাতেই আপনার আত্ম সমর্পণে সক্ষম হইয়াছেন।"

রাজা ঋষিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন, "হে ঋষিগণ। আপনারা সর্ব্বান্তর্য্যামী, তথাপি অমায়িকতা প্রযুক্ত আমাকে যাহা আদেশ করিলেন তদ্বিষয়ে আমি এই মাত্র অবগত আছি যে, এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং ইহার অন্তর্গত যাহা কিছু আছে সকলি ভগবানের অধিকারভুক্ত। এই অট্টালিকা, প্রাসাদশ্রেণী, দাস, দাসী, হস্তী, অশ্ব, নানা বিধ ঐশ্বর্য্য, শক্তি ও

বৈভব প্রভৃতি যাহা এইস্থানে দেখিতেছেন এবং এই সকল ব্যতীত অন্য সমুদায়ও কোন প্রকারেই আমার নহে। আমি ইত্যাকার চিন্তাস্রোত অনুক্ষণ হৃদয়ে ধারণা করি এবং এইরূপ চিন্তাস্রোতের অনুবর্ত্তী হইয়া আমি সকল কার্য্য সম্পন্ন করি। সমস্ত বস্তুই তাঁহার এবং তাঁহারই শক্তিতে সকলই হয়। আমি যে কোন কার্য্য করি সে সমস্ত বস্তুতঃ তাঁহার কার্য্য, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত আমাকে সমস্ত কার্য্য করিতে হয়। আমি তাঁহার ক্রীতদাসের ন্যায় কেবল তাঁহা-রই আজ্ঞা পালন করিয়া থাকি। আমার এই যে বিদ্যমানতা ইহা তাঁহারই কার্য্য সাধনের জন্য এবং আমিও এই জ্ঞান সহযোগে সর্ব্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। সকলই ভগবানের, আমার যে ইহা মত মাত্র তাহা নহে। আমি সত্য সত্যই জানি যে সকলই তাঁহার। ইহা আমি প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ অনুভব করি ও যথার্থ বিদিত আছি, আর ইহাই আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস।

"এই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড - জীবপ্রকৃতি ও জড়জগৎ তাঁহারই সাম্রাজ্য। এতদুপরি তিনিই একাধিপত্য করেন। আমার একান্ত অভিলাষ নিরন্তর তাঁহার সম্মুখে থাকিয়া মনসুখে তাঁহারই অনুসন্ধান করি এবং তাঁহার নিকটে থাকিয়া তাঁহার পবিত্র সন্দর্শনলাভে নিরন্তর মগ্ন থাকি। যিনি তাঁহার স্বরূপ একবার মাত্র অব-লোকন করিয়াছেন, অন্য বস্তুতে সন্তোষলাভ করা সেই ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব। যাবৎ পরম অবস্থা প্রাপ্ত না হয় তাবৎ বস্তু বিশেষ আনন্দ প্রদান করিতে পারে। কিন্তু যখন সেই পরমানন্দময়ের অনন্ত প্রকাশ সমুদ্ভাসিত হইবে, তখন সকল ভোগতৃষ্ণা তিরোহিত হইবে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের যে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়, তাহার তিনিই একমাত্র নিরবচ্ছিন্নরূপে কর্ত্তা। আমাদিগের সকল আনন্দের তিনিই মূল প্রস্রবণ; যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা তাঁহাকে সর্ব্বস্বরূপে চিনিতে না পারি ততক্ষণ আমাদিগের পক্ষে সমসময়ে সৃষ্টির অন্তর্ভূত ও বহির্ভূত হইয়া থাকা সুকঠিন ব্যাপার কিন্তু ব্যক্তিমাত্রেরই ঐরূপ ধর্ম্মাচরণ করা যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রেরই বিশেষ অনুজ্ঞা। আমি প্রত্যক্ষানুভূতি কর্ত্তৃক বিশেষরূপে অবগত আছি যে সর্ব্বতো-ভাবে আত্মসমর্পণ ব্যতীত আমাদের যে স্বার্থপর স্বভাব, যাহা অনুক্ষণ অধিকতর সুখ প্রাপ্তির আশায় ধাবিত এবং যৎকর্ত্তৃক আমরা প্রকৃত পরমানন্দপ্রাপ্তি হইতে বিচ্যুত পরন্তু ঐ পরমানন্দ পাইতে বাস্তবিক আমরা লালায়িত। সেই স্বভাব আমাদিগের বশে আসে না। সর্ব্বপ্রকারে তাঁহাকে আমাদের

আত্মসমর্পণ ব্যতীত ঈশ্বরপ্রাপ্তি ঘটে না। যখন ভগবদ্‌সন্দর্শন ঘটে তখন মন স্থির ও শান্ত হয়। তদ্ব্যতীত ইহজীবনে শান্তি কি আত্মজ্ঞানের উদয় হওয়া অসম্ভব। নতুবা, ইহজীবন ধারাবাহিক বেদনা, দারিদ্র্য, পীড়া, ব্যাধি দুঃখ ও শোকে অতিবাহিত করিতে হইবে। যদ্যপি প্রকৃত সুখ বাঞ্ছা কর তবে এইরূপে বিশ্বাস স্থাপন কর যে সমস্তই তাঁহার এবং উক্ত বিশ্বাস হৃদয়ে ধারণ করিয়া ইহজীবন অতিবাহিত কর।

"কৈ—বল—কই কোথায় তোমার দেখা পাইব। হে আমাদিগের সৃষ্টিকর্ত্তা, বিধাতা ও সর্ব্বেশ্বর ভগবান, হে ঋষিগণ, আপনারা কি এইরূপ প্রকারে তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। তিনিই যোগ, ধ্যান, তপঃ প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্ম আচরণ, অতএব, তাঁহাকেই আপনাদিগের যোগ, ধ্যান, তপঃ প্রভৃতি ধর্ম্মচর্য্যায় পরিণত করুন। আপনাদিগের সমস্ত ধর্ম্মাচরণ, আপনাদিগের নিজ মন মধ্যে লয় করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্তির নিমিত্ত ব্যাকুল রোদনে পরিণত হউক। কোথায়-কোথায়--কোথায় তাঁহাকে পাইব এই বাক্য মৌখিক না হইয়া যেন হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে উত্থিত হয়। যতক্ষণ সেই সত্যময়ের প্রকাশ না হয় ততক্ষণ ততোধিক ব্যাকুল অন্তরে ডাকিতে থাকুন যেরূপ বিকারগ্রস্ত রোগী ব্যাকুলিত হয়। যেজন তাঁহাকে দেখিবার জন্য তাঁহার অদর্শনজনিত বিরহ যন্ত্রণা যত পরিমাণে সহ্য করে সেই ব্যক্তির নিকট তিনি ততোধিক স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হন। তাঁহার পূর্ণপ্রকাশ একবার দেখিলে অন্য বস্তু মন আকৃষ্ট করিতে পারে না।

পরমাবস্থায় উপনীত হইলে জনসাধারণের ন্যায় ব্যবহার করিয়াও তাঁহাতে মন অর্পিত রাখা যায়।

এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মবিষয় শ্রবণ, পঠন বা উচ্চারণ করিলে তাহাকে ধর্ম্মজীবন কহে না।

# রহস্যময় ঘটনাবলী।

## পরলোকাগত বর।

মিঃ জেমস এলেন (James Allen) নিম্নলিখিত ঘটনাটী কোনও মার্কিণ পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন,

আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠাচিত্তে ষ্টেসনে অপেক্ষা করিতেছিলাম। বিবাহ ৪ ঘটিকার সময় সম্পন্ন হইবার কথা, কিন্তু বর, ওয়াণ্টম্যান (Whitman), ২॥০ ঘটিকার গাড়ীতে উপস্থিত হইলেন না।

তিনি মিলওয়াকী (Milwaukee) হইতে ছাড়িবার সময় টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন, "অনিবার্য্য কারণ-বশতঃ আমার যাইতে বিলম্ব হইতেছে। বাঁচিয়া থাকি কিম্বা মরিয়াই যাই, আমি নিশ্চয়ই যথাসময়ে পৌঁছিব।'

যদি ৩ ২৫ মিনিটের গাড়ী যথাসময়ে পৌঁছায় এবং তিনি যদি ঐ গাড়ীতে আসেন, তাহা হইলে আমরা ঠিক কাঁটায় ৪ ঘটিকার সময় ধর্ম্মমন্দিরে পৌঁছিতে পারিব। কিন্তু তাহা হইলে তিনি বেশ পরিবর্ত্তনের অবসর পাইবেন না, পথিধূসরিত অবস্থাতেই তাঁহাকে তাঁহার মনোনীতা কন্যা এবং পাত্রীর বন্ধুবর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে। হয়ত তিনি স্পেশাল (Special) গাড়ীতে আসিবেন। যাহা হউক আমি বসিয়া বসিয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করি। ওয়াণ্টম্যান কখনও মিথ্যা কথা বলেন না। তিনি বলিয়াছেন "বাঁচি কিম্বা মরি অর্থাৎ যে কোনও প্রকারে হউক আমি যথাসময়ে পৌঁছিব।'

আমি টেলিফোঁ করিয়া পাত্রীর বাড়িতে খবর দিলাম, "ওয়াণ্টম্যান অনিবার্য্য কারণ বশতঃ আসিতে পারেন নাই, কিন্তু তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি যথাসময়ে উপস্থিত হইবেন। আমি তাঁহার জন্য শেষ গাড়ীর অপেক্ষা করিতেছি।"

পাত্রী হেলেন (Helen)র পিতা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন "আমরা কি করিব?"

আমি উত্তর দিলাম "আমার মতে আপনাদিগের ধর্ম্মমন্দিরে অপেক্ষা করাই কর্ত্তব্য। ইহা ব্যতীত আর কি করা যাইতে পারে? তিনি বলিয়াছেন যে তিনি যথাসময়ে এখানে উপস্থিত হইবেন। তিনি অন্য প্রকার সংবাদ না দেওয়া পর্য্যন্ত আমাদের তাঁহার কথার উপর নির্ভর করিয়া থাকা কর্ত্তব্য। যদি তিনি

বাঁচিয়া থাকেন তবে তিনি এখানে আসিবেন কিম্বা কোনও সংবাদ পাঠাইয়া দিবেন।"

ইহার পর আমি আর কোনও সংবাদ পাই নাই। আমি কেবল তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। গাড়ী অত্যন্ত দেরীতে পৌঁছিল। গাড়ী যখন আসিল তখন প্রায় ৩ ৫৫ মিনিট, কিন্তু ওয়াণ্টম্যান সে গাড়ীতে আসিলেন না।

ব্যস্ত হইয়া আমি ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিয়া ধর্ম্মমন্দিরের দিকে, যেখানে কন্যাযাত্রীগণ অপেক্ষায় ছিলেন, সেইদিকে চলিলাম। দরজায় আমার সহিত বোমেণ্টের (Beaumont) সাক্ষাৎ হইল।

আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম "তিনি আসেন নাই।'

বোমেণ্ট উত্তর করিলেন 'তিনি ঠিক বিবাহের সময় পৌঁছিয়াছেন। তুমি তাহাকে দেখিতে পাও নাই। এতক্ষণ বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।"

তাহার পর তিনি সকলকে নিকটে ডাকিয়া ফুস ফুস করিয়া বলিলেন, "ওয়াণ্টম্যানের কোন অসম্ভাবনীয় ঘটনা ঘটিয়াছে। তিনি ভূতের ন্যায় সাদা হইয়া গিয়াছেন, তিনি কাহারও সহিত কথা বলেন নাই কিম্বা কোন দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। তাহাকে দেখিয়া আমার কম্প হইতেছিল। ঐ দেখুন তাঁহারা আসিতেছেন।"

বর ও কন্যাপক্ষীয়গণ ধর্ম্মমন্দির পরিত্যাগ করিলেই আমি ওয়াণ্টম্যানের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম বাস্তবিক তাঁহাকে ভূতের ন্যায় সাদা দেখাইতেছিল তাঁহার চক্ষুদ্বয় ক্ষণমাত্র আমার দিকে পতিত হইল, কিন্তু তাহাতে পলক মাত্রও ছিল না। তাঁহার চক্ষুদ্বয় যেন মৃত ব্যক্তির চক্ষুর ন্যায় এক দৃষ্টে চাহিয়াছিল।

হেলেন তাহার হস্তাবদ্ধা আছে। তাহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন সে ভীতা হইয়াছে, কিন্তু কাঁদিতেছে না। যেমন তাহারা গাড়ীর ভিতর ঢুকিল অমনি যেন কোনও ভৌতিক ক্রিয়া বলে অর্গান যন্ত্র হইতে শোক সূচক বাদ্য বাজিতে লাগিল। উপস্থিত অভ্যাগতগণের উপরে যেন একটা বিষাদের ছায়া পতিত হইল। এবং আমি স্ত্রীলোকদিগের ক্রন্দন শুনিতে পাইলাম।

তাড়াতাড়ি আমি একখানা গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম ও শীঘ্রই পাত্রীর বাড়ীতে নীত হইলাম। আমরা পাত্রীর গাড়ী পৌঁছিবার পূর্ব্বেই বাটীর দরজায় পৌঁছিলাম। যে গাড়ীতে বর ও কনে ছিল উহার দ্বার উন্মুক্ত হইলে

বোধ হইল যেন গাড়ী শূন্য রহিয়াছে। ওয়াণ্টম্যান তথায় ছিলেন না। হেলেন গাড়ীর ভিতরে জড় সড় ভাবে অজ্ঞান অবস্থায় ছিল। তাহার পিতা তাহাকে তুলিয়া ঘরের ভিতরে লইয়া গেলেন।

আমরা সকলে দ্বারদেশে ভীতি-বিহ্বল ও নিস্তব্ধভাবে একত্রিত হইলাম। গাড়োয়ান শপথ করিয়া বলিল যে ধর্ম্মমন্দির হইতে বাড়ীতে পৌছানর ভিতর সে তাহার গাড়ী কোথাও থামায় নাই এবং গাড়ীর দরজাও উন্মুক্ত হয় নাই।

একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। যাহা হউক আমরা শীঘ্রই জনৈক সংবাদ-বাহকের নিকট নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম পাইলাম, আমি উহা খুলিয়া পড়িলাম "ওয়াণ্টম্যান মিলওয়াকী ষ্টেশনে গাড়ী করিয়া যাইবার সময় আর একখানা দ্রুতগামী গাড়ীর সংঘর্ষণে ১২টার সময় হত হইয়াছেন।"

শীঘ্রই সংবাদের সত্যতা নির্ণীত হইল। ওয়াণ্টম্যান দ্রুতগামী গাড়ীতে ষ্টেশনে আসিবার সময়, আর একখানা দ্রুতগামী গাড়ীর সহিত তাহার সংঘর্ষ হয় এবং মৃত ওয়াণ্টম্যানকে ভগ্ন গাড়ী হইতে বহির্গত করা হয়। পুলিশ মৃতদেহ হস্তগত করে এবং তাহার মৃতদেহ সনাক্ত করা এবং তাঁহার ঠিকানা ধার্য্য করা প্রভৃতি কার্য্যে বিলম্ব হওয়ায় আমরা ৪॥০ টার পূর্ব্বে এ খবর পাই নাই।

বিবাহকালে যখন ওয়াণ্টম্যান তাঁহার পরিচিত ও তাঁহার ভৌতিক-মূর্ত্তি-দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত বন্ধুবর্গের সম্মুখে তাঁহার মনোনীত পাত্রীর পার্শ্বে ধর্ম্মমন্দিরে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার মৃতদেহ মিলওয়াকীতে পতিত ছিল।

যদিও ইহা অসম্ভব এবং আমার নিজে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না, তথাচ ঘটনাগুলি সত্য। ওয়াণ্টম্যান মিলওয়াকীতে দ্বিপ্রহরের সময় হত হইয়া-ছিলেন এবং তিনি ৪টার সময় সিকাগো (Chicago)তে বিবাহিত হইয়াছিলেন।

তিনি হোটেল হইতে ষ্টেশনে যাইবার পূর্ব্বে আমাকে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন "বাঁচিয়া থাকি কিম্বা মরিয়াই যাই যথা সময়ে আমি পৌঁছিব।" এসম্বন্ধে আমার আর কিছুই বক্তব্য নাই।

হেলেন আর কথা কহে নাই এবং এক সপ্তাহের মধ্যেই তাহার দেহ তাহার স্বামীর পার্শ্বে কবরস্থ হইয়াছিল।

ওঁ

# পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

১১শ ভাগ } পৌষ, ১৩১৪ সাল। { ৯ম সংখ্যা।

## শান্তিশতক।

( শিহ্লন-বিরচিত )

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

(৪৫)

হে কুরঙ্গ! কহ মোরে ভালত আছিলে সবে অরণ্য ভবনে?
তরু! তব শাখা সুখাসীন?
হে কল্যাণি প্রবাহিণি! কুশলে ছিলেত তুমি ভুবন ভ্রমণে?
পূর্ণসুখে ছিলে ত পুলিন?
উপল! কুশল তব? হেরিবারে তোমা সব, আলাপন তরে,
চিত্তসুখ বিনাশন ছাড়ি নিজ নিকেতন এসেছি প্রান্তরে।

(৪৬)

সাধিবারে প্রয়োজন কিনা ধরে তপোবন সন্তোষ নিলয়?
কেন তবে যাচি পর পায়

বসন বল্কল দল বাসভূমি তরুতল, নব কিশলয়
আস্তরণ নহে কি ধরায় ?
ফল মূলে মিটে ক্ষুধা, নির্ঝরিণী নীর সুধা, তৃষা করে দূর,
কুরঙ্গ, ক্রীড়ায় সঙ্গ, বিহঙ্গ, সুহৃদ সংঘ ; প্রদীপ বিধুর।

(৪৭)

শয়ন শষ্পিতবন, শুচিশিলা সুখাসন, গৃহ তরুতল,
ঝরবারি পানীয় শীতল,
মধুর অশনকন্দ, সহায় হরিণবৃন্দ, সহজ সরল
অযাচনে মিলায় সকল ;
সর্ব্বগুণ ধরে বন, কিন্তু পরপ্রয়োজন, সাধন মনন
সফল না হয় তথা, করিবারে যাচ কথা, নাহি কোন জন।

(৪৮)

কাননের ফলমূলে বাঞ্ছিত আহার মিলে, ভূতল শয়ন,
বল্কলেতে তনু আবরণ ;
সমিৎকুসুম-কুশ পরিচ্ছদ মনোহর, পুত্র মৃগগণ,
সখা যত তরু সুশোভন ;
গায়ক বিহঙ্গরাজি, বিস্তৃত কলাপে সাজি নাচে শিখীদল ;
বনপূর্ণ গৃহসুখে, নাহি সে কানন বুকে বিষাদ কেবল।

(৪৯)

কিন্তু হায় ! এ সংসার ! কি বিচিত্র মায়াগার ! বৃদ্ধ মৃত্যু-মুখ
নাহি চায় ছাড়িতে ভবন !
কোনমতে স্থূলধটি ভগ্ন মরি। পৃষ্ঠকটি ঢাকে লোল বুক
আশে তবু বাঁধে সে জীবন !
কাশ-অশ্রু-লালা-রসে প্লাবিত বদন ভাসে, অস্ফুট বচনে
তব'বারে অতিথিরে, দূর করে যায় সেবে ধনু প্রদর্শনে !

(৫০)

বিষয়ে প্রণয় যার কি করিবে বল তা'র। ভোগের গরল
করে পান কাননে সেজন ;

বিষয়ে বিরাগ যার কি করিবে গৃহ তার? ইন্দ্রিয় বিকল
গৃহতপে করে সে দমন।
সকাম করম ছাড়ি, কামহীন কর্ম্ম যেবা করয়ে সাধন
কি অভাব কহ আর, ভবন কানন তার, গৃহ তপোবন।

(৫১)

বিবেক নহেক তাহা যাহে নাহি কৃপাস্রোত হয় প্রবাহিত,
চিত হ'তে স্বতই আপন;
সে পন্থা নহেক পথ, পরদুঃখ নিবারণে যাহে নাহি চিত
অনুরাগী হয় অনুক্ষণ;
ধরম নহেক তাহা, নিবৃত্ত না করে যাহা পরহিংসা মতি,
সে শাস্ত্র নহেক শাস্ত্র শান্তিরূপ ফল যাহে না করে বসতি।

(৫২)

এ সংসার অগ্রে কার, কারো পুন চারিধার, পশ্চাতে কাহার
চিরকাল আছে বিরাজিত;
বিরাজে অদৃষ্টপূর্ব্ব শিশুর নয়ন আগে মোহন আকার
তেঁই তারে পূজে শিশু চিত;
যুবকের চারিধারে রাজে, তাই যুবা তা'রে পারে সেবিবারে;
বৃদ্ধের পশ্চাতে, কেন, বৃদ্ধ তবু ফিরে ফিরে চাহে বারে বারে?

(৫৩)

মূঢ়চিত্ত মানবের পুত্র দারপরিবৃত মায়ার সংসার
যোগাভ্যাসে সদা বিঘ্নকর,
তত্ত্ববেদী মানবের শাস্ত্রজ্ঞান উদ্ভাসিত বিস্তার সংসার
যোগাভ্যাসে সদা বিঘ্নহর;
সুমহান্ পুণ্যপণ্যে এ দেহ-তরণী তব করিয়াছ ক্রয়,
দুঃখার্ণব হতে পারে ক্ষণেক বিলম্ব আর যেন নাহি হয়।

---

# চৈতন্য কথা।

## "অজা" ছাগী না প্রকৃতি ?

### ব্রহ্মসূত্র – প্রথম অধ্যায়।

তৃতীয় পাদ ১১ অধিকরণ ৩য় সূত্র।

কঠোপনিষদে "প্রাণ এজতি মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্" এই বাক্যে প্রাণ শব্দে বজ্র কি বায়ু বুঝিতে হইবেনা, পরব্রহ্ম বুঝিতে হইবে।

১২ অধিকরণ ৪০ সূত্র।

ছান্দোগ্য উপনিষদে "পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য" এই বাক্যে পরজ্যোতি শব্দেও পরব্রহ্ম বুঝিতে হইবে।

রামানুজ স্বামী বলেন শঙ্করাচার্য্যে ৯ম, ১০ম, ১১শ ও ১২শ অধিকরণ ভিন্ন ভিন্ন অধিকরণ নহে, বস্তুতঃ একই অধিকরণ। অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ ব্রহ্ম-বাচক এই মাত্র অধিকরণের বিষয়। শূদ্রের প্রসঙ্গ মূল প্রসঙ্গের আনুসঙ্গিক যদিও প্রসঙ্গ হইতে ভিন্ন। প্রাণ আর জ্যোতি শব্দ কঠোপনিষদেই অঙ্গুষ্ঠ পুরুষের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী ও এই শব্দ কঠোপনিষদে স্পষ্টতঃ ব্রহ্মবাচক, সুতরাং অঙ্গুষ্ঠপুরুষও ব্রহ্মবাচক।

এ কেবল অধিকরণ লইয়া বিবাদ।

১৩ অধিকরণ ৪১ সূত্র।

ছান্দোগ্য উপনিষদে আকাশ শব্দ ব্রহ্ম বাচক।

১৪ অধিকরণ ৪২—৪৩ সূত্র।

বৃহদারণ্যকে বিজ্ঞানময় শব্দও ব্রহ্ম বাচক। রামানুজ স্বামীর মতে ১৩ ও ১৪ অধিকরণ ভিন্ন নহে, কেবল মাত্র আকাশ বিষয়ক অধিকরণ।

### চতুর্থ পাদ।

১ম অধিকরণ ১—৭ সূত্র।

"মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ"—কঠোপনিষদ্। মহৎ, অব্যক্ত ও পুরুষ শব্দ এইরূপ সন্নিকট থাকায় "অব্যক্ত" শব্দে সাংখ্য শাস্ত্রের প্রধান

বুঝাইতে পারে। এই সন্দেহ নিরাকরণের জন্য ব্যাসদেব বলেন যে প্রকরণ অনুসরণ করিলে, অব্যক্ত শব্দে শরীর বুঝায়। কঠোপনিষদের অগ্র পরবর্ত্তী বাক্য সকল বিচার করিয়া শঙ্করাচার্য্য এই অর্থ সুস্পষ্ট করিয়াছেন।

## ২য় অধিকরণ ৮—১০ সূত্র।

এই অধিকরণের অর্থ করিতে গিয়া শঙ্করাচার্য্য যে বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। সূত্র তিনটি। চমসবদ বিশেষাৎ। কোন বিশেষ নাই। এইজন্য "চমস" শব্দের ন্যায়।

জ্যোতিরুপক্রমাত্তু তথা অধীয়ত একে।

জ্যোতিরুপক্রমের জন্য কেহ কেহ এরূপ পাঠ করিয়া থাকেন।

কল্পনোপদেশাচ্চ মধ্বাদিবদবিরোধঃ।

কল্পনার উপদেশ থাকায় মধ্বাদির ন্যায় বিরোধ হয় না।

প্রথম সূত্রের অর্থ সম্বন্ধে কোন বিরোধ নাই। সকল ভাষ্যকারেই বলেন শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের "অজামেকাং রোহিত শুক্লকৃষ্ণাং। বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাম্। অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেকাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ" এই শ্লোক লইয়া এই অধিকরণের আরম্ভ হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য বলেন "অজা" শব্দে প্রধান কি প্রকৃতি বুঝিতে হইলে কোন বিশিষ্ট নির্দ্দেশ চাই। কারণ অজা শব্দে ছাগী ও ত বুঝায়। এখানে অজা শব্দে প্রধান বুঝিতে হইবে, তাহার কোন কারণ নাই।

লোহিত শুক্ল কৃষ্ণা অজার যে কোন অর্থ করা যায়। এবং যে কোন মতে সে অর্থ প্রযুক্ত হইতে পারে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে "অর্গগ্বিলশ্চমস ঊর্দ্ধবুধ্নঃ" এইরূপ চমসের বিবরণ আছে অর্থাৎ সেই চমসের মুখ নীচে এবং শেষভাগ ঊর্দ্ধে। কেবলমাত্র এই মন্ত্র পড়িলে জানা যায় না, যে কোন চমস পাত্রের উল্লেখ এই মন্ত্রে আছে। পরে অন্য মন্ত্রে এই চমসকে আমাদের মস্তক বলা হইয়াছে, কারণ মস্তকের নিম্নভাগে মুখগহ্বর এবং উপরিভাগে অবশিষ্ট ইন্দ্রিয়গণ।

অজা শব্দের প্রকৃত অর্থ তবে কিরূপে জানা যায়? সেই জন্য দ্বিতীয় সূত্রে বলিতেছেন—জ্যোতিঃ অর্থাৎ অগ্নি হইতে আরম্ভ করিয়া ( তেজ, জল ও পৃথিবী এই তিন ভূত ) অজা শব্দ বাচ্য। কারণ কোন কোন শাখায়

এরূপ পাঠ আছে। যেমন ছান্দোগ শাখায়—"যদগ্নে রোহিতং রূপং তেজস-স্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎকৃষ্ণং তদন্নস্য"। অগ্নির লোহিত রূপ, জলের শুক্ল রূপ এবং পৃথিবীর কৃষ্ণরূপ।

তেজোবন্নকে অজা বলিয়া শঙ্করাচার্য্যের নিজের মন পরিতৃপ্ত হইলনা। ব্যাসের সূত্রের অযথা অর্থ করিয়া শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং অজার অন্য অর্থ করেন। তিনি বলেন শ্বেতাশ্বর উপনিষদেই ঐশ্বরিক শক্তির উল্লেখ আছে—"তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্ম শক্তিং স্বগুণৈ নিগূঢাম্"। এই অব্যাকৃত নামরূপা দৈবী শক্তিই অজা শব্দ বাচ্য হইতে পারে। তবে শঙ্করাচার্য্যকে এই অর্থ করিতে নিষেধ কে করিয়াছিল ?

তেজোহবন্ন না হয় লোহিতশুক্ল কৃষ্ণ হইল। "অজা" কিরূপে হইবে। এই জন্য শঙ্করাচার্য্যকে তৃতীয় সূত্রের এক বিকৃত অর্থ করিতে হইল।

এ কেবল কল্পনা মাত্র। ইহাতে কোন দোষ নাই। এখানে এ কথা বলা হয় নাই যে তেজোবন্ন ছাগজাতীয় কিম্বা জন্ম রহিত। এখানে এইমাত্র কল্পনা করা হইয়াছে, যে পৃথিবী, জল ও তেজ হইতে জরায়ুজাদি সকল প্রাণী উদ্ভূত হইয়াছে। এবং সেই ভূতত্রয় একটি ছাগীর তুল্য। যেমন কোন ছাগী দৈববশতঃ কতকটা লোহিত বর্ণ, কতকটা শুক্লবর্ণ ও কতকটা কৃষ্ণবর্ণ। তাহার সন্তান সন্ততিগণ মাতারই বর্ণ প্রাপ্ত হয়। তাহার মধ্যে কোন ছাগ ঐ ছাগীর নিকট থাকিতে ভাল বাসে কেহ বা ভাল বাসেনা। সেইরূপ তেজোবন্ন লক্ষণ, ত্রিবর্ণ, ভূতপ্রকৃতি হইতে চরাচর ভূতজাত উৎপন্ন হয়। অবিদ্বান্ সেই প্রকৃতির উপভোগ করে। বিদ্বান্ সেই প্রকৃতিকে ত্যাগ করে।

যদি শঙ্করাচার্য্য এই অর্থ না করিতেন তাহা হইলে আমরা কিছুতেই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতাম না।

আচার্য্য সূত্রের অর্থ করিতে গিয়া বেশী দূরে গিয়াছেন। তিনি সাংখ্যের প্রকৃতি পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতিকে একবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন। এবং ব্যাসদেবকে অজার তেজোবন্ন অর্থ দিয়া নিজে চুপে চুপে "ঐশ্বরিক শক্তি" অর্থ করিলেন।

গোবিন্দানন্দ কিন্তু দোষ দিলেন ব্যাসের ঘাড়ে এবং থিবো ( Thibaut ) সাহেব গোবিন্দানন্দেরই অনুসরণ করিলেন।

"Here there seems to be a certain discrepancy between the views of the Sutra writer and Sankara. Govindananda notes that according to the Bhashyakrit *aja* means simply maya which interpretation is based on *prakarara* while according to the Sutrakrit who explains *aja* on the ground of the Khandoyya-passage treating of the three primary elements, *aja* denotes the aggregate of those three elements constituting an *avantara prakriti.*—On Sankara's explanation the term *aja* present no difficulties for *mays* is *aja*, i. e. unborn, not produced. On the explanation of the Sutra writer, however, *aja* cannot mean unborn, since the three primary elements are products. Hence we are thrown back on the *rudhi* signification of *aja*, according to which it means she-goat. Sacred sootra of the East. Vol. XXXIV (Vedanta Sutras with Sankara, comment) Pages 255-256-

থিবো সাহেব যদি জানিতেন যে ভেজোবন্ন লক্ষণ অজা শঙ্করাচার্য্যের সৃষ্টি তাহা হইলে তিনি এরূপ লিখিতেন না।

রামানুজ বলেন, অজা অর্থে প্রকৃতি কেন ছাড়িব, সাংখ্যের স্বতন্ত্র প্রকৃতিই ছাড়িব। ঈশ্বরাধীন প্রকৃতি ভগবদ্গীতাতেও আছে, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও আছে। তদ্ভিন্ন আথর্ব্বন চূলিকা উপনিষদে ও গর্ভ উপনিষদে সুস্পষ্টরূপে ঈশ্বরাধীন প্রধান, প্রকৃতি ও অব্যক্তের উল্লেখ আছে।

ব্যাসদেব কেবল এইমাত্র মীমাংসা করেন, যে "অজা" শব্দে সাংখ্যাচার্য্যের স্বতন্ত্র প্রধান বুঝায় না, ঈশ্বর পরতন্ত্র শ্রুতি সম্মত প্রকৃতি বুঝায়। কেবলমাত্র 'অজা' শব্দ থাকিলেই স্বতন্ত্র প্রকৃতির অধিগম হয় না। যেমন কেবলমাত্র চমস শব্দে কোন নির্দ্দিষ্ট চমস বুঝায় না। প্রকরণে এমন কিছু নাই যাহাতে অজা শব্দে স্বতন্ত্র প্রকৃতি বুঝায়। "অতোঽনেন মন্ত্রেণ ন অব্রহ্মাত্মিকা অজা অভিধীয়তে।"

"জ্যোতিরুপক্রমাত্তু"— অপরন্তু ব্রহ্মাত্মিকা প্রকৃতি বলিবার কারণ আছে। সূত্রে "জ্যোতি" শব্দ ব্রহ্মবাচক। জ্যোতিরুপক্রমা—ব্রহ্মকারণিকা। তথা হি অধীয়তে একে। তৈত্তিরীয় শাখান্তর্গত মহানারায়ণ উপনিষদে ব্রহ্মাত্মিকা

অজার উল্লেখ আছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও প্রকরণের আরম্ভে "কিং কারণং ব্রহ্ম"—এইরূপ উল্লেখ আছে।

কেবল এইমাত্র আপত্তি হইতে পারে যে যদি প্রকৃতি ব্রহ্মকারণিকা হয় তাহা হইলে 'অজা' কিরূপে হইতে পারে। তাহার উত্তরে তৃতীয় সূত্রে বলিতেছেন যে "কল্পনোপদেশাচ্চ" এখানে "কল্পন" শব্দের অর্থ সৃষ্টি। যেমন 'সূর্য্যাচন্দ্রমসৌধাতা যথা পূর্ব্ব মকল্পয়ৎ'।

প্রকৃতি কারণ ও কার্য্যরূপে দুই অবস্থাপন্ন।

সা হি প্রলয়বেলায়াং ব্রহ্মতাপন্না অবিভক্ত নামরূপা অব্যক্তাদিশব্দবাচ্যা সূক্ষ্মরূপেণ অবতিষ্ঠতে। সৃষ্টিবেলায়াং চোদ্ভূত সত্ত্বাদিগুণা বিভক্ত নামরূপা ব্যক্তাদিশব্দ বাচ্যা তেজোবন্নাদিরূপেণ চ পরিণতা লোহিত শুক্ল কৃষ্ণাকারা চ অবতিষ্ঠতে। অতঃ কারণাবস্থা অজা, কার্য্যাবস্থা চ জ্যোতিরুপক্রমা ইতি ন বিরোধঃ।

কারণাবস্থায় ব্রহ্মতাপন্ন অব্যক্ত প্রকৃতিকে অজা বলিলে দোষ হয় না। রামানুজের এ অর্থ অসঙ্গত মনে হয় না।

শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদে সৃষ্টি নাই, প্রকৃতির সত্তা ও বিকার নাই। আছে মাত্র মায়া শক্তি। সেই মায়া শক্তি দ্বারা অদ্বয় ব্রহ্ম জগতের ভান হয়। এই মায়াবাদ অনুসরণ করিয়া হয়ত আচার্য্য অজা প্রকৃতি স্বীকার করিতে চাহেন না। কিন্তু তেজোবন্ন দ্বারা কিরূপে মায়াবাদের সমর্থন হয় তাহা বুঝি না। কিন্তু তেজোবন্ন ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র শক্তি গ্রহণ করিলে তাঁহার মতের সমর্থন হয় বটে। কিন্তু গোবিন্দানন্দ সে কথা বলিলেও ভাষ্যকার সে কথা বলেন নাই।

মধ্যাচার্য্যের মতে এই তিন সূত্রে অজার উল্লেখ নাই। তাঁহার ব্যাখ্যানুসারে চমস শব্দের যেরূপ বিরোধ অর্থ মুখ, সেইরূপ অব্যক্তাদি শব্দের অর্থ ব্রহ্ম। "জ্যোতি" অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ শব্দেও ব্রহ্মকে উল্লেখ করিতেছে। "কল্পন" অর্থাৎ ঈশ্বরের অনুধ্যানের জন্যই ঈশ্বরের এইরূপ নানা অভিধান শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

মধ্যাচার্য্যের অর্থ একরূপ দয়ানন্দী অর্থ। যেমন দয়ানন্দের মতে বেদের দেবতা বাচক সকল শব্দই ঈশ্বর বাচক এবং বেদের শিক্ষাও কতক পাশ্চাত্য

সভ্যতার অনুগত—প্রকরণ যাহাই হউক না কেন—সেইরূপ হনুমানের অবতার মধ্যাচার্য্য সকল সূত্রেই ব্রহ্ম দেখেন। সেই পরম ভক্তের নিকট আমি সতত মস্তক অবনত করি। তাঁহার ভাষ্যের কথা আমি কিছুই বলিতে চাহি না। তিনি যাহা বলেন ভক্তের নিকট তাহাই উপাদেয়।

চৈতন্য সম্প্রদায়ভুক্ত বলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁহার গোবিন্দ ভাষ্যে রামানুজের অর্থই সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। বাস্তবিক এ বিষয়ে রামানুজ স্বামী ও মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের মত অভিন্ন।

( ক্রমশঃ )

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

---

ওঁ নমো গুরবে

# আমি কি ?

যদি জগতে এমন কিছু পদার্থ থাকে যাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে জীব সর্ব্বদাই নিশ্চিত, যৎসম্বন্ধে তাহার নিমেষের জন্যও তিল মাত্র সন্দেহের উদ্রেক হয় না, তাহা "আমি" বা "আমি আছি"। "নহি কশ্চিৎ সন্দিগ্ধে অহং বা নাহং বেতি" বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন। সকল দেশে ও সকল কালে পণ্ডিতেরা একবাক্যে এই সত্যের পোষকতা করিয়াছেন। অথচ "আমি" কি তাহা কেহই নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারেন না, কেহই জানেন না। 'আমি'ই কেবল 'আমি'কে চিনে, 'আমি'কে জানে, কারণ "আমি"র তুলনা কিছুই নাই, 'আমি'ই "আমি"র তুলনা। পুরাণে দেখা যায় কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড ও কোটি কোটি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব। এক ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর তদপেক্ষা বৃহত্তর ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরকে ধ্যান ও স্তব করিতেছেন, তিনি আবার তদপেক্ষা উচ্চ ঈশ্বরের ধ্যান ধারণায় নিমগ্ন,—এইরূপ শৃঙ্খল ক্রমাগত চলিয়াছে, ইহার অন্ত বা পরিসমাপ্তি কোথায় কেহই জানে না। কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, নর, বানর, দেবতা, অসুর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, ঋষি, প্রজাপতি, ব্রহ্মা, রুদ্র, হইতে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই এক একটি সসীম 'আমি' বা

আপেক্ষিক 'আমি' (Conditioned or relative self)। প্রত্যেক সসীম 'আমি' তদপেক্ষা উচ্চতর সসীম "আমি" কে জানিতে পারেন। কিন্তু অসীম নিরুপাধিক "আমি"কে (Un-conditioned Absolute self) (যাঁহার অধ্যাস বা আভাস হইতে এই সকল সসীম আমির উৎপত্তি), কেহই জানিতে পারে না, তিনি নিজেই কেবল নিজেকে জানেন।

"আমি" কি তাহা জানা অসম্ভব হইলেও, "আমি" কি নহি তাহা বোধ হয় কতক পরিমাণে জানা যাইতে পারে। "আমি" আজ একটি বালক,—দেহ ও হস্ত পদাদি ক্ষুদ্র, দাড়ী গুম্ফ জন্মে নাই, ভোজনে ও খেলায় আমার আনন্দ। ক্রমশঃ বয়োপ্রাপ্ত হইয়া যুবাপুরুষ হইলাম, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সবল, পুষ্ট ও আয়তনে বর্দ্ধিত হইল, দাড়ী গুম্ফ জন্মিল, বর্ণ উজ্জ্বল হইল, কণ্ঠস্বর পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল,—সংক্ষেপে আমার দেহের এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিল যে, যে ব্যক্তি আমাকে বাল্যে দেখিয়াছেন, তিনি আর এখন চিনিতে পারেন না। কিন্তু কই? 'আমার' কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি? দেহের পরিবর্ত্তন হইয়াছে বটে, কিন্তু বাল্যে যে "আমি" ছিল এখনও কি ঠিক সেই "আমি" নাই! আবার শরীর-বিজ্ঞানবিৎদিগের মতে আমার দেহ এখন সম্পূর্ণ নূতন পরমাণু দ্বারা গঠিত হইয়াছে; বাল্য-দেহের সব পরমাণুগুলি চলিয়া গিয়াছে এবং সম্পূর্ণ নূতন পরমাণু আসিয়া তত্তৎস্থান অধিকার করিয়াছে; অর্থাৎ প্রতি ৭ (সাত) বৎসর অন্তর আমি এক একটি নূতন দেহ আশ্রয় করিতেছি। কিন্তু নূতন দেহের সহিত এক একটি নূতন "আমি" উৎপন্ন হইতেছে কি? স্থূল ব্যক্তি কৃশ হইতেছেন, দুর্ব্বল সবল হইতেছেন, সুস্থ পীড়িত হইতেছেন, গৌরবর্ণ শ্যামবর্ণ হইতেছেন, চক্ষুষ্মান্ অন্ধ হইতেছেন। দেহের এই সকল পরিবর্ত্তনে, 'আমি'র কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় কি?

সেইরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তনেও, "আমি" অক্ষুণ্ণ থাকে। যিনি একসময়ে সহস্র দাস দাসী সেবিত হইয়া বহুমূল্য প্রাসাদে বাস করিতেন, আজ হয়ত তিনি ছিন্ন বস্ত্র ও কুটীর-বাসী। কত ধনী দরিদ্র ও দরিদ্র ধনী হইতেছেন, পুত্রবান্ পুত্রহীন হইতেছেন, স্ত্রী বিধবা হইতেছেন, সুখী দুঃখী ও দুঃখী সুখী হইতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। বাস্তবিক এইরূপ পরিবর্ত্তনই জগতের নিত্য ঘটনা। কিন্তু এই সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে, 'আমি' স্থির ও অচল রহিয়াছে।

যিনি সুখী ছিলেন তিনিই আজ দুঃখী, যিনি একদা দরিদ্র ভিক্ষুক ছিলেন, তিনিই আজ রাজা, অর্থাৎ বরাবরই সেই এক "আমি" অবিচ্ছিন্ন ও অব্যাহত (Continuous and without break) রহিয়াছে।

আবার মন ও বুদ্ধির কত পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছে—কত তুমুল বিপ্লব সংঘটিত হইতেছে, কিন্তু "আমি" ধ্রুবতারার ন্যায় অটল ও অবিকৃত রহিয়াছে। কত অজ্ঞ জ্ঞানী হইতেছেন, মূর্খ পণ্ডিত হইতেছেন, নির্দ্দয় দয়াশীল হইতেছেন, আস্তিক নাস্তিক হইতেছেন, বিনয়ী উদ্ধত হইতেছেন, কত চোর সাধু হইতেছেন, সরল কপট হইতেছেন, স্থূলবুদ্ধি সূক্ষ্মবুদ্ধি হইতেছেন,—মোট কথা আমাদের জীবনের কত সংস্কার ও নীতি (notions and principles) আমূল পরিববর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে, কিন্তু পূর্ব্বেও যে "আমি", এখনও সেই "আমি"। পূর্ব্বে আমি জড়বাদী ছিলাম, জড় পরমাণুর সংযোগ বিয়োগেই স্বভাবতঃ এই জগদাদি উৎপন্ন হইয়াছে, পরলোক বা দেহাতিরিক্ত কোন পদার্থ নাই ইহাই আমার বিশ্বাস ও ধারণা ছিল এবং আমার জীবনের কার্য্যাদি ঐ বিশ্বাসের দ্বারা নিয়মিত ও পরিচালিত হইত। কিন্তু এখন হয়ত আমি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা প্রত্যেক অনু পরমাণুতে ভগবৎ সত্বা উপলব্ধি করিতেছি এবং আমার জীবনের প্রত্যেক কার্য্য ও চিন্তা তদনুরূপ গঠিত হইয়াছে। পূর্ব্বে যিনি আমার সহিত আলাপ করিয়াছেন, এখন কথাবার্ত্তা কহিয়া তিনি একেবারে অবাক্ হইতেছেন, বলিতেছেন "একি! এ যে সম্পূর্ণ নূতন লোক! কি ছিল, আর কি হইয়াছে?" কিন্তু পূর্ব্বেও আমি ছিলাম, এখনও আমি আছি, একটি পৃথক্ বা স্বতন্ত্র 'আমি" হয় নাই।

যেরূপ কালসহকারে এই জগতে কত পরিবর্ত্তন ও বিপ্লব ঘটিতেছে; কত নদী শুষ্ক হইতেছে, আবার নূতন নদীর উৎপত্তি হইতেছে; কোন স্থানে মহাদেশ সাগর-গর্ভে বিলীন হইতেছে, আবার সাগর ভেদ করিয়া ধবলশিখর পর্ব্বতমালা গগনমার্গে সমুত্থিত হইতেছে; কত গ্রহতারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে; কত সৌর জগৎ অনন্ত শূন্যে বিলীন হইতেছে, আবার সেই স্থানে হয়ত গ্রহতারা সমন্বিত নূতন সৌর জগতের আবির্ভাব হইতেছে; কিন্তু এই সকল বিপ্লবের মধ্যে ধ্রুবতারা স্থির অচল ও অবিকৃত আছেন। ঠিক সেইরূপে মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, যুগের পর যুগ যেমন অতীত হইতেছে,

বালক যুবা ও যুবা বৃদ্ধ হইতেছে, ধনী নির্ধন, ভক্ত নাস্তিক হইতেছে, কিন্তু "আমি"র কোন পরিবর্ত্তন নাই, "আমি ঠিক স্বরূপাবস্থায় থাকিয়া স্বীয় জ্যোতি বিকিরণ করিতেছেন। এই জন্যই পঞ্চদশীতে উক্ত হইয়াছে :—

মাসাব্দযুগকল্পেষু গতাগম্যেষনেকধা।
নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সংবিদেষা স্বয়ংপ্রভা॥

অতএব আমরা দেখিতেছি দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির পরিবর্ত্তনে "আমি র কোন পরিবর্ত্তন হইতেছে না, সুতরাং "আমি" দেহ, ইন্দ্রিয়াদি হইতে একটি স্বতন্ত্র পদার্থ। দেহ ও ইন্দ্রিয়ের নাশে 'আমি'র নাশ হয় না, ইহার প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষাসিদ্ধ বহুতর প্রমাণ আধুনিক প্রেততত্ত্ববিদ্‌গণের (Spiritualists) দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে। স্থূল দেহের পতন হইলে (অর্থাৎ মৃত্যুর পর) মানুষ প্রায় তদবস্থই থাকে সহস্রাধিক পরীক্ষা দ্বারা ইহা অবিসংবাদীরূপে স্থাপিত হইয়াছে, সুতরাং ইহা বর্ত্তমান যুগের একটি বৈজ্ঞানিক সত্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

"আমি" দেহ নয়, ইন্দ্রিয় নয়, মন নয়। তবে "আমি" কি? অহঙ্কার (Personality) কি "আমি"? অহঙ্কার নাম ও রূপের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্ত্রী, পুরুষ, নর, বানর, গো, মহিষ ইত্যাদি নাম এবং দুই হস্ত দুই পদ অথবা চারি পদ শৃঙ্গ লাঙ্গুল ইত্যাদি রূপ। এখন যদি দেখা যায় অহঙ্কারের (নাম রূপের) পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াও "আমি" অক্ষুণ্ণ আছে, তবেই বুঝিব "আমি" অহঙ্কার বা personality নহে, একটি ভিন্ন পদার্থ। সৌভাগ্য ক্রমে আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অনুসন্ধান ফলে, আমাদের এ দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। Psychical Research Society এরূপ বহুতর লোকের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যাঁহাদের personality স্বতঃই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। মনে করুন হরি বাবু একটি ভদ্র লোক। তিনি হরি বাবু রূপে বাস করিতেছেন। একদিন হঠাৎ তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল; তিনি ভাবিলেন তিনি আর হরি বাবু নহেন, তিনি রাম বাবু (অথবা হেমাঙ্গিনী দেবী) হইয়াছেন। অতঃপর যতদিন এই ভাব স্থায়ী হইল, তাঁহার কথা বার্ত্তা, হাব ভাব, রীতি নীতি, আহার বিহার, পোষাক পরিচ্ছদ, এমন কি ভাবনা চিন্তা পর্য্যন্ত রাম বাবুর (বা হেমাঙ্গিনী দেবীর) অবিকল অনুরূপ। হয় ত ২।৩ মাস পরে

তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া হরিবাবু হইলেন। কিছু দিন পরে হয়ত আবার তাঁহার নাম ও রূপ পরিবর্ত্তিত হইল। তন্দ্রাবেশ (Hypnotism) দ্বারা নাম-রূপের পরিবর্ত্তন সহজে ও প্রভূত পরিমাণে সম্পাদিত হইতে দেখা যায়। একটী দাড়ীগুম্ফবিশিষ্ট বলবান্ পুরুষকে তন্দ্রাবিষ্ট (hypnotised) করিয়া বলা হইল "তুমি মেয়ে মানুষ, এতগুলি পুরুষের সমীপে এরূপে বসিতে তোমার লজ্জা হইতেছে না?" তৎক্ষণাৎ তিনি স্ত্রীলোকের ন্যায় ঘোমটা টানিয়া মৃদু-পদবিক্ষেপে ও সলজ্জভাবে এক পার্শ্বে সরিয়া বসিলেন। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে নামরূপের পরিবর্ত্তন হইলেও "আমি" অক্ষুণ্ণ আছে। হরিবাবু যখন স্বাভাবিক অবস্থাতে থাকেন তখন যেরূপ তাঁহার "আমি আছি" "আমি আনন্দভুক্" ইত্যাকার বিশ্বাস আছে, তিনি রামবাবু অথবা স্ত্রীলোক হইয়াও ঠিক সেইরূপে "আমি আছি, আমি আনন্দভুক্" ইত্যাদি দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করেন। অবশ্য স্বাভাবিক অবস্থায় তাঁহার ধর্ম্ম, নীতি, চিন্তা, ধারণাদি যেরূপ ছিল, রামবাবু বা স্ত্রীলোকের অবস্থায় সেরূপ থাকিতে পারে না, কিন্তু উভয় অবস্থায় "আমি" ঠিক একরূপই আছে। কোনও মানুষ স্বীয় নাম রূপ ত্যাগ করিয়া গো মাহিষাদি হইয়াছেন এরূপ ঘটনা বা পরীক্ষা বৈজ্ঞানিকগণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন কি না জানি না। কিন্তু এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে। একটি গল্প আছে। কোন ব্যক্তিকে ক্রমাগত মহিষের ধ্যান করিতে বলা হয়। কিছুকাল পরে তিনি গুরুগৃহে ফিরিলে দেখা গেল যে গৃহপ্রবেশকালে তিনি স্বীয় মস্তক অবনত করিয়া অতি সাবধানে আসিতেছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন "দ্বারে যে আমার শিঙ্ আটকাইয়া যাইবে।" তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে তিনি মহিষ হইয়া গিয়াছেন। মহিষই হউন বা সিংহই হউন, "আমি"র কোন পরিবর্ত্তন নাই।

জগতের যে দিকে চাই সেই দিকেই দেখিতে পাই "আমি" বিরাজিত। যেন স্থাবর জঙ্গম সকলেই এক বাক্যে বলিতেছে "আমি"। মাতা শিশুকে স্তন্যদান করিয়া বলিতেছেন "আমি"; পিতা পুত্রের মুখ চুম্বন করিয়া বলিতেছেন 'আমি", বিরহিনী সতী পতির সহিত মিলিত হইয়া বলিতেছে "আমি"; আর্কিমিদিস্ গণিতের জটিল প্রশ্ন সমাধান করিয়া বলিতেছেন "আমি"; নিউটন মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কার করিয়া বলিতেছেন "আমি", চৈতন্যদেব

জগাই মাধাইকে কোল দিতে দিতে বলিতেছেন "আমি"। কবি কবিতাচ্ছলে বলিতেছেন "আমি," তানসেন্ গান গাহিয়া বলিতেছেন "আমি"। ক্রিমি কীট বিষ্ঠানদীতে সন্তরণ দিতে দিতে যেন দেহ নাড়িয়া বলিতেছে "আমি", ধেনু স্বীয় বৎসের প্রতি ধাবমান হইয়া হাম্বারবে বলিতেছে "আমি"। বসন্তাগমে কোকিল কুহুরবে গাহিতেছে "আমি", ভ্রমর গুঞ্জন করিয়া বলিতেছে "আমি", বৃক্ষলতাদি নবপত্রপুষ্পে সুসজ্জিত হইয়া যেন অব্যক্তস্বরে বলিতেছে "আমি"। পবন সন্ সন্ করিয়া বলিতেছে "আমি", নদী তর্ তর্ করিয়া বলিতেছে "আমি", মেঘ ভীষণ বজ্রনির্ঘোষে ও সমুদ্র উত্তাল তরঙ্গনিনাদে গর্জ্জন করিতেছে "আমি"। কোনদিকে কোন স্থানে এই "আমি"র অভাব বা বিরাম নাই, বিশ্বের সর্বত্র এই "আমি", যেন জগতে আর কিছুই নাই, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক বিরাট "আমি"। কবি সত্যই গাহিয়াছেন :—

"আছি কোনোখানে কারেও না জানি
শুনিতে না পাই আজি কারো বাণী (হে),
অখিল নিশ্বাস আজি এ বক্ষে
বাঁশরীর সুরে বিলাসে।"

"এক এব তু ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ॥"

এই "আমি" কি? আমরা দেখিলাম দেহ, ইন্দ্রিয়, মন অহংকার ইত্যাদি "আমি" নয়, অথচ "আমি" সর্ব্বত্র বিরাজিত, ক্ষুদ্র কীট হইতে বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি পর্য্যন্ত (যত সাদি ও সান্ত জীব আছেন বা কল্পনা করা যায়) সকলের মধ্যেই এই "আমি" বিদ্যমান। এখন দেখা যাক্ এই সকল জীবের মধ্যেই কোন সাধারণ উপাদান (Common elements) আছে কিনা, এমন কোন বস্তু আছে কিনা যাহা সকল জীবেই বর্ত্তমান। যদি এরূপ কিছু থাকে, তবে তাহাই "আমি"। যতগুলি জীব-সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা আছে দেখিতে পাই যে সকল জীবেই (১) একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্বের জ্ঞান (sense of separate existence) স্বাভাবিক ও অটল (২) সকল জীবের মধ্যেই এক অনন্তরিত চৈতন্য প্রবাহ (Continuous stream of Consciousness) ন্যূনাধিকরূপে বর্ত্তমান এবং (৩) সকল জীবই আনন্দ-ভুক্,

আনন্দের জন্য লালায়িত এবং কোন না কোন বস্তুতে আনন্দ পায় (এবং সেই বস্তুর অভাবেই নিরানন্দ বা দুঃখ ভোগ করে)। এখন যদি আমরা প্রথমোক্ত ভাবটিকে সৎ বা সতের ক্রিয়া বলি, দ্বিতীয়টিকে চিৎ বা চিতের ফল বলি এবং তৃতীয়টিকে আনন্দ বা আনন্দের প্রকাশ বলি, তাহা হইলে আমরা সকল জীবেরই তিনটি সাধারণ উৎপাদক (Common factors) প্রাপ্ত হই—সৎ-চি—আনন্দ। এই জন্য "আমি" সচ্চিদানন্দ ইহা শাস্ত্র বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন, এই জন্যই শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য স্বামী তারস্বরে বলিয়াছেন—

মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তাণি নাহং
ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণ নেত্রে।
ন চ ব্যোম ভূমির্ণতেজো ন বায়ু
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং॥ ১।
ন চ প্রাণসংজ্ঞো ন বৈ পঞ্চ বায়ুঃ
ন বা সপ্তধাতুর্ণবা পঞ্চকোষঃ।
ন বাক্‌পাণিপাদং নচোপস্থপায়ু
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং॥ ২।
নমে দ্বেষরাগৌ নমে লোভ মোহৌ
নমে মদো নৈব মাৎসর্য্যভাবঃ।
ন ধর্ম্মঃ নচার্থঃ নকামঃ ন মোক্ষঃ
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং॥ ৩।
ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং
ন মন্ত্রো ন তীর্থং ন বেদাঃ ন যজ্ঞাঃ।
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং চ ভোক্তা
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং॥ ৪।
ন মৃত্যুর্ণশঙ্কা ন মে জাতিভেদো
পিতা নৈব মে নৈব মাতা চ জন্ম।
ন বন্ধুর্ণমিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্যঃ
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং॥ ৫।

অহং নির্ব্বিকল্পো নিরাকাররূপো
বিভুত্বাচ্চ সর্ব্বত্র সর্ব্বোন্দ্রিয়াণাং।
ন চাসঙ্গতং নৈবমুক্তির্ণমেয়ঃ
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং ॥ ৬।

অতএব "আমি" সচ্চিদানন্দ, অপর কিছুই নহি। আমি মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার নহি, আমি ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম নহি, আমি চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্ নহি, আমি প্রাণ অপান সমান ব্যান উদান নহি, আমি অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় কোষ নহি, আমার পিতা মাতা নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখ, জন্ম মৃত্যু, বৃদ্ধি হ্রাস, শত্রু মিত্র, গুরু শিষ্য, বন্ধন মুক্তি—কিছুই নাই। আমি জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি তিন অবস্থার অতীত। আমি সরিৎসিন্ধু নহি, পর্ব্বত প্রান্তর নহি, চন্দ্র সূর্য্য নহি, গ্রহ তারা নহি। আমি বৃক্ষ লতা নহি, কীট পতঙ্গ নহি, পশুপক্ষী নর বানর নহি, স্ত্রী পুরুষ ব্রাহ্মণ শূদ্র নহি, সুর অসুর যক্ষ রক্ষ, গন্ধর্ব্ব কিন্নর, মনু প্রজাপতি, ভাস্বর মহাভাস্বর, ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র,—কিছুই নহি। আমি ভূ ভুব স্ব মহ জন তপ সত্য, অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল পাতাল—এই চতুর্দ্দশ ভুবনও নহি। সংক্ষেপে আমি এই জগৎ প্রপঞ্চ কিছুই নহি, আমি এক ও অদ্বিতীয়—সদেকমেবাদ্বিতীয়ং। আমি কেবল—"অমি"হ,—"আমি" ব্যতীত অপর কিছুই নহি।

যখন "আমি" পূর্ব্বোক্তরূপে চিন্তা করি, তখন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কিছুই থাকে না, আমাতে লয়-প্রাপ্ত হয়। ক্ষিতি অপে, অপ তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ পঞ্চতন্মাত্রে, পঞ্চতন্মাত্র অহঙ্কারে, অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতি "আমা"তে বিলীন হইয়া যায়। ইহারই নাম প্রলয়। আবার "আমি" যখন এই জগৎ-প্রপঞ্চের বিষয় চিন্তা করি, ভাবি "একোঽহং বহুঃস্যাম্" —আমি এক বহু হইব তখন এই বিশ্ব আমাতেই উদিত হয়, যেমন মাকড়শা হইতে জাল উদ্ভূত হয়, যেমন পৃথিবীতে বৃক্ষ লতা জন্মে, যেমন মানব-দেহে কেশ লোম উৎপন্ন হয়।

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।

যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি
তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥

এই বিশ্ব আমারই কল্পনা-প্রসূত, আমারই চিন্তার ফল। যখন আমি ভাবনা করি "আমি"ই এই সব, তখন আমার মধ্যেই প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, চতুর্দ্দশ ভুবন ও অসংখ্য দেবতা, মানব, পশুপক্ষী, কীট পতঙ্গাদি সমন্বিত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড এবং কোটি কোটি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব আবির্ভূত হয়। ইহারই নাম সৃষ্টি। যেরূপ বায়ু সর্ব্বস্থানে গতায়াত করিলেও আকাশের মধ্যেই অবস্থান করে, সেইরূপ এই বিশ্ব অসীম হইলেও আমাতেই (আমার একাংশে) অবস্থিত। যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্। তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়॥

"আমি"ই সব, এই চিন্তা হইতে সৃষ্টি, "আমি কেবল আমি, অন্য কিছুই নহি—এই চিন্তার ফল প্রলয়। যখন "আমি ভাবি আমিই সব, তখন প্রকৃতই "আমি" সব অর্থাৎ নানারূপে ও নানা নামে "আমি" প্রকাশিত হই; সূর্য্যরূপে আলোক উত্তাপ দান করি, অগ্নিরূপে তেজ দিই, ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি করি, বিষ্ণুরূপে পালন করি মাতৃরূপে স্নেহ দ্যূতক্রীড়ারূপে প্রতারণা করি (দ্যূতং ছলয়তামস্মি), রাজনীতিরূপে পরাজয় সাধন করি, মনরূপে চিন্তা করি,—এক কথায় "আমি"ই সব, "আমি" বিনা জগৎ চরাচর কিছুই নাই (ন তদস্তি বিনা যৎস্যাৎ ময়া ভূতং চরাচরং)।

অহং ক্রতুঃ অহং যজ্ঞঃ স্বধাহম্ অহম ঔষধম্।
মন্ত্রোঽহম্ অহম্ এবাজ্যম অহম্ অগ্নিঃ অহং হুতম্॥
পিতাহম্ অস্য জগতঃ মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রম্ ওঙ্কারঃ ঋক্ সাম যজুরেব চ॥
গতিঃ ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাস স্মরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥
তপাম্যহম্ অহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ সদসৎ চাহম অর্জ্জুন॥

কিন্তু "আমি" যখন চিন্তা করি "আমি" এসব কিছুই নহি, তখন

জগদাদি কিছুই নাই,—"আমি" একক। এইরূপ সৃষ্টি ও প্রলয় অনাদি ও অনন্ত,—অনন্তকাল ধরিয়া এই সৃষ্টি ও লয় পর্য্যায়ক্রমে হইতেছে ও হইবে। যেমন মহাসমুদ্রে কোটি কোটি জলবুদ্বুদ উঠিতেছে ও পড়িতেছে, যেমন মানবের মনে সহস্র সহস্র চিন্তা উত্থিত ও বিলীন হইতেছে, সেইরূপ "আমা"তে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভূত ও লয়প্রাপ্ত হইতেছে।

এই সৃষ্টি ও লয় আমার নিত্য ঘটনা, এই দুই কার্য্য সর্ব্বদা একসঙ্গে আমার মধ্যে ঘটিতেছে। অর্থাৎ "আমি এই সব" এবং "আমি এই সব নহি",—এই দুই চিন্তা বিরুদ্ধাত্মক হইলেও, আমাতে যুগপৎ বর্ত্তমান (simultaneously present) রহিয়াছে, কারণ আমি নিরুপাধিক (unconditioned, Absolute) ও দেশ কালের অতীত। কিন্তু যাহা আমাতে যুগপৎ বর্ত্তমান, সসীম ও সোপাধিক জীবে তাহা পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পাইতেছে, কারণ তাঁহারা দেশ কালের দ্বারা বদ্ধ। ইহাই জীবের নিয়ত পরিবর্ত্তনের (উন্নতি বা অবনতির) একমাত্র রহস্য। জীব ক্রমাগতই "আমি ইহা" বলিয়া কোন বস্তু ধরিতেছে এবং পরক্ষণেই "আমি ইহা নহি" বলিয়া তাহা দূরে নিক্ষেপ করিতেছে। কোন জীব হয়ত "আমি রসনা" ভাবিয়া সুমিষ্ট আহার্য্যের প্রতি অত্যধিক আকৃষ্ট হইতেছে এবং কিছুকাল পরে "আমি রসনা নহি, আমি মন" ভাবিয়া রসনার তৃপ্তিসাধনে মনোযোগী না হইয়া জ্ঞানার্জ্জনে আসক্ত হইতেছে। যাবতীয় সোপাধিক জীবের নিয়ত এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। জগতে যত কিছু বিপরীত (opposite) আছে, সৃষ্টি লয়, প্রকৃতি পুরুষ, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, সুখ দুঃখ, আশা ভয়, জন্ম মৃত্যু, পাপ পুণ্য, জ্ঞান অজ্ঞান, চেতন অচেতন, শীত গ্রীষ্ম, দিবা রাত্রি, জোয়ার ভাঁটা, শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষ, উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন, নিশ্বাস প্রশ্বাস, জাগরণ সুষুপ্তি, দেব অসুর, স্বর্গ নরক, সত্যযুগ কলিযুগ, উর্দ্ধ অধঃ, আদান প্রদান, হিংসা প্রেম, উত্থান পতন—এই সমুদায়ই চক্রবৎ পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভূত ও তিরোহিত হইতেছে এবং ইহারা "আমি এই সব" এবং "আমি এই সব কিছুই নহি"—আমার এই দুই যুগপৎ চিন্তার অবশ্যম্ভাবী ফল। আবার "আমি এই সব" এবং "আমি এই সব কিছুই নহি" যুগপৎ এই দুই চিন্তা প্রকৃত পক্ষে একটি মাত্র চিন্তাতে পর্য্যবসিত হইতেছে—"আমি" কেবল "আমি" (অন্য কিছুই

নহি)। অতএব "আমি"ই একমাত্র সৎ,- স্বরূপাবস্থায় থাকিয়া "আমি"ই আমার সত্ত্বা উপলব্ধি করিতেছি, এবং তাহার ফলে এই জগদাদি কল্পনা স্বতঃই আমার মধ্যে উত্থিত ও বিলীন হইতেছে। ওঁ তৎসৎ॥

কলিকাতা } শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী বি,এ।
১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯০৭।

---

# সাধন-পন্থা।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর। )

৯

মানবের যে পুনর্জন্ম হয় হিন্দুকে এ কথা শিখান অনাবশ্যক। আমাদিগের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই তাহা জানেন। ভিখারীরা পর্য্যন্ত পুনর্জন্মবাদসূচক গান গাহিয়া গৃহে গৃহে মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করে। হিন্দু জন্মান্তর বিশ্বাস করেন; কর্ম্ম ও কর্ম্মফলে তাঁহার অটল বিশ্বাস আছে। এই বিশ্বাসই হিন্দুর বিশেষত্ব। জন্মান্তর না থাকিলে ক্ষুদ্র দুর্ব্বল মানবের পক্ষে পূর্ব্ব কথিত উচ্চ অবস্থাপ্রাপ্তি অসম্ভব হইত। যে দুর্গম সুদূর সাধন-পথের কথা বলা হইয়াছে তাহা এক জীবনের এই অল্পকাল মধ্যেই অতিক্রম করা কতদূর সম্ভব? একজন সদ্যজাত শিশু কি পূর্ণবয়স্ক যুবার কার্য্য করিতে সক্ষম হয়? ঠিক সেইরূপ নবাগত মানব জীবাত্মা কি যোগীদিগের দৈবশক্তি এক জন্মেই লাভ করিতে পারে? আমরা যে মানবের পূর্ণবিকাশের কথা বলিয়াছি, আমরা যে তাহার দৈবশক্তির বিষয় আলোচনা করিয়াছি পুনর্জন্ম না মানিলে এই সমস্ত কবির কল্পনা বলিয়া মনে হইবে। মানব প্রতিজীবনে যে সমস্ত কর্ম্ম করিতে থাকে তাহার পরিপাকে তাহার চরিত্র গঠিত হয়। এই জীবনের আমাদিগের বর্ত্তমান চরিত্র পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারে গঠিত হইয়াছে। আবার

এই জন্মে যে সকল কর্ম্ম করিতেছি তাহার পরিপাকে ভবিষ্যৎ জন্মে আমাদিগের স্বভাব গঠন করিয়া দিবে। জন্ম-জন্ম পবিত্র কর্ম্মের ফলে মানব উন্নত হইতে অধিকতর উন্নত হইতে থাকে এবং অবশেষে চরিত্রের ও শক্তি বিষয়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে তিনি মহাত্মা বলিয়া অভিহিত হন। মানবের এইরূপ উন্নতি সম্ভবপর,—ইহা যদি বিশ্বাস করিতে হয় তাহা হইলে পুনর্জ্জন্ম বিশ্বাস না করিলে চলিবে না। এই পুনর্জ্জন্মের উপরেই আমাদের ক্রমোন্নতি ও শেষে পূর্ণ-বিকাশ নির্ভর করিতেছে।

এ জগতে কেহ কেহ মানবদেহ লাভ করিয়া মোহবশে ও অভিমান সহকারে প্রতিষিদ্ধ বা বিহিত কর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া স্বর্গ হইতে নরক বা নরক হইতে স্বর্গে পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করিয়া থাকে। কেহ বা বিহিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল রাগবশে নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করতঃ নরক হইতে নরকান্তরে পুনঃ পুন পরিভ্রমণ করে। আবার সেই এই মানবেরই কেহ কেহ প্রাক্তন পুণ্যশালী মহাত্মা বিচার বলে দিব্য দৃষ্টি লাভ করিতে সমর্থ হইয়া এই সংসারের কৃষ্ণরূপ নিগড়কে ছিন্ন করতঃ সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মপদ লাভ করিতে সক্ষম হন। রাজস ও সাত্ত্বিক প্রকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তি কতিপয় জন্ম ভোগ করিয়াই অনায়াসে মুক্ত হয়। তাঁহারা জন্মের পর হইতে শুক্ল পক্ষীয় চন্দ্রের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে থাকেন। তিনি প্রথম প্রথম বহু জন্ম ধরিয়া ধর্ম্ম জীবন ও পরহিতে আত্মোৎসর্গ অভ্যাস করিতে করিতে তাঁহার উচ্চতর ভাব ও শক্তি বিকশিত করেন। সংসার ও পৃথিবীর সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে তিনি সাধন-পথের উচ্চস্থান অধিরোহণ করেন। তখন তাঁহার অপরাপর সহযাত্রী বহু নিম্নে পড়িয়া থাকে। আমাদিগের এই সংসারের এমন কতশত স্ত্রী ও পুরুষ আছেন যাঁহারা পরার্থপরতায়, মানসিক শক্তি, বুদ্ধি, পবিত্রতা, ভক্তি, প্রেম, ও আধ্যাত্মিকতায় সাধারণ মানবকে অনেক অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন।

এই সংসার প্রপঞ্চে সমুৎপন্ন দেহীগণের পক্ষে অপবর্গ লাভের দুইটী উত্তম ক্রম আছে। একটী ক্রম এই যে গুরুর নিকটে সদুপদেশ গ্রহণ করিয়া সাধনা করিতে করিতে এজন্মে অথবা অন্য জন্মান্তরে মোক্ষপ্রাপ্তি দ্বিতীয় ক্রম এই যে যেমন অকস্মাৎ আকাশ হইতে কাহার ভাগ্যে ইষ্টফল পতিত হয় সেই

প্রকার কোনও গুরুর সাহায্যব্যতিরেকে স্বীয় বুৎপন্নচিত্তের সাহায্যে আত্মজ্ঞানলাভান্তর মোক্ষ।

আমরা এই দুইটী ক্রমের বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করিব। সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আধ্যাত্মিক শক্তির স্রোত প্রবাহমান। তাহারি ভাব লইয়া জগৎ মাঝে নানা ধর্ম্ম ও বিধিনিয়ম প্রচারিত ও প্রবর্ত্তিত আছে। সাধক প্রথম প্রথম এই সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন ও ধর্ম্মাচরণ করিতে থাকেন। অবশেষে যখন সাধারণ মানব হইতে তাঁহার বিশেষ শক্তি, জ্ঞান, পবিত্রতা, প্রেম, ও আধ্যাত্মিকতার বিকাশ আরম্ভ হয়, তখন জগৎ-গুরুদিগের মধ্যে একজন আসিয়া তাঁহার সাধন মার্গের পথ-প্রদর্শক হন ও সাধারণ ধর্ম্ম হইতে বিভিন্ন এক সনাতন গুহ্য-ধর্ম্ম আশ্রয় করিতে আদেশ করেন।

সাধারণ ধর্ম্ম হইতে যে সাধকের ধর্ম্ম বিভিন্ন তাহা ভগবান ব্যাসদেব শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে বেশ বুঝাইয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ঠিক প্রারম্ভে যখন ভগবান,অর্জ্জুনের রথ উভয় সেনার মধ্যবর্ত্তী স্থাপিত করিয়াছিলেন,অর্জ্জুন এই উভয়দলের সৈন্য ও আত্মীয় স্বজন দেখিয়া বিষণ্ণভাবে শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,"হে ভগবন্,যে বিজয় লাভ করিতে হইলে এই বন্ধু ও আত্মীয়ের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী আমি সে বিজয় চাহি না। এই সমস্ত মহানুভব গুরুগণকে হনন করিয়া আমি রাজত্ব অভিলাষ করি না। ইহাঁদিগকে নিধন করিলে কেবল পরলোক কেন ইহলোকেও আত্মীয়গণের রুধিরযুক্ত অর্থকামের উপভোগ করিয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইবে।" বাস্তবিক অর্জ্জুনের সমস্ত কথাই প্রচলিত ধর্ম্ম ও নীতি অনুযায়ী—যে ভীষ্ম ও দ্রোণ তাঁহার শিক্ষক ও গুরু তাঁহাদেরি বিরুদ্ধে তাঁহাকে অস্ত্র ধারণ করিতে হইবে, ইহা কি ধর্ম্ম? অর্জ্জুনের এই আবেদনের উত্তরে ভগবান কি বলিয়াছিলেন? "হে অর্জ্জুন, তুমি সুবুদ্ধি লোকের ন্যায় অনেক কথা বলিলে, আবার বুদ্ধিমানের অকর্ত্তব্য কার্য্যও করিতেছ।" বাস্তবিক সাধারণ নীতি ও ধর্ম্ম যে মার্গ ইঙ্গিত করে, এইরূপ সময় আসিয়াছে যখন অর্জ্জুনকে তাহা পরিত্যাগ করিয়া আধ্যাত্মিক পথে পদার্পণ করিতে হইবে। বৈদিক কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত যোগীর পথে অগ্রসর হইতে হইবে। বেদের বা শ্রুতির তাৎপর্য্য—মানবের ভিতর কতকগুলি শক্তি ও

গুণ বিকশিত করিয়া দেওয়া ;—সেই কার্য্য শেষ হইলেই তাহাকে অপর ধর্ম্ম-পথে—গুহ্য পথে অগ্রসর হইতে হইবে। যখন বাহ্য বৈদিক ধর্ম্মে আক্রান্ত হইয়া ভারতে কেবল বাহ্য ধর্ম্মের আস্থা বাড়িয়া গিয়াছিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেই সময়ে আবির্ভূত হইয়া তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন গোপলীলা অনুশীলন করিলে আমরা ইহা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব।

উপনিষদেও ঠিক এই শিক্ষা দিতেছেন।

> তদেতদৃচাঽভ্যুক্তং ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ। স্বয়ং জুহ্বতে একর্ষিং শ্রদ্ধয়ন্তঃ তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত শিরোব্রতং বিধিবদ্যৈস্তু চীর্ণম্॥ মুণ্ডক ৩।২।১০।

ইহাই হইল মোক্ষ প্রাপ্তির প্রথম ক্রম। আমরা দ্বিতীয় ক্রম মহর্ষি জনকের উদাহরণে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। পূর্ব্বে মহানুভাব মহাত্মাগণ আকাশপতিত আকস্মিক ফলের ন্যায় আকস্মিক বিবেকরূপ ফললাভ করিয়া জন্ম জন্মান্তরার্জ্জিত সুখ দুঃখময় কর্ম্মজাল ছিন্ন করতঃ কিরূপে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, রাজর্ষি জনকের বৃত্তান্তে তাহা বেশ বুঝা যায়।

একদা নববসন্ত সমাগমে লতিকা সকল নূতন শোভা ধারণ করিলে রাজা জনক প্রকৃতির নব শোভা উপভোগ করিতে, উন্মত্ত কোকিলকুলের মধুর কুহুরবে কাকুলিত, লতাপুষ্পে বিরাজিত, এক উপবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সেই নিভৃত কুঞ্জে উপবিষ্ট হইয়া মহারাজ জনক বসন্ত শোভা বিলোকন করিতেছেন এমন সময়ে অদূরে অকস্মাৎ এক সঙ্গীত-লহরী শুনিতে পাইলেন। যাঁহারা অদৃশ্যভাবে এই লোকে বিচরণ করেন তাদৃশ সিদ্ধ পুরুষগণই আত্ম-ভাবনাময় গান গাহিতেছিলেন। সেই বৈরাগ্য-উদ্দীপক সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া মহারাজ জনকের হৃদয় অকস্মাৎ বিষাদরসে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি রাজধানীতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক নির্জ্জনে গৃহে উপবিষ্ট হইয়া অতি চঞ্চল সংসারের গতি সকল চিন্তা করিয়া একেবারে তাহাতে অনাসক্ত হইলেন। তিনি মনে মনে ইষ্ট অনিষ্ট বাসনা পরিত্যাগ করিয়া রাজ্য মধ্যেই সমুদয় কার্য্য করিতে লাগিলেন। তদীয় চিত্ত কোনরূপ আনন্দ ব্যাপারে উল্লাসিত হইত না ও দুঃখ তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারিত না। তখন তিনি সর্ব্ব ভূতের

অন্তস্তত্ত্ববিদ্; তিনি সর্ব্বস্বরূপ হইয়া স্বীয় চিৎশক্তি মধ্যে নিজ স্বরূপেই নিখিল ভাব দর্শন করিতে লাগিলেন। ইহাই হইল দ্বিতীয় ক্রম।

(ক্রমশঃ)

জনৈক বিদ্যার্থী।

---

# মানবের ইতিবৃত্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

## দ্বিতীয় অধ্যায়।

### মানবের দৈহিক ইতিবৃত্ত।

### ১। মানবদেহ।

মানবদেহের আদ্যোপান্ত বর্ণনা করা বড় কঠিন ব্যাপার। আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ এই দেহের অংশবিশেষের মাত্র বর্ণনা করিতে গিয়া তাহার জটিলতা অনুভব করিয়া স্তম্ভিত হন। বস্তুতঃ এই দেহ অত্যাশ্চর্য্য কারুকার্য্যময় একটী যন্ত্র বিশেষ। এই পৃথিবীর উদ্ভিজ্জ, প্রাণী প্রভৃতি যাবতীয় প্রধান প্রধান রাজ্যে যে সকল প্রাণের বীজ পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, তাহা এক মানবদেহেই বিদ্যমান দেখা যায়।

মানবদেহ সম্বন্ধে জানিতে হইলে, পূর্ব্ব পিতৃগণ সম্বন্ধে বিস্তৃতরূপে জানা নিতান্ত আবশ্যক। কারণ এই দেহের সঙ্গে তাঁহাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। প্রকৃত পক্ষে তাঁহারাই এই দেহের নির্ম্মাতা ও শাসনসংরক্ষণকর্ত্তা। প্রথমে তাঁহারা এই দেহের আদর্শ প্রস্তুত করেন, তদবলম্বনে এই স্থূলদেহ গঠিত হইয়া ক্রমোন্নতিতে বর্ত্তমান অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। এই পিতৃগণ সম্বন্ধে বহুকাল ব্যাপিয়া একটা গোলমাল চলিয়া আসিতেছে দেখা যায়। প্রথমতঃ মূল পিতৃগণ নানা মূর্ত্তিতে এই ধরাতলে পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহারা

প্রত্যেক গ্রহচক্রে, ভিন্ন ভিন্ন কালাবর্ত্তে বিভিন্নাকারে অবতরণ করিয়াছেন। তৎপরে তাঁহারা মানব শরীরে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছেন এবং বিভিন্ন আকারে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া দেখা যায়। তাঁহারা বিভিন্ন সময়ে নানারূপে এই ধরণীতলে আবির্ভূত হইলেও তাঁহাদের মধ্যে এই একটী বিশেষত্ব সর্ব্বদাই বর্ত্তমান দেখা যায় যে, তাহারা মানবের স্থূল দেহের অধিপতি। তাঁহারা এই অত্যাশ্চর্য্য দেহযন্ত্র নির্ম্মাণের সুচতুর ও সুকৌশলী শিল্পী, তাঁহারা ইহার নির্ম্মাতা ও নিয়ামক। দ্বিতীয়তঃ, এই "পিতৃ" শব্দ অগ্নিস্বাত্তা পিতৃগণেও প্রয়োগ করা হইয়াছে; কিন্তু মানবদেহের সঙ্গে তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই।

## ২। পিতৃগণ।

পিতৃগণ সাত ভাগে বিভক্ত, যথা :—অগ্নিস্বাত্তা, সৌম্য, হবিষ্মান্, উষ্মপ, সুকালী, বর্হিষদ ও আজ্যপ। তন্মধ্যে অগ্নিস্বাত্তা, সৌম্য, হবিষ্মান্ এই তিন উচ্চ শ্রেণীর পিতৃগণ "অগ্নিস্বাত্ত" এই সাধারণ নামে অভিহিত। তাঁহারা অরূপ (Arupa), অবয়ব বিহীন। দেবগণের সঙ্গে তাঁহাদের বিশেষ সম্বন্ধ। সময় সময় তাঁহাদিগকে দেবগণের পিতৃপুরুষ বলা হইয়া থাকে। তাঁহারা মানবজাতির জ্ঞানের অধীশ্বর ও পরিবর্দ্ধক, তখন তাঁহারা মানস পুত্র নামে খ্যাত। এই অগ্নিস্বাত্তা পিতৃগণ ব্যতীত আরও দেবগণ এই মানস পুত্র শ্রেণীর অন্তর্গত।

উষ্মপ, সুকালী, বর্হিষদ্ ও আজ্যপ এই চার নিম্ন শ্রেণীর পিতৃগণ "বর্হিষদ্" এই সাধারণ নামে খ্যাত। তাঁহারা মানবের স্থূল দেহের নির্ম্মাতা। প্রকৃতপক্ষে তাহারাই মানবজাতির পূর্ব্ব পুরুষ। এই চার শ্রেণীর সাধারণ নাম "বর্হিষদ্" আবার তদন্তর্গত একজাতীয় পিতৃগণও এই নামে আহুত হওয়ায় সময় সময় নানা গোলমাল উপস্থিত হইয়া থাকে। এই শেষোক্ত চার শ্রেণী রূপপিতৃগণ Rupa Pitris)। তাঁহারা অবয়ব বিশিষ্ট। তাঁহারা মানবজাতির স্থূলদেহ নির্ম্মাণ ও এই দেহের উন্নতি বিধান করিয়া থাকেন। এই প্রবন্ধে বর্হিষদ্ পিতৃ বলিলে শেষোক্ত নিম্ন চার শ্রেণীর পিতৃগণকে বুঝিতে হইবে।

## ৩। পিতৃলোক।

এই বর্হিষদ্‌ পিতৃগণ চন্দ্রলোক (সোম গ্রহ) হইতে আসিয়াছেন। চন্দ্রকে স্বর্গের দ্বার স্বরূপ বলা যায়, যেহেতু চন্দ্রলোক কথিত পিতৃগণের আবাসস্থান। সাধারণতঃ মৃত্যুর পর মানুষ প্রেতলোক হইতে মুক্ত হইয়া প্রথমে পিতৃলোকে (চন্দ্রলোকে গমন করে, পরে তথা হইতে স্বর্গে যায়। নৈসর্গিক নিয়মেও চন্দ্র প্রকৃতই দ্বার স্বরূপ, এই দ্বার দিয়া চন্দ্রলোকবাসিগণ পৃথিবীতে আগমন করিয়া থাকে। পিতৃগণ সোমমণ্ডল হইতে এই পার্থিব মণ্ডলে আসিয়াছেন বলিয়া, বিশেষতঃ তাঁহারা চন্দ্রের অধিপতি হওয়ায়, তাঁহাদিগকে সোমপিতৃগণ বলা হয়।

## ৪। সোম পিতৃগণে ও সোম মণ্ডলের ভূতপূর্ব্ব সাধারণ জীবগণে প্রভেদ।

বর্ত্তমান পার্থিব মণ্ডলের অব্যবহিত পূর্ব্বেই গিয়াছে সোমমণ্ডল। কাজেই উভয় মণ্ডলে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। আমরা এখন যাঁহাদিগকে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ ও মহাত্মা বলিয়া প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকি তাঁহারা মনুষ্য-রূপে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করতঃ যুগ যুগান্তর ব্যাপিয়া উন্নতি সাধনের পর কালসহকারে জন্ম মৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান মানব-জাতিরূপ যৎসামান্য অঙ্কুরের তুলনায় তাঁহারা সুগন্ধযুক্ত প্রস্ফুটিত পুষ্প বিশেষ। তাঁহারা এই নশ্বরজগতের যাবতীয় অবস্থায় অতিক্রম করিয়াছেন। এখন তাঁহারা বাহ্যজগতের ও নৈসর্গিক নিয়মাদির অধীশ্বর হইয়া মানব-জাতির অভিভাবক, উপদেষ্টা এবং রক্ষাকর্ত্তা স্বরূপ অন্তরালে অবস্থিতি করিতেছেন। ঠিক সেইরূপ সোমমণ্ডলে সোমপিতৃগণ ক্রমশঃ উন্নতি সোপানে আরোহণ করিতে করিতে কথিত মণ্ডলের যাবতীয় বস্তু তাঁহাদের আয়ত্বাধীনে আনিয়া ইচ্ছামত প্রয়োগ করিতে পারিতেন। অধিকতর উন্নতি সাধন করার মানসে এই পদার্থসমূহকে তাঁহারা এই পৃথিবীতে আনয়ন করিয়াছিলেন। এই জন্য গুপ্তবিদ্যায় তাঁহাদিগকে চন্দ্রাধীশ্বর বলা হয়। তাঁহারা আরও নানা নামে অভিহিত। সোমমণ্ডলের ভূতপূর্ব্ব সাধারণ

জীবগণের ( Ex-Monads of the Lunar chain ) সঙ্গে এই পিতৃগণের কোন সম্পর্ক নাই, ইহা যেন বেশ মনে থাকে, নতুবা গোলমাল বাঁধিবে। তবে আমরা যেমন এখন মহাজ্ঞানী ও পরম দয়ালু মহাত্মাদের তত্ত্বাবধানে উন্নত হইতেছি, তাহারাও সেইরূপ উক্ত পিতৃগণের সাহায্যে উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান মানবজাতির অধিকাংশই এই সোম-মণ্ডলের ভূতপূর্ব্ব জীবগণে পূর্ণ, অধিকন্তু আমাদের প্রাণী ও উদ্ভিদ্ রাজ্যও তাহাদের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া আছে। তাহাদিগকে পিতৃগণ বলা হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহারা কখনই অত্যুন্নত সোমপিতৃগণ নহেন। এতদুভয় শ্রেণী পরস্পর সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ও পৃথক, এমন কি, উভয়ে আকাশ পাতাল প্রভেদ।

মানুষ মরিয়া প্রথমে প্রেতলোকে যায়, তথা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বর্গে যাইবার পথে পিতৃলোকে গমন করে। তথায় তাহারা অত্যুন্নত পিতৃগণের রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানে থাকে। সময় সময় এই পরলোকগত, পিতৃলোক প্রাপ্ত মানবগণের পিতৃপুরুষ বলায় অনেক সময় নানা গণ্ডগোল উপস্থিত হয়, প্রকৃত পিতৃগণকে সর্ব্বদাই শ্রাদ্ধে প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে এই বলিয়া আহ্বান ও ভক্তি করা হইয়া থাকে।

ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ।

তাহারা পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার মানস পুত্রগণের বংশধর ও চন্দ্রের অধিপতি এবং মানবজাতির স্থূলদেহের নির্ম্মাতা ও উন্নতি বিধান কর্ত্তা।

গীতা মাহাত্ম্যে আছে

পিতৄন্নুদ্দিশ্য যঃ শ্রাদ্ধে গীতা পাঠং করোতিহি!
সন্তুষ্টাঃ পিতরস্তস্য নিরয়াদ্ যান্তি স্বর্গতিম্॥
গীতা পাঠেন সন্তুষ্টাঃ পিতরঃ শ্রাদ্ধতর্পিতাঃ।
পিতৃলোকং প্রয়ান্ত্যেব পুত্রাশীর্ব্বাদ তৎপরাঃ॥

ইহারাই মানবজাতির পূর্ব্বপুরুষগণ। তাহারা শ্রাদ্ধতর্পিত হইয়া প্রেতলোক হইতে স্বর্গরাজ্যে গমন করেন। অতএব আবার বলিতেছি, এই দুই শ্রেণীতে যে অত্যন্ত প্রভেদ, তাহা যেন মনে থাকে।

## ৫। পিতৃগণের উৎপত্তি।

সৌমমণ্ডলে সৌমপিতৃদেবগণ যখন উন্নতির চরমসীমায় উঠিলেন, তখন তাঁহারা সেই মণ্ডলাধিপতির অঙ্গে বিলীন হইয়া নির্ব্বাণ লাভ করিলেন, তাঁহার সত্তায় লীন হইয়া তাঁহারই স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন এবং ভাবী জীবনের বীজ স্বরূপ তাঁহার সঙ্গে নিহিত রহিলেন। সেই অধিপতির নবকলেবর স্বরূপ যখন বর্ত্তমান চতুর্থ (পার্থিব) মণ্ডলের অভ্যুদয়ের কাল আসিল, তখন সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার সান্ধ্যদেহ হইতে এই পিতৃগণ জন্মলাভ করিলেন।

পূর্ব্বোক্ত চারটী মণ্ডল (Planetary chain) লোকপিতামহ ব্রহ্মার চারটী অঙ্গস্বরূপ। প্রথমটী তামসদেহ, দ্বিতীয়টী দিবাদেহ, তৃতীয়টী সৌম বা সান্ধ্য-দেহ; চতুর্থটী পার্থিব বা প্রত্যূষদেহ। ব্রহ্মার সান্ধ্যদেহ হইতে কথিতরূপে উৎপন্ন বলিয়া এই পিতৃগণকে সান্ধ্য পিতৃগণ, ইচ্ছাপ্রসূত, (the Will born) এবং কখনও কখনও যোগেশ্বরগণও বলা হইয়া থাকে। তাঁহারা অযোনি-সম্ভব; জন্মরহিত বলিয়া সময় সময় তাঁহাদিগকে স্বয়ম্ভুবও বলা হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণে এবং বরাহপুরাণে আছে :—"ব্রহ্মা নিজকে জগতের পিতা ও অধিপতি বলিয়া ভাবিলেন। তৎপর তাহা হইতে কিরূপে জীবলোকের উৎপত্তি হইবে, এই বিষয় ভাবিতে ভাবিতে যখন তপঃ ও ধ্যানমগ্ন হইলেন, তখন তাঁহার সান্ধ্য দেহ হইতে এই সৌম পিতৃগণের উদ্ভব হইল। *

স্থূল শরীরের উন্নতি কল্পে এই পিতৃগণ মানবকে লিঙ্গদেহ (Etheric Double), প্রাণ, কামদেহ এবং মনের অঙ্কুর মাত্র প্রদান করিয়াছিলেন। এতাধিক দিবার তাঁহাদের কোন অধিকার ও ক্ষমতা ছিল না।

এই সকল পিতৃগণ মৃত্যুপতি যমরাজের অধীনে আছেন। ধর্ম্মরাজ যমকে এজন্য পিতৃপতি বলা হয়। এই যমরাজ হইতে জীবের দেহ পরিবর্ত্তন ও মৃত্যু

---

* সত্ত্বমাত্রাত্মিকামেবততোহন্যাংজগৃহেতনুম্।
পিতৃবন্মন্যমানস্য পিতরস্তস্য জজ্ঞিরে ॥ ৩৩ ॥
উৎসসর্জ্জ পিতৃন্‌সৃষ্ট্বা ততস্তামপি স প্রভুঃ।
সা চোৎসৃষ্টা হ্যভবৎ সন্ধ্যা দিননক্তান্তরস্থিতিঃ ॥ ৩৪ ॥

বিষ্ণুপুরাণ। ১ম অংশ। ৫ম অধ্যায়।

ঘটে। কাজেই তাহারা মানবকে বিনশ্বর দেহ ও ক্ষণভঙ্গুর রূপ প্রদান ভিন্ন তাহাদের অবিনশ্বর ভাগ বা অংশ (Immortal principles) প্রদানে অসমর্থ। মানবজাতি তাহাদের বংশধর, এজন্য তাহারা যমরাজের অধীন। এ জন্যই এই পৃথিবীবাসী জীবে ও বুধগ্রহবাসী জীবে অনেক তফাৎ, কারণ বুধগ্রহবাসীগণ অমর, কিন্তু এই পার্থিব মানবগণ মর (mortal)। কিন্তু এই মণ্ডলে উন্নত হইয়া কালে পিতৃগণ যমের অধিকার বহির্ভূত হইবেন। পরবর্ত্তী পঞ্চম মণ্ডলে তাহারা মানসপুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়া মৃত্যুর অধিপতি হইবেন।

প্রথম চক্রে পিতৃগণের আবির্ভাব। এই হইল পিতৃগণের সঙ্গে প্রথম দেখা। তাহার পর প্রথম চক্রের আরম্ভে তাহারা আবির্ভূত হইলেন।

দিব্য চক্ষে যোগীগণ এই প্রথম চক্রের কিরূপ চিত্র ও দৃশ্য দেখিতে পান? উদ্বেলিত, আন্দোলিত, ঘূর্ণায়মান্ আগ্নেয় পদার্থ পুঞ্জ। ভয়ানক শব্দায়মান্, বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় উদ্ভাসিত, তরঙ্গায়িত, অতি চঞ্চল সূক্ষ্ম পদার্থ রাশি ধীরে ধীরে অতি সূক্ষ্ম সপ্তাকারে তিন প্রকারে ঘনীভূত হইতেছে। এই আকৃতি সকলকে আকার না বলিলেও চলে। কারণ এই সপ্তাকৃতির মধ্যে আমাদের এই ভাবী পৃথিবীর আকার তখন অপেক্ষাকৃত স্থূল ছিল, দিব্য দৃষ্টিতে এই পৃথিবীর উক্ত প্রথম রূপ অতি অস্পষ্টভাবে দেখা যাইত। সেই রূপটী কেমন? অত্যুজ্জ্বল, স্বচ্ছ, আগ্নেয় সূক্ষ্ম আকাশিক পদার্থ মাত্র। স্তূপাকার, পুঞ্জিকৃত অগ্নিরাশি ব্যতীত প্রথম চক্রে আর কিছুই দেখা যায় নাই। সাতটী গোল আকৃতি অতি অস্পষ্টভাবে দৃষ্টি গোচর হয়। তন্মধ্যে এই পৃথিবীর আকার অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট। তদূর্দ্ধে আগ্নেয় কুজ্ঝটিকার মধ্য দিয়া অস্পষ্ট হইতে অস্পষ্টতর অপর ছয়টী গ্রহের আকার দেখিতে পাওয়া যায়। অপূর্ব্ব, অসীম অগ্নিরাশিতে অনন্ত আকাশ ব্যাপ্ত হইয়া আছে, কখনও কখনও আকার ধারণ করে, আবার তদ্দণ্ডেই তাহা ভাঙ্গিয়া যায়। সেই আকারগুলি কিরূপ? অতি প্রকাণ্ড, অত্যাশ্চর্য্য, অতি ভয়ঙ্কর। সদাকাল অস্থির, অসীম শক্তিশালী!! তৎপ্রতি দৃকপাত করিলে মনে স্বতঃই যুগপৎ দারুণ ভয় ও প্রগাঢ় ভক্তিরসের সঞ্চার হয়।

(ক্রমশঃ)

যুগলসেবক।

# জীবাত্মা।

( পূৰ্ব্বপ্রকাশিতের পর )

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, নামরূপমধ্যে Three fold সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর, জীবাত্মারূপে অবস্থিত—"তদেতৎ অমৃতং সত্যেন চ্ছন্নম্," প্রাণঃ বৈ অমৃতং। নামরূপে সত্যং। তাভ্যাং অয়ং প্রাণঃ ( ঈশ্বর—One Life ) চ্ছন্নঃ। সুতরাং দেখা যাইতেছে আমাদের জীবাত্মায় ঈশ্বর স্বয়ং। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে মায়া বা প্রকৃতি ঈশ্বরের সম্পূর্ণ বশীভূত, কিন্তু তাঁহার (direct Ray) প্রতিবিম্ব—জীব, অবিদ্যার নামরূপের মধ্যে বদ্ধ ও ক্ষমতা হীন। যদিও জীবাত্মা ঈশ্বরাংশ বলিয়া স্বয়ং নিত্য শুদ্ধ ও মুক্ত, কিন্তু ত্রিলোকীর কঠিন উপাধিমধ্যে তিনি বদ্ধবৎ ( বাস্তবিক উপাধি সকলই বদ্ধ, জীবাত্মা চিরকালই যে মুক্ত সেই মুক্ত ); উচ্চস্তরে অতি সূক্ষ্মতম উপাধি মধ্যে তিনি সদাই স্বাধীন। নিম্ন স্তরের কঠিন ভূত সমূহের জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়া প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া পিতার সমান সদা সৰ্ব্বত্র মায়ার অধীশ্বর তাঁহাকে হইতে হইবে—এই জন্যই তাঁহার নিম্নাবতরণ।

'নামরূপে প্রবেশ করিয়া আমি বহু হইব' ঈশ্বর স্বয়ং এই সঙ্কল্প করায় তাঁহার বাসস্থান দেবগণ সাহায্যে নানারূপে নির্ম্মিত হইতে লাগিল। তন্মধ্যে উৎকৃষ্ট মানবদেহ যাহাকে ব্রহ্মপুর কহে—সেই ব্রহ্মপুরে হৃদ্‌পদ্মে যে ক্ষুদ্র আকাশ বিদ্যমান তাহাতেই তিনি সদা বিরাজিত।

"সূর্য্যো যথা সৰ্ব্বলোকস্য চক্ষু
র্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সৰ্ব্বভূতান্তরাত্মা
ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ ॥১১॥ কঠ—৫ম।
"একো বশী সৰ্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা—
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাং ॥ ১২ ॥

পূর্ব্বে ছায়াতপের বর্ণনায় প্রকাশ পাইয়াছে যে যতক্ষণ 'ছায়া' স্বরূপ

ততক্ষণ উপাধি এবং উপাধির গুণ জীবে স্পর্শ করে সুতরাং বাহ্য দোষে তখন জীব লিপ্ত বলা যায়। মুক্তাত্মাগণ কিন্তু ব্রহ্মাত্ম এবং তাঁহারা প্রকৃতি জয় করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা উপাধিগ্রহণ করিলে উপাধিতে কদাচ লিপ্ত হয়েন না। ঈশ্বর যেরূপ সর্ব্বত্র "পদ্মপত্রমিবাম্ভসাবৎ" অবস্থিত, মুক্ত জীবগণ পক্ষেও সেইরূপ জানিতে হইবে। আসক্তিই বন্ধকারক, মুক্তপুরুষ হইতে আসক্তি একেবারে তিরোহিত হইয়াছে। উপরে উদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য্য এই যে সর্ব্বজীবের চক্ষুস্বরূপ সূর্য্য যেরূপ চাক্ষুষ কোন দোষে লিপ্ত হয়েন না, তদ্রূপ "একমেব সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" ঈশ্বর বিশ্বের সুখ দুঃখে লিপ্ত নহেন ॥ ১১ ॥ যিনি এক ও নিয়ন্তা এবং সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, যিনি একই রূপকে বহুধা বিভক্ত করিয়াছেন, যে ধীরগণ তাঁহাকে আত্মস্থরূপে দর্শন করিয়াছেন তাঁহারই অনন্ত, নিত্যসুখ—অপরের নহে। অপরের নহে অর্থে যাহাদের আসক্তি চৈতন্যের বিপরীত নামরূপে কিম্বা যাহারা বিবিধ কামনা দ্বারা হৃতজ্ঞান হইয়া অপরাপর দেবতাগণকে ভজনা করে, সেই সেই দেবযাজীগণ, তাহাদের কামনানুযায়ী অঙ্গবিশিষ্ট সেই সেই দেবগণ প্রভৃতিকেই প্রাপ্ত হয় -অনন্ত শান্তিস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় না তাহাদের জন্মমৃত্যুশীল সংসারচক্রে ক্রমাগত ঘুরিতে হয়। যিনি সমস্ত অনিত্য নামরূপমধ্যে একমাত্র নিত্য, চেতন জীব সকলেরও মুখ্যচেতনাস্বরূপ তাঁহাকে আপনার ভিতর এবং আপনা হইতে অভিন্ন, ব্রহ্মচর্য্য এবং তপস্যা দ্বারা এইরূপ জানিতে পারিলেই কেবল, শাশ্বতী শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এতদ্দ্বারা আমরা কিয়ৎপরিমাণে অবগত হইতে পারিলাম যে একই ব্রহ্ম চৈতন্যের দ্বারা সমস্ত বিভাসিত "তমেবভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং, তস্য ভাসা সর্ব্ব মিদং বিভাতি ॥" তিনি প্রকাশিত হইলে সকলই প্রকাশিত, তাঁহারই প্রভা সমগ্র বিশ্বকে বিভাসিত করিতেছে। এবং "অহমেতৎ ন" চিন্তা দ্বারা ব্রহ্ম কর্ত্তৃক তাঁহার চৈতন্য সংহৃত হইলেই "যথা মক্ষিকা মধুকররাজানমুৎক্রামন্তং সর্ব্বা এব উৎক্রামন্তে" মধুচক্র হইতে মধুকররাজের উৎক্রামনে যেরূপ অপরাপর সকল মক্ষিকাই উৎক্রমন করে, তদ্বৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বভূতগত চৈতন্য, যাহা আপাততঃ স্থূল দৃষ্টিতে বহু এবং পৃথক প্রতীয়মান হইতেছে, সকলই সেই অনন্ত মহাচৈতন্যে গিয়া মিলিত হয়। সুতরাং ব্রহ্মই একমাত্র

সত্য। ছান্দগ্য কহিতেছেন "এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যমিতি"; অপর সকলই নামরূপ, মূল প্রকৃতির গুণ বিকার মাত্র—সুতরাং অনিত্য। উপনিষদে "তত্ত্বমসি," প্রণব—ওঙ্কার যেমন এক একটী মহাবাক্য, এবং যেরূপ উহাদের এক একটীকে তিন পৃথক্ অংশে বিভক্ত করিয়া বাক্যার্থ প্রমাণিত হইয়াছে—সেইরূপ "সত্য"ও একটী মহাবাক্য এবং ছান্দগ্য ইহাকে এইরূপে তিনভাগে ভাগ করিয়াছেন:—স,তি, য়ং। তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ অর্থ এইরূপে:—"তৎ যৎ সৎ তদমৃতম্, অথ যৎ তি তৎ মর্ত্যম্, যৎ ইয়ম্ তেনোভে যচ্ছতি॥" ৮, ৩, ৫। স=অমৃত—ব্রহ্ম, তি—অনিত্য বিশ্ব, য়ম্=যাহা উভয়কে একত্রে বদ্ধ করে অর্থাৎ দৈবী প্রকৃতি—যদ্দ্বারা বিশ্ব প্রকাশ করণান্তর পুনরায় ব্রহ্ম আপনাতে সমস্ত চৈতন্য সংহরণ করিতেছেন। সেই সত্য নির্গুণ ব্রহ্মে, ও সগুণ ব্রহ্ম মহেশ্বরে—"ঈশ্বরাণাং ঈশ্বরে"—কোন ভেদ নাই—কারণ তিনিও পূর্ণ এবং ইনিও পূর্ণ—পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে। এবং সগুণ ব্রহ্ম, মহেশ্বর নামরূপ মধ্যে জীবরূপে বহুধা বিকাশিত হয়েন সুতরাং সর্ব্ব জীবচৈতন্য সেই ব্রহ্ম চৈতন্য ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে। আরও ব্রহ্মবিদ্গণ, কাম্য এবং পঞ্চাগ্নি গৃহস্থগণ জীব ও ব্রহ্মকে "ছায়াতপৌ" বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন এবং উপাধিনাশে মহাপ্রলয়ে একই নির্গুণ ব্রহ্ম মাত্র অবশিষ্ট থাকেন তাহাও প্রমাণীকৃত হইয়াছে। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে জীবসমূহ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন—উভয়ের অভেদ সাধনা দ্বারা নামরূপ অলীক—মায়া-মাত্রমিদং বিশ্বং—বোধগম্য হইলেই আত্মজ্ঞান জন্মিবে। ক্রমে ইন্দ্রিয়গণকে মনে লয়, মনকে জ্ঞানাত্মনি অর্থাৎ বুদ্ধিতে লয়, বুদ্ধিকে জীবাত্মায় লয়, এবং জীবাত্মাকে ভিন্ন ভিন্ন জগতের ঈশ্বরে লয়, পরে ঈশ্বরকে মহেশ্বরে বা শান্তমাত্মনিতে লয় করিতে পারিলেই জীব মুক্ত অর্থাৎ জীবব্রহ্মে তখন অভিন্ন হইয়া যায়। যতদিন জীব এইরূপে ব্রহ্মাত্ম হইতে না পারে—যতদিন জীবে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ জ্ঞান বর্ত্তমান থাকিবে -বা আমি—তুমি দ্বন্দ্বভাব থাকিবে ততদিন জীব অমুক্ত। যদিও প্রকৃতপক্ষে জীবাত্মা নিত্য মুক্ত, তথাপি দেহাভিমান বা ভ্রান্তবুদ্ধি বশতঃ দ্বৈতভাব দ্বারা বদ্ধবৎ। যে যে ভাবে আপনাকে দেখিবে বা চিন্তা করিবে, সে সেই ভাবই প্রাপ্ত হইবে—মহর্ষি অষ্টাবক্র কহেন—

"মুক্তাভিমানী মুক্তো হি বদ্ধো বদ্ধাভিমান্যপি।
কিম্বদন্তীতি সত্যেয়ং যামতিঃ সা গতির্ভবেৎ॥"

যাহার যে মতি তাহার গতিও তদ্রূপ—এই কিম্বদন্তি নিতান্ত সত্য। গীতা, উপনিষদাদিও ঐ মত সমর্থন করে। ইহা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানমূলক। যেরূপ যিনি আপনাকে সদা অসুখী মনে করিবেন, যিনি সদা নিরানন্দ এবং নিজের কাল্পনিক ক্লেশ সমূহ সদাই যিনি চিন্তা করিয়া সেই চিন্তাতে মগ্ন থাকেন, তিনি ইহজগতে চিরদিনই অসুখী, এবং ভাবী জীবনেরও অশান্তির কারণ তিনি নিজেই প্রস্তুত করিতেছেন। চিন্তার অদ্ভুত ক্রিয়াশক্তি হইতেই ইহা ঘটিয়া থাকে। সুতরাং যিনি আপনাকে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন জ্ঞান করেন, যাঁহা হইতে দ্বৈতজ্ঞান তিরোহিত হয় নাই তাঁহার পক্ষে একবারে ব্রহ্মে লীন হওয়া সম্ভবেনা। যিনি যে ভাবে ভগবানকে ডাকিবেন, এবং যাঁহার যাদৃশী ভাবনা, তাঁহার সিদ্ধিও সেই পরিমাণে সেই ভাবে হইবে।

জনক ঋষি কহিতেছেন "শরীরং স্বর্গনরকৌ বন্ধমোক্ষৌ ভয়ং তথা।
কল্পনামাত্র মেবৈতৎ কিং মে কার্য্যং চিদাত্মনঃ॥২০॥"

দ্বৈতজ্ঞানযুক্ত মানবের ভয় প্রভৃতি থাকায় তাহারা মুক্ত নহে, কিন্তু আত্মজ্ঞানলব্ধ পুরুষের নিকট এ সমুদায়ই শূন্য - অর্থাৎ তাহাদের ইহা হইতে পারে না।

"দ্বৈতমূলং মহো দুঃখং নান্যত্তস্যাস্তি ভেষজম্।
দৃশ্যমেতন্মৃষা সর্ব্বং একোহহং চিদ্রসোহমলং॥১৬॥

দ্বৈত ভাবই দুঃখের হেতু; পরিদৃশ্যমান সমস্তই মিথ্যা এবং আমি জ্ঞানময়, নির্ম্মল ও অদ্বিতীয়, এই জ্ঞান ব্যতীত উক্ত ক্লেশের অন্য কোন প্রতিকার নাই। সুতরাং "কূটস্থং বোধমদ্বৈতমাত্মানং পরিভাবয়" অষ্টাবক্র ১২—আত্মাকে কূটস্থ চৈতন্য স্বরূপ এবং অদ্বিতীয় বলিয়া জানিবে।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে এস্থলে এইমাত্র বলিতে পারি যে সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের প্রথম প্রতিবিম্ব কুমারগণই আমাদের জীবাত্মা—অর্থাৎ আমরাই সেই পরমাত্মার direct Rays এই জ্ঞান আমাদের মধ্যে দৃঢ়ীভূত হইলে, আমরা অদ্বৈতবাদী—আর যদ্যপি আমাদের Spiritual Triad আমাদের জীবাত্মা এইরূপে ধারণা হয়, তাহা হইলে আমরা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। Monad

আমাদের প্রকৃত জীবাত্মা—তাঁহার সহিত মহেশ্বরের অবচ্ছেদরহিত ভাব। সুতরাং সাধনার দ্বারা আমাদের প্রকৃত জীবাত্মার জ্ঞান উপলব্ধি হইলে, তাঁহাতে মিলিতে পারিলেই ব্রহ্মের জ্ঞান জন্মে এবং জীবব্রহ্মের একত্বও অনুভূত হয়। শঙ্করাচার্য্যকৃত "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের ব্যাখ্যা তখনই প্রমাণিত হইয়া আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইবে, এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীদিগের সামান্য পৃথক্ ভাব আর বর্ত্তমান থাকিবে না—দ্বন্দ্বভাব তিরোহিত হইয়া একাকার সোঽহং জ্ঞান আমাদের উদিত হইবে।

Note 1. Human Monads.

"The myriads of such units ( units of Consciousness,—Monads ) who are to be developed in that coming universe are generated within the divine Life, as germ-cells in organisms, before the field for their evolution is formed." Page 13. A Study in Consciousness.

"This multiplication within the One by the action of Will marks the place of origin—the First Logos, the undivided Lord, the Eternal Father. The life of the Monads is thus of the First Logos, and is therefore of the triple aspect, consciousness existing as Will, Wisdom and Activity; this life takes form ( of rarest film of matter ) on the plane of divine Manifestation, the second, or Anupadaka, Sons of the Father, even as is the Second Logos, but younger Sons." Page 14.

"A Study in Consciousness."

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গোস্বামী।

# প্রাচ্য ও প্রতীচ্য।* ( আদর্শাবলী )

ইহ জগতে কার্য্যসিদ্ধি বাল্যকালে একটী আদর্শের সংগঠন ও চরিত্রকে তদনুরূপে পরিণত করিবার প্রযত্নের উপর নির্ভর করে; এবং ঐ সিদ্ধির রীতি ও ধর্ম্ম নির্ব্বাচিত আদর্শের প্রকারের উপর নির্ভর করে। ইতিহাসোল্লিখিত যাবতীয় মহোদয় ব্যক্তি বাল্যাবস্থা হইতেই তাঁহাদের জীবনযাত্রার গন্তব্য পথ স্থিরীকৃত করিয়া লইয়া উহা অবলম্বনে যাত্রা করিবার উদ্যোগ করণার্থে তাঁহাদের সমগ্র উদ্যম নিয়োজিত করিয়াছেন।

ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির যেমন আদর্শ আছে, পৃথিবীস্থ সকল জাতিরও সেইরূপ আদর্শ আছে, এবং ঐ জাতীয় আদর্শাবলী পৃথিবীস্থ জাতি সমূহের ভাগ্য ও চরিত্রের উপর প্রভূত ক্ষমতা ধারণ করে। এই জাতীয় আদর্শাবলী প্রায়শঃ জাতীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে; অথবা, আরও প্রকৃত ভাবে বলিতে গেলে এই বলিতে হয় যে, যে পর্য্যন্ত জাতীয় কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির প্রতিভার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা প্রত্যক্ষীভূত হইয়া জনসমক্ষে স্পষ্ট ভাবে ব্যক্তীকৃত না হয় তত্তাবৎকাল অজ্ঞাত, অপ্রত্যভিজ্ঞাত ও প্রচ্ছন্নরূপে জাতীয় প্রকৃতির অন্তর্নিহিত ও তৎপূর্ব্ব হইতে অব্যক্ত ভাবে বিদ্যমান এই আদর্শাবলী জাতীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক স্পষ্টীকৃত হইয়া থাকে। অধিকন্তু, এই সকল আদর্শ হইতে সাধারণ মতের উৎপত্তি হয়, এবং তৎপরে ঐ আদর্শ সকল অধিকাংশ লোকের অবিসম্বাদিত চিন্তা সমষ্টি হইতে প্রতিনিয়ত বল প্রাপ্ত হওয়াতে ঐ সাধারণ মত দ্বারাই উহাদের পুষ্টি ও বলসাধন হইয়া থাকে। পুনশ্চ দেখ, কোন বংশ বা জাতির বিশিষ্ট প্রকৃতির মধ্যে, পরিণতিক্রমের যথাগতিতে অগ্রতঃ উপনীত ও একটী না হয় অপর একটী জাতি মধ্যে সন্নিবিষ্ট প্রধান প্রধান বিশিষ্ট গুণ বা আসক্তি সমূহের মধ্যে, ঐ জাতীয় আদর্শবলীর মূল ন্যস্ত রহিয়াছে। পরিণতি প্রণালীর অন্তরালে ক্রীড়মানা শক্তিরূপিনী ঐশী ইচ্ছা কর্ত্তৃক পরিচালিত সুশৃঙ্খল মানব ক্রমোন্নতি পর্য্যায়ে নির্দ্দিষ্টকালে নির্দ্দিষ্ট গুণরাজী বিকাশোন্মুখী হইয়া থাকে। ফল ও পুষ্পাদি উৎপত্তির যেরূপ সময় ও ঋতু আছে, মানব প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন অংশাদির পরিণতিরও তদ্রূপ অবধারিত কাল আছে। সর্ব্বজাতিতেই

* পূর্ব্বে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বলিয়া যে হেডিং প্রকাশিত হইয়াছে,তাহা আদর্শাবলী বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশিষ্ট গুণাবলী নিহিত আছে, এবং যে সকল জীবে——যে সকল আত্মাতে——ঐ বিশিষ্ট গুণাবলী বিকাশোন্মুখ হইয়াছে তাহারা ঐ সকল জাতিতে জন্মগ্রহণার্থে কর্ম্মদ্বারা প্রেরিত হইয়া থাকে। এই বিশিষ্ট গুণসমূহ ঐ সকল জাতির আদর্শালীর মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইবে, এবং ঐ আদর্শাবলী ঐ গুণসমূহকে আকর্ষণ ও উহাদিগের জাতিগত পরিণতি সাধন করিবার উপযোগী হইবে। এই সকল আদর্শই প্রাগুক্তরূপে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের সহজজ্ঞান দ্বারা প্রত্যভিজ্ঞাত হইয়া থাকে এবং উঁহারা উহাদিগকে সর্ব্বজন কর্ত্তৃক প্রতক্ষীকৃত ও পরিকীর্ত্তিত করাইবার জন্য উর্দ্ধোত্তলিত করিয়া ধারণ করেন। প্রত্যেক জাত শিশুর অবয়বের উপর যেরূপ তাহার জন্মস্থানীয় জলবায়ুর অনিবার্য্য প্রভাব, তাহাব উপর তাহার জাতীয় আদশের প্রভাব ও তদ্রূপ। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপিত দক্ষিণ ইউরোপে জন্মগ্রহণ করিলে মনুষ্য শ্যামলবর্ণ, কৃষ্ণকেশ ও কৃষ্ণাক্ষ হয়; উগ্র শৈত্যযুক্ত উত্তর ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করিলে মনুষ্য শুভ্রকায়, কপিলকেশ ও নীলাক্ষ হয়। জলবায়ু দেহকে রঞ্জিত করে; আদর্শ মনকে রঞ্জিত করে। মনুষ্য এই দুইটীরই তুল্যরূপে আয়ত্তাধীন; বাহ্য ও অন্তর্জ্জগত সমভাবে তাঁহার প্রকৃতির উপর ক্রিয়া করিতেছে, এবং ফুস্‌ফুস্‌ দ্বারা যদ্রূপ তিনি বায়ুপ্রবাহ শ্বাসপথে আকর্ষণ করেন, মনদ্বারা ও তদ্রূপ চিন্তাপ্রবাহ অন্তর্গৃহীত করিয়া থাকেন।

গত দেড়শত বৎসরেব মধ্যে পাশ্চাত্য আদর্শাবলীর বহুল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মধ্যযুগের সমাজ ব্যবস্থার অত্রত্য ব্যবস্থাব সহিত অনেক মুখ্য বিষয় সম্বন্ধে প্রবল সৌসাদৃশ্য ছিল, জাতি ব্যবসায় প্রায়শঃ কুল ক্রমাগত ছিল, এবং শ্রেণী বিভাগরেখা সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত ছিল, কেবল ব্যতিরেক মাত্র ছিল এই যে পুরোহিত সম্প্রদায় শ্রেণীনির্ব্বিশেষে নির্ব্বাচিত হইত। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য সময় হইতে, বহুকালযাবৎ অন্তর্নিহিত পরিবর্ত্তনসমূহ ঝটিতি বহির্ভাগে প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ইংলণ্ডে যুদ্ধসাহায্যার্থে জাইগীরদান প্রণালী ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল; ফ্রান্সে সেই বিখ্যাত রাষ্ট্রবিপ্লব-তাড়নে উহা সশব্দে অধঃপতিত হইল; কিন্তু ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্তি দ্বারাই হউক বা অকস্মাৎ পতন দ্বারাই হউক, উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভপূর্ব্বেই উহা বিলুপ্ত হইয়া গেল। মানব পরিণতিপ্রণালীপ্রভাবে পাশ্চাত্য প্রদেশে

স্থূলপদার্থজ্ঞানগ্রাহী, বিচার ও প্রশ্ন তৎপর এবং বিজ্ঞানানুসন্ধিৎসু নিয়াখ্য মনের দ্রুত বিকাশ হইতে আরম্ভ হইল। তোমরা অবগত আছ যে অহংত্ব সৃজনকারী গুণ বা অহঙ্কার হইতেই মনের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং এই মন ইহার নিম্ন ও ভেদদর্শী আকারে সর্ব্বত্রই বৈষম্য দর্শন করে। ইহার ক্রম-বিকাশের সহিত মনুষ্যের নিজ নিজ পার্থক্য জ্ঞানের, "আমিই আমি" এইরূপ স্বগত জ্ঞানের, বৃদ্ধি হইতে লাগিল। "আমিই আমি", "তুমিই আমি", "এইটী আমার", "ঐটী তোমার" ইত্যাকার ব্যক্তিগত মনোভাবের অতিরিক্ত উৎপত্তি ও স্ফুরণ হইতে লাগিল। ঈদৃশ মনোভাবোৎপত্তি ব্যাপার চলিতে চলিতে উহার অন্তর্নিষ্ঠ প্রবৃত্তি দ্বারা প্রেরিত হইয়া পাশ্চাত্য প্রদেশীয় সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি-সম্পন্ন কতিপয় ব্যক্তি এই আমিত্বের ও আমারত্বের জ্ঞানকে বিবৃত করতঃ উহাকে, মনুষ্যের এককত্ব ও স্বাতন্ত্র্য সূচক, অন্যনিরপেক্ষ ও স্বাবলম্বী জীবরূপে তদীয় ব্যষ্টিভাব ব্যঞ্জক, এবং স্বীয় সুবিধার্থে যাবতীয় সক্ষমতা পরিচালনে স্বত্ববান হইয়া বিভিন্ন ও একক ভাবে তদীয় অবস্থান জ্ঞাপক, একটী আদর্শরূপে বরণ করিল। মনুষ্য একক ও সঙ্গনিরপেক্ষ জীব এই ধারণা লোকের মনে সংরূঢ় হওয়াতে, সম্যক্ সমাজ সংস্থান এই ধারণার অভিমুখ হইতে, অর্থাৎ "মনুষ্যস্বত্বের" অভিমুখ হইতে, পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল।

কিন্তু কথা হইল এই যে, এই ব্যষ্টিভাব সমন্বিত ও অনন্যাপেক্ষ প্রাণী-সংখ্যা হইতে সমাজ শরীর কিরূপে গঠিত হইতে পারে? জীন্ জ্যাকোয়েস্ রূসোর সামাজিক চুক্তি ঐ কথায় উত্তর দিল।

"মনুষ্য আজন্ম স্বাধীন"। তাঁহার নিজেরই স্বামীত্ব আছে। তাঁহার আজ্ঞাকারীত্বে কাহারও অধিকার নাই। তাঁহার স্বসম্মতি ব্যতীত কেহই তাঁহাকে আদেশ করিতে পারেন না। যাহা তিনি লইতে পারেন তাহা লইবার ও যাহা তিনি স্বাধিকারে রাখিতে পারেন তাহা রাখিবার তাঁহার স্বত্ব আছে। বাহুবল ও বুদ্ধিবল সংসাধিত কার্য্যের ঔচিত্য স্বতঃই সমর্থিত হইয়া থাকে; "সামর্থ্যই স্বত্ব"। কিন্তু বলবত্তম মনুষ্যও কখন না কখন অবশ্যই হীনবল হইয়া আসিবেন, সময়ে সময়ে সম্ভবতঃ পীড়িত হইয়া পড়িবেন এবং বার্দ্ধক্যের জীর্ণদশায় অবশ্যই উপনীত হইবেন। বলীয়ান ব্যক্তি কেবল বলাবলম্বনেই পরপীড়ন করে, এবং বলাপক্ষয়ে পরদ্বারা

প্রপীড়িত হইয়া থাকে ও শরণ ভিক্ষা করে। ইহা হইতেই "সামাজিক চুক্তির" উৎপত্তি। এতৎ সম্বন্ধে অনুমান এইরূপ যে মনুষ্য, তাঁহার অন্যান্য স্বত্ব পরিরক্ষণ বিনিময়ে, তাঁহার প্রাকৃতিক অন্তর্নিষ্ঠ স্বেচ্ছাচারাধিকারের কিয়দংশ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার বলহীন অবস্থায় তাঁহার অধিকারভুক্ত দ্রব্যাদির উপভোগে যদ্যপি তিনি অপর কর্তৃক সংরক্ষিত হন, তাহা হইলে তাঁহার বলবান অবস্থায় অপরের নিকট হইতে দ্রব্যাদি বল পূর্ব্বক গ্রহণ করিবার ক্ষমতা থাকিলেও তিনি ঐরূপ করিবেন না। এই প্রকারে, "তুমি হত্যা করিতে পারিবে না", "তুমি চুরি করিতে পারিবে না", এবং বিনিময়ে, "তোমাকে কেহ হত্যা করিতে পারিবেনা", "তোমার দ্রব্য কেহ চুরি করিতে পারিবেনা", অথবা, "তোমাকে যদি কেহ হত্যা করে, তোমার দ্রব্য যদি কেহ অপহরণ করে, তাহা হইলে তোমার হত্যাকারী বা তোমার দ্রব্যাপহর্ত্তাকে দণ্ডিত হইতে হইবে" ইত্যাদি বিধির আবির্ভাব হইল। এই ভাবে দৃষ্ট হইলে, পরস্পরের মধ্যে নিষ্পন্ন চুক্তিই আইন বা বিধি সমূহের মূল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কোন মনুষ্যকেই তাহার স্বসম্মতি ব্যতীত শাসনাধীন করা যাইতে পারে না। কোনও মনুষ্যের নিকট হইতে তাহার স্বসম্মতি ব্যতীত কর প্রভৃতি তাহার সম্পত্তির অংশ অপর কেহ হস্তগত করিতে পারে না। ইহাই সমাজ ও রাজ্য সম্বন্ধে প্রজাতন্ত্র বাদের ভিত্তি স্বরূপ। এক ব্যক্তি তোমার দ্রব্য অপহরণ করিল; তাহাকে আঘাত দ্বারা নিক্ষেপিত করিবার ও অপহৃত দ্রব্য আক্রমণ করিবার প্রাকৃতিক অধিকার তোমার আছে, কিন্তু "সামাজিক চুক্তি" অনুসারে তুমি এরূপ অবস্থায় পুলিশ কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া থাক।

নিতান্ত বর্ব্বরদিগের মধ্যে ও প্রাকৃতিক মনুষ্যের অনুমানতঃ অন্তর্নিষ্ঠ যাবতীয় স্বত্বের পরিচালনা হইতে গেলে পারিবারিক কিম্বা সাম্প্রদায়িক সম্মিলন অসম্ভব হইয়া পড়ে। যে কোন অবস্থাতেই হউক, অবশ্যপালনীয় বলিয়া সর্ব্বজন কর্তৃক পরিগৃহীত কতকগুলি নিয়ম সাধারণতঃ প্রয়োজনীয়। অন্ততঃ পরিবার মধ্যে ও সম্প্রদায় মধ্যে হত্যা ও চৌর্য্য অবশ্য নিষিদ্ধ হওয়া উচিত।

ক্রমশঃ

শ্রীসাধুসেবক শর্ম্মা।

# অলৌকিক ঘটনা।

## মৃত ভ্রাতার দর্শন দান।

কলিকাতার প্রায় চারি ক্রোশ উত্তরে পানিহাটী নামে একটী গ্রাম আছে। ঐ গ্রামের ঘোষবংশ ধনে কুলে মানে একটী প্রসিদ্ধ বংশ বলিয়া দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজে উচ্চ আসন অধিকার করিত। কালের কুটিল গতিতে সেই বংশের পূর্ব্বগৌরব লুপ্তপ্রায় হইলেও এখনও সেই বংশোদ্ভূত কেহ "পেনেটীর ঘোষ" বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলে কায়স্থ কুলীন সমাজে বিশেষ মর্য্যাদা লাভ করিয়া থাকেন।

সেই বংশে স্বর্গীয় কালীমোহন ঘোষের দুই পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠের নাম ক্ষেত্রমোহন, কনিষ্ঠের নাম মনোমোহন। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবৎসল জ্যেষ্ঠের স্নেহ ও যত্নে প্রতিপালিত হয়েন। কনিষ্ঠও জ্যেষ্ঠকে পিতার ন্যায় ভক্তি ও সম্মান করিতেন, অধিক কি, অগ্রজ হইলেও তাঁহাকে পিতাস্বরূপ জ্ঞান করিতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ অথবা পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফলে কনিষ্ঠ সংসারের সেই একমাত্র অবলম্বন হইতে বিচ্যুত হয়েন—করাল কাল আসিয়া অকালে অনাথ বালক মনোমোহনের সেই পিতৃতুল্য অগ্রজকে কবলিত করে। আমাদের বর্ত্তমান ইংলণ্ডেশ্বর সপ্তম এড্ওয়ার্ড যুবরাজ অবস্থায় যে বৎসর ভারতের ইংরাজ-রাজধানী কলিকাতা নগরী পরিদর্শনার্থ আগমন করেন সেই বৎসর অক্টোবর মাসে জ্যেষ্ঠ ক্ষেত্রমোহনের মৃত্যু হয়। মনোমোহনের বয়স তখন ১৯ বৎসর।

মনোমোহন বাল্যাবস্থা হইতেই অতিশয় সাহসী ও নির্ভীক ছিলেন। তিনি প্রেতযোনী সম্বন্ধীয় অসংখ্য অদ্ভুত গল্প শুনিয়াছেন কিন্তু কিছুতেই তাঁহার বিশ্বাস হয় নাই এবং ভয় কাহাকে বলে তাহা তিনি জানেন না। যে কোন স্থানে ভূতের উপদ্রবের কথা শুনিয়াছেন ভূত দেখিবার জন্ম নির্ভীক চিত্তে তিনি তথায় গমন করিয়াছেন কিন্তু কিছুই দেখিতে না পাইয়া নিরাশ অন্তঃকরণে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। এরূপ যে তাঁহার কত শতবার

ঘটিয়াছে তাহা বলা যায় না। তবে তাঁহার নিজের জীবনে একটী অদ্ভুত অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছে এবং ঐ ঘটনাটী কি তাহা তিনি নিজে এ পর্য্যন্ত বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। যে রাত্রে ঐ ঘটনাটী ঘটে সেই রাত্রি প্রভাত হইলে তিনি সমবয়স্কবন্ধুদিগের ( যাঁহারা এই ঘটনা ঘটিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই তাঁহার সঙ্গে ছিলেন ) নিকট যাইয়া ঐ অদ্ভুত ব্যাপারের কথা প্রকাশ করিয়া বলেন। তাঁহারা শুনিয়া নিজ নিজ বিশ্বাসমত নানা কথা বলেন, কিন্তু মনোমোহন এ পর্য্যন্ত সেই রহস্যের উদ্ভেদ করিতে পারেন নাই। সে বিষয়ে তিনি অনেক চিন্তা করিয়াছেন এবং ভৌতিক বিষয় সম্বন্ধীয় বহু পুস্তকাদি পাঠ করিয়াছেন কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন স্থির মীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন নাই। সে ঘটনাটী এই—

পূর্ব্বে যুবরাজের আগমনের উল্লেখ করা হইয়াছে। যুবরাজের সেই শুভ আগমনোপলক্ষে কলিকাতা নগরীতে মহা ধুমধাম হয়। ঐ ধুমধাম দেখিবার জন্য নানা দেশদেশান্তর হইতে বহু লোকের সমাগম হয়। মনোমোহনও কতিপয় সমবয়স্ক বন্ধু সমভিব্যাহারে কলিকাতায় উপস্থিত হয়েন। সমারোহ দেখিয়া তাঁহাদের গৃহে প্রত্যাগত হইতে রাত্রি প্রায় ১টা বাজে।

এই উপলক্ষে দেশ দেশান্তর হইতে লোকদিগের গমনাগমনের সুবিধার জন্য রেলওয়ে কোম্পানী অনেক স্পেশাল গাড়ীর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। মনোমোহন ও তাঁহার বন্ধুগণ রেলপথে আসিয়াছিলেন এবং সেই রেলপথেই বাড়ী ফিরিয়া গিয়াছিলেন। রেলপথে পানিহাটী যাইতে হইলে শিয়ালদহ ষ্টেশনে গাড়ীতে উঠিয়া সোদপুর ষ্টেশনে নামিতে হয়। এই ষ্টেশন হইতে তাঁহাদের বাড়ী প্রায় অর্দ্ধক্রোশ পথ হইবে। গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহারা পদব্রজে গৃহাভিমুখে গমন করেন। ক্রমে ক্রমে একে একে সকলে স্ব স্ব গৃহে গিয়া পৌঁছিলেন—শেষে মনোমোহন একা পড়িলেন। যেখানে একা পড়িলেন সেখান হইতে মনোমোহনের বাড়ী প্রায় অর্দ্ধ পোয়া দূর হইবে। সঙ্গীছাড়া হইয়া মনোমোহন একটী পুষ্করিণীর পাড়ের উপর একটী অপ্রশস্ত পথ ধরিয়া যাইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে অকস্মাৎ তাঁহার মনে হইল, যেন কে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। চক্ষু ফিরাইয়া যাহা দেখিলেন

তাহাতে তিনি অতিশয় বিস্মিত ও ভীত হইলেন—দেখিলেন তাঁহার মৃত অগ্রজ ক্ষেত্রমোহন তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে পার্শ্বে আসিতেছেন। নির্ভীক হইলেও মৃত ভ্রাতাকে পার্শ্বে দেখিয়া মনোমোহনের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল কিন্তু তিনি সাহসহীন হয়েন নাই। সহোদর ভ্রাতার নিকট হইতে কোন বিপদের আশঙ্কা না করিয়া সাহসে ভর করিয়া মনোমধ্যে নানারূপ তর্ক বিতর্ক করিতে করিতে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, বাটীর সদর দরজার নিকট উপস্থিত হইয়া আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। এতদ-বস্থায় যাইতে যাইতে পথিমধ্যে তাঁহার বোধ হইয়াছিল যেন তাঁহাকে ভয়-বিহ্বল দেখিয়া তাঁহার মৃত অগ্রজ বলিলেন—"কোন ভয় নেই—আমি সঙ্গে যাচ্চি"। সাহস থাকিলেও এই অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শনে মনোমোহনের মনে বিলক্ষণ ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল এবং সেই ভয়প্রযুক্ত তিনি ভালরূপে বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই সুতরাং এখন ভালরূপ স্মরণও নাই—ঐ কথা কয়েকটী কিরূপস্বরে উচ্চারিত হইয়াছিল এবং মৃত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ক্ষেত্রমোহন কি আকৃতি ধারণ করিয়া—কিরূপবেশে তাঁহাকে দেখা দিয়াছিলেন। মনোমোহন যে এইরূপ অবস্থায় তাঁহার মৃত ভ্রাতাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং উক্ত প্রকার কথা কয়েকটা শুনিয়াছিলেন—ইহা সম্পূর্ণ সত্য। ঘটনাটী অলৌকিক কিন্তু সত্য বলিয়াই ইহা "পন্থায়" প্রকাশিত হইল।

প্রায় ৩২।৩৩ বৎসর হইল এই ঘটনাটী ঘটিয়াছিল। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মনোমোহনের আর কখনও মৃত ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, তবে স্বপ্নে দুই একবার হইয়াছে। মনোমোহন এখনও ইহধাম পরিত্যাগ করেন নাই। এই গল্পের লেখক তিনি স্বয়ং।

ওঁ

# পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ।

১১শ ভাগ | মাঘ, ১৩১৪ সাল। | ১০ম সংখ্যা।

## চৈতন্য কথা।

### কাশকৃৎস্নের সিদ্ধান্ত - শঙ্কর ও রামানুজ।

### ব্রহ্ম সূত্র—প্রথম অধ্যায়।

চতুর্থ পাদ—

তৃতীয় অধিকরণ সূত্র ১১—১৩।

"যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিত" বৃহদারণ্যকের এই বাক্যে "পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" সাংখ্য দর্শনের পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকে বুঝায় না।

চতুর্থ অধিকরণ (১৪—১৫)

বেদবাক্যে সৃষ্টির ক্রম সম্বন্ধে বিরুদ্ধ বাক্য থাকিলেও, স্রষ্টার সম্বন্ধে কোন বিরোধ নাই।

পঞ্চম অধিকরণ (১৬—১৮)

"যো বৈ বালাক এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা যস্য বৈ তৎকর্ম্ম সবৈবেদিতব্যঃ"

কৌষিতকী ব্রাহ্মণের এই বাক্যে 'পুরুষাণাং কর্ত্তা' কে ? শঙ্করের পূর্ব্বপক্ষ—প্রাণ না হয় জীব। রামানুজের পূর্ব্বপক্ষ—প্রসঙ্গানুযায়ী সাংখ্যদর্শনের পুরুষ কি কর্ত্তা ? উভয়েরই মীমাংসা ব্রহ্ম কর্ত্তা।

## ষষ্ঠ অধিকরণ (১৯—২২)

এইরূপ "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদি বাক্যে পূর্ব্বপক্ষ শঙ্কর মতে জীব, রামানুজ মতে সাংখ্য পুরুষ। উভয়ের সিদ্ধান্ত ব্রহ্ম। অর্থাৎ এই শ্রুতিতে আত্মার অর্থ ব্রহ্ম।

কেন শ্রুতিতে আত্ম শব্দে ব্রহ্ম বুঝায়। কেন একই শব্দ জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই দুয়ে প্রযুক্ত হয়। মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে পতি, পুত্রের উল্লেখ আছে। হে মৈত্রেয়ি, পতির জন্য পতি প্রিয় নহে, আত্মার জন্য পতি প্রিয়। সেই আত্মাই আবার শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের বিষয়। অতি সহজে শ্রুতি বাক্যে জীবাত্মা পরমাত্মা হইয়া যায়। ইহার যথার্থ কারণ কি ? জীবাত্মা ও পরমাত্মা কি এক ? তার প্রসঙ্গে ভগবান ব্যাসদেব তিন জন মুনির মত উল্লেখ করিতেছেন—আশ্মরথ্য, ঔড়ুলোমি এবং কাশকৃৎস্ন।

আশ্মরথ্য ঋষি বলেন—"প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গম্"।

প্রকরণে এইরূপ প্রতিজ্ঞা আছে "আত্মনি বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" আত্মা বিজ্ঞাত হইলেই সকলই বিজ্ঞাত হয়। এই সকলই আত্মা।

এই প্রতিজ্ঞা দ্বারা জানা যায় আত্মা পরমাত্ম হইতে ভিন্ন হইলেও অভিন্ন। আশ্মরথ্যের এই ভেদাভেদবাদ ভামতীকার বাচস্পতি মিশ্র আপন টীকায় বিশদ করিয়াছেন।

"অগ্নির স্ফুলিঙ্গগণ অগ্নি হইতে একান্ত ভিন্ন নহে, কারণ স্বরূপতঃ স্ফুলিঙ্গগণ অগ্নি। এবং একান্ত অভিন্নও নহে, কারণ তাহা হইলে অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গের ভেদ করা যাইত না, এবং এক স্ফুলিঙ্গ হইতে অন্য স্ফুলিঙ্গেরও ভেদ হইত না। সেইরূপ জীব সকল ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়া ব্রহ্ম হইতে একান্ত ভিন্ন নহে, কারণ চৈতন্যই তাহাদের স্বরূপ। আবার একান্ত অভিন্নও নহে, কারণ তাহা হইলে তাহাদের ব্যক্তিগত ভেদ থাকিত না। আর যদি তাহারা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন ও সর্ব্বজ্ঞ হইত, তাহা হইলে

জীবের প্রতি উপদেশ নিরর্থক হইত। এই জন্য জীবসকল ব্রহ্ম হইতে কতক ভিন্ন ও কতক অভিন্ন।"

আশ্মরথ্য ঋষির সাপক্ষে রামানুজ স্বামী দুইটী শ্রুতি বাক্যের উল্লেখ করেন।

"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ" ঐতরেয় আরণ্যক।

"যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তি সরূপাঃ।
তথা ক্ষরাদ্বিবিধাঃ সৌম্যভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিয়ন্তি।"

মুণ্ডক উপনিষৎ।

ঔড়ুলোমি ঋষি বলেন—"উৎক্রমিষ্যত এবং ভাবাৎ।"

অবশ্য জাগ্রত অবস্থায় জীব ও পরমাত্মা ভিন্ন। কিন্তু উৎক্রমণ করিলে জীবের পরমাত্মভাব হয়। অর্থাৎ যদিও জীব বাস্তবিক পরমাত্মা হইতে ভিন্ন, তথাপি ভাবান্তর হইলে জীবের পরমাত্মত্ব হয়। তবে কি যে সে জীব উৎক্রমণ করিলে পরমাত্মা হয়? তা নয়। "বিজ্ঞানাত্মা বা জীব দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সঙ্ঘাতরূপ উপাধি সম্পর্কে কলুষীভূত। জ্ঞানধ্যানাদি সাধনের অনুষ্ঠান করিয়া জীব সংপ্রসন্ন হইলে, তখন উৎক্রমণান্তর তাহার পরমাত্মার সহিত ঐক্যোপপত্তি হয়।" শঙ্কর।

এই মতের সমর্থনে নিম্নলিখিত শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করা যায়--

"এষ সম্প্রসাদোঽস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে।"

ছান্দোগ্য।

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
হস্তং গচ্ছন্তি নাম রূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নাম রূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥

মুণ্ডক।

এই মতকে বাচস্পতি মিশ্র সত্যভেদবাদ বলেন।

কাশকৃৎস্ন ঋষি বলেন—"অবস্থিতেঃ"। পরমাত্মা জীবরূপেই অবস্থিত। শঙ্কর বলেন—

শঙ্কর ও রামানুজ উভয়েরই মতে কাশকৃৎস্নের মত সিদ্ধান্ত। তবে "অবস্থিতি" শব্দে সম্পূর্ণ অদ্বৈত বুঝায় এবং রামানুজ বলেন ঐ শব্দে তাঁহার অভিমত বিশিষ্টাদ্বৈত বুঝায়।

এই বিষয়ে দুই আচার্য্যেরই মত পর্য্যালোচনা করা উচিত।

প্রথমে শাঙ্কর ভাষ্যের উল্লেখ করিব। "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" এবং জাতীয়ক ব্রাহ্মণ বাক্যদ্বারা পরমাত্মারই জীবভাবে অবস্থান দেখা যায়। এই অভিপ্রায়ব্যঞ্জক বৈদিক মন্ত্রও আছে -"সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরো নামানি কৃত্বাভিবদন যদাস্তে।" অগ্নি, জল, প্রভৃতি ভূতের সৃষ্টি প্রকরণে, জীবের পৃথক্ সৃষ্টি হইয়াছিল, একথা শ্রুতিতে পাওয়া যায় না। অতএব শ্রুতিতে এমন কিছু নাই, যাহাতে পরমাত্মার বিকাররূপ জীব স্বতন্ত্র পদার্থ, এরূপ অবধারিত হইতে পারে। কাশকৃৎস্ন আচার্য্যের মত এই যে, অবিকৃত পরমেশ্বরই জীব। জীব অন্য কোন তত্ত্ব নহে।

আশ্মরথ্য ঋষি যদিও জীবের সহিত পরমাত্মার অনন্যত্ব বলেন, তথাপি "প্রতিজ্ঞা সিদ্ধির জন্য" এইরূপ বলিয়া তিনি কার্য্য কারণ ভাবের সূচনা করিয়াছেন অর্থাৎ জীব কার্য্য ও পরমাত্মা কারণ। উক্ত ঋষির কিয়ৎ-পরিমাণে অনন্যত্ব অভিপ্রেত, সম্পূর্ণরূপে নহে। আবার ঔড়ুলোমি ঋষি স্পষ্টতই অবস্থার অপেক্ষা করিয়া ভেদ ও অভেদ বলিয়াছেন।

এই সকল ঋষিদিগের মতের মধ্যে কাশকৃৎস্ন ঋষির মতই শ্রুতির অনুসারী। কারণ তাহার মত "তত্ত্বমসি" আদি মহাবাক্যের সহিত সঙ্গত। পরমাত্মরূপ জীবের জ্ঞানেই অমৃতত্ব সম্ভব হয়। আর জীব যদি বিকারাত্মক হয়, তাহা হইলে যেমন বিকৃতি তাহার প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হইলে, সেই বিকৃতির আর কিছু থাকেনা, সেইরূপ বিকারাত্মক জীব আপন প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হইলে, কে আর অমৃতত্ব লাভ করিবে? (যদি ভেদ কল্পিত হয়, তবেই তত্ত্বমস্যাদি বাক্যের জ্ঞানদ্বারা ভেদের নিবৃত্তি হইতে পারে। যদি ভেদ সত্য হয়, তাহা হইলে তাহার নিবৃত্তি হয় না। আনন্দগিরি) এই কারণে নাম ও রূপ ও জীবকে আশ্রয় করিতে পারে না। নাম ও রূপ

জীবের উপাধিকেই আশ্রয় করে। উপাধি অশ্রিতনাম রূপই জীব গ্রহণ করে। তবে যে কোন শ্রুতিতে জীবকে অগ্নি বিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় বলিয়াছেন, সে স্ফুলিঙ্গত্ব বা অংশত্ব উপাধির আশ্রিত বলিয়া বুঝিতে হইবে। জীবের উৎপত্তিও উপাধি আশ্রিত বলিয়া বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ বাস্তবিক জীবের উৎপত্তি হয় না, উপাধিরই উৎপত্তি হয়। .. ... ...

... . . উপরে কাশকৃৎস্নের মত বেদসম্মত ইহা দেখান হইয়াছে। এইজন্য বিজ্ঞানাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ পারমার্থিক নহে। এ ভেদ অবিদ্যা প্রত্যুপস্থাপিত নামরূপ বিরচিত দেহাদি উপাধি নিমিত্ত ভেদ। এই অর্থ সকল বেদান্ত বাদীরই স্বীকার করা উচিত।

"সদেক সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছান্দোগ্য) "আত্মৈবেদং সর্ব্বম (ছা), ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্ (মু), ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা (বৃ), নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা, নান্যতোঽস্তি দ্রষ্টৃ (বৃ)—এই সকল শ্রুতিবাক্য দ্বারাও ঐ মতের সমর্থন হয়।

"বাসুদেবঃ সর্ব্বম্" (গীতা) "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত" (গী), "সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্" (গী) -ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যও ঐ মতের সমর্থন করে।

যে সকল বাক্যে ভেদ দর্শনের নিষেধ করে, সেই সকল বাক্য দ্বারাও কাশকৃৎস্নের মত সিদ্ধ হয়। যথা—অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন সবেদ যথা পশু" (বৃ), 'মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি ইহ নানেব পশ্যতি" (বৃ)।

আবার যে সকল শ্রুতি বাক্যে আত্মার বিকার নাই একথা বলে, সে সকল বাক্যও অভেদ প্রতিপন্ন করে—যেমন "স বা এষ মহানজ আত্মাঽজরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্ম" (বৃ)।

অন্যথা মুমুক্ষুর নিরপবাদ বিজ্ঞান হইতে পারে না। (কারণ জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে জীবের ব্রহ্ম জ্ঞান প্রবল হইয়া, "অহং ব্রহ্ম" এই নিরব ধ জ্ঞানের বাধক হয়—আনন্দগিরি। ভেদই অপবাদ। যদি জ্ঞান মুক্তির অবস্থাতেও ভেদ কলুষিত হয়, তাহা হইলে মুমুক্ষুকে নিরপবাদ জ্ঞানের আশা পরিত্যাগ করিতে হয়)।

আর মুমুক্ষুর সুনিশ্চিত অর্থও হইতে পারে না। ভেদ ও অভেদের বিরোধ প্রযুক্ত যে সংশয় হয়, ভেদজ্ঞানে তাহার নিবৃত্তি হয় না। আনন্দগিরি)

নিরপবাদ বিজ্ঞান সকল আকাঙ্ক্ষার নিবর্ত্তক। কেবলমাত্র সে জ্ঞান আত্মবিষয়ক। সে জ্ঞানের অন্য বিষয় থাকিবে না।

শ্রুতিতে কথিত আছে—"বেদান্ত বিজ্ঞান সুনিশ্চিতার্থাঃ" মুণ্ডক।

"তত্রকোমোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ" (ঈশা)।

গীতাস্মৃতিতে স্থিত প্রজ্ঞের লক্ষণেও এইরূপ বর্ণন আছে।

যদি এইরূপ প্রতিপন্ন হইল, যে ক্ষেত্রজ্ঞ ও পরমাত্মার একত্ব জ্ঞানই সম্যগ্দর্শন, এবং ক্ষেত্রজ্ঞ ও পরমাত্মার ভেদ কেবল নাম মাত্র, তখন ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মা হইতে ভিন্ন এবং পরমাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে ভিন্ন এইরূপ আত্মভেদ বিষয়ক নির্বন্ধ নিরর্থক।

একই আত্মা নাম মাত্র ভেদে বহুধা অভিহিত হয়।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়াম" (তৈত্তিরীয় উপনিষৎ) এই বাক্যে কোন এক গুহা নির্দেশ করিয়া "গুহায়াং" শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। আর ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন অন্য কেহ গুহাতে নিহিত নহে। শ্রুতিতে স্পষ্ট বলা হইয়াছে, "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানু প্রাবিশৎ" (তৈত্তিরীয়)।

যাহারা জীব পরমাত্মার ভেদ বিষয়ক নির্বন্ধ করে, তাহারা বেদান্তের প্রকৃত অর্থের বাধক হয়, শ্রেয়োদ্বার সম্যগ্দর্শনের বাধক হয় এবং অনর্থক মোক্ষকে কৃত বা কার্য্যকলীভূত কল্পনা করে, এবং যাহা কৃত তাহাই অনিত্য সুতরাং তাহাদের কল্পিত মোক্ষও অনিত্য। এবং যদি তাহারা এরূপ তর্ক করে যে মোক্ষ 'কৃত' হইলেও নিত্য, তাহা হইলে তাহাদের তর্ক ন্যায় সঙ্গত হয় না। শঙ্করের যুক্তি আনুপূর্ব্বিক দেওয়া হইল।

এইবার শঙ্করের যুক্তি সম্বন্ধে রামানুজের তর্ক দিব। এই তর্ক রামানুজের অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচায়ক। যদি রামানুজের সিদ্ধান্ত বা খণ্ডন তাঁহার খণ্ডনের সমতুল্য হইত, তাহা হইলে অনায়াসে তিনি শঙ্করাচার্য্যের স্থান অধিকার করিতে পারিতেন।

আশ্মরথ্যের ভেদাভেদ সম্বন্ধে রামানুজ বলেন—

এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান হয় এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবার জন্য আশ্মরথ্য

যে বলেন জীব ব্রহ্মের কার্য্য অতএব জীব শব্দে ব্রহ্মকে বলা যায় একথা অযুক্ত।

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা জানা যায় যে জীব অজ।

আর ইহাও সকলে স্বীকার করে, যে জীবের পূর্ব্বজগতে অর্জ্জিত কর্ম্মফল ভোগের জন্য নূতন জগতের সৃষ্টি হয়।

নতুবা ( যদি প্রতিজগতে নূতন করিয়া সূর্য্য হইতে সূর্য্য কিরণের ন্যায়, ব্রহ্ম হইতে জীবের উদ্ভব হয়, তাহা হইলে ) বিষম সৃষ্টি হইতে পারে না। ( কারণ ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত হইলে, সকল জীবই সমান ধর্ম্মাবলম্বী হইবে। তাহা হইলে কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ ভাল, কেহ মন্দ কেন হইবে ? )

আর যদি জীব ব্রহ্মের কার্য্য মাত্র হয়, তাহা হইলে মুক্তির অবস্থায় জীব একবারে ব্রহ্মে লীন হইয়া যাইবে, তাহার ব্রহ্মতাপত্তি হইবে, তখন আর জীব বলিয়া কিছুই থাকিবে না। যেমন ঘটাকাশে মহাকাশে মিলিয়া গেলে তাহার কিছুই থাকে না। এই বিনাশরূপী মোক্ষের জন্য উপায় বিধান ও সেই উপায়ের অনুষ্ঠান অনর্থক।

আর এরূপ মোক্ষে পুরুষের কি অর্থ সাধিত হইবে ? ঘট যদি মৃত্তিকায় পরিণত হয়, তাহা হইলে ঘটের কি উপকার হয়। ঔড়ুলোমির মতের সম্বন্ধে রামানুজ বলেন, জীবের আবার ব্রহ্ম হওয়া বা ব্রহ্মভাব কি কথা ? উৎ-ক্রমণের পূর্ব্বে জীবের অব্রহ্মত্ব কি স্বাভাবিক না ঔপাধিক ? আর যদি ঔপাধিক হয়, তাহা হইলে সে উপাধি কি পারমার্থিক না অপারমার্থিক ?

যদি পূর্ব্বকালীন অব্রহ্মত্ব স্বাভাবিক বা স্বভাবগত হয়, তাহা হইলে যাহা স্বরূপতঃ অব্রহ্ম তাহা স্বরূপ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম হইতে পারে না।

আর যদি বল উৎক্রমণের পর ভেদেরও নাশ হয়, স্বরূপেরও নাশ হয়, তাহা হইলে যাহার স্বরূপ গেল, তাহার অস্তিত্ব গেল, তখন আর ব্রহ্মভাব কাহার হইবে ? আর সে ব্রহ্মভাব হইয়াই বা কি লাভ ?

যদি বল উৎক্রমণের পূর্ব্বে জীবের অব্রহ্মত্ব বা ব্রহ্মের সহিত ভেদ ঔপাধিক, এবং সেই উপাধি পারমার্থিক অর্থাৎ বাস্তবিক বা সত্য, কাল্পনিক নহে—তাহা হইলে জীব ব্রহ্ম হয় এ কথা বলিতে পারে না। কারণ জীব ত

পূর্ব্ব হইতেই ব্রহ্ম ছিল। উপাধি জীব হইতে ভিন্ন ছিল। এই পক্ষবাদীর মত অনুসারে উপাধি ও ব্রহ্ম ব্যতিরেকে অন্য বস্তু নাই। তাহা হইলে উপাধিতে ভেদ হইতে পারে। নিরবয়ব ব্রহ্মে উপাধি কর্ত্তৃক ভেদ হইতে পারে না। ভেদ যদি কেবল মাত্র উপাধিগত হয়, তাহা হইলে উৎক্রমণের পূর্ব্বে যাহা ব্রহ্ম ছিল না তাহা উৎক্রমণের পর ব্রহ্ম হইল এরূপ কথা বলা চলে না।

আর যদি বল উৎক্রমণের পূর্ব্বে জীবের অব্রহ্মত্ব ঔপাধিক, আর সে উপাধি অপারমার্থিক বা কাল্পনিক, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি উৎক্রমণের পর কে ব্রহ্ম হইল কাহার ব্রহ্মভাব হইল।

যদি বল ব্রহ্মই ব্রহ্ম হয়, অর্থাৎ উৎক্রমণের পূর্ব্বে ব্রহ্মের আত্মস্বরূপ অবিদ্যা উপাধি কর্ত্তৃক তিরোহিত ছিল এবং উপাধি নষ্ট হইলেই ব্রহ্ম আপন স্বরূপে প্রতিভাত হয়—তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি ব্রহ্ম ত নিত্য, মুক্ত, স্বপ্রকাশ, জ্ঞানস্বরূপ, সেই ব্রহ্মের অবিদ্যা কর্ত্তৃক তিরোধান কিরূপে হইবে ?

তিরোধান অর্থ কি ? বস্তুর স্বরূপ বিদ্যমান থাকে, তবে তাহার প্রকাশের নিবৃত্তি হয়।

আর যেখানে প্রকাশই বস্তুর স্বরূপ, আর অদ্বৈতবাদী তাহাই অঙ্গীকার করেন, সেখানে তিরোধান বা প্রকাশের নিবৃত্তি হইতে পারে না। আর যদি প্রকাশের নিবৃত্তি হয়, তাহা হইলে স্বরূপেরই নাশ হইল।

ব্রহ্ম নিত্য আবির্ভূত স্বরূপ হইলে উৎক্রান্তির পর ব্রহ্মভাব হওয়া অসম্ভব।

এই ত গেল রামানুজের পূর্ব্বপক্ষ। এইবার দেখিব রামানুজের সিদ্ধান্ত, যাহাকে তিনি কাশকৃৎস্নের সিদ্ধান্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কাশকৃৎস্ন বলেন জীববাচক শব্দ ব্রহ্মে প্রয়োগ করা যায়, কারণ ব্রহ্ম আত্মারূপে স্বশরীরভূত জীবাত্মায় অবস্থিতি করেন। এই মতের সমর্থক শ্রুতি বাক্যও আছে যথা—"য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোঽন্তরো যমাত্মা নবেদ যস্যাত্মা শরীরং য আত্মানমন্তরো যময়তি সবে আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ" "যোঽক্ষরমন্তরে সঞ্চরন্" "যস্যাক্ষরং শরীরং যমক্ষরং নবেদ", "অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্ব্বাত্মা"।

তিন সূত্রের বিচার করিয়া শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজ কাশকৃৎস্নের দোহাই দিয়া আপন আপন মত স্থাপিত করিলেন। এখন চৈতন্য সম্প্রদায়ী ভাষ্যকার কোথায়? বলা হয় নাই, শঙ্করাচার্য্য এই তিন সূত্রের প্রকরণ অনুসারে অন্য অর্থও করিয়াছেন।

মৈত্রেয়ী সংবাদে এইরূপ শ্রুতিবাক্য আছে—"মহদ্ভূতমনন্তমপারং বিজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তিঃ"। "ভূতেভ্যঃ সমুত্থায়", ভূতসমূহ হইতে সমুত্থান। একথাও কেবল বিজ্ঞানাত্মারই হইতে পারে, পরমাত্মার নহে।

এই পূর্ব্বপক্ষ নিরাকরণের জন্য ব্যাসদেব তিন জন ঋষির মত দেখাইতেছেন। প্রত্যেকেরই মতে বিজ্ঞানাত্মাকে পরমাত্মা বলা চলে।

এই ব্যাখ্যায় এই তিন ঋষির পরস্পর বিরোধ বিচারের আবশ্যকতা হয় না।

বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই ব্যাখ্যার উপরেই ভর দিয়া রণে ভঙ্গ দিলেন।

আমরা ক্ষীণ বুদ্ধির ক্ষীণ আলোকে, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের চরণকমল ধ্যান করিয়া ঐ তিন সূত্রে তাঁহার মত স্থাপিত করিবার প্রয়াস পাইব।

শ্রীপূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ।

---

# আদর্শ ও ধর্ম্ম।

"Cull from every faith and race the best
And bravest soul for counsellor and friend."

উপরিধৃত বাক্যে কবি টেনিসন্ জগতের সকল ধর্ম্ম ও সকল জাতি হইতে মহত্তম ও প্রকৃত বীরপুরুষদিগের কাহিনী সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে আমাদের উপদেষ্টা ও বন্ধুরূপে গ্রহণ করিতে আদেশ করিতেছেন। সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বজাতিতে যে মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে ইহা নিশ্চিত

এবং তাহাদের পুণ্যগাথা যে পাপী তাপী মানবের এক প্রধান সহায় ইহাও সকলে একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন :—

"Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime."

"ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা।"

"মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ।" ইত্যাদি

কিন্তু "সজ্জন" কে বা প্রকৃত বীরত্ব কাহাকে বলে এ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে। মহত্ত্বের আদর্শ চিরকাল ও সকল জাতির মধ্যে একরূপ থাকে কিনা? অথবা ইহা আপেক্ষিক? সভ্যতা ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আদর্শও পরিবর্ত্তিত হয় কিনা? ইতিহাসজ্ঞ মাত্রই অবগত আছেন যে, অষ্ট্রেলিয়াবাসী বর্ব্বরদিগের যাহা আদর্শ, গেটে (Goethe), ব্যাসদেব বা শঙ্করাচার্য্যের কখনই তাহা হইতে পারে না। অতএব মহত্ত্ব একটি স্থির বস্তু নহে। প্রত্যেক ব্যক্তির আদর্শ পৃথক, প্রত্যেক জাতির আদর্শ পৃথক, প্রত্যেক কালের আদর্শ পৃথক।

আদর্শ ও ধর্ম্ম নিত্য সহযোগী,—সর্ব্বদা একত্রাবস্থান করে। যেখানে আদর্শ সেইখানে ধর্ম্ম এবং যতদিন আদর্শ ততদিনই ধর্ম্ম। আদর্শই ধর্ম্মের প্রাণ, ধর্ম্মের ভিত্তি। আদর্শ-হীন ধর্ম্ম অন্তঃসারশূন্য এবং নির্জ্জীব প্রথামাত্র,—কায়িক ও বাচনিক কতকগুলি ক্রিয়ার সমষ্টি মাত্র। যাঁহার আদর্শ নাই, তাঁহার ধর্ম্মও নাই। যাঁহার যেরূপ আদর্শ, তাঁহার সেইরূপ ধর্ম্ম। আদর্শের পরিবর্ত্তনে ধর্ম্মেরও পরিবর্ত্তন ঘটে। আদর্শ যেমন ক্রমোন্নত হইতে থাকে, ধর্ম্মেরও ক্রমোন্নতি হয়, অবশেষে চরম অবস্থায় আদর্শও থাকে না, ধর্ম্মও থাকে না।

জীব ক্রমোন্নতির যে সোপানে উপনীত, তদবস্থায় সে অনন্ত সৌন্দর্য্যের যতটুকু অনুভব করিতে পারিয়াছে, অথচ স্বীয় প্রাত্যহিক জীবনে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছে না, কিন্তু পরিণত করিবার একটা আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে, ততটুকুই তাহার আদর্শ। কথাটা একটু স্পষ্ট করিয়া বলা প্রয়োজন। জগতে এক অদ্বিতীয় পদার্থ আছেন। তিনিই নিত্য ও সত্য। তিনিই অনন্ত ঐশ্বর্য্য, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত সৌন্দর্য্যময়। জগতে

ক্ষুদ্র হইতে বিশাল অবধি যত জীব বর্ত্তমান, তৎসমুদায়েই সেই সচ্চিদানন্দময়ত্ব অল্লাধিক বিকাশ পাইয়াছে। সচ্চিদানন্দময়ত্বের পূর্ণ বিকাশই জীবের লক্ষ্য ও পরিসমাপ্তি। এই চরম অবস্থাকেই বেদান্ত "ভূমা" বলিয়াছেন।

"যত্র নান্যৎ শৃণোতি নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ বিজানাতি স এব ভূমা।

যত্র চান্যৎ শৃণোতি অন্যৎ পশ্যতি অন্যৎ বিজানাতি তদল্পম্।"

যতদিন জীবের দ্বৈত জ্ঞান থাকে, অর্থাৎ আত্ম ভিন্ন অপর কিছু শুনিতে দেখিতে বা জানিতে পারে, ততদিন সে অল্প। কিন্তু যখন এরূপ থাকে না, অর্থাৎ "আমিই সব, আর দ্বিতীয় বস্তু নাই" এই জ্ঞান হয় ইহাই ভূমা। "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি।" যদবধি জীব এই ভূমাবস্থা প্রাপ্ত না হয়, তদবধি সে অল্প এবং অল্পে সুখ নাই। সুখ নাই, কারণ পূর্ণতার অভাবে একটা অতৃপ্তি সর্ব্বদাই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। পূর্ণতার প্রতি তাহার স্বাভাবিক আকর্ষণ হেতু, সে তদপেক্ষা উন্নততর জীবকে "মহৎ" বা "শ্রেষ্ঠ" জ্ঞান করে এবং তদীয় গুণের প্রতি আসক্ত হয়। এই আসক্তি বা আকাঙ্ক্ষাই ক্রমোন্নতির মূল।

কিন্তু যে উন্নততর জীব তাহার আদর্শ হইবে সে তদপেক্ষা ঠিক এক সোপান উর্দ্ধে অবস্থিত হইলেই মঙ্গল। অধিক উচ্চে থাকিলে নিম্নস্থ জীব তাহার মহত্ত্বের আদৌ উপলব্ধি করিতে পারে না, সুতরাং আকাঙ্ক্ষা ও তজ্জন্য উন্নতি অসম্ভব হয়। এক ক্ষুদ্র কীট তাহার মৃত্তিকা কোটরে বাস করিতে করিতে একদিন দেখিল যে তৎসদৃশ অন্য কতকগুলি কীটের পক্ষ জন্মিয়াছে এব তন্নিবন্ধন তাহারা অনায়াসে আহার সংগ্রহ করিতে এবং শত্রু হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইতেছে। ইহা দেখিয়া তাহারও তদনুরূপ হইবার আকাঙ্ক্ষা জন্মিল। এখানে পক্ষবিশিষ্ট কীটই পক্ষহীনের "মহৎ" ও আদর্শ। ঐ কীটের সমীপে একটি কুকুর, ঘোটক বা মনুষ্যকে আদর্শ স্বরূপ উপস্থাপিত করিলে, কীটের কোন লাভ নাই, কারণ এতাদৃশ উচ্চতর জীবের মহত্ত্ব সে আদৌ উপলব্ধি করিতে সক্ষম নহে। ফিজি দ্বীপবাসী এক উলঙ্গ বর্ব্বরের নিকট শারীরিক বল বা কৌশলের আদর্শ আনীত হইলে, সে হয়ত তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু কেহ যদি তাহার নিকট অদ্বৈতবাদ বা অহৈতুকী ভক্তির সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা

করেন, যে এইরূপ অর্থশূন্য প্রলাপ শুনিয়া হয়ত বক্তাকে উন্মাদরোগগ্রস্ত বলিয়া নিশ্চয় করিবে।

প্রত্যেক জীবের যেমন নিয়ত ক্রমোন্নতি হইতেছে, সেইরূপ সমগ্র মনুষ্য জাতিরও ক্রমোন্নতি আছে। এই ক্রমোন্নতি এরূপ ধীরে ধীরে অল্পে অল্পে ঘটে যে, ঐতিহাসিক সময়ের (৪।৫ সহস্র বৎসরের) মধ্যে বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হয় না। বরং ইহা হইতে অনেকের সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণা হইতে দেখা যায়। তাঁহারা বলেন "হায়, হায়, পূর্ব্বে কি উন্নত অবস্থাই (Golden Age) ছিল, আর এখন কি ভয়ানক অবনতিই হইয়াছে। সে রাম নাই, সে অযোধ্যা নাই! সে ব্যাস বশিষ্ট গৌতম কণাদের দিন গিয়াছে।" তাঁহাদের এই বিলাপ যে অমূলক তাহা আমি বলিতেছি না। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উন্নতি ও অবনতি প্রতিযুগে ঘটিয়া থাকে ও ঘটিবে, কিন্তু একটা দীর্ঘকাল লইয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, সাধারণ গতি উন্নতির দিকে। যেমন সমুদ্র-বক্ষে ক্ষণিক বাত্যা উপস্থিত হইয়া তদুপরিভাগস্থ জল-রাশিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও সঞ্চালিত করিলেও জোয়ারের প্রবল অন্তঃস্রোত অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত হইয়া সমগ্র জল-রাশিকে অল্পে অল্পে ও অলক্ষ্যে তদ্দিকে লইয়া যায়, সেইরূপ মানবজাতির ক্রমোন্নতি কোন সাময়িক কারণের দ্বারা প্রতিহত হইতেছে বলিয়া বোধ হইলেও, তাহা অব্যাহতভাবে চলিয়াছে ও চলিবে। এক কল্প বা এক মন্বন্তরের সহিত তুলনায় ১০।১২ হাজার বৎসর নিমেষ মাত্র।

শাস্ত্রে বলেন্ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, এই চতুর্যুগ অনন্তকাল ধরিয়া পর্য্যায়ক্রমে চলিতেছে। সন্ধ্যাংশ লইয়া সত্যের পরিমাণ ৪৮০০, ত্রেতার ৩৬০০, দ্বাপরের ২৪০০, এবং কলির ১২০০ দেববর্ষ — অর্থাৎ এক চতুর্যুগে ১২০০০ দেববর্ষ বা আমাদের ৪৩২০০০০ ( ৪৩ লক্ষ ২০ হাজার বৎসর )। এইরূপ প্রায় ৭২টী চতুর্যুগে একটি মন্বন্তর হয় এবং ১৪টি মন্বন্তরে একটি কল্প বা ব্রহ্মার এক দিন হয়। এক কল্পে আমাদের ৪৩২০০০০০০০ ( ৪ শত ৩২ কোটি ) বৎসর হয়। কল্পান্তে ভূলোক ( অর্থাৎ পৃথিবী ) ভুবঃ ও স্বঃ এই তিন লোক ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ইহাকে নৈমিত্তিক প্রলয় বলে। ৪৩২ কোটি বৎসর পরে পুনর্বার ত্রিলোক সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক মন্বন্তর ও প্রত্যেক

চতুর্যুগের শেষে ও এক একটি ক্ষুদ্র প্রলয় ঘটে। ইহাতে সমগ্র পৃথিবী ধ্বংস প্রাপ্ত না হইলেও, ইহার আংশিক নাশ বা বিলোপ হয়, যেমন কোন মহাদেশ সমুদ্রগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া যায় ইত্যাদি। ইহার নাম খণ্ড-প্রলয়। ইহা ব্যতীত আর এক প্রকার প্রলয় আছে। তাহাকে মহাপ্রলয় বা প্রাকৃতিক প্রলয় বলে। ৩৬০০০ ( ছত্রিশ হাজার ) কল্প গত হইলে এক একটি মহাপ্রলয় ঘটে। ইহাতে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। প্রলয়ান্তে নূতন ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়া নূতন ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন। বর্ত্তমান ব্রহ্মাণ্ডের ১৮০০০ কল্প অতীত হইয়া গিয়াছে। ১৮০০১ তম কল্পের সপ্তম মন্বন্তরের অষ্টবিংশতিতম (28th) যুগ এখন চলিতেছে।

এই সকল প্রলয়ের অবসান হইলে অর্থাৎ প্রত্যেক কল্পের, প্রত্যেক মন্বন্তরের এবং প্রত্যেক চতুর্যুগের প্রারম্ভে, দেবতা, ঋষি ও মহাপুরুষগণ স্বর্গ ও উচ্চতর লোক হইতে নামিয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। সেই কল্পে, মন্বন্তরে অথবা যুগে জীবের যতদূর উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তাহার আদর্শ জীবের সমীপে উপস্থাপিত করাই তাঁহাদের জন্মগ্রহণের উদ্দেশ্য। ক্রমোন্নতি দ্বারা জীব যখন পশু হইতে মনুষ্যে পরিণত হইল, এই মহাপুরুষগণ প্রত্যেক কল্পের ও যুগের প্রারম্ভে মনুষ্যরূপে তাহাদের মধ্যে আসিতে লাগিলেন এবং পিতামাতা যেরূপ স্বীয় শিশু সন্তানদিগের প্রতি সর্ব্বদা সস্নেহ দৃষ্টি রাখিয়া তাহাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করেন, সেইরূপ ইঁহারাও শিশু মানব জাতির উপদেষ্টা, রক্ষক ও পরিচালক হইয়াছিলেন। ব্যাস, বশিষ্ট, কপিল, নারদ, মোসেস (Moses), জরথস্ত্র (Zoroaster) প্রভৃতি মহাপুরুষগণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে নারদের যে আত্ম-বৃত্তান্ত আছে তাহা হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয়। তিনি বলেন পূর্ব্বকল্পে সাধনা দ্বারা তিনি ভগবানের সাহচর্য্য লাভ করেন অর্থাৎ মুক্ত হন এবং বর্ত্তমান কল্পের প্রারম্ভে তিনি ভৃগু মরীচি ও অন্যান্য ঋষির সহিত প্রথম নিষ্ক্রান্ত হন।

ক্রমশঃ

শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী।

# মানবের ইতিবৃত্ত।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর। )

৬। বর্হিষদ পিতৃগণ।

আমাদের বর্ত্তমান পার্থিব মণ্ডলের চারটী চক্র ক্রমশঃ চার শ্রেণীর বর্হিষদ পিতৃগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াছে ও হইতেছে। তন্মধ্যে যাহাদের দেহ সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম, তাহারা প্রথমচক্র ( First Round ) পরিচালনা করিয়াছেন। যাহাদের দেহ সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল তাহারা বর্ত্তমানে চতুর্থ চক্র পরিচালনা করিতেছেন। মধ্যবর্ত্তী দুই শ্রেণী দ্বিতীয় এবং তৃতীয় চক্রের অধিনায়ক। অর্থাৎ উষ্মপ, সুকালী, বর্হিষদ ও আজ্যপ পিতৃগণ ক্রমান্বয়ে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ চক্রের অধিপতি।

এই চার শ্রেণীর পিতৃগণ আবার প্রত্যেকে সাতভাগে বিভক্ত হওয়ায় বর্হিষদ পিতৃগণ সর্ব্বসমেত আটাশ উপবিভাগে বিভক্ত। সপ্ত শ্রেণীর সৌম পিতৃগণ বলিলে বর্হিষদ পিতৃগণের উপবিভাগগুলি বুঝিতে হইবে। অগ্নিস্বাত্ত, সৌম্য প্রভৃতি প্রধান সপ্ত শ্রেণীকে তদ্দ্বারা কখনই বুঝায় না। এই বিষয়টী স্মরণ থাকিলে, স্থান বিশেষে "পিতৃগণ" "সপ্ত শ্রেণীর পিতৃগণ" প্রভৃতি শব্দের ও বাক্যের প্রয়োগ দেখিতে পাইলে আর কোন গণ্ডগোলের সম্ভাবনা থাকিবে না।

উপাধিভেদে এই চার শ্রেণীর পিতৃগণ পরস্পর বিভিন্ন। প্রথম শ্রেণীর উষ্মপ পিতৃগণের কেবল কারণশরীর কার্য্যকারী, তাহাদের অধস্তন অন্য উপাধি নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর সুকালী পিতৃগণের মানসদেহ কার্য্যকারী। তৃতীয় শ্রেণীর বর্হিষদ পিতৃগণ কামদেহ ব্যবহার করিয়া থাকেন, এবং চতুর্থ শ্রেণীর আজ্যপ পিতৃগণ ছায়াদেহ ( Etheric Double ) ব্যবহার করেন, ইহাই তাহাদের স্বাভাবিক দেহ।

মানবের স্থূল দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশ নির্ম্মাণ ও উন্নতি সাধন করার ভার কথিত এক শ্রেণীর বর্হিষদ পিতৃগণের উপর ন্যস্ত আছে। যাহারা অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম দেহধারী, তাহারা মানবের স্থূল দেহের সূক্ষ্ম ভাগ নির্ম্মাণে

নিযুক্ত আছেন। যাহারা অপেক্ষাকৃত স্থূলদেহধারী, তাহাদের উপর মানব দেহের স্থূলভাগ নির্ম্মাণের ভার অর্পিত, চক্রের পর চক্র পরিবর্ত্তিত হইয়া যখন গ্রহগণ ক্রমশঃ ঘনীভূত ও দৃঢ় হইতে থাকে, তখন এই পিতৃগণ তাহাদের স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদনে তৎপর হইয়া স্থূল দেহ নির্ম্মাণ ও তাহাদের উন্নতি বিধান করিয়া থাকেন।

প্রথমাধ্যায়েই উক্ত হইয়াছে, এই বর্হিষদ পিতৃগণ বিশ্বকর্ম্মা দেবগণের সপ্তম শ্রেণিভুক্ত। কিন্তু অগ্নিস্বাত্ত, সৌম্য ইত্যাদি পিতৃগণকে পৃথক পৃথক রূপে ধরিলে তাহারা দ্বাদশ শ্রেণীর অন্তর্গত। তাহাদের অধীনে বহু সংখ্যক দেবগণ দেহাবয়ব ও বিভিন্ন রূপাদি নির্ম্মাণে নিযুক্ত আছেন। এই দেবগণ যেন ইষ্টকালয় নির্ম্মাণের যোগালি ( যোগাড়িয়া ) ও মিস্ত্রিস্বরূপ, এবং পিতৃগণ রাজমিস্ত্রি ও এঞ্জিনিয়র স্বরূপ। পিতৃগণ আদর্শ, প্রণালী এবং আকার নির্ম্মাণ করেন, তদবলম্বনে অধীনস্থ অসংখ্য দেবগণ সুকৌশলে দেহের অংশসমূহ যথোপযুক্ত স্থানে বিন্যাস করিয়া থাকেন। সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত এই অসংখ্য দেবগণই আমাদের হিন্দুধর্ম্মের তেত্রিশ কোটী দেবতা।

---

## ৭। সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসমুদ্র।

পুরাণে সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসমুদ্রের উল্লেখ আছে। জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর, এই সপ্তদ্বীপ। "লবণেক্ষুসুরাসর্পির্দধিদুগ্ধজলান্তকাঃ" এই সপ্তসমুদ্র। কথিত সপ্তদ্বীপকে এই সপ্তসমুদ্র বেষ্টন করিয়া আছে, তাহাতেই একটী দ্বীপ অপরটী হইতে পৃথক। ইহা শুনিয়া হয়ত বিংশতি শতাব্দির নব্যশিক্ষিত যুবকগণ উষ্ণ মস্তিষ্ক কবির কল্পনা প্রসূত অলীক গল্প বলিয়া ইহাকে উপহাস করিবেন। কিন্তু বিশেষ অনুধাবণ করিলে, এইরূপ উপহাসের কোন কারণ থাকিবে না। এই "দ্বীপ" শব্দ নানাস্থানে নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। উল্লিখিত সপ্তদ্বীপ আমাদের বিশ্বের সপ্তগ্রহ; তন্মধ্যে এই পৃথিবী চতুর্থ গ্রহ। অণ্ডস্যাণ্ডস্থিমেলোকাঃ সপ্তদ্বীপাচ মেদিনী। এখানে মেদিনী অর্থে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, অর্থাৎ সপ্তগ্রহ বিশিষ্ট একটী গ্রহমণ্ডল ( Planetary chain )। এই সপ্তদ্বীপমধ্যে জম্বুদ্বীপই আমাদের পৃথিবী।

আর এই যে সপ্ত সমুদ্রের উল্লেখ আছে,তাহারা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর নৈসর্গিক পদার্থ বই আর কিছুই নহে। লবণসমুদ্র এই পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে। অপর ছয়টী সমুদ্র পার হওয়া সাধারণের ক্ষমতার অতীত। যাহারা সাধন বলে স্ব স্ব সূক্ষ্মোপাধি নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহারাই ইহা লঙ্ঘন করিতে পারেন। যোগবলে এই বিশ্বের বাহিরে দাঁড়াইয়া যদি কোন সাধক ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তবেই তিনি পুরাণের বর্ণনানুরূপ সপ্তসমুদ্র কিরূপে সপ্তদ্বীপকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে, তাহার সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তখন তিনি কিরূপ প্রত্যক্ষ করিবেন? উত্তাল তরঙ্গায়িত সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর পদার্থ সমূহ গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে লহর তুলিয়া অবিরতধারায় আন্দোলন প্রবাহ ছুটাইয়াছে। এই সূক্ষ্ম পদার্থ সমূহ মধ্যে যাহার সঙ্গে এই পৃথিবীস্থ স্থূল দ্রব্যের সুসাদৃশ্য আছে, সেই দ্রব্যের নামেই তাহাকে আহুত করা হইয়াছে। ইক্ষুরস, সুরা, ঘৃত, ইত্যাদি যে যে দ্রব্যের সঙ্গে এই সকল সূক্ষ্ম পদার্থের সাদৃশ্য আছে, তাহাকেই সেই সেই পদার্থের সমুদ্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। শেষোক্তটী কারণবারি-সমুদ্র। সুনির্ম্মল শুদ্ধোদকের সঙ্গে এই অতি সূক্ষ্ম কারণবারির সাদৃশ্য আছে বলিয়া ইহাকে জলসমুদ্র কহে।

---

৮। আদর্শ রূপ বা আকার (Archetypal or Ideal Forms)।

উত্তাল ও উদ্দীপ্ত তেজতরঙ্গপুঞ্জের মধ্যে পূর্ব্ব কথিত গ্রহগুলিকে কিরূপ দেখায়? তন্মধ্যে যেগুলি তেজদীপ্ত ও যাহাতে আকার প্রকারের কিছুমাত্র চিহ্ন নাই, তাহাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর সৌম পিতৃগণ অবতীর্ণ হইলেন। তাহারাই আকারের প্রথম আদর্শ নির্ম্মাণ করিলেন। সেই আদর্শ অবলম্বনে পরবর্ত্তী সৃষ্টিকৌশল স্রষ্টাগণ রূপের সৃষ্টি করিলেন। সৃষ্টির প্রাক্কালে লোকপিতামহ ব্রহ্মা সৃষ্টি বিষয়ে তপঃ করিলেন, তাহা হইতে ব্রহ্মার মনে সৃষ্টি বিষয়িণী চিন্তার উদ্রেক হইল; সেই চিন্তা-প্রসূত ভাবসমূহ অবলম্বনে প্রথম শ্রেণীর সৌমপিতৃগণ সৃষ্টিবিষয়িণী আদর্শ নির্ম্মাণ করিলেন। সেই আদর্শ সকল অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তী স্রষ্টাগণ পূর্ব্ববর্ত্তী সৌমমণ্ডল হইতে আগত জীবসকলের আকার প্রকারের বা রূপের সৃষ্টি করিলেন।

আমরা সাধারণতঃ যাহাদিগকে আকার প্রকার বলিয়া জানি, তাঁহার কিছুই প্রথম গ্রহে (বা "ক" গ্রহে) নাই, কাজেই তাহাদিগকে অরূপ বলা হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা নর জীবের কাছে তাহা আকার বলিয়া গণ্য না হইলেও তাহাদের একটা আকৃতি আছে, তাহাদিগকে আদর্শ আকৃতি Archetypal or Ideal Forms) বলে। অনির্দ্দিষ্ট, পরিবর্ত্তনশীল, আকার-বিহীন। অনমুমেয় এবং ধারণাতীত অবিভক্ত চিন্তা হইতে এই আকার-গুলির সৃষ্টি হইয়াছে। তাহা আমাদের সসীম মনে ধারণা করা দুষ্কর, তবে তাহাদের অস্তিত্ব কিরূপে অনুভব করা যায়? যখন এরূপ একটী আকার অধোগামী জড়জগতে অবতরণ করে, তখন ইহা হঠাৎ নানা সদৃশ আকৃতিতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই সকল আকৃতি মোটামোটিভাবে মূল আদর্শাকৃতির অনুরূপ।

বিলাতের একজন প্রসিদ্ধ উদ্ভিজ্জ তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত, অধ্যাপক ওয়েন এই আদর্শাকৃতির দৃষ্টান্ত দেওয়ার একটী অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। স্তন্যপায়ী পশুদের মধ্যে কি কি বিষয়ে তাহাদের সাদৃশ্য আছে, তাহা তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। যেমন মেরুদণ্ড, চতুষ্পদ ইত্যাদি তাহাদের সকলের মধ্যেই বর্ত্তমান আছে। সদৃশ অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে মনে মনে একত্র করিয়া তাহাদের সমষ্টিদ্বারা কল্পনাতে তিনি একটী অভূতপূর্ব্ব জীবের সৃষ্টি করিয়া তাহার নাম দিলেন আদর্শ-জীব বা আদর্শ-আকার। অথচ এইরূপ আকার বিশিষ্ট জীব জলে, স্থলে, আকাশে, অন্তরীক্ষে কোথাও বিদ্যমান নাই। উক্ত অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করিয়া শুধু কল্পনাবলে এই প্রকৃত আদর্শের সৃষ্টি করিয়াছেন। বস্তুতঃ আদর্শ আকারগুলি ভাবরূপে, সূক্ষ্ম বীজরূপে, ঈশ্বরের মনে নিত্য বিরাজমান রহিয়াছে। স্রষ্টা বর্হিষদ পিতৃগণ তাহাদিগকে সূক্ষ্ম ও উন্নত প্রথম গ্রহে (ক গ্রহে) আনয়ন করিলেন। কারণ প্রত্যেক মণ্ডলেরই কগ্রহে আদর্শ আকারের আবির্ভাব হয়। এই জন্ত ইহাকে আদর্শ আকারের গ্রহ বলে।

পুরাণে এই আদর্শ আকারগুলির বিশদ বর্ণনা আছে। এই কিম্ভূত কিমাকার অদ্ভুত আকার বিশিষ্ট জীবসমূহের বৃত্তান্ত পুরাণে পাঠ করিয়া নব্য-শিক্ষিত বৈজ্ঞানিকগণ নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া উপহাস এবং নিতান্ত আষাঢ়ে

গল্প মনে করিয়া তৎপ্রতি কটাক্ষপাত ও শ্লেষোক্তি করিতে পারেন। কিন্তু পুরাণাদি প্রণেতা ঋষিগণ আধুনিক পণ্ডিতগণ অপেক্ষা অধিকতর বিদ্বান, বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান এবং বহুদর্শী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। এই বিসদৃশ ও অদ্ভুত দেহধারী জন্তুর বিষয় যাহা পুরাণাদিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগকে প্রকৃত দেহধারী এই পৃথিবীর জীব বলিয়া অনুমান করিলে আমরা বিষম ভ্রমে পতিত হইব। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা "ক" নামক প্রথম গ্রহস্থিত সূক্ষ্ম জগতের আদর্শ আকারসমূহবই আর কিছুই নহে। এই আকারসমূহকে পুরাণে যে ভাষায় ও যে উপায় অবলম্বনে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা ভাল ও বিশদ বর্ণনা মনুষ্যভাষায় সম্ভবপর নহে। প্রত্যেক মণ্ডলেই সপ্ত জীবজগতের উদ্ভব হয়। ভূতরাজ্য তিন, স্থাবর, উদ্ভিজ্জ, প্রাণী ও মনুষ্য জগৎ প্রত্যেকে এক এক করিয়া চার, সর্ব্বশুদ্ধ এই সপ্তজগৎ। মণ্ডল বিশেষের সকল গ্রহে সকল রূপের উদ্ভব না হইলেও তাহারা ব্রহ্মার মনে সূক্ষ্মবীজরূপে নিহিত থাকে। তাহারা গ্রহের চতুর্দ্দিকে বীজ বা ভ্রূণ রূপে অবস্থান করে; কাজেই গ্রহের বহির্ভাগের আকাশে দৃক্পাত করিলেই তাহাদের ইতিহাস জানা যায়। ইহাই চিত্রগুপ্তের খাতার লিখা আকাশিক ইতিহাস (Astral Record)।

৯। প্রথম চক্র ও উষ্মপ পিতৃগণ। - প্রথম শ্রেণীর বর্হিষদ পিতৃগণের নামই উষ্মপ। তাঁহারা প্রথম চক্রে কার্য্য করেন। সেইরূপ বর্হিষদ পিতৃগণের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পিতৃগণ ক্রমান্বয়ে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ চক্রে সৃষ্টিকার্য্যে রূপনির্ম্মাণে নিযুক্ত হন। প্রথম চক্রে গ্রহগণ তেজোময় উত্তপ্ত অগ্নিপিণ্ড বিশেষ। উষ্মপ পিতৃগণ অতি সূক্ষ্ম আদর্শরূপসমূহের সৃষ্টি করিয়া গ্রহগুলি পূর্ণ করিলেন। পরবর্ত্তী দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ চক্রের বীজস্বরূপ ক্রমান্বয়ে উদ্ভিজ্জ প্রাণী ও মনুষ্য জগতের যে সকল ভ্রূণ গ্রহগণের চারদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, তাহাদের বিকাশের জন্য অপর তিন শ্রেণীর বর্হিষদ পিতৃগণ ব্যাপৃত ছিলেন। এই এই জাতীয় ভ্রূণের সঙ্গে এখনও তাহাদের কোন সাদৃশ্য হয় নাই, কেবল অঙ্কুররূপে সূক্ষ্ম পদার্থের সমাবেশমাত্র। মাতৃগর্ভে মানব ভ্রূণের আবির্ভাব ও অবস্থানের ন্যায় এই তিন রাজ্যের ভ্রূণ সকল প্রকৃতি জঠরে নিহিত থাকে। এই জন্যেই

বলা হইয়া থাকে, যখন মানবজীবনের ক্রমোন্নতির রহস্য বুঝিবার চেষ্টা করা যায়, তখন সৃষ্টিবিষয়িণী ক্রিয়ার সমগ্র চিত্রটী নয়নপথে পতিত হয়। প্রথম চক্রে গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে রূপের বিকাশ ও ক্রমে ক্রমে উৎকর্ষ সাধন হইলেও এই মণ্ডলে উষ্মপ পিতৃগণ কেবল দ্রব্য সংগ্রহমাত্র করিয়া থাকেন। জীব যতই উন্নত এবং বিকাশপ্রাপ্ত হয়, তাহার উন্নতিও অধিকতর দ্রুতগতিতে চলিতে থাকে। প্রথম চক্রের অবসানে প্রলয় আসিয়া উপস্থিত হইল। কঠোর পরিশ্রমে ক্লান্ত সেই বিশ্বকর্ম্মাদেবগণ তত্তকাল ব্যাপিয়া বিশ্রাম ভোগ করিতে লাগিলেন প্রলয়াবসানে পুনরায় সৃষ্টি কার্য্য আরম্ভ হইল। এই-রূপে প্রথম চক্রের কার্য্য সমাধা হইল।

ক্রমশঃ

---

# কর্ম্মের প্রহেলিকা।

ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন যে, গহনা কর্ম্মণো গতিঃ, 'কার্ম্মের গতি অতি দুর্বোধ্য।' বাস্তবিক এক জন্মে কৃত কর্ম্মের ফল অপর জন্মে কিরূপে ভোগ হয়, তাহা নিরূপণ করা অতীব দুরূহ। আমরা এইরূপ করিতে পারি না বলিয়াই বিধাতার বিধানকে অনেক সময়ে নিদারুণ অব্যবস্থা ও নিষ্করুণ যদৃচ্ছা ভাবিয়া ভ্রমে পড়ি। এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে; কারণ, আমরা শুধু ফলেরই আস্বাদন করি। কি বীজের পরিপাকে সেই ফল উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা জানিবার আমাদের কোন সুযোগই নাই। আমি একজন সাধুর মুখে শুনিয়াছিলাম যে, এই জটিল কর্ম্মতত্ত্ব সুগম করিবার জন্য তাঁহার গুরুদেব তাঁহার পরিচিত ৪১৫ জন ব্যক্তির ১০১১২টী পূর্ব্ব পূর্ব্ব জীবনের চিত্রাবলী উদ্ঘাটন করিয়া তাঁহাকে প্রদর্শন করান। তাহা হইতে তিনি বুঝিতে পারেন জন্মান্তরের কোন্ ঘটনা কি সূত্রে কেমন করিয়া কোন্ প্রণালীতে ইহ জন্মের ভোগে পরিণত হইয়াছে। যখন একে একে অতীত জীবনের চিত্রপট তাঁহার মানস নয়নের সম্মুখ দিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং এক এক জীবনের অঙ্ক গর্ভাঙ্ক অভিনীত হইয়া যবনিকা পতিত হইতে

লাগিল, তাহার পর আবার অন্য জীবনের নাটকের অভিনয় আরম্ভ হইল, তখন তিনি ঘটনার পর ঘটনার সূত্র অনুসরণ করিয়া কর্ম্মতত্ত্বের গহন জটিলতার মধ্যে পথ খুঁজিয়া পাইলেন। বাস্তবিক এইরূপভাবে না দেখাইলে কর্ম্মতত্ত্ব বিশদ করা যায় না।

*কর্ম্মের প্রতিফল কিরূপে ফলে ?* *কর্ম্ম দ্বিবিধ, ব্যক্তিগত ও জাতিগত।* এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির ইহজন্মে উপকার বা অপকার করিল। ইহার ফল কিরূপ দাঁড়াইবে? এইরূপ এক জাতি ( জাতি ব্যক্তির সমষ্টি মাত্র ) অন্য জাতির উপর অত্যাচার বা উপকার করিল। ইহারই বা ফল কিরূপ দাঁড়াইবে? আমাদের মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, ব্যক্তির যেরূপ কর্ম্ম আছে, জাতিরও সেইরূপ কর্ম্ম আছে। এবং কি ব্যক্তি কি জাতি কর্ম্ম করিলেই তাহাকে তাহার ফল ভোগ করিতে হয়।

কর্ম্মের সাধারণ বিধি এই যে,—হন্তা হতেন হন্যতে—'হন্তা হত হইবে হত ব্যক্তির দ্বারা'। অর্থাৎ, জন্মান্তরে যে যাহাকে হনন করিয়াছে, ইহজন্মে সে তাহাকে হত্যা করিবে। ইহার অর্থ এরূপ নহে যে, হত ব্যক্তি হন্তাকে নিজ হস্তে বধ করিবে। সে যদি সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে তাহার মৃত্যুর কারণ হয়, তাহা হইলেই এ বিধি রক্ষিত হয়। কোন কোন স্থানে দেখা যায় যে চিকিৎসকের অপ-চিকিৎসায় অথবা আকস্মিক ভুলে রোগীর মৃত্যু ঘটিল। এরূপ ঘটনা সময় সময় ঘটে। হঠাৎ ঘটিল এরূপ বলা সঙ্গত নহে। এই নিয়মাধীন জগতে হঠাৎ কোন কিছু ঘটেনা। প্রত্যেক হঠাতের পশ্চাতেই ( এই হঠাতের ইংরাজী নাম accident ) বিধির অখণ্ড বিধান অখণ্ডিত ভাবে বিদ্যমান থাকে। আমরা স্থূলদর্শী, তাহা দেখিতে পাই না। যদি কর্ম্মের রহস্যোদ্ঘাটন আমাদের সাধ্যায়ত্ত হইত, তবে আমরা দেখিতাম যে, এই চিকিৎসক কর্ত্তৃক হঠাৎ হত রোগী জন্মান্তরে সেই চিকিৎসকের মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। ইহজন্মে এইরূপে সেই অপকারের প্রত্যপকার হইল।

স্থল বিশেষে এই বিধির একটু বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। হত ব্যক্তি স্বতঃ বা পরতঃ হন্তার বধের কারণ হয়। হন্তা হতের প্রাণ রক্ষার জন্য আত্ম প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত ঋণের উন্মুল করে। এইরূপে তাহার কৃত কর্ম্মের প্রতিফল হয়।

এই তত্ত্ব বিশদ করিবার জন্য কয়েক বৎসর পূর্ব্বে Theosophical Review পত্রিকায় একটী সুন্দর গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল। গল্পটি এই—দূর অতীতের এক অজ্ঞাতকালে কোন সম্রাটের অধিকৃত দেশে অত্যাচার পীড়িত প্রজা বিদ্রোহী হইয়াছিল। তাহারা এক তেজস্বী যুবককে নেতৃত্বে বরণ করে। বিদ্রোহীরা সম্রাটের বিপুল বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পলায়নপর হইলে, সেই যুবক শত্রু কর্ত্তৃক ধৃত হয়। পরে সম্রাটের কঠোর আদেশমত অতি নৃশংসভাবে সেই যুবকের প্রাণদণ্ড করা হয়। ইহার পর অনেক বর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে। সে সম্রাট, সে সাম্রাজ্য কোথায় কালসাগরে বিলীন হইয়াছে। কিন্তু সেই যুবক ও সেই সম্রাটের গ্রন্থিবদ্ধ কর্ম্মসূত্র তাহাদের উভয়কেই আকর্ষণ করিয়া ইংলণ্ডের এক সীমান্ত প্রদেশে জন্মগ্রহণ করাইয়াছে। সেই সম্রাট এখন সেই প্রদেশের সামন্ত। যুবক, তাঁহার অধিকৃত এক গ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু প্রজা। সামন্ত নিজে বিষয়াদির কিছু দেখেন শুনেন না। তাঁহার এক প্রিয় কর্ম্মচারীর হস্তেই সমস্ত ভার অর্পিত। সে প্রভুর অতি-বিশ্বাসের সুযোগে প্রজাদিগের প্রতি সবিশেষ অত্যাচার করে। দিন দিন সে অত্যাচার অসহ্য হইয়া পড়িতেছে। প্রজারা আমাদের সেই পূর্ব্বপরিচিত যুবককে নায়ক করিয়া সামন্তকে অনেক আবেদন নিবেদন করিল। যখন তাহাতে কোনই ফল দর্শাইল না, তখন সকলে এক বাক্যে স্থির করিল যে সেই অত্যাচারী প্রভুকে হত্যা করিতে হইবে।

এই গুরুভার সেই যুবকের স্কন্ধে অর্পিত হইল। তিনি সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা লইয়া সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। এক দিন সুবিধা মত এক নির্জ্জন স্থানে উহাদের উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটিল। কথায় কথায় বচসার সৃষ্টি হইল। যুবক অস্ত্র উদ্যত করিয়া সামন্তের প্রাণ বধে অগ্রসর হইলেন। হঠাৎ যেন এক অতীত জীবনের ঘটনাচিত্র তাহাদের চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। উভয়েই স্তম্ভিত হইল। যুবকের উদ্যত অস্ত্র স্খলিত হইয়া ধরাশায়ী হইল। মুহূর্ত্তে উভয়ের সে শত্রুভাব অন্তর্হিত হইল। সামন্ত অত্যাচারী কর্ম্মচারীকে পদচ্যুত করিয়া তাহার স্থানে সেই যুবককে নিযুক্ত করিলেন। প্রজাদিগের মধ্যে শান্তি সুখ বিরাজিত হইল। যুবক নানা উপায়ে সেই সম্পত্তির শ্রীবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।

সেই প্রদেশে একটা পার্ব্বত্য নদী ছিল, বর্ষাকালে তাহার জল বর্দ্ধিত হইয়া প্রজালোকের বড়ই অপকার করিত। যুবক সেই নদীতে একটা বাঁধ বাঁধিবার ব্যবস্থা করিলেন। বাঁধের কার্য্য যখন অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় একদিন তিনি প্রভুকে লইয়া সেই বাঁধ পরিদর্শন করিতে গেলেন, হঠাৎ স্থান ভ্রষ্ট হইয়া যুবক সেই বর্ষাস্ফীত প্রবল জলরাশির স্রোতের মধ্যে নিমজ্জিত হইলেন। সামন্ত তাঁহার এই অবস্থা দর্শন করিয়া বিনা দ্বিধায় তাঁহার উদ্ধার মানসে, সেই স্রোতের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। বহু চেষ্টায়, অনেকক্ষণে সামন্ত সেই যুবককে তীরের কাছে আনিলেন, এমন সময় একটা প্রবল তরঙ্গ আসিয়া তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। তিনি যুবকের প্রাণ রক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু নিজেকে বাঁচাইতে পারিলেন না। এইরূপে সেই ভূতপালের হন্তা সম্রাট হতের প্রাণ দান দিতে নিজের প্রাণ বলিদান দিলেন প্রারব্ধ কর্ম্মের এইরূপে প্রতিফল ফলিল।

মহাভারতে অম্বার আখ্যানে এই হন্তা হতের ঘাত প্রতিঘাত আমরা অন্য আকারে দেখিতে পাই। পিতৃ সত্যে দার পরাঙ্মুখ ভীষ্মদেব স্বয়ম্বর সভায় কাশীরাজীয় তিন কন্যাকে হরণ করেন তাহাদিগের নাম অম্বা অম্বিকা ও অম্বালিকা। ভীষ্মের উদ্দেশ্য ছিল ঐ কন্যাদিগের সহিত তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতার বিবাহ দেন। স্বয়ম্বর সভা হইতে কন্যাহরণ করিয়া শান্তনুনন্দন যখন হস্তিনার অভিমুখে যাত্রা করিলেন, তখন শাল্বপ্রমুখ সমবেত রাজগণ তাঁহার গতিরোধের চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ভীষ্মের বীর্য্যের সম্মুখে কার সাধ্য দাঁড়াইতে পারে? ভীষ্মদেব যুদ্ধে রাজাদিগকে পরাভব করিয়া কতকদূর অগ্রসর হইলে কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বা ভীষ্মকে বলিলেন যে তিনি পূর্ব্ব হইতেই মনে মনে শাল্বরাজকে বরণ করিয়াছেন, অতএব তিনি আর কাহারও পত্নী হইতে পারেন না। ভীষ্ম তাঁহার এই সঙ্গত আপত্তি শুনিবামাত্র তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। অম্বাও ত্বরিত পদে শাল্বরাজের সমীপে গিয়া সমস্ত বিবরণ বিবৃত করিলেন, কিন্তু শাল্বরাজ অপরের অনুগ্রহ-দত্তা সেই কন্যাকে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তখন অম্বা অনন্যোপায় হইয়া আবার ভীষ্মের নিকট ফিরিয়া যাইলেন কিন্তু ভীষ্মও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। ইহাতে অম্বার বড় শোচনীয় অবস্থা হইল।

তিনি অনেকেরই শরণাপন্না হইলেন। কিন্তু কুরুবীর ভীষ্মের সহিত কেহই তাঁহার জন্ত বিবাদ করিতে সম্মত হইলেন না। শেষ অম্বা পরশুরামের শরণ লইলেন। পরশুরাম হস্তিনায় আসিয়া ভীষ্মকে নানামতে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ভীষ্ম পিতার নিকট আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালনের যে সত্য করিয়াছিলেন তাহা কিছুতেই ভঙ্গ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তখন ভীষ্ম ও পরশুরামে প্রচণ্ড যুদ্ধ বাধিয়া গেল। কিন্তু ক্ষত্রিয়ান্তকারী পরশুরাম ভীষ্মকে বিচলিত করিতে সক্ষম হইলেন না। অবশেষে ভগ্নমনোরথ হইয়া তিনি আপনার আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন। ইহাতে অম্বার কি দারুণ মর্ম্মান্তিক মনঃপীড়া হইল, তাহা সহজেই অনুমেয়। তিনি অসহ্য মনের খেদে অগ্নিকুণ্ডে দেহ আহুতি দিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত অবধি তাহার চিত্ত ভীষ্মের প্রতি বৈরনির্য্যাতনের প্রবল ভাবে ভাবিত হইয়া রহিল। ইহার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই অম্বা শিখণ্ডিরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ভীষণ রণস্থলে ভীষ্মের শরশয্যার কারণ হইয়া পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম-ঋণের প্রতিশোধ লইলেন। এইরূপে হন্তা ভীষ্ম, হত অম্বা কর্তৃক নিহত হইলেন। কর্ম্মের প্রতিফল ফলিল।

কয়েকবৎসর পূর্ব্বে 'থিয়সফিষ্ট' পত্রে কর্ম্মফল সম্বন্ধে একটী অদ্ভুত ঘটনা প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখক সে বিবরণের সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন। সে বিবরণটী এই,—

বোম্বাই অঞ্চলে এক পান্থ পথিমধ্যে দস্যু কর্তৃক নির্দ্দয়ভাবে নিহত হয়। পথিকের সঙ্গে অনেক টাকা কড়ি ছিল। দস্যু তাহার প্রাণ বধ করিয়া সেই সকল আত্মসাৎ করে। এবং সেই টাকা মূলধন করিয়া কারবারে প্রবৃত্ত হয়। ক্রমে কারবারের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া সে একজন ধনীলোক হইয়া উঠে। সে অপুত্রক ছিল। শেষ জীবনে বহু আশা ও আকাঙ্ক্ষার পর তাহার একটী পুত্র সন্তান লাভ হয়। সে পুত্র স্বভাবতই বৃদ্ধের জীবন সর্ব্বস্ব হইয়া উঠে। বৃদ্ধ পুত্রকে প্রাণ অপেক্ষাও ভাল বাসিতে আরম্ভ করে। বুঝি, আঁধার গৃহের মাণিকেরও এত আদর যত্ন হয় না। ক্রমে পুত্র যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলে বৃদ্ধ বড় সাধ করিয়া একটী পুত্রবধূ গৃহে লইয়া আসে। ইহার কিছু দিন পরেই পুত্র সাঙ্ঘাতিক পীড়ায় পীড়িত হয়। বহু চিকিৎসা বহু চেষ্টা,

প্রচুর অর্থব্যয়েও যখন সে রোগের উপশম হইল না, তখন সে বৃদ্ধ নিরাশ হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় সেই রোগী তাহাকে একদিন রোগশয্যার পার্শ্বে আহ্বান করিল। এবং সমস্ত লোককে ঘরের বাহির করিয়া দিয়া পিতার সহিত কিছু গোপন কথা আছে, এই ভাব জানাইল। পিতাপুত্র যখন নিরালা হইল, তখন পুত্র পিতাকে নিকটে বসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি আমাকে চিনিতে পারেন কি"? পিতা ভাবিল পুত্রের বিকার উপস্থিত হইয়াছে; প্রকাশ্যে বলিল, "তোমাকে চিনিতে পারি না? তুমি আমার হৃদয়ের ধন।" পুত্র বলিল, অনেক বৎসর পূর্ব্বে এক পথিককে হত্যা করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছিলেন মনে আছে কি? পিতা ভাবিল, 'এ কথা এ জানিল কেমন করিয়া, গোপনে যে পাপ করিয়াছিলাম, তাহা ত কেহই জানিতে পারে নাই। কেবল একটা দুঃস্বপ্নের ছায়ার মত আমার চিত্তে কদাচ কখন জাগিয়া উঠে মাত্র' প্রকাশ্যে বলিল, কে পথিক, কেন, তাহার কি হইয়াছে? পুত্র বলিল, 'আমিই সেই পথিক। আমার পাওনা আদায় করিতে আসিয়াছিলাম, আদায় হইয়াছে, এখন যাইতেছি। হিসাব করিয়া দেখুন, আমাকে মারিয়া যে টাকা পাইয়াছিলেন, তাহার কড়া ক্রান্তি পর্য্যন্ত আমার প্রতি ব্যয় হইয়াছে কি না? সুদের স্বরূপ আমার স্ত্রী আপনার পুত্রবধূকে রাখিয়া গেলাম, ইহাকে পালন করিবেন' পিতা স্তম্ভিত হইলেন। কিন্তু তখনি তাঁহার বিস্ময় বিষাদে পরিণত হইল। কারণ অচিরে পুত্রের প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল।

এ গল্প সত্য হউক না হউক, ইহার মূলে যে কর্ম্ম-তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে, তাহা যে সত্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অনেক সময়ে দেখা যায়, আদরের দুলাল পিতামাতাকে অকূল পাথারে ভাসাইয়া অকালে চলিয়া গেল। চির-দিনের জন্য তাহাদিগের আনন্দের আলোক নির্ব্বাপিত হইল। যদি দিব্য-দৃষ্টির সাহায্যে অতীতের কুহেলিকা ভেদ করিয়া আমরা সেই পিতাপুত্রের জন্মান্তরীণ সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করিতে পারিতাম, তবে দেখিতে পাইতাম যে এ জন্মের স্নেহশীল পুত্রপ্রাণ পিতা জন্মান্তরে এখন যে ব্যক্তি তাহার পুত্র হইয়াছে, তাহাকে অনাদর অযত্ন করিয়াছিলেন। কর্ত্তব্যের অবহেলা করিয়া, তাহাকে তাহার প্রাপ্য স্নেহ মমতা হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছিলেন, তাহারই

প্রতিফলে ইহজন্মে এই মর্ম্মান্তিক পুত্রশোক ঘটিল। কর্ম্মনীতি এইরূপেই জন্ম-জন্মের সামঞ্জস্য রক্ষা করে। *

এইরূপ এক জাতি যদি অন্য জাতির উপর অত্যাচার করে, তবে তাহাকেও তাহার প্রতিফল পাইতে হয়। যখন কোন জাতির সুদিন হয়, সেই সমৃদ্ধির দিবসে সে অভিমানে স্ফীত হইয়া, দম্ভে উন্মত্ত হইয়া হিতাহিত জ্ঞানহারা হয়। ধর্ম্মের ও ন্যায়ের ঋজু পথ হইতে বিচলিত হইয়া অন্যায় ও অধর্ম্মকে শ্রেয়ঃ বলিয়া বরণ করে। কিন্তু কর্ম্মের বিধি অলঙ্ঘ্য। দুষ্কৃতের ফলে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী অধর্ম্ম বীজ হইতে পরিতাপ ফল ফলেই ফলে।

এইরূপে জাতীয় কর্ম্মের প্রতিফলের একটা প্রকাণ্ড দৃষ্টান্ত আমাদের চক্ষুর সম্মুখে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছিল। মার্কিনে ও স্পেনে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যাহার ফলে স্পেন ইউরোপের মধ্যে নগণ্য রাজশক্তিতে অবনত হইয়াছে, সেই যুদ্ধের অদৃষ্ট কারণ কি? কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে স্পেন উন্নতির চরমশিখরে অধিরূঢ় হইয়াছিল। ইউরোপ ব্যাপী সাম্রাজ্যের উপর, কলম্বসের নাবিক প্রতিভার ফলে নবাবিস্কৃত আমেরিকা মহাদেশও তাহার করায়ত্ত হইয়া পড়ে। অবাধ বাণিজ্য ও অগাধ ঐশ্বর্য্যের উত্তেজনায় স্পেনের হিতাহিত জ্ঞান তিরোহিত হয়। তখন ধনমদে স্ফীত ও অর্থলোভে উন্মত্ত স্পেন আমেরিকায় যে অত্যাচারের স্রোত প্রবাহিত করে, যে অধর্ম্মের অনল প্রজ্জ্বলিত করে, জগতের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। এই অনলে স্পেন পেরু ও মেক্সিকোর অধিবাসীদিগকে পতঙ্গের মত পুড়াইয়া মারে। স্পেনের সেই পুঞ্জীকৃত দুষ্কৃতরাশি বিধাতার ভাণ্ডারে সযত্নে রক্ষিত ছিল। কাল-

* If an Ego treats unkindly or neglects one to whom he has affectionate duty and protection, or service of any kind he will but too likely again find himself born in close relationship with the neglected one, and perhaps tenderly attached to him, only for early death to snatch him away from the encircling arms, the despised poor relation may reappear as the much honored heir, the only son and when the parents find their house left unto them desolate, they marvel at the "unequal ways of Providence", that deprived them of their only one on whom all their hopes have been set —Karma—p 52]

সহকারে সেই আমেরিকায় এক নব জাতির অভ্যুদয় হইল। এত বর্ষ পরে সেই জাতি স্পেনের দুষ্কৃতের প্রতিফল দিল। স্পেন আমেরিকার সহিত যুদ্ধে সর্ব্বত্র বিজিত ও হতমান হইয়া আপনার গৌরব ও গর্ব্ব আমেরিকার পদে অঞ্জলি দিয়া সন্ধি ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইল। এইরূপে উভয় জাতির পূর্ব্ব সঞ্চিত কর্ম্মের সামঞ্জস্য বিধান হইল।

বুঝিয়া দেখিলে ভারতবর্ষের আধুনিক দৈন্য দুর্দ্দশার মধ্যেও আমরা এই কর্ম্মের শিক্ষা জাজ্জল্যমান অক্ষরে দেখিতে পাই। আর্য্যজাতিও এক সময়ে জয়োল্লাসে স্ফীত হইয়া ভারতবর্ষের প্রাচীন অধিবাসী অনার্য্যজাতির উপর নানাবিধ অত্যাচার করিয়াছিল। বেদের সংহিতাভাগে এবং প্রাচীন সূত্রকার ও ধর্ম্মশাস্ত্রকারদিগের রচনার মধ্যে এই অত্যাচারের অস্পষ্ট বিবরণ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। কিন্তু বিধির অমোঘ বিধানে, কি জাতি কি ব্যক্তি, কোন অত্যাচারীরই পরিত্রাণ নাই। আর্য্যজাতিরই বা পরিত্রাণ হইবে কিরূপে? কালসহকারে সেই উন্নত আর্য্যজাতি অবনতির চরমসীমায় উপনীত হইয়াছে। এখন কোথায় সেই বিজেতার হুহুঙ্কার, সেই সাম্রাজ্য গর্ব্ব, সেই অহঙ্কার স্ফীতি? যবন, শক, হুন, পারসিক, পাঠান, মোগল আফগান, পর্ত্তুগীজ, ফরাসী ইংরেজ কতই না বিজেতা ভারতের বক্ষে পদাঘাত করিয়া তাহার ধনরত্ন বিভব বৈভব অপহরণ করিয়াছে। সেই স্পর্দ্ধিত আর্য্যজাতিকে কতই না তাড়না লাঞ্ছনা বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইয়াছে। ইহা কি বিধাতার অবিচার, অথবা কর্ম্মনীতির সূক্ষ্ম গতি? হায়! কত দিনে আর্য্যজাতির সেই দুষ্কৃত রাশির ক্ষালন হইবে!

যে জাতি এখন ভারতবাসীকে নিপীড়িত নিগৃহীত করিতেছে, তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে কর্ম্মের অকাট্য বিধান তাঁহাদিগকেও ক্ষমা করিবে না। দুর্ব্বল অধঃপতিত জাতির প্রতি, প্রবল তাঁহারা যে অত্যাচার করিতেছেন,

---

* ধর্ম্মভীরু Gladstone এই কর্ম্মচক্রের অখণ্ড গতিতে ভীত হইয়া তাঁহার diaryতে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"I am in dread of the judgment of God upon England for our national inequity towards China—[ Morley's Life of Gladstone )

Chinaর পরিবর্ত্তে India লিখিলে কি অসঙ্গত হয়?

কাল পরিপক্ক হইলে তাঁহাদিগকেও তাহার প্রতিফল ভোগ করিতে হইবেই। কর্ম্মচক্র মন্থর গতিতে পরিবৃত্তিত হয় বটে, কিন্তু ইহা সুদর্শন নীতি চক্র। অপরাধীকে যথাযথ দণ্ড দিবার পক্ষে ইহার একতিলও ব্যত্যয় হয় না *

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

---

# রূপ সনাতন ও জীবগোস্বামী।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

শান্তভক্তিরসের গুণ শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠা। এই রসের সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি নরাকার পরব্রহ্ম, চতুর্ভুজ নারায়ণ, পরমাত্মা ও শান্ত দান্ত শুচি বশী প্রভৃতিগুণসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। মমতারহিত, শ্রীভগবন্নিষ্ঠ, ভক্তিমার্গপ্রদর্শক সনকাদি আধিকারিক ভক্ত সকল আশ্রয়ালম্বন। জ্ঞানিগণও মোক্ষবাসনা ত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণভক্তের কৃপায় যদি ভক্তিবাসনাযুক্ত হয়েন, তবে তাঁহারাও আশ্রয়ালম্বন হইয়া থাকেন। পর্ব্বতকাননাদিবাসী সাধুজনের সঙ্গ ও সিদ্ধ ক্ষেত্রাদি-উদ্দীপন-বিভাব। নাসাগ্রদৃষ্টি, অবধূতের ন্যায় চেষ্টা, নিম্মমতা, ভগবদ্বেষিজনে বিদ্বেষ-রাহিত্য, ভগবদ্ভক্ত জনেও ভক্ত্যাতিশয্যের অভাব, মৌন, জ্ঞানশাস্ত্রে অভিনিবেশ প্রভৃতি অনুভাব। প্রণয়বর্জ্জিত অশ্রুপুলকাদি সাত্ত্বিক ভাব। নির্বেদ মতি ও ধৃতি প্রভৃতি সঞ্চারী ভাব।

দাস্য ভক্তিরসের গুণ সেবা। এই রসের ঈশ্বর প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ও ভক্তবৎসল প্রভৃতি গুণান্বিত শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। মমতাযুক্ত গৌরবভাবময়, শ্রীভগবন্নিষ্ঠ, নিজ আচরণ দ্বারা অন্যের উপকারক, দাস্যসেবাপরায়ণ, অধিকৃতভক্ত আশ্রিতভক্ত পারিষদ ও অনুগামী এই চারিপ্রকার ভক্ত আশ্রয়ালম্বন। তন্মধ্যে ব্রহ্মাশঙ্করাদি আধিকারীক দেবতারা অধিকৃত ভক্ত। আশ্রিতভক্ত শরণ্য জ্ঞানিচর ও সেবানিষ্ঠ ভেদে ত্রিবিধ। তন্মধ্যে কালিয়নাগ, মগধরাজ জরাসন্ধকর্ত্তৃক রুদ্ধরাজাগণ প্রভৃতি শরণ্য। প্রথমে জ্ঞানী থাকিয়া পরে মোক্ষেচ্ছা ত্যাগ পূর্ব্বক যাঁহারা দাস্যে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারাই জ্ঞানিচর

সনকাদি মুনিগণ এই বিভাগের অন্তর্গত। আর যাঁহারা প্রথম হইতেই সেবানিষ্ঠ হয়েন, তাঁহাদিগকে সেবানিষ্ঠ বলা যায়। চন্দ্রধ্বজ হরিহর ও বহুলাশ্ব প্রভৃতি রাজগণ সেবানিষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হয়েন। উদ্ধব দারুক ও শ্রুতদেবাদি ক্ষত্রিয়গণ এবং উপনন্দ প্রভৃতি গোপগণ পারিষদ। পুরে সুচন্দ্র ও মণ্ডনাদি এবং ব্রজে রক্তক পত্রক ও মধুকণ্ঠাদি অনুগামী। ইহাঁদের মধ্যে যাঁহারা সপরিবার শ্রীকৃষ্ণে যথোচিত ভক্তি করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের নাম ধূর্য্যভক্ত, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী বর্গে অধিক আদরযুক্ত তাঁহাদিগের নাম ধীর ভক্ত।

আর যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভে গর্ব্বিত থাকিয়া কাহারও অপেক্ষা রাখেন না, তাঁহারাই বীরভক্ত। এই সকল সম্ভ্রম প্রীতি যুক্ত ভক্তের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণে গুরুত্ববুদ্ধি বিশিষ্ট প্রদ্যুম্ন ও শাম্বাদি শ্রীকৃষ্ণের পাল্য। উক্ত ভক্ত সকল আবার নিত্যসিদ্ধ সাধনসিদ্ধ ও সাধকভেদে ত্রিবিধ। শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ চরণধূলি ও মহাপ্রসাদ প্রভৃতি উদ্দীপন ভাব। আজ্ঞা পালনাদি অনুভাব। এই রসের তিনটী অবস্থান,—প্রেম, স্নেহ ও রাগ। তন্মধ্যে অধিকৃত ভক্তে ও আশ্রিত ভক্তে প্রেম পর্য্যন্ত স্থায়ী, পার্ষদ ভক্তে স্নেহ পর্য্যন্ত স্থায়ী; পরীক্ষিৎ দারুক ও উদ্ধবে রাগ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়, ব্রজানুগ রক্তকাদিতে এবং পুরে প্রদ্যুম্নাদিতে সকলগুলিই দৃষ্ট হয়। এই রসে অযোগ যোগ ও বিয়োগ এই তিনটী অবস্থা হয়। প্রথম দর্শনের পূর্ব্বের অবস্থার নাম অযোগাবস্থা। দর্শনের পর যে বিচ্ছেদ, তাহার নাম বিয়োগাবস্থা। আর মধ্যাবস্থার সঙ্গের নাম যোগাবস্থা। বিয়োগে অঙ্গে তাপ, কৃশতা, জাগরণ, আলম্বনশূন্যতা বা অনবস্থা, অধীরতা, জড়তা, ব্যাধি, উন্মাদ, মূর্চ্ছা ও মৃত্যু অর্থাৎ মৃত্যুতুল্য অবস্থা এই দশ দশা। অযোগে ঔৎসুক্যাদি এবং যোগে সিদ্ধি ও তুষ্টি প্রভৃতি দশা।

সখ্যভক্তিরসের গুণ সম্ভ্রমরাহিত্য। এই রসে বিদগ্ধ বুদ্ধিমান, সুবেশ ও সুখী প্রভৃতি গুণযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। মমতাযুক্ত, বিশ্বাসভাবময়, শ্রীভগবন্নিষ্ঠ, নিজ আচরণ দ্বারা অন্যের উপকারক, সখ্যসেবাপরায়ণ, তদীয় সখা সকল আশ্রয়ালম্বন। সুহৃৎ, সখা, প্রিয়সখা ও প্রিয়নর্ম্মসখা ভেদে ঐ আশ্রয়ালম্বন চতুর্ব্বিধ। তন্মধ্যে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ হইতে বয়সে কিছু অধিক ও

কিঞ্চিৎ বাৎসল্যযুক্ত, তাঁহারাই সুহৃৎ। ব্রজে বলভদ্র সুভদ্র ও মণ্ডলীভদ্র প্রভৃতি সুহৃৎ। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ হইতে বয়সে কিঞ্চিৎ ন্যূন ও কিঞ্চিৎ দাস্যমিশ্র তাঁহারাই সখা। ব্রজে বিশাল বৃষভ ও দেবপ্রস্থ প্রভৃতি সখা। যাঁহারা বয়সে শ্রীকৃষ্ণের তুল্য, তাঁহারাই প্রিয়সখা। ব্রজে শ্রীদাম সুদাম ও বসুদাম প্রভৃতি প্রিয়সখা। আর যাঁহারা প্রেয়সীরহস্যের সহায় ও শৃঙ্গার-ভাবশালী, তাঁহারাই প্রিয় নর্ম্মসখা। সখ্যে বাহুযুদ্ধ ক্রীড়া ও এক শয্যায় শয়ন প্রভৃতি অনুভাব। অশ্রুপুলকাদি সমস্তই সাত্ত্বিক ভাব। হর্ষগর্ব্বাদি সঞ্চারীভাব। সখ্য রতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া প্রেম, স্নেহ, প্রণয় ও রাগ এই চারিটী আখ্যা ধারণ করিয়া থাকে। পুরে অর্জ্জুন ভীমসেন ও শ্রীদামবিপ্র প্রভৃতি সখা। এই সখ্যরসেও দাস্যের ন্যায় বিয়োগে দশ দশা।

বাৎসল্য ভক্তিরসের গুণ স্নেহ। এই রসে কোমলাঙ্গ বিনয়ী সর্ব্বলক্ষণযুক্ত ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। মমতাযুক্ত, অনুগ্রাহ্য ভাববন্ত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগের অনুগ্রহ পাত্র এই প্রকার বুদ্ধিবিশিষ্ট, নিজ আচরণদ্বারা অন্যের উপকারক বাৎসল্য সেবাপরায়ণ পিত্রাদি গুরুজন সকল আশ্রয়ালম্বন। ঐ আশ্রয়ালম্বন ব্রজে ব্রজেশ্বরী ব্রজরাজ রোহিণী উপনন্দ ও তৎপত্নী প্রভৃতি এবং পুরে দেবকী কুন্তী ও বসুদেবাদি। হাস্য মৃদু মধুর বাক্য ও বাল্য চেষ্টাদি উদ্দীপন বিভাব। মস্তকাঘ্রাণ আশীর্ব্বাদ ও লালন পালনাদি অনুভাব। স্তম্ভস্বেদাদি সমস্ত ও স্তনদুগ্ধক্ষরণ এই নয়টী সাত্ত্বিক ভাব। হর্ষ ও শঙ্কা প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব। এই রতির প্রেম ও স্নেহ ও রাগ এই তিনটী উত্তরোত্তর অবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতেও বিয়োগে পূর্ব্ববৎ দশটী দশা হয়।

মধুর ভক্তিরসেরগুণ অঙ্গসঙ্গ সুখদান। এই রসে রূপমাধুর্য্য, বেণু-মাধুর্য্য, লীলামাধুর্য্য ও প্রেমমাধুর্য্যের আধারভূত নায়ক চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। মমতাযুক্ত, সম্ভোগভাবময় শ্রীভগবন্নিষ্ঠ, নিজ আচরণ দ্বারা অন্যের উপকারক, কান্ত সেবা পরায়ণ প্রেয়সীগণ আশ্রয়ালম্বন। মুরলীরব বসন্ত কোকিলধ্বনি নবমেঘ ময়ূরকণ্ঠ প্রভৃতি দর্শনাদি উদ্দীপন বিভাব। কটাক্ষ ও হাস্য প্রভৃতি অনুভাব। স্তম্ভাদি সমস্ত সাত্ত্বিকভাব সুদ্দীপ্ত পর্য্যন্ত। আলস্য ও উগ্রতা বর্জ্জিত নির্ব্বেদাদি সমস্ত সঞ্চারী ভাব।

ইহাতে প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়,-রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব এই সকল অবস্থাই পরিদৃষ্ট হয়।

মধুর রসের বিষয়ালম্বন শ্রীকৃষ্ণে ধীরোদাত্তাদি ছিয়ানব্বই প্রকার নায়কগুণই দৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং আশ্রয়াবলম্বন শ্রীরাধিকাতে তিনশত ষাইট প্রকার নায়িকাগুণই দৃষ্ট হইয়া থাকে। সাধারণী সমঞ্জসা ও সমর্থা ভেদে নায়িকা তিন প্রকার। শ্রীরাধাদি গোপীগণই সমর্থা নায়িকা।

মধুর রস রসের পরাকাষ্ঠা। এই রসে সকল রসের সমাহার হওয়ায় সকল রসেরই গুণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই রসে শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের অসঙ্কোচ, বাৎসল্যের লালন ও কান্তার নিজাঙ্গ দ্বারা সেবন এই পঞ্চগুণই দৃষ্ট হয়। যেমন আকাশের গুণ বায়ুতে, বায়ুর গুণ তেজে, আকাশ বায়ু ও তেজের গুণ জলে এবং আকাশ বায়ু তেজ ও জলের গুণ পৃথিবীতে দেখা যায়, তেমনই শান্তের গুণ দাস্যে, শান্ত ও দাস্যের গুণ সখ্যে, শান্ত দাস্য ও সখ্যের গুণ বাৎসল্যে এবং শান্ত দাস্য সখ্য ও বাৎসল্যের গুণ মধুররসে দৃষ্ট হইয়া থাকে। মধুর রস স্বাদাধিক্যে সকল রস হইতে চমৎকারিত্ব উৎপাদন করে। এই মধুররসের স্বকীয় ও পরকীয় ভেদে দ্বিবিধ সংস্থান। এই ভক্তিরসের সূত্র মাত্র প্রদর্শিত হইল। অতএব তুমি স্বয়ং এই বিষয় চিন্তা কর। চিন্তা করিতে করিতে সমগ্র রসতত্ত্ব তোমার অন্তরে স্ফুরিত হইবে। রসসাগর অনন্ত ও অগাধ। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় অজ্ঞ জীব ঐ রসসিন্ধুর পার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই পর্য্যন্ত বলিয়াই প্রভু শ্রীরূপ গোস্বামীকে আলিঙ্গন প্রদান করিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

# বিজ্ঞান, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য।

কার্ত্তিক মাসের পন্থায় "জনৈক বিদ্যার্থী' মহাপুরুষগণ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাতে গুটীকত বিস্ময়াবহ উক্তি আছে। লেখক বলেন যে মহাপুরুষগণ শঠের প্রতি শঠতা আচরণ করেন। এই প্রকার অসংযত প্রমাদযুক্ত উক্তি বৈষ্ণবগণ নামাপরাধের অন্তম অপরাধ বলিয়া গণ্য করেন। সেইজন্য এ বিষয়টী ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। কালের অত্যাশ্চর্য্য প্রভাবে ও মহামায়ার অঘনঘটনপটিয়সী শক্তিবশে "ব্রহ্মবিদ্যা সমিতিতে" আজকাল এই প্রকার মতের প্রসার দেখিতে পাওয়া যায়।

গুরু কি বুঝিতে গেলে গুরুর কার্য্যের জ্ঞান হওয়া আবশ্যক। এইজ্ঞানে ব্যক্তিগত ভাবের স্থান নাই। ব্যবহারিক জগতে জ্ঞান বৃত্তির ফল। চিত্তে যেরূপ বৃত্তির উদয় হয় আমাদের জ্ঞান সেইরূপ ভাব ধারণ করে। কি প্রকারে বৃত্তির সাহায্যে জ্ঞান হয় সে তত্ত্ব রহস্যময়। বৃত্তি ইন্দ্রিয়শক্তি ও বস্তুশক্তির তাদাত্মে উৎপন্ন হয়। সুতরাং আমাদের ব্যবহারিক জ্ঞান ইন্দ্রিয়শক্তি ও বস্তুর মান সমসূত্রে একপ্রকার অভেদ জ্ঞানে অন্বিত। কিন্তু এই জ্ঞান অর্থে বিশিষ্টতা। চক্ষুদ্বারা গ্রাহ্য রূপ নামক বিশিষ্ট ভাব উৎপন্ন হইতে গেলে বাহিরে তদনুরূপ অথচ স্থূলতর বস্তুশক্তি থাকা আবশ্যক। কিন্তু এই জ্ঞান কি প্রকারে উৎপন্ন হইল তাহা কি কেহ বলিতে পারেন? স্থূল আলোক স্পন্দন কি কৌশলে চক্ষু দ্বারা গৃহীত হইয়া একপ্রকার স্বভাবাত্মক অথচ বিভিন্ন প্রকার ভাবাত্মক ছবি (Optical image) উৎপন্ন করে তাহার কারণ কি কেহ বলিতে পারেন? আলোক স্পন্দনকে ছবির ভাষায় কে অনুবাদ করিল ও কি প্রকারে তাহা হইল? তাহার পর এই ছবির ভাষাকে জ্ঞানে কে কি প্রকারে জ্ঞানে পরিণত করিল? এই তিনের মধ্যে যে সৌসাদৃশ্য আছে তাহা বিশিষ্টতামূলক কিন্তু সে বিশিষ্টতা কাহার? স্পন্দনের বিশিষ্টতা অর্থে তাহার গতি ও Wave length, ছবি বা Optic imageএর বিশিষ্টতা অন্য প্রকারের, তাহাতে স্পন্দনের লেশ মাত্রও নাই। আবার আমার বৃত্তির স্বরূপ অন্য প্রকার, তাহাতে স্পন্দন কিম্বা আকারগত বিশিষ্টতা নাই। সুতরাং বস্তুগত বিশিষ্টতা যে বিশিষ্ট জ্ঞানের কারণ তাহাও বলিতে পার না। এই বিভিন্ন প্রকার বিশিষ্টতার

অভয় বরদ করে
বুঝাতে চাহ কি তারে
'তোর এই লীলাখেলা, সর্ব্ব সারাৎসার'।
বটে বটে বটে তাই
তাতে মাগো ভুল নাই
মায়াময়ি, জ্ঞানময়ি জননী বরদে!
বাহিরে ভৈরবী লীলা
অশেষ ভীতির খেলা,
অন্তরে আনন্দময়ী তুই যে সারদে!
বাড়ায়ে অভয় কর
সাপটিয়া কোলে ধর
তোর এ খেলায় ভীত দীনার্ত্ত সন্তানে,
শরণ আগত তা'রে
বরদে! বরদ করে
বর দানে তুলে লও আনন্দ সদনে।
এ লীলা'ত মহা কূট
অজ্ঞেয় অপরিস্ফুট।
নশ্বর প্রপঞ্চ এই ইন্দ্রজাল মাঝে
আনন্দ বীজলী রেখা
সম, যাহা যায় দেখা,
তাও তোর আনন্দের ভাণ্ডারেতে রাজে॥
মহাদেবী মহাসুরী
সকল খেলাই তোরি;
মহাবিদ্যা, মহামোহা, স্মৃতি মেধা তুই
অসুরেতে মহাসুরী
মহাশক্তি বলে তোরি
ত্রিপুরারী ধনুধরে দাঁড়ায়েছে ওই।
ত্রিকূট তাঁহার রথ,
দৈবশক্তিগণ যত
সে রথের 'সর্ব্ব' অংশ করেছে ধারণ

সারথী হ'য়ে সে রথে
মন্মথ-প্রগ্রহ হাতে
ইন্দ্রিয়-বাসনা-অশ্ব করি সংযমন,
পদ্মযোনী প্রজাপতি
যেন ভয়ে ভীত অতি
ধরি অন্তর্ম্মুখী গতি আছে অবস্থিত
সর্ব্বাধার নারায়ণে
টানিয়া একত্র গুণে,
পরাপর প্রান্তদ্বয় করিয়া যোজিত
শুদ্ধতম অহঙ্কার
শঙ্কর সে রুদ্রাকার
ভৈরব বৈষ্ণব ধনু করি আকর্ষণ
একে রোধি ত্রিধাগতি
সৃজন, প্রলয়, স্থিতি
সূক্ষ্মাগ্র প্রণব শরে পূরিয়া সন্ধান
ত্রিধা ভিন্ন অবস্থিত
পুষ্যালগ্নে সম্মিলিত
ময়-দানবের পুরী করিল দহন ।
হর-শরানল দগ্ধ
সে পুরে ভাতিছে স্নিগ্ধ
শিখারূপে তোরি মূর্ত্তি বিস্তানন্দ-ঘন ।
বাগ্‌রূপে প্রকাশ বিশ্ব
যাহা কিছু দৃশ্যাদৃশ্য
অক্ষর মাতৃকা বর্ণে তোরই মন্ত্রমালা ।
দ্রব্যেতে, ক্রিয়াতে, কামে
বিরাজিত বিশ্ব ধামে,
কামরূপ মহাকূট সেও তোরি খেলা ।
হ্রীংকারেতে মায়াবীজে
কামরূপে সেজে নিজে
মায়িক কামের ক্ষেত্রে বিরাজিত শিরে

ব্যক্তির দেহ হইতে নানাবর্ণের সুন্দর ও কুৎসিত আকৃতিসকল বহির্গত হইতেছে। সেই সকল বর্ণ ও আকৃতি চিন্তার প্রকৃতি অনুসারে বুদ্ধিবৃত্তির ক্রিয়ানুযায়ী হয় সুন্দর নয় বীভৎস ভাব ধারণ করে। আচার্য্য ক্লিফোর্ডের মতে এই সকল চিন্তামূর্ত্তি মানস পদার্থে বা মানস উপাদানে গঠিত হইয়া স্ফুর্ত্তি প্রাপ্ত হয় এবং তাহারা চিন্তাশীল ব্যক্তির চারিদিকে বেষ্টন করিয়া থাকে এবং অপরাপর বক্তির মনের উপর ও কার্য্য করে। কখন লক্ষ্য করিয়াছেন কি—বহুদিন ধরিয়া একসঙ্গে অবস্থিত দুইজনের মধ্যে অথবা পরস্পরে প্রীতি সম্পন্ন দম্পতির মধ্যে একের চিন্তা অন্যকে কেমন আকৃষ্ট করে? অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন কথায় ব্যক্ত না হইলেও একের মস্তিষ্কের চিন্তা অপরের মস্তিষ্কে কিরূপ সত্বরে ও সহজে সংক্রামিত হয়। কখন কি আপনাদের মধ্যে এরূপ ঘটে নাই যে, আপনার কোন বন্ধু যাহার সহিত বহুদিবস একত্রে বাস করিয়াছেন এবং যে আপনার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র এক সময়ে এক বিষয় চিন্তা করিয়া আপনাকে সেই চিন্তা ব্যক্ত করিবার সময় আপনিও বলিয়া উঠিলেন যে "ভাই আমিও ওই বিষয় বলিতে যাইতেছিলাম" আমিও ওই একই বিষয় ভাবিতেছিলাম"? ইহার কারণ চিন্তাশক্তি অতিসূক্ষ্ম এবং অতি সূক্ষ্ম পদার্থের উপর তাহার কার্য্য এইজন্য উচ্চারিত ভাষা ব্যতিরেকে উহা মনুষ্যের মনে প্রতিঘাত হয়। চিন্তা আপনাকে প্রকাশ করে না কিন্তু অতি অতর্কিত ভাবে মানবের মনে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে।

আপনি কখন কাহাকে লৌহ গলাইয়া ছাঁচে ঢালিতে দেখিয়াছেন কি? দেখিয়াছেন কি সে কি প্রণালীতে অগ্নিসংযোগ করিয়া লৌহময় আকৃতি গঠন করে? সে অগ্রে বালুকাদ্বারা ছাঁচ প্রস্তুত করে, পরে সেই ছাঁচে উত্তপ্ত দ্রব লৌহ ঢালিয়া দেয়। সেই দ্রব লৌহ বালুকাছাঁচের সর্ব্বস্থানে প্রবেশ করে এবং শীতল হইলে কঠিন হয়, তখন ঐ বালুকাছাঁচ ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু লৌহের আকৃতি অবিকল সেই ছাঁচের আকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। চিন্তার ক্রিয়াও অবিকল সেইরূপ। উহা যেমন প্রসূত হয় অমনি মনঃ জগতে প্রধাবিত হইয়া সদৃশ আকারে প্রবৃষ্ট হয়। সেই সূক্ষ্মপদার্থময় আকার প্রত্যেক চিন্তারই ছাঁচের কার্য্য করে, এবং সেই আকৃতি চিন্তার গাঢ়তা অনুসারে স্থায়ী হয়।

মনুষ্য একইভাবে চিন্তা করিয়া থাকে এবং সেই প্রণালীতে এত অভ্যস্ত হয় যে, তাহা তাহার অজ্ঞাতসারে এবং ইচ্ছা ব্যতিরেকে অন্তঃকরণে স্বতই উদিত হইয়া থাকে, কেন যে এরূপ হয় আমরা তাহার কারণ অনুসন্ধান করি না। আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলে নিশ্চয়ই বলিবেন যে, আপনার অজ্ঞাতসারে আপনার মন সেই একই বিষয় চিন্তায় আকৃষ্ট হয়। মনে করুন দিবসে কোন দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনায় কিম্বা পুনঃ পুনঃ কোন বৈষয়িক চিন্তায় মনকে প্রধাবিত করিয়াছেন, এখন রাত্রিতে অবসর সময়ে অন্য চিন্তায় মনোনিবেশ করিতে ইচ্ছা করিলে আপনি কি সফলকাম হইতে পারেন? আপনার পূর্ব্বোক্ত চিন্তা স্বতঃই আপনার বর্ত্তমান চিন্তার স্থানাধিকার করিবে; কারণ, সেই সমস্ত চিন্তামূর্ত্তি মনের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে সুতরাং মনের উপরেই আধিপত্য করিবে এবং যে শক্তির দ্বারা প্রসূত হইয়াছে সেই শক্তির উপরই প্রভাব বিস্তার করিবে। এই যে আমরা বলিয়া থাকি যে, লোকটার স্বভাব চিরদিনই একরূপ, চলিত কথায় বলে "স্বভাব যায় না মলে আর আক্কেল যায় না ধুলে"—আবার এই যে আমরা নানা উপদেশে কোন ব্যক্তিগত কুসংস্কার দূর করিতে পারি না তাহার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নয়, মনুষ্যের প্রকৃতিগত চিন্তা একপ দৃঢ় মূর্ত্তি ধারণ করে যে, তাহার মস্তিষ্কে কোন নূতন চিন্তা প্রবেশ করিবার স্থান পায় না। নূতন শক্তি এইরূপ অভ্যস্ত ভাবের কাঠিন্য ও অনমনীয়তা দূর করিতে অসমর্থ হয়।

ক্রমশঃ

শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

# সাধন-পন্থা।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

১০

এই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণের আত্মভাবনাময় অনাহত ধ্বনী পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত। কিন্তু তাহা সকলের শ্রুতিগোচরে আসেনা। যাঁহাদিগের হৃদয়ে স্বার্থের ক্ষুদ্র কলরব প্রবেশ করিতে পারে না তাঁহারাই কেবল এই মধুরস্বর শ্রবণ করিতে সক্ষম হন।

১১

কেবল আত্মশক্তিতে নির্ভর করিয়া শিষ্যকে তাহার নিজ নিম্নবৃত্তির সহিত সংগ্রাম করিতে হয়, ইচ্ছাশক্তি বর্দ্ধন করিয়া ইন্দ্রিয়ের প্রলোভন ও কামকে দমন করিতে হয়। হয়ত এই শিক্ষা দিবার জন্যই ভগবান লোকশিক্ষক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কালিয়হ্রদে ভীষণ মহাবিষধরকে দমন করিয়াছিলেন। যোগ-বাশিষ্ঠে আছে—"সংসারজাত বিবেকীদের নিজ চেষ্টা ব্যতিত দৈব কিংবা বন্ধুজনে কিছুই করিতে পারে না।"

যত দিন না আমরা অন্ততঃ আংশিকভাবে আমাদিগের ইন্দ্রিয় বিজয় করিতে সক্ষম হইব ততদিন কামাদি নিম্নবৃত্তি আমাদিগের হৃদয়দ্বার নাগ-পাশের মত বদ্ধ করিয়া রাখিবে। মহাপুরুষদিগের শ্রীচরণবিভাসিত বিমল জ্যোতিঃ তাহাতে প্রবেশ অধিকার লাভ করিতে পারিবে না। বাস্তবিক যে সকল লোক সংসাররূপ সাগরের—বিষয়-সুখরূপ স্রোতে ভাসমান হইয়া বুদ্ধির জড়তা সম্পাদন করিতেছে তাহাদিগের ওই পরমাত্ম-লাভের উপায়ভূত জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদিগের উপদেশবাক্য কি করিতে পারে।

১২

জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণ একদেশস্থ হইয়াও কালত্রয়ে সর্ব্বত্রব্যাপিয়া অবস্থিত আছেন। তাঁহারা সর্ব্বগা ও সর্ব্বাত্মা—যেখানে যেসময়ে প্রকাশ প্রাপ্ত হন। তবে তাঁহাদিগের অস্তিত্ব অনুভব করিতে আমরা কেন সক্ষম হই না? তাহা অনুভব করিতে হইলে এই তিনটি থাকা চাই :—

১। জীবন ও চিন্তার বিশুদ্ধতা।

২। ভগবানের প্রতি এবং উপাস্য গুরুদেবে অচলা ও একনিষ্ঠ ভক্তি।

৩। উচ্চজীবন লাভ করিবার মহতী আশা ও অবিচলিত উদ্দম।

যাঁহারাই এই গুণত্রয়ে বিভূষিত হইয়াছেন তাঁহারাই তাঁহাদিগের সান্নিধ্যসুখ উপভোগ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই বর্ত্তমান কালে এমন অনেকে আছেন যাঁহারা মহাপুরুষদিগের চরণপ্রান্তে বসিয়া জীবনের চরিতার্থতা লাভ করিতেছেন। আমরাও যদ্যপি এই সাধনপথ অবলম্বনে অগ্রসর হই, তাহা হইলে আমরাও সেই সুখ সম্ভোগ করিতে সক্ষম হইব।

১৩

পূর্ব্বোক্তরূপ জীবন যাপন করিয়া ভগবৎপ্রেম হৃদয়ে পোষণ এবং ভগবানের সেবাব্রত গ্রহণ করিলে মহর্ষিদিগের চিত্ত আকর্ষিত না হইয়া থাকিতে পারে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এইরূপ পরার্থপরায়ণ শিষ্য পাইবার জন্য তাঁহারা জগৎ অন্বেষণ করিতেছেন

জগতে যে আধ্যাত্মিক শক্তিতরঙ্গ ক্রীড়া করিতেছে, যে দেব-গঙ্গা ভগবানের চরণপ্রান্ত হইতে প্রবাহিত হইতেছে তাহাকে কে শক্তিমান ধারণ করিবে, এই উদ্দেশ্যেই শিষ্যগ্রহণ। এবং সাধক যতই পবিত্র হইতে থাকিবে, যতই সেবাব্রত পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারিবে, ততই সে সেই আধ্যাত্মিক শক্তির আধার হইয়া ভগবানের লীলার নিমিত্তকারণ হইতে পারিবে।

যে মানব পরহিতব্রত আপনার জীবনের উদ্দেশ্য করিয়া লীলাময়ের ইচ্ছার সহিত আপনার ইচ্ছা মিশাইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে সে দেখিতে পায় কোন অদৃশ্য লোক হইতে তাহার বাহুতে শক্তি, হৃদয়ে বল এবং মানসে বুদ্ধি আসিতেছে এবং প্রতি কার্য্যেই সে সফলমনোরথ হইতেছে।

আমরা যে আধ্যাত্মিক স্রোতের কথা বলিয়াছি তাহা প্রতি নিয়ত তাহারি মত আধার অন্বেষণ করিতেছে। ঋষিদিগের অনুগ্রহ বা করুণার অভাব নাই, অভাব তাঁহাদিগের করুণালিপ্সু মানবের। মানব সাহায্যকারী শক্তিস্রোত জগতে প্রবাহিত, কিন্তু অধিকারী না থাকায় তাহা ধারণ করিয়া রাখিতে পারে না বরং তাহাকে বাধা দিতে থাকে। যে মুহূর্ত্তে

একটী প্রাণ সেই শক্তি ধারণে উৎসুক হইয়া উঠে তখনি গুরুদেবের নয়ন তাহার দিকে আকৃষ্ট হয়—তাহাকে শিষ্য হইবার যথার্থ অধিকারী দেখিয়া তাহাকে গ্রহণ করেন। যখনই স্বার্থকামনা পরিত্যাগ করিয়া নিঃস্বার্থভাবে পরোপকারব্রত গ্রহণ করিবে, ও পবিত্র হৃদয়ে তাঁহাদিগের অনুগ্রহপ্রয়াসী হইবে, তখনই তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারিবেন এবং প্রিয় শিষ্যকে বক্ষে আলিঙ্গন করিয়া লইবেন

৪

যাহাকে যেইরূপ সাহায্য করিলে তাহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকার হইবে, গুরুদেব তাহাকে সেইরূপ সাহায্য প্রদান করেন। তাঁহারা একবারও চিন্তা করেন না যে, মানব তাঁহাদিগের ব্যবহার বুঝিতে পারিতেছেনা বা হয়ত ভাবিতেছে যে, তাঁহারা একজনের প্রতি পক্ষপাতী এবং তাহাকে অধিক অনুগ্রহ দান করিতেছেন। এখনও তত্ত্বজিজ্ঞাসুর পূর্ণতা প্রাপ্তির অনেক বিলম্ব তাহাই সে অর্দ্ধপরিস্ফুট জ্ঞানে গুরুদেবের অনুগ্রহ ইতরবিশেষ বিবেচনা করিয়া তাহার প্রতি অল্প বা অধিক কৃতজ্ঞ হয় কিন্তু তাঁহারা কৃতজ্ঞতার তারতম্য গ্রাহ্য করেন না—অধিক কৃতজ্ঞতা পাইবার আশয়ে শিষ্যের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহও প্রকাশ করেন না। এমনও হয়—শিষ্য তীক্ষ্ণ ধীসম্পন্ন হইলে তাহাকে এইরূপ সাহায্য করিতে থাকেন যে, সে এ জীবনে বুঝিতেই পারে না যে, কেহ তাহার কোনও উপকার সাধিত করিয়াছে। তত্ত্বজিজ্ঞাসুর ধীশক্তি বৃদ্ধিকরণে তাহাকে সাহায্য করিতে থাকেন—কি উপায় অবলম্বন করিলে তাহার মস্তিষ্কের বিশেষ পুষ্টি সাধন হইবে এইরূপ সুযোগ আনিয়া দিতে থাকেন। অনন্ত প্রেমের আধার, অনন্ত দয়ার প্রস্রবণ স্বার্থচিন্তাবিরহিত তাঁহার, কখন মনেও আসিতে পারেনা যে, তিনি যে শিষ্যের অগোচর তাহার উন্নতির জন্য এত লালায়িত হন সেই শিষ্যই হয়ত ভাবিতেছে যে, সে আত্ম-উদ্যমে ও নিজ-শক্তি নির্ভর করিয়া উন্নত হইতেছে, তাহাকে কেহই সাহায্য করিতেছে না। তিনি এই সব চিন্তায় ভ্রূক্ষেপ করেন না এবং যে পথে যেরূপভাবে লইয়া যাইলে শিষ্যের উন্নতি সহজসাধ্য হইবে তাহাই করিতে থাকেন। ক্রমশঃ

জনৈক বিদ্যার্থী।

# আর্য্য আদর্শাবলী।

মানব স্বাধীন জীব ও আপন স্বত্বে স্বত্ববান ; মানবের এই রূপ আদর্শ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ তৃতীয় ভাগে পাশ্চাত্য জানপদবর্গের চিত্ত অধিকার করিয়াছিল। যে স্বাধীনতা ঘোষণা দ্বারা পাশ্চাত্য প্রদেশে বিপুল সাধারণ-তন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং যদ্দ্বারা আমেরিকেয় উপনিবেশ সকল ইংলণ্ডরাজ্যের আধিপত্য হইতে বিচ্ছিন্নীকৃত হইয়া আমেরিকার মিলিত রাজ্যাকারে বিনির্ম্মিত হইয়াছে, "মানবস্বত্বই" সেই স্বাধীনতা ঘোষণার ভিত্তি স্বরূপ। আমেরিকা রাজ্যের মূল নীতি মানবস্বত্বের উপরেই সংস্থাপিত। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবেও সদৃশরূপ মানবস্বত্বাঙ্কিত পতাকা উড্ডীন হওয়াতে তদবলম্বনে উহার যুদ্ধবিগ্রহ কার্য্যাদি নির্ব্বাহিত ও উহার সাধারণতন্ত্র সংস্থাপিত হইয়াছিল এবং এই আদর্শ উহার বিজয়ী সৈন্যদলের হৃদয় উদ্দীপিত করিয়া তুলিয়াছিল। ইংলণ্ডে ও সেই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল এবং টমাস পেইন্ প্রণীত প্রসিদ্ধ মানবস্বত্ব ইংরাজ প্রজাতন্ত্রের রণনাদ স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ধীরে ধীরে এবং নিশ্চয়তা সহকারে উহার মুখ্য ভাবগুলি উনবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক প্রণালী সমূহের মধ্যে সন্নিবেশিত হইতে লাগিল।

ইহাই হইল পাশ্চত্য আদর্শ ; মনুষ্য সমর্থ, দৈবৎ, স্বাধীন ও স্বাবলম্বী ; ঈশ্বর বা প্রকৃতি প্রদত্ত স্বত্বনিচয় যাহার অন্তর্জাত ও অন্তর্নিষ্ঠ, যাহার উপর অত্যাচার করিতে ও যাহাকে শাসনাধীন করিতে কাহারও অধিকার নাই। ইহা, ব্যক্তিগত পার্থক্যের জয়ডঙ্কা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার দেবরূপে আরাধনা। স্বাধীনতানুরাগ সকল হৃদয়ের স্পন্দিত হইতেছে, স্বাধীনতা জনসাধারণের প্রাণবায়ু। যদ্যপি তোমরা এই আদর্শ কর্তৃক উদ্দীপিত পাশ্চাত্য হৃদয়ের বলবৎ প্রোৎসাহ বোধগম্য করিতে ইচ্ছুক হও, তাহা হইলে এই আদর্শের আকর্ষণী শক্তি বোধগম্য করা তোমাদিগের আবশ্যক। ইংলণ্ড, আমেরিকা বা ফ্রান্সবাসীর পক্ষে অত্যাচার ও পীড়ন অসহনীয় দৌরাত্ম্য ; উহাদের দ্বারা তাঁহার ব্যক্তিগত মর্য্যাদা, তাঁহার আত্মসম্ভ্রম ও তাঁহার স্বস্বামীত্বগৌরবের অবমাননা হয়। উহাদের সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করিবার ধৈর্য্য তাঁহার নাই। উহারা তাঁহার গভীরতম অন্তর্দেশনিহিত প্রকৃতিসিদ্ধ

জ্ঞানের ও তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস সমূহের বিরোধী; উহাদের সম্বন্ধে যুক্তি বা বিচার না করিয়াই সর্ব্বসঙ্কট স্বীকারেও উহাদের প্রতিরোধ করাই কর্ত্তব্য।

এক্ষণে দেখা যাউক স্বাধীনতার এইরূপ আদর্শ হইতে, সমর্থ এবং স্বৈর মানবের এইরূপ আদর্শ হইতে, কি কি গুণের উৎপত্তি হইয়াছে।

প্রথমতঃ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম—পাশ্চাত্য জগতের ধর্ম্ম—সম্বন্ধে দেখা যাউক। পাশ্চাত্য পরিণতি প্রণালীর সাহায্যার্থে সংস্থাপিত এই ধর্ম্মের ব্যক্তিগত পার্থক্যের প্রতি বলবতী আসক্তি ছিল এবং ঐ আসক্তি অগ্রসারিণী শতাব্দী পরম্পরার সহিত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। পাপীজন সহ স্বীয় জীবনের সম্মিলন দ্বারা পাপীজনের উপকার সাধন করিবার পরিবর্ত্তে, পাপীজনের প্রতিভূ স্বরূপে অবস্থিত হইয়া ইহার উপকার সাধনকারী খ্রীষ্ট, মানবজাতি হইতে স্বতন্ত্রভাবে স্থিত ও উত্তরোত্তর ব্যষ্টিভাবাপন্ন ব্যক্তি বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন। তিনি পাপীজনের পাপের দণ্ড ভার বহন করতঃ তাহার প্রতিভূ স্বরূপ হইয়াছিলেন এবং ঐ প্রায়শ্চিত্ত অধ্যাত্ম সম্মিলনের পরিবর্ত্তে একটী বিধিসিদ্ধ চুক্তি স্বরূপ হইয়াছিল পরবর্ত্তী সময়ের বিধি বিষয়ক মর্ম্মে বিবৃত এই সিদ্ধান্ত সমীচীন না হইলেও আদি শিক্ষার তত্ত্বগত সত্যতা নিবন্ধন উহা অনেক গুণোৎপত্তির মূলীভূত কারণ হইয়াছিল। খ্রীষ্টের মনুষ্যার্থ আত্মোৎসর্গে তাঁহার করুণা ও স্বতঃপ্রবর্ত্তিত অনুরাগ দর্শনে মানবহৃদয়ে তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতা ভাবের উদ্রেক হইয়াছিল। সম্যক সুখে তাঁহার "অধিকার" ছিল, কিন্তু মনুষ্যের প্রতি অনুরাগবশতঃ তাঁহাকে ক্লেশ সহ্য করিয়া কালকবলে নিপতিত হইতে হইয়াছিল তাঁহার প্রতি এই প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতাভাব হইতে, প্রত্যুপকার স্বরূপ তাঁহার নিমিত্ত কোন কর্ম্ম সাধন করিবার ঐকান্তিক ইচ্ছা মানবহৃদয়ে উদয় হইয়াছিল; কিন্তু তিনি ঈশ্বর বলিয়া তাঁহার কোন বিষয়েরই অভাব না থাকাতে ঐ কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস নিঃস্ব ও ক্লিষ্ট জীবগণের উপর বিকীর্ণ হইয়া উহাদের সেবায় নিয়োজিত হইয়াছিল যাহাদের সম্বন্ধে খ্রীষ্ট বলিয়াছেন যে "আমার এই ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে অল্পতম মাত্র সংখ্যার ও সেবা করিয়াছিলে বলিয়া উহা আমারই সেবা করা হইয়াছিল"

ক্রমশঃ

সাধুসেবক শর্ম্মা।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

১১শ ভাগ | ফাল্গুন, ১৩১৪ সাল। | ১১শ সংখ্যা।

# চৈতন্য কথা।

## ব্রহ্মসূত্র ( প্রথম অধ্যায় )

কাশকৃৎস্ন-চৈতন্যদেবের সিদ্ধান্ত বোধায়ন ঋষি প্রবর্ত্তিত শারীরক সূত্রের ভাষ্য সনাতন কাল হইতে প্রচলিত ছিল। শঙ্করাচার্য্যও সেই ভাষ্যের অনুসরণ করিয়াছেন। কেবল মাত্র নিজ মত স্থাপনের জন্য যেখানে অন্যতর ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইয়াছে, সেখানে তাহাই করিয়াছেন। এই জন্য মোটামুটি শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজ স্বামীর ভাষ্য, যেখানে মতভেদ নাই সেখানে এক। মধ্বাচার্য্যের ভাষ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আনন্দগিরি, গোবিন্দানন্দ, বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি সকলে শঙ্করাচার্য্যের টীকার অনুসরণ করেন। বলদেব বিদ্যাভূষণও মোটামুটি সেই পথের পথিক হইয়াছেন। অতএব বোধায়ন প্রবর্ত্তিত সনাতন মূল ভিত্তি একরূপ বজায় আছে। সেই মূল ভিত্তি না থাকিলে, ব্যাসসূত্র লইয়া যে গণ্ডগোল হইত, তাহার অনুমান করাও দুঃসাধ্য।

চৈতন্যদেবও সূত্রের ভাষ্য করিতে হইলে মূল ভিত্তি ছাড়িতেন না।

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ" ইত্যাদি।

কোন্ আত্মা দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য। জীবাত্মা না পরমাত্মা? উত্তর, পরমাত্মা

জীবাত্মা নহে পরমাত্মা, ইহার কারণ কি? আশ্মরথ্য বলেন, "প্রতিজ্ঞা সিদ্ধের্লিঙ্গম্"। আত্মনি বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" -আত্মা বিজ্ঞাত হইলে, 'ইদং সর্ব্বং' বিজ্ঞাত হয়। 'ইদং সর্ব্বং' যাহা, তাহাই আত্মা। এই প্রতিজ্ঞাবাক্যে আত্মার লিঙ্গ বা চিহ্ন দেওয়া রহিয়াছে। যাহাকে জানিলে প্রত্যেক আত্মাকে জানা যায় সেই আত্মা দ্রষ্টব্য। সে কিরূপে সম্ভব হয়। যদি প্রত্যেক আত্মা পরমাত্মার অংশ হয়, তবেই পরমাত্মাকে জানিলে তাহার সকল অংশকে জানা যায়। অংশ অংশী রূপে জীবাত্মা পরমাত্মা এক সেই জন্য "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ"—এই শ্রুতিতে জীবাত্মবাচক শব্দ দ্বারা পরমাত্মাকে বুঝিতে হইবে।

অবশ্য স্বীকার করি, জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ। চৈতন্যের অংশ নাই সত্য। কিন্তু প্রকৃতি সত্য। সমগ্র প্রকৃতিই ঈশ্বরের মায়া শক্তি রচিত। এ জন্য ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে। ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছু নাই। যাহা কিছু আছে সকলই ঈশ্বর।

শক্তির তারতম্য অনুসারে ঈশ্বর মায়াধীশ। জীব মায়ার অধীন। ঈশ্বরের পরাশক্তি। জীবের ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি—ক্ষেত্র পরিচ্ছিন্ন।

ঈশ্বরের শুদ্ধ সত্ত্বময় শুদ্ধ মায়ায় মায়ারচিত অংশ হয়। সেই অংশ আরাগ্র শত ভাগের ন্যায় সূক্ষ্ম। সেই অংশে ঈশ্বর অধিষ্ঠিত থাকেন। সেই অংশ ঈশ্বরের বীজ স্বরূপ। সেই বীজ প্রকৃতির ক্ষেত্রে নিহিত হইয়া ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হয়। সেই বীজ প্রথমে গর্ভাবস্থায় থাকে। পরে প্রসূত হইয়া নানা যোনি ভ্রমণ করে। পরে মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান বলে, পিতার অনুরূপ হয়। "মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্"। "অহং বীজপ্রদঃ পিতা"। "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" "প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং। জীবভূতাং মহাবাহো"।

শ্রুতিতেও রহিয়াছে—"যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ"

কিন্তু সেই অংশবাচক জীব শব্দকে পরমাত্মবাচক বলা ধৃষ্টতা। জীব ও ঈশ্বরে বস্তুতঃ অভেদ থাকিলেও ভেদ আছে। মায়াধীন বিজ্ঞানাত্মাকে মায়াধীশ পরমাত্মা বলা কিছুতেই সঙ্গত হয় না।

অতএব উড়ুলোমি ঋষি বলেন "উৎক্রমিষ্যত এবম্ভাবাৎ"। জীব যদিও পরিচ্ছিন্ন ও মায়াধীন—তথাপি সংস্কার দ্বারা ও জ্ঞান ধ্যানাদি সাধনের অনুষ্ঠান দ্বারা সম্প্রসন্ন হইয়া জীব উৎক্রমণ করিলে, তখন সে বাস্তবিক ব্রহ্মই হয়।

অবশ্য এই পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে পারা যায়, যে উপাসনাদি দ্বারা বদ্ধ জীব ত্রিগুণময়ী মায়ার সীমা অতিক্রম করিতে পারে। কিন্তু তথাপি সে ঈশ্বরের রাজ্যভুক্ত থাকে। এবং যদিও ঈশ্বরের তুল্য ঐশ্বর্য্য লাভ করে, তথাপি সৃষ্টি স্থিতি লয় এই তিন ঐশ্বরিক কার্য্যে তাহার অধিকার হয় না।

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মমমায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে॥"

তে এতাং মায়াং তরন্তি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ইহা বলেন না যে তাহারা আমার স্বরূপ ধারণ করে।

আর যদি বল নির্গুণ ব্রহ্মের ধ্যান দ্বারা উৎক্রমণ অর্থাৎ মৃত্যুর পর ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি। তাহার উত্তর এই যে শ্রুতিতে তাঁহাদের সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, "নতেষাং প্রাণা উৎক্রমন্তি"। সেই সকল বিদ্বানের প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না।

জীব ব্রহ্মে পরিণত হইতে পারে, এই বলিয়া যে বিজ্ঞানাত্মা বাচক শব্দকে পরমাত্মা বলিবে, তাহা সঙ্গত হয় না। যখন পরিণত হইল, তখন ত ব্রহ্মই হইল।

এই জন্য কাশকৃৎস্ন ঋষি বলিতেছেন—"অবস্থিতেঃ"।
পরমাত্মা জীবাত্মাতে সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেছেন।

"দ্বাবেব সুপর্ণা সযুজা সখায়ৌ" দেহ সংঘাত মধ্যে নিত্য অবস্থিতি করিতেছেন। বিজ্ঞানাত্মায় পরমাত্মা এরূপ ভাবে অবস্থিত যে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা কেবল পরমাত্মারই দর্শন হয়। দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ বিবর্ত্ত জ্ঞানের লোপ হইলে, শ্রবন, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা কেবলমাত্র পরমাত্মা

প্রতিজ্ঞাত হন্। দেহাদিজ্ঞান না থাকিলে, অংশ জ্ঞানের লোপ হয়। তখন অংশী যিনি অংশে নিত্য অবস্থিত স্বয়ং প্রকাশিত হন্। "বাসুদেবঃ সর্ব্বং"।

এই নিত্য অবস্থিতির জন্য, জীবাত্মদর্শনে কেবল পরমাত্মদর্শনই হয়। এবং জীবাত্ম শব্দ ও অধিষ্ঠাতা পরমাত্মায় প্রযুজ্য –

সকল আত্মাতেই পরমাত্মা অবস্থিতি করিতেছেন। এই জন্য আত্মা শব্দে মৈত্রেয়ী শ্রুতিতে পরামাত্মা বুঝিতে হইবে।

অতি সঙ্কুচিত চিত্তে, চকিত হৃদয়ে, ব্রহ্মসূত্রের সিদ্ধান্ত শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষানুসারে উপস্থিত করিলাম। পাঠকবর্গ, আমার ধৃষ্টতা মাপ করিবেন।

এখন এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজ স্বামীর কটাক্ষ পর্য্যালোচনা করিব।

## প্রথমতঃ শঙ্করাচার্য্য।

১। পরমাত্মা বিজ্ঞানাত্ম ভাবে অবস্থান করেন। "অনেন জীবেনাত্মনা নুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" এই ব্রাহ্মণ বাক্য তাহার প্রমাণ।

কিন্তু এই ব্রাহ্মণ বাক্যে "অনুপ্রবিশ্য" শব্দ আছে। এবং "জীবেন আত্মনা" অনুপ্রবেশ। পরমাত্মা জীবাত্মা রূপে ঘটে ঘটে প্রবেশ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের এই অর্থই স্বাভাবিক। ইহাতে জীবাত্মার স্বতন্ত্রতা নাই এ কথা বলা হয় নাই।

দ্বিতীয় মন্ত্রবর্ণ—"সর্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরো নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্তে"। আনন্দগিরি এই মন্ত্র বর্ণের এরূপ অর্থ করেন—"সর্ব্বাণি রূপাণি কার্য্যাণি বিচিত্য সৃষ্ট্বা তেষাং নামানি চ কৃত্বা তেষু বুদ্ধ্যাদিষু প্রবিশ্য অভিবদনাদিকং কুর্বন্ যো বর্ত্ততে"। পরমাত্মা সর্ব্বত্র অবস্থিত। তিনি বুদ্ধ্যাদিতে প্রবেশ করিবেন, সে কিরূপ কথা? জীবরূপে অবশ্য তিনি প্রবেশ করিতে পারেন। পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণে এই কথাই বলা হইয়াছে।

২। জীবের পৃথক্ সৃষ্টি—ভূতাদির ন্যায়—শ্রুতিতে কথিত নাই। শ্রুতিতে এমন কিছু নাই যাহাতে পরমাত্মার বিকার রূপ জীব যে স্বতন্ত্র পদার্থ এরূপ অবধারিত হইতে পারে।

জীবের সৃষ্টি কথিত নাই। কারণ এই ব্রহ্মাণ্ডে জীবের সৃষ্টি হয় নাই। জীবপ্রবাহ অনাদি।

জীব যে স্বতন্ত্র পদার্থ, তাহার অনেক শ্রুতি আছে। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও জীবপ্রকৃতির কথা বলিয়াছেন।

৩। কাশকৃৎস্নের মত এই যে অবিকৃত পরমেশ্বরই জীব।

তবে "অবস্থিতি" কথার তাৎপর্য্য কি? এক পদার্থ অন্য পদার্থে অবস্থিতি করে।

৪। ভেদাভেদ, ভেদ, ও অভেদ, এ তিনের মধ্যে অভেদই শ্রুতি সম্মত। "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য ইহার প্রমাণ।

"তত্ত্বমসি" যে মহাবাক্য তাহার প্রমাণ কি?

প্রণবই সকল বেদের বীজ। ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। প্রণবে ব্যষ্টি ও সমষ্টি অবস্থাত্রয়ে নিঃশ্বাসের ন্যায় নিত্য উদ্ভূত ও নিত্য তিরোহিত হইতেছে। যদি প্রণব সত্য হয়, তাহা হইলে অ, উ, ম তিনই সত্য। আর যদি অ, উ, ম সত্য হয় তাহা হইলে, ব্যষ্টি, সমষ্টি দুই সত্য। ব্যষ্টি, সমষ্টি দুই সত্য হইলেও প্রণবরূপে সকলই এক। "ওঁকার মাত্রং সচরাচরং জগৎ"। অভেদ সত্য বটে। কিন্তু সে অভেদ প্রণবের সহিত, সে অভেদ ব্রহ্মের সহিত। কারণ সকলই ব্রহ্ম। জীব কল্পিত, জগৎ কল্পিত, ব্রহ্মমাত্র বস্তুতে কেবল বিবর্ত্ত মাত্র। এরূপ অভেদ শ্রুতি বাক্যে নাই।

"তত্ত্বমসি" মহাবাক্য প্রণবের সহিত মিলিত করিয়া অর্থ করিতে হবে।

৫। বিকারাত্মক জীব আপন প্রকৃতিতে লয়প্রাপ্ত হইলে, কে আর অমৃতত্ব লাভ করিবে?

জীবের যদি সত্তাই না থাকে, জীব যদি কাল্পনিক হয়, তাহা হইলে কে অমৃতত্ব লাভ করিবে?

৬। জীবের নাম ও রূপ উপাধিগত।

এ কথা চৈতন্য দেবও স্বীকার করেন।

৭। এই সকল যুক্তি দ্বারা বিজ্ঞানাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ পারমার্থিক নহে। এইরূপ বেদান্তের সিদ্ধান্ত হয়।

দেখান হইয়াছে, এ সকল যুক্তি অখণ্ডনীয় নহে।

৮। "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি এক ছিলেন।

একথা সকলেই স্বীকার করেন। "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্", ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্", "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা"।

একথা সকলেই স্বীকার করেন। ইহা দ্বারা কল্পিত ভেদ প্রমাণ হয় না।

"নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা"

ইহাও সত্য

"বাসুদেবঃ সর্ব্বম্" 'ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি", "সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং।" যাহারা গীতা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বলিবেন, গীতার বাক্য কাল্পনিক ভেদের প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করার শঙ্করাচার্য্যের কোন অধিকার নাই।

৯। ভেদদর্শনের অপবাদ বাক্য। "অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি নস বেদ যথা পশুঃ"। "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি ইহ নানেব পশ্যতি।"

সকলই ঈশ্বর। ঈশ্বরেরই অংশ "একাংশেন স্থিতং জগৎ।"

আমি ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র। আমি অন্য ঈশ্বর অন্য। সকল পুরুষই ভিন্ন ভিন্ন। এ সকল জ্ঞান মৃত্যুরই কারণ। ঈশ্বরেরই অংশ অমৃতত্বের কারণ। সে অংশ পরিত্যাগ করিলে সকলই মৃত্যু রূপ।

১০। আত্মা বিকার শূন্য। "আত্মাঽজরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্ম।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চৈতন্যদেবের মতে দেহেন্দ্রিয়াদি আত্মার উপাধি "দেহে আত্মজ্ঞান এই বিবর্ত্তের স্থান।" দেহ বিকারী। আত্মা বিকার শূন্য এ বিষয়ে শঙ্করের সহিত চৈতন্যদেবের মতভেদ নাই।

১২। ভেদ কল্পিত না হইলে, মুমুক্ষুর নিরপবাদ জ্ঞান হয়না ও তাহার অর্থও সুনিশ্চিত হয় না।

"নিরপবাদং হি বিজ্ঞানং সর্ব্বাকাঙ্ক্ষা নিবর্ত্তকমাত্মাবিষয়মিষ্যতে।" এই কথা শঙ্করাচার্য্য বলেন। এবং এই সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত শ্রুতিরও উল্লেখ করেন —"তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।" গীতাতে স্থিতপ্রজ্ঞের যে লক্ষণ দেওয়া আছে, তাহাও উদাহরণ স্বরূপ বলেন। "বেদান্ত বিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ।" যদি ভেদজ্ঞানই থাকিল, তাহা হইলে সুনিশ্চিত অর্থ কিরূপে হইল।

যদি এই নানাত্বের মধ্যে এক ঈশ্বরের অনুভব করা যায়, তাহা হইলে কি নিরপবাদ বিজ্ঞান হয়না। "দ্বিতীয়াদ্ বৈ ভয়ং ভবতি" অবশ্য এ কথা

সকলে স্বীকার করে। সকলই ঈশ্বর, এ জ্ঞান হইলে, দ্বিতীয়ের জ্ঞান কোথায় থাকিল। যাহা কিছু দেখিতেছি, সকলই ঈশ্বর। এই এক জ্ঞান। এবং যাহা কিছু দেখিতেছি, সব মিথ্যা। এ অন্য জ্ঞান।

জগৎ যদি মিথ্যা হয়, জীব যদি মিথ্যা হয়, জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়, যদি না থাকে, তবে বুদ্ধদেবের শূন্যবাদ কি দোষ করিল। সৎ, চিৎ, আনন্দের তাৎপর্য্য কি? কি লইয়া আনন্দ। কাহার জ্ঞান। জীবের স্বরূপে অবস্থিতির অর্থ কি? মুমুক্ষুর স্বরূপে স্থিতির নাম, তাহার ব্রহ্ম সমুদ্রে অস্তি-লোপ। তাহাতে মুমুক্ষুর কি রহিল? মুমুক্ষুর নিরপবাদ জ্ঞানের নাম, জ্ঞানাভাব। তাহার সুনিশ্চিত শব্দের তাৎপর্য্য অর্থাভাব। যেখানে জীব নাই, জগৎ নাই সেখানে জ্ঞানই বা কি, অর্থই বা কি?

নির্গুণ ব্রহ্মে মুমুক্ষুর সাযুজ্য মুক্তি হইতে পারে না, এ কথা আমরা বলিনা। নির্গুণ ব্রহ্মে মুমুক্ষুর স্বরূপে অবস্থিতি সম্ভব। তবে ইহা দ্বারা একথা প্রতিপন্ন হয়না, যে সগুণ ব্রহ্ম নাই জগৎ নাই জীব নাই, এ সকল কেবল মিথ্যা কল্পনা। নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ ব্রহ্মেরই বিকারহীন ভাব। ইহাই চৈতন্যদেবের সিদ্ধান্ত। তিনি নির্গুণ ব্রহ্মের অস্বীকার করেন না। কিন্তু সগুণ ব্রহ্মও স্বীকার করেন। তিনি ভেদ স্বীকার করেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলেন, সে ভেদ ব্রহ্মাত্মক ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। তিনি ভেদ কল্পিত এ কথা স্বীকার করেন না।

এই মাত্র চৈতন্যদেবে ও শঙ্করাচার্য্যে ভেদ।

১৩। ভেদবাদীর মোক্ষ কার্য্য ও অনিত্য।

যাহা কার্য্য তাহা অনিত্য স্বীকার করি।

কিন্তু মোক্ষ নিত্য হউক অনিত্য হউক, চৈতন্যদেবের শিক্ষা অনুসারে মোক্ষ অতীব তুচ্ছ পদার্থ।

ভেদ অঙ্গীকার মোক্ষের জন্য নহে—সেবার জন্য। জগতের সেবা এবং সেই সেবা দ্বারা জগতের ঈশ্বরের সেবা। যে সেবক নহে, যে সেবক হইতে চাহে না, সে অনিত্য মোক্ষলাভ করুক, বা নিত্য নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করুক—একই কথা। সেবকের ভেদপ্রবাহ নিত্য। সে কোন শরীরে, বা কোন অধিকারে নিত্য সেবা করিতে পারিবে।

দ্বিতীয়তঃ রামানুজাচার্য্য।

১। সূর্য্য কিরণ যেরূপ সূর্য্য হইতে উদ্ভূত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে যদি জীব উদ্ভূত হয়, তাহা হইলে বিষম সৃষ্টি হইতে পারে না।

ইহার উত্তর এই যে আদি সৃষ্টির কথা বলা হয় না। জীব সৃষ্টি অনাদি। প্রলয়ে যদিও জীবসকল পুরুষে মিলিত হয়, যদিও প্রকৃতি অব্যাকৃত অবস্থায় পরিণত হয়, তথাপি প্রাকৃতিক সংস্কার অব্যাকৃত প্রকৃতিতে বীজ স্বরূপ থাকে। এবং সেই সংস্কারগত চৈতন্য বিষয়ের অভাবে পারিবক চৈতন্যের সহিত মিলিত হইলেও, সৃষ্টি কালে সংস্কার পরিচ্ছিন্ন হয়। যেমন সুষুপ্তি অবস্থায় জ্ঞানের তারতম্য থাকে না, তথাপি সংস্কারবশতঃ জাগ্রৎ অবস্থায় জ্ঞানের তারতম্য হয়। প্রলয়ের অদ্বয় জ্ঞান সংস্কারবশতঃ বিভিন্ন জ্ঞান হয়। সে সংস্কার প্রকৃতিগত, জীবচৈতন্যগত নয়। যতদিন জীব মায়ার অধীন থাকে, প্রাকৃতিক সংস্কার সে বিচ্ছিন্ন হয় না। প্রাকৃতিক সংস্কার ব্রহ্মাংশরূপ জীবের আমুক্তি চিরউপাধি। এই জন্যই বিষম সৃষ্টি ভেদাভেদ মতে বিষম সৃষ্টির বাধ হয় না।

২। জীব যদি ব্রহ্মের কার্য্য হয়, তাহা হইলে, মুক্তি অবস্থায় জীব ব্রহ্মে লীন হইবে। বিনাসরূপী মোক্ষে কি লাভ?

জীব অবশ্য ব্রহ্মের কার্য্য। এবং জীব ব্রহ্মে লীন হইতেও পারে। তবে মুক্তিলাভ করিলেই যে জীব লীন হইবে এমন নহে। সাযুজ্য ভক্ত ও জ্ঞানীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। যে ইচ্ছা করেনা, তাহার সাযুজ্য হয় না। যে ইচ্ছা করে তাহার হইতে পারে।

৩। শঙ্করাচার্য্যের অপারমার্থিক বা কাল্পনিক ভেদ সম্বন্ধে রামানুজ যাহা বলিয়াছেন, চৈতন্যদেব সে যুক্তি সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করেন।

৪। রামানুজের সিদ্ধান্ত, জীব, চিৎ বা আত্মা অন্তর্যামী পরমেশ্বরের শরীর।

শরীর শরীরী হইতে অত্যন্ত ভিন্ন। শরীর কখনও শরীরীর সহিত এক হইতে পারে না। "নদ্যঃ সমুদ্রে অস্তং গচ্ছন্তি" হইতে পারে না। "সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ" হইতে পারে না। শরীর ও শরীরীর সম্বন্ধে তত্ত্বমসি বলা চলে না।

"অহং বীজপ্রদঃ পিতা"—ভগবানের বীজ কি ভগবানের শরীর?

আমাদের শেষ অবস্থা, আমাদের নিদান, আমাদের চরম কি, ভগবানের শরীর মাত্র?

শরীরে আবার নিজত্ব কি? শরীরের আবার সত্তা কি?

রামানুজের সিদ্ধান্ত রামানুজের কাছে থাকুক। মনুষ্যের অভিমান আছে। সেই অভিমানের বন্যায় রামানুজের সিদ্ধান্ত একবারে ভাসিয়া যাউক। শ্রুতি, স্মৃতি অক্ষুণ্ণ থাকুক। তাহারা একবাক্যে রামানুজের সিদ্ধান্ত অস্বীকার করিবে।

পণ্ডিতবর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, সন্ন্যাসীর শ্রেষ্ঠ প্রকাশানন্দ, তোমরা যদি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য করিয়া যাইতে, তাহা হইলে চৈতন্যের চরম সিদ্ধান্তে এতদিন জগৎ আলোকিত হইত। কিম্বা যদি ছয় গোস্বামীর মধ্যে একজন এ বিষয়ে ধ্যান দিতেন, তাহা হইলে জ্ঞানের ভাণ্ডার সম্পূর্ণ হইত।

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

---

# আদর্শ ও ধর্ম্ম।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে মন্বন্তরের ও যুগের প্রারম্ভে মহাপুরুষগণ মনুষ্যজাতিকে এক নূতন আদর্শে পরিচালিত করেন। নরপতিরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহারা রাজনীতি ও প্রজা-পালন শিক্ষা দেন, পুরোহিত বা যাজকরূপে ধর্ম্মোপদেশ দেন, সেনাপতিরূপে আসিয়া অস্ত্রবিদ্যা ও রণকৌশল শিক্ষা দেন। তৎকালে মানবেরা তাঁহাদের দ্বারা সম্যক্‌রূপে পরিচালিত হয়, সুতরাং কোন অন্যায় বা দুষ্কর্ম্ম করিতে পারে না বা তাঁহারা করিতে দেন না। ইহারই নাম সত্য যুগ। ক্রমে শিশু হাঁটিতে ও কথা কহিতে শিখিল। পিতা মাতা উহাকে একটু স্বাধীনতা দিতে লাগিলেন। এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বদা ক্রোড়ে করিয়া বা হস্তে ধরিয়া বেড়ান না, ছাড়িয়া দিয়া তাহার কাছে কাছে থাকেন। বালক ছাড়া পাইয়া হয়ত অগ্নিতে

হাত পুড়াইল, বা কিছু একটা নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিতে লাগিল। ইহাই ত্রেতা যুগ বা ত্রিপাদ পুণ্য ও একপাদ পাপ। ক্রমশঃ বালক কিশোর ও কিশোর পূর্ণবয়স্ক হইল। পিতা মাতাও তাহাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। কেন? চিরকাল যদি হাত ধরিয়া কাজ করান হয়, তবে নিজে করিবে কিরূপে? শিশুকে সর্ব্বদা কোলে পিঠে করিয়া রাখিলে সে কি হাঁটিতে শিখে না শক্ত হয়? তাঁহারা যে আদর্শ দিয়াছেন, মানব নিজে স্বাধীনভাবে (তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত) কতদূর তাহার অনুবর্ত্তন করিতে পারে, ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য,—মানবকে স্বাবলম্বী ও শক্তিশালী করিবার জন্য তাঁহারা অন্তর্হিত হইলেন। ফল কি হইল? তাঁহাদের প্রত্যক্ষ সাহায্য ও উপদেশ হইতে বঞ্চিত হইয়া, মানব নিজ নিজ বুদ্ধিচালনা দ্বারা যাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিল, তাহাই করিতে লাগিল। ক্রমশঃ সেই আদর্শ হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িল, কেহ কেহ সম্পূর্ণরূপে তাহা হারাইয়া ফেলিল। এই পৃথিবী ব্যতীত আর কোন লোক নাই এবং ভোগসাধনই ধর্ম্ম—ইহাই ঘোষণা করিতে লাগিল। অল্পসংখ্যকের মধ্যে সেই আদর্শের একটু আভাস এখনও পাওয়া যায়। ইহারই নাম কলিযুগ। আমরা পথভ্রান্ত হইতে পারি, আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইতে পারি, কিন্তু স্বাধীন চেষ্টা দ্বারা যে শক্তি সঞ্চিত হইতেছে, যে অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছি তাহা আমাদের স্থায়ী সম্পত্তিরূপে রক্ষিত হইতেছে। পুনর্ব্বার সত্যযুগে মহাপুরুষগণ যে সকল নূতন আদর্শ উপস্থাপিত করিবেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে আমরা কি সমধিক সক্ষম হইব না? সুতরাং কলিযুগের এই আপাততঃ প্রতীয়মান অবনতিই কি উন্নতির একটি সোপান নহে?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি জীব অনন্ত সৌন্দর্য্যের যতটুকু ধারণা করিতে পারে ততটুকুই তাহার আদর্শ। এবং এই ধারণাশক্তি তাহার উন্নতি সাপেক্ষ, অর্থাৎ সে যত উন্নত হইবে তত অধিক ধারণা করিতে পারিবে, সুতরাং আদর্শও ক্রমশঃ উচ্চ হইবে। এখন দেখা যাউক্ তাহার ধর্ম্ম কি! আদর্শের অনুসরণ অর্থাৎ তাহার জীবন আদর্শানুরূপ গঠিত করা,—ইহাই তাহার ধর্ম্ম। উন্নতি সহকারে যেমন আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে, ধর্ম্মেরও পরিবর্ত্তন হয়। মর্ত্ত্যধাম হইতে ভগবানের রাজ্য পর্য্যন্ত যেন অসংখ্য

সোপান বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং জীবগণ একটির পর একটিতে আরোহণ করিয়া ক্রমশঃ তদ্দিকে ধাবমান হইতেছে। কেহ কেহ সর্ব্ব নিম্নে, কেহবা একটু উচ্চে এবং কেহ কেহ আরও উচ্চে অবস্থিত রহিয়াছে। যে, যে সোপানে অবস্থিত তাহার আদর্শ এবং ধর্ম্মও তদনুরূপ। আমার বা মদ্বস্থ ব্যক্তিগণের যাহা ধর্ম্ম, উচ্চ সোপানাবলম্বীর তাহা অধর্ম্ম, এবং আমার যাহা অধর্ম্ম নিম্নস্থ ব্যক্তিগণের তাহাই ধর্ম্ম।

মনে করুন এক ব্যক্তি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৪ ঘণ্টা নিদ্রায় অতিবাহিত করে এবং অবশিষ্ট ১০ ঘণ্টা জাগ্রৎ থাকিলেও জড়ের ন্যায় একস্থানে বসিয়া থাকে। কোন বিষয় চিন্তা করিবার আদৌ শক্তি নাই, আহার পরিচ্ছদাদি বিষয়ে উদাসীন, যাহা পায় তাহাই খায়, ভাল মন্দ বুঝে না, কেহ অপমান বা প্রহার করিলেও ক্রুদ্ধ হয় না এবং উপকার করিলেও হৃষ্ট বা কৃতজ্ঞ হয় না, কোন আত্মীয়ের মৃত্যুতে দুঃখিত বা সৌভাগ্যে উল্লাসিত হয় না, পরের ভালও করে না, মন্দও করে না, কোন বস্তু পাইবার জন্য উদ্যম নাই, পরের ভাল হইলে আনন্দও নাই, হিংসাও নাই, যেন জগতে তাহার আকাঙ্ক্ষার বস্তু বা অনুরাগের বিষয় কিছুই নাই। প্রশ্ন হইতে পারে ঈদৃশ ব্যক্তির ধর্ম্ম কি? আমার বোধ হয় কাম ক্রোধ প্রভৃতি প্রবৃত্তিনিচয়কে (যাহাদিগকে আমরা রিপু বলি) উত্তেজিত করাই তাহার পক্ষে ধর্ম্ম। ঐ ব্যক্তি ঘোর তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন। রজোগুণের উদ্রেক না হইলে এই তামস ভাব হইতে পরিত্রাণ নাই। তাহার বাসনা জাগরিত করিতে হইবে। এখন তাহার ভাল মন্দ কোনরূপ বাসনাই লক্ষিত হইতেছে না। মন্দ বাসনাগুলির উদ্রেক করা সহজ। অতএব তাহাকে আমি উত্তম উত্তম ভোজ্য দ্রব্য খাইতে ও তাহাদের তারতম্য অনুভব ও বিচার করিতে পরামর্শ দিব। যদি সুরাপান ব্যতীত তাহার রসিকতার উদ্রেক বা কোন বাসনার উদয় না হয় আমি প্রথমে তাহাকে তাহাই করিতে বলিব। এইরূপে ভোজ্য দ্রব্যের প্রতি, বা পরিচ্ছদাদির প্রতি, বা রমণীর প্রতি, বা অর্থ-সংগ্রহের প্রতি, একটা লোভ জাগাইয়া দিব। তখন সে আর ১৪ ঘণ্টা নিদ্রা যাইতে ও ১০ ঘণ্টা জড়ের ন্যায় বসিয়া থাকিতে পারিবে না। বাসনা-তাড়িত হইয়া সে ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইবে। কি উপায়ে বাসনা

চরিতার্থ করিবে, কি কৌশলে বাধা বিপত্তি খণ্ডন করিবে, কিসে তাহার সুখের মাত্রা বাড়াইতে পারিবে ইত্যাদি চিন্তায় সে অহরহঃ ব্যাপৃত থাকিবে। যে মস্তিষ্ক পূর্ব্বে দিন রাত্রির মধ্যে ৫ মিনিটও চালিত হইত না, বাসনা-তাড়িত হইয়া আজ তাহা সর্ব্বদাই ক্রিয়াবান্। অতীতের স্মৃতি, ভাবী সুখের কল্পনা, বিঘ্ন-নিবারক কৌশল-উদ্ভাবনে যুক্তি ও বিচার, পাছে বাসনা চরিতার্থ না হয় এই ভয় এবং বিঘ্নকারীর প্রতি ক্রোধ ইত্যাদি ভাব ও চিন্তায় মন নিয়ত আন্দোলিত ও তরঙ্গায়িত হইতে থাকিবে। সেই জড় অবস্থা হইতে এই চঞ্চল ক্রিয়াশীল অবস্থা—ইহা কি কম উন্নতি ?

উল্লিখিত দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্টই প্রতীত হইলে যে পাপ পুণ্য, ধর্ম্ম অধর্ম্ম এগুলি সম্পূর্ণ আপেক্ষিক শব্দ (Relative terms) ভগবানের চক্ষে পাপ পুণ্য কিছুই নাই। সোপানে আরোহণ করিতে যে গুলি আমাদের সম্মুখে থাকে সেই গুলিকে আমরা বলি পুণ্য বা ধর্ম্ম এবং যে গুলিকে পশ্চাতে ফেলিয়া আসি, সেই গুলির নাম দিই অধর্ম্ম বা পাপ। সকলগুলিই জীবের ক্রমোন্নতির কোন না কোন অবস্থায় প্রয়োজনীয়। যে ইন্দ্রিয়-সুখ যোগীর বা মুমুক্ষুর বিষবৎ পরিত্যজ্য, তাহাই খনিজ বা উদ্ভিজ্জ পদার্থের চৈতন্যোদ্রেক করিবার একমাত্র সহায়। যাঁহারা ভগবান্ জগতে পাপ সৃষ্টি করিলেন কেন বলিয়া চীৎকার করেন, তাঁহারা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে আমরা এক অংশ বা একদেশ মাত্র দেখি বলিয়াই পাপ দেখি,—সমস্তটা দেখিতে পারিলে পাপ পুণ্য থাকে না। যিনি যে সোপানে আছেন, যিনি যতদূর অধিকারী, তাঁহার ধর্ম্মও তদুপযোগী। ইহাই তাঁহার স্বধর্ম্ম। এই স্বধর্ম্ম পালন না করিলে প্রত্যবায় আছে। স্বধর্ম্মে মরণং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।

প্রত্যেক মানবের যদি আদর্শ ও ধর্ম্ম পৃথক পৃথক হইল, তবে সার্ব্বজনীন, সার্ব্বভৌমিক বা সার্ব্বকালিক ধর্ম্ম কিরূপে সম্ভব হয় ? বাস্তবিক এরূপ সম্ভব নয়, এরূপ হইতে পারে না। কিন্তু মন্বন্তরের ও যুগের প্রারম্ভে মহাপুরুষগণ এরূপ একটি আদর্শ রাখিয়া যান্ যেন প্রত্যেক মানব চেষ্টা করিলে ঐ মন্বন্তরের বা যুগের শেষভাগে তদনুরূপ হইতে পারে। ঐ আদর্শ তত্তৎ মন্বন্তরে বা যুগে সাধারণ মানবের উন্নতির সীমা

নির্দ্দেশ করে। সকল মানবই যে ঐ যুগে বা মন্বন্তরে ঠিক আদর্শানুরূপ হয়, তাহা নহে; যাঁহারা দৃঢ়ব্রত, অধ্যবসায়ী ও পরিশ্রমী তাঁহারাই কেবল ঐ আদর্শে উপনীত হন, অপরে কতক পরিমাণে অগ্রসর হইয়া থাকেন, এবং দুই একটি ক্ষণজন্মা পুরুষ ঐ সীমা অতিক্রম করিয়াও চলিয়া যান। যে সকল ব্যক্তি অসাধারণ উন্নতি করিয়া পূর্ব্ব মন্বন্তরেই এই আদর্শের প্রায় নিকট গত প্রায় হইয়াছিলেন, তাঁহারা বর্ত্তমান মন্বন্তরের আদিভাগে জন্মগ্রহণ না করিয়া উচ্চতর লোকে বিশ্রাম-সুখ ও আনন্দ উপভোগ করেন এবং সাধারণ মানব উন্নতিতে তাহাদের তুল্য বা সমীপবর্ত্তী হইলে তাঁহারা নামিয়া আসেন ও অধিকতর উন্নতিসাধনে মনোযোগী হন্। যে সকল মহাত্মা কঠোর সাধন দ্বারা যুগের বা মন্বন্তরের আদর্শ অতিক্রম করেন, তাঁহারা পরবর্ত্তী কোন যুগের বা মন্বন্তরের এমন কি কল্পের পর্য্যন্ত আদর্শানুযায়ী উন্নতিলাভ করিয়া থাকেন। শুনা যায় ভগবান্ বুদ্ধদেব এই সপ্তম মন্বন্তরেই দ্বাদশ মন্বন্তরের আদর্শানুরূপ উন্নত হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, মন্বন্তরের বা যুগের আদর্শকে সার্ব্বজনীন বা সার্ব্বকালিক আদর্শ বলা যায় না। ইহা তত্তৎ মন্বন্তরের বা যুগের সাধারণ আদর্শ বা ধর্ম্ম। বর্ত্তমান মন্বন্তরের সাধারণ ধর্ম্ম মনু এইরূপ বলিয়াছেন:—অহিংসা সত্যম্ অস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। এতং সামাসিকং ধর্ম্মং চাতুর্বর্ণ্যেঽব্রবীৎ মনুঃ॥

কিন্তু মহাপুরুষগণ দেখিলেন একরূপ একটা সাধারণ ধর্ম্মে কাজ চলিবে না। সকল মানব সমোন্নত বা তুল্যাধিকারী নহে। অতএব বিশেষ ধর্ম্মের প্রয়োজন। তবে কি প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বিশেষ ধর্ম্ম করিতে হইবে? ইহাও নিষ্প্রয়োজন। কারণ প্রত্যেক মানবের সহিত অপরের ঈষৎ ব্যক্তিগত প্রভেদ থাকিলেও, সমগ্র মানব-জাতিকে মোটামুটি এমন কয়েকটি শ্রেণী বা সম্প্রদায়ে ভাগ করা যাইতে পারে যে এক শ্রেণীস্থ মানব-নিচয়কে প্রায় সমোন্নত ধরিয়া লইলে বিশেষ ক্ষতি হয় না। এই জন্যই তাহারা ভগবন্নির্দেশে মানবকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি শ্রেণীতে বিভাগ করিলেন। তৎকালে যাঁহারা আধ্যাত্মিকতায় সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ছিলেন তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইলেন, রজোগুণপ্রধান ব্যক্তিগণ (উৎকর্ষাপকর্ষানুসারে) ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এবং তমোপ্রধান ব্যক্তিরা শূদ্র নামে অভিহিত হইলেন। অতঃপর

প্রত্যেক শ্রেণীর জন্ত পৃথক্ পৃথক ধর্ম্ম ও কর্ম্ম নিরূপিত হইল। এখানে একটি কথার উল্লেখ করা প্রয়োজন। আর্য্যজাতির উৎপত্তি কালে সোমপ, আজ্যপ প্রভৃতি পিতৃগণ দ্বারাই ব্রাহ্মণাদি জাতির সূক্ষ্মদেহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সূক্ষ্ম দেহের উপরিই প্রকৃত জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত। পিতৃগণের সাহায্য ব্যতীত এই সূক্ষ্ম দেহের পরিবর্ত্তন সাধন করা অসম্ভব। কঠোর তপস্তা দ্বারা বিশ্বামিত্র এই সাহায্য পাইয়াছিলেন বলিয়াই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। আর এক কথা—মহাপুরুষগণ এই ৪ জাতিকে ৪ বর্ণ বলিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য কি? বর্ণের অর্থ রং। যাঁহারা সূক্ষ্ম জগৎ দেখিতে পান, তাঁহারা বলেন তথায় সমস্ত বস্তুই বিচিত্র বর্ণ যুক্ত এবং মানবের সূক্ষ্মদেহেও নানারূপ সুন্দরবর্ণ সর্ব্বদাই ক্রীড়া করিতেছে। এই বর্ণ হইতেই ঐ মানবের চরিত্র ও স্বভাব অভ্রান্তরূপে জানা যায়। স্থূলদেহ দেখিলে সে কতদূর উন্নত বা অবনত ঠিক নিশ্চয় করা যায় না, কিন্তু সূক্ষ্মদেহে এ সকল গোপন করিবার যো নাই। ঋষিগণ সূক্ষ্ম দেহের বর্ণানুসারে জাতিবিভাগ করিয়াছিলেন। ইহাই বোধ হয় বর্ণ-রহস্য। এখন আর সূক্ষ্মদর্শী মহাত্মারা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া প্রত্যক্ষভাবে আমাদের সাহায্য করেন না, সুতরাং বর্ণ বংশগত বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। এখন প্রকৃত ব্রাহ্মণ বা প্রকৃত ক্ষত্রিয় কে কিরূপে জানিবে? সে যাহা হউক বিভিন্ন অধিকারীর জন্ত বিভিন্ন ব্যবস্থা করা, পৃথক্ ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করা—ইহা হিন্দুধর্ম্মের এক বিশেষত্ব ও অসাধারণত্ব। ইহা পৃথিবীর অন্ত কোন ধর্ম্মে নাই। ইহা বুঝিতে না পারিয়া কোন কোন বিদেশীয় পণ্ডিত হিন্দু ধর্ম্মকে এক 'খিচুড়ী'—নানারূপ বিরুদ্ধ মতের এক অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ বলিয়া উপহাস করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন "ইহাতে সবই আছে—'জুতাসেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত' কিছুরই অভাব নাই। যে ব্যক্তি নর-বলি দিয়া শ্মশান--কালীর পূজা করিয়া ডাকাতী করিতে যাইতেছে সেও বলে হিন্দু এবং যিনি অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানং মৈত্রঃ করুণ এব চ, নির্ম্মমঃ নিরহঙ্কারঃ সম দুঃখ-সুখঃ ক্ষমী, তিনিও হিন্দু। অতএব হিন্দুত্ব কি বুঝিব কিরূপে?" বাস্তবিক এই সন্দেহের জন্ত বিদেশীয় ভ্রাতার কোন দোষ নাই, কারণ মহাভারতেই আছেঃ—"বেদাঃ বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ নাসৌ

মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং। ধর্ম্মস্য তত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥" অর্থাৎ সকলেরই ভিন্ন ভিন্ন মত, কোন্ পথ অবলম্বন করি, ধর্ম্মতত্ব বড়ই গুহ্য ; আর কিছু নয়, মহাপুরুষের পথই পথ। কিন্তু সকলের "মহাজন" একরূপ নহেন। অতএব যাঁহার নিকট যিনি "মহাজন" অর্থাৎ আদর্শ, তৎপথ-অবলম্বনই তাঁহার ধর্ম্ম। এবং এই জন্যই তো শাস্ত্রে এত মতভেদ।

ক্রমশঃ।

শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী।

---

# মানবের ইতিবৃত্ত।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

## ১০। দ্বিতীয় চক্র ও সুকালী পিতৃগণ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর বর্হিষদ পিতৃগণ সুকালী নামে প্রসিদ্ধ। দ্বিতীয় চক্রের আরম্ভে তাঁহারা সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা উদ্ভিজ্জ রাজ্যের আদর্শরূপ প্রথম গ্রহে ( "ক" গ্রহে ) আনয়ন করিলেন। পরে "খ" গ্রহে আনিয়া তাহাদের বিশেষ বিশেষ নির্দ্দিষ্ট আকারবিশিষ্ট করিলেন। "গ" গ্রহে তাহাদিগকে তদপেক্ষা ঘণীভূত ও দৃঢ় করিলেন, পরিশেষে "ঘ" বা পৃথ্বীগ্রহে এই"রূপ" সমূহ ভূমি স্পর্শ করিল। প্রাণী ও মনুষ্য জগৎ চতুর্দ্দিগের নভোমণ্ডলে অবস্থিত রহিল, এবং সকলেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রথম চক্রে মানবভ্রূণ সমূহ স্থাবররূপে পরিণত হইল ; পরে এই দ্বিতীয় চক্রে তাহারা উদ্ভিজ্জের আকার ধারণ করিল। সূক্ষ্ম, অতি প্রকাণ্ড উদ্ভিজ্জের আকারবিশিষ্ট ভ্রূণরূপী মানবগণ যখন বিস্তার লাভ করিল, তখন তাহাদিগকে মানুষ বলিয়া পরিচয় করে কার সাধ্য ? তখনকার "রূপ" বাষ্পাকার।

---

## ১১। তৃতীয়চক্র ও বর্হিষদ পিতৃগণ।

তৃতীয় শ্রেণীর বর্হিষদ পিতৃগণের নাম ও বর্হিষদ। তাঁহারা তৃতীয় চক্রে মানবাকারের সৃষ্টি কার্য্য আরম্ভ করিলেন। এই চক্রে গ্রহগণ যদিও সূক্ষ্ম এবং তেজোময় ছিল, তথাপি তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দৃঢ় ও ঘণীভূত হইল। তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণের ন্যায় এই বর্হিষদ পিতৃগণ প্রাণীজগতের আদর্শরূপসমূহের সৃজন আরম্ভ করিলেন। মানব ভ্রূণসকল পৃথিবীর চতুর্দ্দিগস্থ আকাশে অবস্থিত থাকিয়া নানা অদ্ভুতাকার ধারণ করিতে লাগিল। ভীষণ দৃশ্য রাক্ষসের ন্যায়, দেখিতে নিতান্ত কদাকার। কোন কোনটা বা ভয়ানক অথচ প্রকাণ্ড মর্কট সদৃশ। তাহারা প্রকৃত পক্ষে মানব জাতি। প্রাণীজগতের লক্ষণ তাহাদের মধ্যে দেদীপ্যমান্ থাকিলেও এই অদ্ভুতাকারবিশিষ্ট হইয়াই মানবভ্রূণ বিকাশ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তখন তাহাদের দেহে জলীয় পদার্থের সৃষ্টি হইল।

---

## ১২। চতুর্থ চক্র ও আজ্যপ পিতৃগণ।

চতুর্থ শ্রেণীর বর্হিষদ পিতৃগণের নাম আজ্যপ, এই পিতৃগণ চতুর্থ চক্রের আরম্ভে আদর্শাকৃতি সকল প্রথম গ্রহে আনয়ন করিলেন। অপর শ্রেণীর পিতৃগণ অপেক্ষা এই শ্রেণীর পিতৃগণের শরীর অপেক্ষাকৃত স্থূল। তাহাদের দেহ ঈথারে বা স্থূলাকাশিক পদার্থে নির্ম্মিত। তাহাদের নির্ম্মিত এই আদর্শরূপসমূহ অত্যাশ্চর্য্য ও অতি মনোহর। বর্ত্তমানে মানুষের কিরূপ ও ভবিষ্যতে তাহাদের কিরূপ হইবে, তাহা এই আদর্শরূপ সকলে বিদ্যমান রহিয়াছে। সপ্তমৌলিক মানব জাতির রূপই তাহাতে দেদীপ্যমান্ আছে। তন্মধ্যে ভাবী ষষ্ঠ ও সপ্তম মৌলিকজাতির রূপসমূহ উজ্জ্বল আভায় দীপ্তিমান্, দেখিতে অতি সুন্দর ও মন মুগ্ধকর। সুদূর ভবিষ্যতে শেষ চক্রে এই জাতি যে উন্নতির চরমসীমায় পদার্পণ করিবে তদ্দ্বারা তাহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এই রূপসমূহের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল, পরিশেষে অধিকতর ঘনীভূত হইয়া আমাদের এই সুপরিচিত পৃথিবীতলে অবতরণ করিয়া ভূমিস্পর্শ করিল।

## ( ক ) পৃথিবীর তখনকার অবস্থা।

এখন নবজাত পৃথিবীর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করা যাউক। তখনকার পৃথিবীর দিকে চাহিলে মনে যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ের আবির্ভাব হয়। ইহা এক অতি আশ্চর্য্য জগৎ! ভীষণ ব্যাপার সঙ্কুল! প্রকৃতির প্রলয়ঙ্করী হুঙ্কার! প্রবল ভূমিকম্পে ভগ্ন ও পতনোন্মুখ অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গের তুমুল নিনাদ ব্যতীত আর কিছুই শ্রুতিগোচর হয় না। আগ্নেয়গিরির ভয়ানক ও গভীর গর্জ্জন! তাহারা অত্যুষ্ণ গন্ধকস্রাব এবং ভস্মরাশি উদ্গীরণ করিয়া তুমুল শব্দে ইতস্ততঃ বিক্ষেপ করিতেছে। অলস্থ প্রস্তরপূর্ণ উত্তালতরঙ্গরাশি, অত্যুচ্চ পর্ব্বতের ন্যায় মস্তকোত্তলন করিয়া গম্ভীর নিনাদে চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত! প্রচণ্ড বহ্নি লহ লহ জিহ্বায় সর্ব্বত্র প্রজ্জলিত।। প্রবল ঝড়, শিলাবৃষ্টি, তুফান, ঘূর্ণ্যবায়ু প্রভৃতি যাবতীয় নৈসর্গিক বিভ্রাট এবং ভয়ানক উৎপাত দৃষ্টে মনে হয়, এই গ্রহে জীবের অবস্থান কিরূপে সম্ভবে?

বৈশ্বানরদেব এই ভীষণকাণ্ডের সংঘটনকারী। এই তুমুলকাণ্ড বিশকোটি বৎসর কাল ব্যাপিয়া অবিশ্রান্তভাবে চলিতে লাগিল! একশ, দুইশ, বা এক হাজার, দুই হাজার নয়, বিশকোটি বৎসরকাল ব্যাপী এ সকল উৎপাত ও দুর্ঘটনা। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পিতৃগণ ধীরভাবে তাহাদের সৃজনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা এই সকল দুর্দৈবের মধ্যে অচল অটল ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। বিন্দুমাত্রও বিক্ষুব্ধ বা বিচলিত না হইয়া তাঁহাদের স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন।

আমাদের এই পৃথিবীতে চতুর্থ চক্রের ত্রিশকোটি বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। স্থাবর, উদ্ভিদ্ এবং প্রাণী জগতের সৃজন কার্য্যে পিতৃদেবগণ ব্যাপৃত। পূর্ব্ববর্ত্তী চক্রের পরিত্যক্ত প্রাণহীন দেহাবলম্বনে তাঁহারা নূতন জীবজগতের সৃজনকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তাহাতে, ভয়ঙ্কর আকৃতির নানা ভীষণ ও অদ্ভুত জীবের উৎপত্তি হইল তাঁহাদের দেহের অর্দ্ধেক মানুষ ও অপরার্দ্ধেক পশুর আকার। অগ্নি, ঘূর্ণ্যবায়ু ও মেঘের মধ্যে এই সকল সরীসৃপ জাতীয় জীবের আবির্ভাব হইল। প্রধান ও উচ্চ শ্রেণীর দেবগণের সাহায্য ব্যতীত নিম্নশ্রেণীর দেবগণ কর্ত্তৃক এই সকল কিম্ভূত

কিম্বাকার জীবের সৃষ্টি হইল। নূতন ব্রতী, উমেদার কারিকর কোন মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে গেলে যেমন তাহা কদাকার ও অসম্পূর্ণ হয়, সেইরূপ অনভিজ্ঞ এবং অপটু দেবগণের এই সৃষ্টিকার্য্য অসম্পূর্ণ এবং কদর্য্য হইল।

ক্রমশঃ।

যুগল সেবক।

---

# পরাবিদ্যা সমিতির তৃতীয় উদ্দেশ্য।

( ১ )

বর্ত্তমানে অনেকের মনে পরাবিদ্যাসমিতির কার্য্যে ইহার তৃতীয় উদ্দেশ্যের স্থান কোথায় এবং ইহার সভ্যরূপে আমরাই বা ইহার দিকে কি ভাবে অগ্রসর হইব—এই প্রশ্ন উদিত হইয়াছে। কতকটা এই জন্য এবং কতকটা স্থূলাতীত (super-physical) বিষয়ের দিকে পাশ্চাত্য জগৎ এত অধিক অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া—সর্ব্বতোভাবে এ প্রশ্ন আলোচনা করা আমাদের কর্ত্তব্য। কারণ তাহা হইলে এ সম্বন্ধে কোন পন্থা অবলম্বন করা আমাদিগের পক্ষে বিধেয় তাহা বিচার করিতে সক্ষম হইব। সমিতির প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণার উপরেই এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত বহুল পরিমাণে নির্ভর করিবে, সুতরাং আমরা প্রথমতঃ তাহারই কিছু আলোচনা করিব।

যাঁহারা সমিতির ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ এবং স্থাপয়িতার (President Founder) সহিত ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত হইবার সুবিধা পাইয়াছিলেন তাঁহারা জানেন তিনি "সমিতিকে সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাবের বীজকেন্দ্র (nucleus) রূপে পরিণত করাই"—সমিতির এই প্রথম উদ্দেশ্যের দিকে—সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে কিরূপ প্রয়াস পাইতেন; তাঁহারা আরও জানেন যে যখন তিনি নূতন সভ্যদিগকে সমিতিতে প্রবেশাধিকার প্রদান করিতেন তখন কিরূপ বিশদভাবে সভ্যপদপ্রার্থির একমাত্র এবং অবশ্য পালনীয় বিধি বা নিয়মের কথা তাহাদের মনে ধারণা করাইয়া দিতেন। সেই বিধিটী এই যে সভ্যপদপ্রার্থির কর্ত্তব্য প্রথম উদ্দেশ্যে সহানুভূতি এবং তাহার অনু-

শীলন ও সাধনের ( realisation ) জন্য তাহার যতদূর ক্ষমতা ততদূর চেষ্টা করিতে প্রস্তুত থাকা চাই, এবং এই জন্যই সাধারণ ও অতি বিশদভাবে তিনি সকলকে উদারতা সাধনা করিতে অর্থাৎ প্রত্যেকে নিজের বিশ্বাসের উপর অপরের যেরূপ শ্রদ্ধা দেখিতে ইচ্ছা করেন নিজের বিশ্বাস হইতে অপরের বিশ্বাস যতদূর পৃথক হউক না কেন অপরের সেই বিশ্বাসকে ততদূর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে উপদেশ দিলেন। 'ভ্রাতৃভাব' যে মৌলিক ভাব ( keynote ) অথবা মূল সূত্র ইহা তিনি পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত করিয়াছেন ; এবং আমাদের অনেকেই তাঁহার নিকট হইতে উক্ত ভাবই 'এক মাত্র অবশ্য প্রয়োজনীয় ভাব' ("one thing needful") বলিয়া শিক্ষা করিয়াছি। প্রথম দৃষ্টে ইহা অতি সামান্য এবং সহজ বলিয়া মনে হয়। এমন কেহই নাই যিনি ভ্রাতৃভাবের আদর্শের মনোহর সৌন্দর্য্য বোধ করিতে সমর্থ নহেন, এবং যাহারা আচার ব্যবহার অথবা স্বভাব বিষয়ে উচ্চ আদর্শ এবং উচ্চ ভাব হৃদয়ে পোষণ করেন অন্ততঃ তাহাদের মধ্যে এরূপ লোক বিরল যাহারা এই ভাব পরিজ্ঞানের ( realisation ) উদ্যমে তাহাদের যথাযোগ্য প্রযত্ন প্রয়োগ করিতে প্রস্তুত বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিবেন না। কিন্তু আমরা সকলেই জানি প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে ইহা কত কঠিন। আমাদের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎসাহ সম্পন্ন এবং সবল প্রাণে কার্য্য করিতে ইচ্ছুক (earnest) তাঁহারাও এ বিষয়ে কিরূপ পুনঃ পুনঃ অকৃতকার্য্য হন। সুতরাং বাহিরের আবরণ ভেদ করিয়া ভ্রাতৃভাব যে প্রকৃত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সেই ভাবের অনুসন্ধানার্থ চেষ্টা করা যাউক।

আনন্দময় কোষের (Buddhic plane) বর্ণনায় আমরা এই মৌলিক ভাবটী সর্ব্বপ্রথমে পরিস্ফুট দেখিতে পাই। আমরা দেখিতে পাই যে "ভ্রাতৃভাবের প্রকৃত ভিত্তি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে (on the spiritual planes) বা বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষে প্রতিষ্ঠিত। কারণ এক মাত্র এইখানেই পূর্ণ একত্ব একমাত্র এইখানেই পূর্ণ সহানুভূতি বিরাজিত।" নিম্নতর লোক বা কোষ সমূহে আমরা সেই একত্বের অস্পষ্ট প্রতিফলন দেখিতে পাই মাত্র, অপূর্ণ ভ্রাতৃভাব লাভ করিতে পারি মাত্র। কিন্তু যখন কাহারও মধ্যে সেই আনন্দময় প্রজ্ঞা (Buddhic consciousness)

জাগিয়া উঠে যখন কাহারও প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা লাভ হয় তখন অপরে যে ভ্রাতৃভাবের আদর্শের কথা বলে তাহা তিনি অপরোক্ষরূপে অনুভব করেন। সুতরাং যদি প্রকৃত পক্ষে আমরা পরাবিদ্যা সমিতির প্রথম উদ্দেশ্য পরিপালনের ইচ্ছুক হই তবে আমাদিগকে এই প্রকার একতামূলক আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের চেষ্টা করিতে হইবে। এই প্রকার আধ্যাত্মিক উন্নতিকেই আমাদের প্রধান লক্ষ্য বলিয়া ধরিতে হইবে, সুতরাং যদিও অপ্রকাশ্য ভাবে আছে মূলতঃ এই প্রকার ভেদজ্ঞানরহিত আনন্দময় একতাবৰ্দ্ধক আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনার্থই যে এ সমিতির প্রধান ভাব তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

আমরা প্রথম উদ্দেশ্যটী আর এক দিক হইতে দেখিয়াও এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। এ সমিতির উদ্দেশ্য সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাবের বীজ কেন্দ্র (nucleus) স্থাপন। শ্রীমতী বেসান্তের "ভারতের ধর্ম্ম সমস্যা" (Religions Problems in India) পুস্তকে দেখিতে পাই যে "যখন পরাবিদ্যা সমিতি স্থাপিত করা হইয়াছিল তখন ইহাকে এইরূপ বীজ কেন্দ্ররূপে স্থাপিত করা হইয়াছিল। এক্ষণে বীজ কেন্দ্র কাহাকে বলে? কোষাণুর মধ্যে (in a cell) একটী শক্তিশালী বিন্দু অথবা কেন্দ্র আছে, যেখানে সমস্ত জীবনীশক্তি (life forces) সংগৃহীত বা সংহৃত হইয়া থাকে এবং যেখান হইতেই পুনরায় ঐ শক্তি চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত হয়, ঐ অপরিণামী অথচ পরিণামের মূল কারণরূপ কেন্দ্রের নাম বীজকেন্দ্র। বিজ্ঞান যে চক্ষে দেখে তেমনি ভাবে একটী কোষাণুকে দেখা যাউক। বৈজ্ঞানিক ঐ কোষাণুর পরিবর্দ্ধনের ইতিহাস বিবৃত করেন। কোষাণুর অন্তস্থিত সংহননশক্তি এবং সেই শক্তি সাহায্যে কোষাণুরূপ শরীর সংগঠন ব্যাপার, ও কোষাণুটী যেরূপে একত্ব হইতে প্রকটিত বহুত্বে পরিণত হয় সেই অদ্ভুত ব্যাপারটীও একটী ক্ষুদ্র শক্তিকেন্দ্রের উপর নির্ভর করে, ঐ বিন্দু শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্র (microscope of high power) সাহায্যে দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ বিন্দু হইতেই শরীর গঠন, বৃদ্ধি ও পরিবর্দ্ধন ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় ঐ বিন্দুই বীজকেন্দ্র পরাবিদ্যা সমিতিও ঐরূপ একটী বীজকেন্দ্র (nucleus) আর অধিক কিছু নহে। ইহা ক্ষুদ্র বটে স্বল্পায়তন বটে কিন্তু ইহার ভিতরে

সমস্ত জীবনী শক্তি রহিয়াছে, সেই শক্তিই সর্ব্বদিকে পরিব্যাপ্ত বিশাল সমাজদেহ গঠিত, পরিবর্দ্ধিত, সংবৃদ্ধ করিবে, আমাদের সমিতি এইভাবে একটী বীজ কেন্দ্র।”

শ্রীমতী বেসান্ত এ বিষয়ে অধিকতর একভাব-ব্যঞ্জক কোন উক্তি করিয়াছেন কিনা জানি না, অন্য কোথাও এক কথায় এরূপ সুন্দর ভাবে এ বিষয় ব্যাখ্যাত করিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। এরূপ সঞ্জিবনী মহা-বাক্য তাঁহা দ্বারা উচ্চারিত হইয়াছে কিনা বলিতে পারি না। আধ্যাত্মিক ভ্রাতৃভাব ও বীজকেন্দ্র এই দুইটী ভাবকে আমরা যদি জীবন পরিচালক বা আদর্শ (text and motto) বলিয়া গ্রহণ করি এবং এই দুইটী মহাভাবের গভীরতম অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়া ইহার প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করতঃ সেই তথ্য আমাদের সমস্ত আচার ব্যবহারে ও সমগ্র জীবনে প্রয়োগ করিতে পারি তাহা হইলে একদিন আমরা এমন প্রবল শক্তি স্বরূপতা লাভ করিব যে তদ্দ্বারা বাহ্যজগতে এই সমিতি ইহার প্রকৃত কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হইবে। জগতের রূপক্ষেত্র অপেক্ষা জগতের জীবন শক্তি সঞ্চারণে আমাদের সমিতির মহান কার্য্য। সমিতি জগতকে জীবনীশক্তি দ্বারা সঞ্জীবিত করিবার জন্য স্থাপিত। নাম বা রূপ ভাব উন্নত করিবার জন্য নহে। মানব হৃদয়ই ইহার কর্ম্মক্ষেত্র। মানবের রূপ ইহার ক্ষেত্র নহে। আধ্যাত্মিক বা মৌলিক একতার জন্যই সমিতির কার্য্যের শুষ্ক জ্ঞান বা বাহ্যিক ধর্ম্ম ইহার গতি নহে। ভৌতিক বিষয়ক উন্নতি অপেক্ষা ইহার লক্ষ্য আধ্যাত্মিকতার উপরই ন্যস্ত। কারণ আত্মাই সর্ব্ব ভাবের অস্তিত্বের মূল কারণ, শক্তি বা জীবনের বীজ কেন্দ্রের উৎপত্তি স্থান। অতএব এই মহান তথ্যটী মনে রাখিয়া আমাদের বর্ত্তমান প্রশ্ন আলোচনা করিতে হইবে।

এই প্রকার আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রধান অন্তরায় কি? এ পথে চলিতে গেলে কোন্ প্রবল শত্রুর সহিত আমাদিগকে যুদ্ধ করিতে হইবে? জগতের সর্ব্ব ধর্ম্ম শাস্ত্রের দিকে তাকাইলে সকল দেশের সর্ব্ব সময়ের সকল মহাযোগী ও সাধকের নিকট উপস্থিত হইলে একই উত্তর শুনিতে পাওয়া যায়, একই উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সকলেই একবাক্যে স্থির করিয়াছেন সে প্রবল শত্রু অহঙ্কার—ক্ষুদ্র ব্যক্তি, কেন্দ্রীভূত আমিত্বের প্রতিষ্ঠা, স্বার্থ-

পরন্তু ভেদজ্ঞানই সে প্রবল অন্তরায়। ইহাকে পরাজয় করিলে পথ সুগম হইবে। ঐ অহঙ্কারকেই রক্তবীজ বলে এবং উহা প্রকৃতই বহুরূপী ( Protean monster )। এই রক্তবীজ স্থূলদেহের ভিতর দিয়া ( the ahankara of the personality ) দৈহিক বাসনা বা ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার আকাঙ্ক্ষা রূপে প্রকাশ হয়। যখন এই সমস্ত কামনা অন্ততঃ আংশিকরূপে অতিক্রম করা যায় তখন সূক্ষ্মদেহে মন এবং প্রতিভার ( intellect ) মধ্য দিয়া অন্য মূর্ত্তিতে প্রকাশ হয় ( ahankara of the individuality )। এখানেও ছদ্মরূপের শেষ নয় এ সমস্ত ভাবের অতীত সূত্রাত্মা বা কারণ দেহ গত এক প্রকার অহঙ্কার আছে, ( ahankara of the soul ) ; এ অহঙ্কারে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের বাসনা আছে, পরিবর্দ্ধন লব্ধ উন্নতিজাত সুখের আকাঙ্ক্ষা আছে, সূক্ষ্মতর ও উচ্চতর জগৎ সন্ধানে বিচরণ করতঃ তথাকার অভিজ্ঞতা লাভের ইচ্ছা আছে, সিদ্ধ পুরুষদিগের সহিত পরিচিত হওয়া এবং তাহাদের সঙ্গসুখ লাভের কামনা প্রভৃতি নানা প্রকার ইচ্ছা এই অহঙ্কার হইতেই উৎপত্তি হয়। ইহার উপরেও আর এক প্রকার অহঙ্কার আছে— যদি আমাদের দুইটী বিপরীত অর্থ বোধক শব্দ সমন্বিত করার অধিকার থাকে তবে তাহার নাম আধ্যাত্মিক অহঙ্কার ( spiritual ahankara ) বলিতে পারি। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিপজ্জনক, কারণ ইহার মূর্ত্তি সূক্ষ্মতম এবং ইহাকে দমিত করা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কষ্টসাধ্য। তথাপি আমার মনে হয় আমরা—যাহার সানন্দে আমাদিগকে পরাবিদ্যা সমিতির সভ্য বলিয়া মনে করিতেছি, সেই আমাদের প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি কোষস্থিত এই অহঙ্কার যে পরিমাণে দমিত করিতে পারিব সমিতিও সেই পরিমাণে সর্ব্ব সাধু এবং আধ্যাত্মিক ভাবাবলির বীজ কেন্দ্র স্বরূপ যে পরম সুন্দর আদর্শ সেই আদর্শস্থানীয় হইতে পারিবে। যদি আমরা সেই মহা শত্রু অহঙ্কারের মূলোৎপাটন করিতে পারি তাহা হইলে সমিতিও এরূপ হইবে যে "যেখানে ইহার প্রসার হইবে, যে ভূমিতে ইহা পদার্পণ করিবে সেখানেই অভিনব জীবন স্রোত প্রবাহিত হইবে, কিন্তু সে স্রোত সমিতি দ্বারা আসিবে না সমিতির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইবে মাত্র।" ( ক্রমশঃ )

---

# কস্তুরী প্রকরণ।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

দত্তে যেন বিনা ঘনেঽপি হি ধনে স্যাদ্দুঃসহস্তদ্ব্যয়।
শ্চীর্ণে যেন বিনাতিকামবিমলে শীলে চ ভোগক্ষয়ঃ ॥
তপ্তে যেন বিনা চ দুস্তরতপঃ স্তোমে চ কার্শ্যোদয়ঃ।
কার্য্যাস্তৎফলমিচ্ছুভিঃ শুভতরে ভাবেঽত্র ভব্যৈর্লয়ঃ ॥২৭॥

যেন ( ভাবেন ) বিনা, ঘনে বহুতরে অপি ধনে ( সম্পত্তৌ ) দত্তে ( অর্পিতে ) সতি তৎ ( তস্য ) ব্যয়ঃ দুঃসহ ( দুঃখেন সোঢুং শক্যঃ ) স্যাৎ ( ভবেৎ )। তথা, যেন বিনা অতিকামবিমলে অতি মনোহরে ) শীলে ( চরিত্রে চীর্ণে ( সঞ্চিতে ) সত্যাপি ( ভোগক্ষয়ঃ ( ভোগক্ষতিঃ ) স্যাদিত্যনেনান্বয়ঃ। যেন বিনা, দুস্তরতপঃ স্তোমে, ( দুঃখেন তরীতুং শক্যানি তপাংসি তেষাং স্তোমঃ তস্মিন্ ) তপ্তে ( আচরিতে ) সত্যাপি কার্শ্যোদয় ( কৃশতোৎপত্তিঃ ) স্যাদিত্যনেনান্বয়। তৎ তস্মাৎ ) ফলাভিচ্ছুভিঃ ( ফলাভিলাসিভিঃ ) ভব্যৈঃ ( সজ্জনৈঃ ) অত্র ( এতস্মিন্ ) শুভতরে ( অতিশুভে ) ভাবে, লয়ঃ কার্য্যঃ ( অবশ্যং কর্ত্তব্যঃ )। ২৭।

যে ভাব বিনা, বহুধন বিতরণ করিলেও তাহার ব্যয় দুঃসহ হয়। অতি মনোহর চরিত্র সঞ্চয় করিলেও ভোগ ক্ষয় হয়। অত্যুগ্র তপশ্চরণ করিলেও কার্শ্যোদয় হয়, সেই শুভতর ভাবে ফলার্থী সদ্ব্যক্তিদের আসক্ত হওয়া উচিত। ভাবনা ব্যতিরেকে দানশীল তপাদি ফলদায়ক নহে। ২৭।

শ্রীহানিং দদতামুপৈতি দধতাং শীলঞ্চ ভোগক্ষয়ঃ
সংক্লেশঃ সৃজতাং তপশ্চ পঠতাং কণ্ঠে ভবেৎ কুণ্ঠতা।
পূজ্যানাং নমতাং চ মান মথনং দুঃখং বৃতং বিভ্রতাং
মন্তেবং ন কথং করোষি সুকরে ভাবে মনাগ্বন্ মনঃ। ১৮।

মনস্বিন্ ( মতিমন্ ) দদতাং ( দানং কুর্ব্বতাং ) জনানামিতি শেষঃ শ্রীঃ ( সম্পৎ ) হানিং ( ক্ষয়ং ) উপৈতি ( গচ্ছতি ) শীলং চরিত্রং ) দধতাং ( ধারয়তাং ) ভোগক্ষয়ঃ, তপঃ সৃজতাং ( তপশ্চরতাং ) সংক্লেশঃ ( কষ্টঃ ) ভবেদ্, পঠতাং ( অধ্যয়নং কুর্ব্বতাং ) কণ্ঠে, কুণ্ঠতা ( সঙ্কোচঃ ) ভবেদ্,

পূজ্যানাং ( পূজনীয়ানাং ) নমতাং ( প্রণতিং কুর্ব্বতাং ) মানমথনং ( সম্মান হানিঃ ) ভবেদ্। বৃতং ( বরণেন দত্তং ) বিভ্রতাং ( ধারয়তাং ) দুঃখং ভবেদ্। এবং মত্বা ( চিন্তয়িত্বা ) মনঃ ( চেতঃ ) সুকরে ( সহজসাধ্যে ) ভাবে কথং ন করোষি ? ( কথং ন বিতরসি ইত্যর্থঃ ) ২৮।

হে মনস্বিন্! দাতাদিগের সম্পত্তি ক্ষয় হয়, চরিত্রবানদিগের ভোগ ক্ষয় হয়, তাপসের ক্লেশ হয়, অধ্যয়নশীলদিগের কণ্ঠ সংকুচিত হয়। পূজ্যাদিগকে প্রণামকারীর তদপেক্ষা অপকর্ষ সূচিত হয়, কর্ম্মনিযুক্ত ব্যক্তিদেরও দুঃখ হয় এইরূপ মনে করিয়া সুকর ভাবে মন অর্পন করনা কেন ? ২৮

নীরেণেব সরঃ সরোরুহং মিবামোদেন সীতাংশুনা
তুঙ্গীবাম্বুজবন্ধুনেব দিবসঃ কুম্ভীব দানাম্বুনা
পুত্রেণেব কুলং কুরঙ্গনয়না ভর্ত্রে ব ধত্তেশ্রিয়ং
ভাবেন প্রচুরাপি পুণ্যপটুতা প্রোল্লাসমীতা ক্রিয়া। ২৯।

নীরেণ ( জলেন ) সরঃ ( সরসী ) ইব, আমোদেন ( গন্ধেন ) সরোরুহং ( পদ্মং ) ইব, সীতাংশুনা ( চন্দ্রেণ ) তুঙ্গী ( রজনী ) অম্বুজবন্ধুনা ( সূর্য্যেণ ) দিবসঃ ( দিনং ) ইব, দানাম্বুনা ( মদজলেন ) কুম্ভীব ( করীব ) পুত্রেণ ( সুতেন ) কুলং ( বংশঃ ) ইব, ভর্ত্রা ( পত্যা ) কুরঙ্গনয়না ( কামিনী ) ইব যথা শ্রিয়ং ( শোভাং ) ধত্তে ( ধারয়তি ) তথা, ভাবেন প্রচুরা ( ভাবসমন্বিতা ভক্ত্যা ইত্যর্থঃ ) ক্রিয়া পুণ্যপটুতা প্রোল্লাসমীতা ( পুণ্যপটুতয়া পবিত্র পাণ্ডিত্যেন প্রোল্লাসমীতা সতী ) শ্রিয়ং ধত্তে। ২৯।

যেমন জল দ্বারা সরোবর, সৌগন্ধ দ্বারা পদ্ম, চন্দ্র দ্বারা রাত্রি, সূর্য্য দ্বারা দিন, মদজল দ্বারা হস্তী, পুত্র দ্বারা কুল, পতি দ্বারা নারী, শোভায়মান হয় সেইরূপ পবিত্র পাণ্ডিত্য দ্বারা প্রোল্লাসিতা ক্রিয়া ভাবভক্তি দ্বারা শোভায়মান হয়। ২৯।

কৈশ্চিদ্দানমদায়ি শীলমমলং চাপালি কৈশ্চিত্তপঃ
কষ্টং কৈশ্চিদধায্যকারি বিপিনে কৈশ্চিন্নিবাসোঽহনিশং।
কৈশ্চিদ্ধ্যানমধারি কৈশ্চিদনঘশ্চাপূজি দেবব্রজো
যত্তেষাং ফলমাপি চাপর নাহং ভাববিস্ফুর্জ্জিতং। ৩০।

কৈশ্চিৎ ( জনৈর্রিতি শেষঃ ) দানং অদায়ি ( দত্তং ) কৈশ্চিৎ অমলং

( নির্ম্মলং ) শীলং ( চরিত্রং ) অপালি ( পালিতং ) কৈশ্চিৎ তপঃকষ্টং ( তপস্যা-জনিত ক্লেশঃ ) অধায়ি ( কৃতং ) কৈশ্চিৎ বিপিনে ( বনে ) অনিশং ( সততং ) বাসঃ ( বসতিঃ ) অকারি ( কৃতঃ ) কৈশ্চিৎ ধ্যানং ( তত্ত্বচিন্তা ) অধারি (ধৃতং) কৈশ্চিৎ অনঘঃ ( নিষ্পাপঃ ) দেবব্রজঃ ( দেবতাসমূহ ) অপূজি ( পূজিতঃ ) চ ( কিন্তু ) তেষাং ( দানাদীনাং ) ফলং অপবনরৈঃ ( অন্যমনুষ্যৈঃ ) আপি ( প্রাপ্তং ) ইতি যৎতৎ ভাববিস্ফূর্জ্জিতং ( ভাবস্য প্রাবল্যং ) নান্যৎ। তেষাং ফলপ্রাপ্তৌ ভাব এব কারণমিতি ভাবঃ। ৩০।

কোন পুরুষ দান করে, কেহ নির্ম্মল চরিত্র পালন করে, কেহ তপস্যার ক্লেশ সহ্য করে, কেহ চিরকাল বনে বাস করে কেহ তত্ত্ব চিন্তা অবলম্বন করে, কেহবা নিষ্পাপ দেবসমূহের পূজা করে কিন্তু তাহাদের ফল অপর মনুষ্য প্রাপ্ত হয় ইহা শুধু ভাবেরই প্রাবল্য ( ভাবই তাহাদের ফলপ্রাপ্তির কারণ )। ৩০।

( ক্রমশঃ )

---

# রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামী।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

## প্রভুর বারাণসীধামে প্রত্যাগমন।

রূপ গোস্বামীকে শিক্ষাদান ও শক্তিসঞ্চার করিয়া প্রভু পরদিন প্রভাতে উঠিয়া বারাণসী যাত্রা করিলেন। রূপ গোস্বামী প্রভুর বিরহভাবনায় কাতর হইয়া তাঁহার অনুগমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। প্রভু বলিলেন, "শ্রীবৃন্দাবনের এত নিকট আসিয়া শ্রীবৃন্দাবন দর্শন না করা ভাল হয় না, অতএব তোমরা দুই ভাই শ্রীবৃন্দাবনেই যাও। আমি বারাণসী হইয়া নীলাচলে যাইব। তুমি শ্রীবৃন্দাবন দর্শনের পর নীলাচলে যাইও। নীলাচলেই আমার সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইবে" এই বলিয়া প্রভু যাত্রা করিলেন। রূপ গোস্বামী ও কনিষ্ঠ বল্লভের সহিত শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে প্রয়াণ করিলেন।

প্রভু প্রয়াগ হইতে নৌকাযোগে বারাণসীধামে উপনীত হইলেন।

চন্দ্রশেখর পূর্ব্বরাত্রিতে স্বপ্নযোগে প্রভু আসিয়াছেন দেখিয়া বাটীর বাহিরে আসিয়া প্রভুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে প্রভু তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রভুকে দেখিয়া তাঁহার চরণতলে পতিত হইলেন। অনন্তর প্রভুকে লইয়া নিজ গৃহে গমন করিলেন। তপনমিশ্র প্রভুর আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রশেখরের আলয়ে আসিয়া প্রভুর চরণ দর্শন করিলেন। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণও প্রভু আসিয়াছেন শুনিয়া চন্দ্রশেখরের গৃহে আসিয়া প্রভুর চরণগ্রহণ করিলেন। এইদিন চন্দ্রশেখরের গৃহেই প্রভুর ভিক্ষা হইল। পরদিন তপনমিশ্র প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন তাঁহার বাসা কিন্তু চন্দ্রশেখরের গৃহেই নির্দ্দিষ্ট রহিল।

---

## সনাতন গোস্বামীর বারাণসী যাত্রা।

এদিকে সনাতন গোস্বামী কারামুক্ত হইয়া ভৃত্য ঈশানের সহিত প্রভুর চরণ দর্শনাভিলাষে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি প্রকাশ্য রাজপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পার্ব্বত্যপথে ফলমূলাদি দ্বারা কোনরূপে জীবনধারণ করিয়া পাতড়া পর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই পর্ব্বতে একজন ভূঞা উপাধিধারী দস্যু বাস করিত। অসহায় পথিকের সর্ব্বস্ব অপহরণ করাই তাহার ব্যবসায়। সনাতন গোস্বামী ঐ ভূঞার নিকট উপস্থিত হইয়া পর্ব্বত পার করিয়া দিবার নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন ভূঞার অধীনে একজন গণক ছিল। সে গণনা করিয়া কাহার নিকট কি আছে বলিয়া দিতে পারিত। গণক গণনা করিয়া ভূঞাকে জানাইল, এই ভৃত্যটীর নিকট আটটী স্বর্ণ মুদ্রা আছে। ভূঞা আনন্দিত হইয়া সনাতন গোস্বামীকে বলিল, "আমি রাত্রিতে আমার লোক দিয়া তোমাদিগকে পর্ব্বত পার করিয়া দিব। এখন তোমরা স্নানাহার করিয়া বিশ্রাম কর।" এই কথা বলিয়া ভূঞা পরম সমাদর সহকারে রন্ধনের আয়োজন করিয়া দিল। সনাতন গোস্বামী নদীতে স্নান করিয়া দুই উপবাসের পর রন্ধন ও ভোজন করিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি রাজমন্ত্রী সনাতন ভূঞার অতিরিক্ত আদর দেখিয়া সংশয়িতচিত্তে ভৃত্য ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নিকট কি কিছু অর্থ আছে?"

ঈশান আটটী মোহরের একটী গোপন করিয়া বলিল, "হাঁ, আমার নিকট সাতটী মোহর আছে" সনাতন গোস্বামী কিছু বিরক্তির সহিত ঈশানকে বলিলেন, "মোহরগুলি আমাকে দাও" পরে ঈশানের নিকট হইতে সাতটী মোহর লইয়া ভূঞাকে দিয়া মধুর বচনে বলিলেন, 'আমার নিকট কয়েকটী মোহর আছে, এইগুলি লইয়া ধর্ম্ম ভাবিয়া আমাকে পার করিয়া দাও; আমি রাজবন্দী—প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া যাইতে পারিব না। আমাকে এই পর্ব্বত পার করিয়া দিলে, তোমার বিশেষ পুণ্য হইবে" ভূঞা হাসিয়া বলিল, "তোমার ভৃত্যের নিকট ৮টী মোহরই ছিল, তাহা আমি পূর্ব্বেই বিদিত হইয়াছি। আমি আজ রাত্রে তোমাদের মারিয়া এ মোহরগুলি লইতাম। ভাল হইল, আমি হত্যাপাপ হইতে অব্যাহতি পাইলাম। তুমি অতি সুবোধ, আমি তোমার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়াছি, মোহর লইব না, তোমাদিগকে পর্ব্বত পার করিয়া দিব" সনাতন গোস্বামী বলিলেন, "তুমি যদি এই মোহরগুলি না লও, পথে অন্য কেহ আমাদিগকে মারিয়া কাড়িয়া লইবে, অতএব তুমিই গ্রহণ কর, আমরাও নিরাপদে গমন করি।" ভূঞা সন্তুষ্ট হইয়া মোহরগুলি লইয়া চারিজন লোক সঙ্গে দিয়া সনাতন গোস্বামীকে রাতারাতি পর্ব্বত পার করিয়া দিল। সনাতন গোস্বামী বনপথে নির্ব্বিঘ্নে পর্ব্বত পার হইয়া ভূঞার লোকদিগকে বিদায় দিলেন। পরে ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নিকট আরও একটী মোহর আছে কি?" ঈশান উত্তর করিল, "আছে পথখরচের জন্য একটী মোহর সম্বল রাখিয়াছি।" সনাতন গোস্বামী বলিলেন, "ভালই করিয়াছ, তুমি এই মোহরটী লইয়া গৃহে ফিরিয়া যাও, আর আমার সঙ্গে যাইবার প্রয়োজন নাই।" ঈশান কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া গেল। সনাতন গোস্বামীও ছিন্ন কাঁথা ও করোয়া লইয়া নির্ভয়ে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি চলিয়া চলিয়া সন্ধ্যার সময় হাজিপুরে আসিয়া একটী উদ্যানের ভিতর রাত্রিযাপনের মানস করিলেন। সনাতন গোস্বামীর গ্রাম সম্বন্ধে ভগ্নিপতি শ্রীকান্ত সেন গৌড়েশ্বরের আদেশে বার্ষিক দেয় ঘোটকের মূল্যস্বরূপ তিনলক্ষ টাকা লইয়া দিল্লীর পাতসাহকে দিতে যাইতেছিলেন। তিনি সম্প্রতি এই হাজিপুরের রাজপ্রাসাদেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি প্রাসাদের উপর হইতে

উদ্যান মধ্যে সনাতন গোস্বামীকে দেখিয়া নামিয়া আসিলেন। দুইজনে নিভৃতে অনেক কথা বার্ত্তা হইল। সনাতন গোস্বামী শ্রীকান্তকে নিজের কারামোচন বৃত্তান্ত সবিশেষ বলিলেন। শ্রীকান্ত সনাতন গোস্বামীকে সন্ন্যাসীর বেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভদ্রবেশ ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। সনাতন গোস্বামী কিছুতেই স্বীকার করিলেন না। তখন শ্রীকান্ত তাঁহাকে অন্ততঃ দুই একদিনও হাজিপুরে থাকিতে বলিলেন। সনাতন গোস্বামী তাহাতেও সম্মত হইলেন না। শ্রীকান্ত সনাতন গোস্বামীর প্রবল বৈরাগ্যের বেগ অপ্রতিরোধ্য বুঝিয়া আর অধিক কথা বলিতে সাহস করিলেন না। তখন সনাতন গোস্বামী শ্রীকান্তকে বলিলেন, "তুমি আমাকে কোন সুযোগে সত্বর গঙ্গা পার করিয়া দাও, আমি আজই এখান হইতে চলিয়া যাইব," শ্রীকান্ত অগত্যা অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া একখানি কম্বল দিয়া তাঁহাকে তখনই নৌকাযোগে গঙ্গা পার করিয়া দিলেন। সনাতন গোস্বামী কয়েকদিন অবিশ্রান্ত চলিয়া বারাণসীধামে উপনীত হইলেন।

( ক্রমশঃ )

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

---

# বিচার সাগর।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

## নির্গুণ প্রণব উপাসনা প্রকার।

কেবল নির্গুণ উপাসনার রীতি লিখিত হইল। সগুণ উপাসনার রীতি লিখিত হইল না। কারণ যাহার ব্রহ্মলোক কামনা হয়, নির্গুণ উপাসনায় তাহার কামনারূপ প্রতিবন্ধক দ্বারা তৎকাল মোক্ষ হয় না। পরন্তু ব্রহ্মলোক প্রাপ্তিই হয়। সেই ব্রহ্মলোকে হিরণ্যগর্ভসমান ভোগসমূহ সম্ভোগে জ্ঞান হইলে তবে তাহার মোক্ষ হয়। যাহার ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি কামনা নাই, তাহার এই লোকেই জ্ঞান হইয়া মোক্ষ হয়। এই রীতিতে সগুণ উপাসনায়

ফল নির্গুণ উপাসনার অন্তর্ভূত। সুতরাং নির্গুণ উপাসনারই রীতি কথিত হইল:—

যাহা কিছু কারণ কার্য্য বস্তু আছে, তাহা সবই ওঁকার স্বরূপ; সুতরাং ওঁকার সর্ব্বরূপ। সকল পদার্থেই নাম ও রূপ দুইভাগ আছে। তথায় রূপ ভাগ আপন আপন নাম ভাগ হইতে পৃথক নহে। পরন্তু রূপভাগ নাম স্বরূপই বটে। কারণ, পদার্থের রূপ অর্থাৎ আকার সেই পদার্থের নাম দ্বারা নিরূপিত হইয়া গ্রহণ বা ত্যাগ হয়। নাম না জানিলে কেবল আকার দ্বারা ব্যবহার সিদ্ধ হয় না। সুতরাং নামই সার। আকারের নাশে নাম নাশ হয় না। নাম থাকে। যেমন ঘট নাশে মাটিশেষ থাকে। সে স্থলে ঘট মৃত্তিকা হইতে পৃথক বস্তু নহে, মৃত্তিকা রূপই। সেইরূপ আকারের নাশে, মৃত্তিকার ন্যায় শেষ থাকে যে নাম তাহা হইতে আকার পৃথক নহে। আকার নাম স্বরূপই। অথবা যেমন ঘটাদি মৃৎপাত্রে মৃত্তিকা অনুগত, এবং ঘটাদি পরস্পর ব্যভিচারী। সুতরাং ঘটাদি মিথ্যা ও তদনুগত মৃত্তিকা সত্য (নিত্য)। সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন আকারের ঘট অনেক, কিন্তু সকলেরই "ঘট" এই দ্বিঅক্ষর নাম এক। সেই সকল আকার পরস্পর ব্যভিচারী, কিন্তু সকলের নাম এক অনুগত। সুতরাং মিথ্যা আকার সত্য নাম হইতে পৃথক নহে। এই রীতিতে সর্ব্ব পদার্থের আকার আপন আপন নাম হইতে পৃথক নহে, কিন্তু নাম স্বরূপই। ফলে, সেই নাম ওঁকার হইতে ভিন্ন নহে, ওঁকার স্বরূপই। কারণ, বাচক শব্দকে নাম কহে। এবং "লোকবেদের শব্দসমূহ ওঁকার হইতে উৎপন্ন" ইহা শ্রুতি প্রসিদ্ধ। কার্য্যসমষ্টি কারণ স্বরূপ, সুতরাং ওঁকারের কার্য্য যে বাচক শব্দরূপ নাম, তাহা ওঁকার স্বরূপ। এই রীতিতে পদার্থের রূপভাগ বা আকার, তাহার নাম স্বরূপ। ও সকল নাম বা নাম-সমষ্টি ওঁকার স্বরূপ; সুতরাং ওঁকার সর্ব্বরূপ।

## ওঁকার ও ব্রহ্মের অভেদ।

যেমন ওঁকার সর্ব্বস্বরূপ, সেইরূপ ব্রহ্ম সর্ব্বস্বরূপ। অথবা ওঁকার ব্রহ্ম-বাচক ব্রহ্মবাচ্য বাচ্য ও বাচকের অভেদ। সুতরাং ওঁকার ব্রহ্মরূপ। বিচারদৃষ্টিতে দেখিলে যে অক্ষর ব্রহ্মে অধ্যস্ত, ব্রহ্ম তাহার অধিষ্ঠান।

অধ্যাস্তের স্বরূপ অধিষ্ঠান হইতে পৃথক নহে। সুতরাং ওঁকার ব্রহ্মস্বরূপ। সুতরাং ব্রহ্মরূপে ওঁকার চিন্তন করিবে।

ব্রহ্মরূপ ওঁকার আত্মা হইতে অভিন্ন চিন্তা করিবে। কারণ, ব্রহ্ম হইতে আত্মা অভিন্ন। ব্রহ্মের চারি পাদ, সেইরূপ আত্মারও চারি পাদ। পাদ অর্থে অবস্থা, ভাগ, বা অংশ। বিরাট বা বৈশ্বানর * হিরণ্যগর্ভ, ঈশ্বর ও তৎপদ লক্ষ্য ঈশ্বরসাক্ষী—ব্রহ্মের এই চারি পাদ। বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ ও তৎপদ লক্ষ্য জীবসাক্ষী—আত্মার এই পাদ চতুষ্টয়। জীবসাক্ষীকেই তুরীয় কহে।

সমষ্টি স্থূল প্রপঞ্চ সহিত চৈতন্যকে বিরাট কহে। ব্যষ্টি স্থূল অভিমানীকে বিশ্ব কহে। বিরাট ও বিশ্বের উপাধি স্থূল। সুতরাং বিশ্ব বিরাটরূপ, বিরাট হইতে ভিন্ন নহে। বিরাটরূপ বিশ্বের সপ্ত অঙ্গ ও উনবিংশতি মুখ। স্বর্গলোক মূর্দ্ধা, সূর্য্য নেত্র বায়ু প্রাণ, আকাশ মধ্য দেশ, (বড) অন্ন, সমুদ্রাদিরূপ জল উদর পৃথ্বীপাদ, অগ্নি মুখ—বিশ্বের এই সাত অঙ্গ কথিত হয়। মাণ্ডুক্যে যদিও স্বর্গলোকাদি বিশ্বের অঙ্গ কথিত হয় নাই তথাপি উহারা বিরাটের অঙ্গ বলিয়া, বিশ্বের অঙ্গ কথিত হয়।

বিরাট বিশ্বের উনবিংশতি মুখঃ—পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ চতুষ্টয় (মন, চিত্ত, বুদ্ধি ও অহঙ্কার) ইহারা মুখের ন্যায় ভোগের সাধন বলিয়া, ইহাদিগকে মুখ কহে। এই একোনবিংশতি মুখ দ্বারা জাগ্রত অবস্থায় স্থূল শব্দাদিকে বাহ্যবৃত্তি করিয়া (অর্থাৎ, বাহ্য বিষয় প্রকাশক ভাবে) ভোগ করে। সুতরাং, বিরাটরূপ বিশ্বকে স্থূলভোক্তা, বহিঃপ্রজ্ঞ ও জাগ্রৎ অবস্থার অধিষ্ঠাতা কহে।

## চতুর্দ্দশ ত্রিপুটী।

প্রাণাদি একোনবিংশতি ভোগসাধন মধ্যে শ্রোত্রাদি দশ ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ চতুষ্টয়—এই চতুর্দ্দশ আপন আপন বিষয়ও আপন আপন অধিষ্ঠাতৃ দেবতার সাহায্য প্রাপ্ত হয়। দেবতাও বিষয়ের সাহায্য বিনা কেবল ঐ সকল হইতে ভোগ হয় না। এই সকলের নাম ত্রিপুটী।

---

* বিশ্বরূপ পুরুষ।

এই রীতিতে সেই ত্রিপুটী কথিত হয়:—শ্রোত্র ইন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, ও তাহার বিষয় শব্দ অধিভূত দিক্ অভিমানী দেবতা অধিদৈব। ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তিবান ইন্দ্রিয়, এবং অন্তঃকরণ অধ্যাত্ম কহে। তাহাদের বিষয়কে অধিভূত কহে, এবং তাহাদের সহায়ক দেবতাকে অধিদেব কহে। ত্বক্ ইন্দ্রিয় অধ্যাত্ম; তাহার বিষয় স্পর্শ অধিভূত, এবং বায়ুতত্ত্বাভিমানী দেবতা অধিদৈব। নেত্র ইন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, রূপ অধিভূত ও সূর্য্য অধিদৈব। রসনা ইন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, রস অধিভূত ও বরুণ অধিদৈব। ঘ্রাণ ইন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, গন্ধ অধিভূত ও অশ্বিনীকুমার অধিদৈব। বার্ত্তিককার সুরেশ্বরাচার্য্য পৃথ্বী অভিমানী দেবতা ঘ্রাণের অধিদেব কহিয়াছেন। তাহা সম্ভবেনা, কারণ পৃথিবী হইতে ঘ্রাণের উৎপত্তি। সুতরাং পৃথিবী অধিদেব কহিয়াছেন। সূর্য্যের নাসিকা হইতে অশ্বিনী কুমারের উৎপত্তি কথিত হয়। সুতরাং নাসিকার অধিদেব অশ্বিনীকুমারই কহে। বাক্ ইন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, বক্তব্য অধিভূত, অগ্নিদেবতা অধিদেব। হস্ত ইন্দ্রিয়, পদার্থগ্রহণ অধিভূত, ইন্দ্র অধিদেব। পাদ ইন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, গমন অধিভূত, বিষ্ণু অধিদেব। পায়ু ইন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, মলত্যাগ অধিভূত, যম অধিদেব। উপস্থ ইন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, গ্রাম্য বা পশুধর্ম্ম সুখের উৎপত্তি অধিভূত, প্রজাপতি অধিদেব। মন অধ্যাত্ম, মনের বিষয় অধিভূত, চন্দ্রমা অধিদেব। বুদ্ধি অধ্যাত্ম, বোদ্ধব্য অধিভূত, বৃহস্পতি অধিদেব। জ্ঞানের বিষয়কে বোধব্য কহে। অহঙ্কার অধ্যাত্ম, অহঙ্কারের বিষয় অধিভূত, রুদ্র অধিদেব। চিত্ত অধ্যাত্ম, চিত্তার বিষয় অধিভূত, ক্ষেত্রজ্ঞ সাক্ষী অধিদৈব। এই চতুর্দ্দশ ত্রিপুটী ও পঞ্চপ্রাণ বিরাট-রূপ বিশ্বের মুখ।

## বিরাটবিশ্ব ও অকারের অভেদ চিন্তন।

যেমন বিরাট ও বিশ্বের অভেদ, সেইরূপ ওঁকারের প্রথম মাত্রা—অকার ও বিরাটরূপ বিশ্ব হইতে অভিন্ন। কারণ, ব্রহ্মের চারি পাদের প্রথম পাদ বিরাট, এবং আত্মার চারি পাদের প্রথম পাদ বিশ্ব। সেইরূপ ওঁকারের চারি মাত্রারূপ পাদের প্রথম পাদ অকার। সুতরাং তিনেরই প্রথম সমান ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্ববিরাট অকারের অভেদ চিন্তন করা হয়।

বিশ্বের যে সাত অঙ্গ ও একোনবিংশতি মুখ কথিত হয়, সেই সকল তৈজসেরও জানিবে। প্রভেদ এই যে—বিশ্বের অঙ্গ ও মুখ ঈশ্বর রচিত, এবং তৈজসের ইন্দ্রিয় দেবতা বিষয়রূপ ত্রিপুটী ও মূর্দ্ধাদি অঙ্গ মনোময়। তৈজসের ভোগ সূক্ষ্ম। যদিও সুখ দুঃখ জ্ঞানের নাম ভোগ এবং সেই ভোগ বিষয়ে স্থূলতা ও সূক্ষ্মতা কখন সম্ভবেনা, তথাপি বাহ্যশব্দাদি বিষয়ের সম্বন্ধ হইতে যে সুখ অথবা দুঃখ প্রতীতি তাহাকে স্থূল কহে, এবং মানস শব্দাদি সম্বন্ধে যে ভোগ, তাহাকে সূক্ষ্ম কহে। এই হেতু শ্রুতিতে বিশ্ব স্থূলভোক্তা * ও তৈজস সূক্ষ্ম ভোক্তা † কথিত হইয়াছে। তৈজস ভোগ্য যে শব্দাদি তাহা মনোময়, সুতরাং সূক্ষ্ম। বিশ্বভোগ্য বাহ্য শব্দাদি স্থূল। বিশ্ব বহিঃপ্রজ্ঞ ও তৈজস অন্তঃপ্রজ্ঞ। বিশ্বের অন্তঃকরণরূপ প্রজ্ঞা বহির্ম্মুখ হয়, তৈজসের নহে।

## তৈজস, হিরণ্যগর্ভ ও উকারের অভেদ চিন্তন।

যেরূপ বিশ্ব ও বিরাটের অভেদ সেইরূপ তৈজস ও হিরণ্যগর্ভের অভেদ। তৈজস হিরণ্যগর্ভরূপ। কারণ তৈজসের সূক্ষ্ম উপাধি, আর সেই সূক্ষ্মই হিরণ্যগর্ভের উপাধি। সুতরাং উভয়ের একত্ব জানিবে। উভয়ের একত্ব জানিয়া ওঁকারের দ্বিতীয় মাত্রা উকার হইতে তাহাদের অভেদ চিন্তা করিবে। কারণ আত্মার দ্বিতীয় পাদ তৈজস, ব্রহ্মের দ্বিতীয় পাদ হিরণ্যগর্ভ এবং ওঁকারের দ্বিতীয় মাত্রা উকার। তিনেরই দ্বিতীয় পাদ সমান ধর্ম্ম। সুতরাং, তিনের একত্ব চিন্তা করিবে।

## প্রাজ্ঞ ঈশ্বর ও মকারের প্রভেদ।

প্রাজ্ঞ ঈশ্বররূপ। কারণ, প্রাজ্ঞের কারণ উপাধি, এবং ঈশ্বরেরও কারণ উপাধি। ঈশ্বর ব্রহ্মের তৃতীয় পাদ, প্রাজ্ঞ আত্মার তৃতীয় পাদ, এবং মকার ওঁকারের তৃতীয় পাদ। তিনেরই তৃতীয় পাদ সমান ধর্ম্ম। সুতরাং, তিনের একতা জানিবে। সুতরাং তিনের একত্ব চিন্তা করিবে। এই প্রাজ্ঞ প্রজ্ঞান ঘন (অর্থাৎ, বিবিধ বস্তুর বিবিধ জ্ঞান ঘনীভূত হইয়া তাঁহাতে বিদ্যমান)। কারণ, জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থার যত জ্ঞান, সুষুপ্তি অবস্থায় ঘনীভূত এক অবিদ্যা-

* স্থূল ভুক। † প্রবিবিক্ত ভুক্ সূক্ষ্ম বিষয়ভোগী।

রূপ হইয়া যায়। এইহেতু প্রজ্ঞানঘন কহে। শ্রুতি কহে এই প্রাজ্ঞ* আনন্দভুক। কারণ, অবিদ্যা দ্বারা আবৃত আনন্দ ভোগ করে। এই প্রাজ্ঞ চেতোমুখ কারণ, জ্ঞানই ইঁহার মুখ বা অনুভবদ্বার। চৈতন্য প্রতিবিম্ব সহিত অবিদ্যাবৃত্তি অধ্যাত্ম, অজ্ঞান আবৃত স্বরূপ আনন্দ অধিভূত, এবং ঈশ্বর অধিদৈব।

এই রীতিতে বিশ্ববহিঃপ্রজ্ঞ, তৈজস অন্তঃপ্রজ্ঞ, এবং প্রাজ্ঞ প্রজ্ঞানঘন। এই ভেদ উপাধিগত। বিশ্বের স্থূল, সূক্ষ্ম ও অজ্ঞান—এই তিন উপাধি। তৈজসের, সূক্ষ্ম ও অজ্ঞান—এই দুই উপাধি, এবং প্রাজ্ঞের এক অজ্ঞান উপাধি। এই রীতিতে তিনের উপাধিগত ভেদ, পরমার্থস্বরূপে ভেদ নাই।

বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ—এই তিনের অনুগত চৈতন্য—পরমার্থে ঐ তিনের উপাধিসম্বন্ধ রহিত। ঐ ত্রয়ের অধিষ্ঠান তুরীয়। সেই তুরীয় বহিঃপ্রজ্ঞ নহেন, অন্তঃপ্রজ্ঞ নহেন, উভয়প্রজ্ঞ নহেন, ও প্রজ্ঞানঘন নহেন। তিনি কর্ম্মেন্দ্রিয় বা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় নহেন, বুদ্ধির বিষয় নহেন, কোন শব্দেরও বিষয় নহেন। তিনি "শান্তং শিবমদ্বৈতম্" - রাগদ্বেষাদিরহিত, মঙ্গলময়, অদ্বৈত। তাঁহাকে পরমাত্মার চতুর্থপাদ ঈশ্বরসাক্ষীশুদ্ধ ব্রহ্মরূপ বলিয়া জানিবে।

## ওঁকার ও আত্মার অভেদ চিন্তন।

এই রীতিতে আত্মার দ্বিবিধ স্বরূপ কথিত হয়—(১) পরমার্থ-রূপ, (২) অপরমার্থরূপ। বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ এই পাদত্রয় অপরমার্থরূপ, এবং চতুর্থপাদ তুরীয় পরমার্থরূপ। সেইরূপ ওঁকারেরও দ্বিবিধ স্বরূপ। অকার, উকার, মকার—এই মাত্রাত্রয় অপরমার্থরূপ এবং এই মাত্রাত্রয় ব্যাপক অস্তিভাতি-প্রিয়রূপ অধিষ্ঠান চৈতন্য পরমার্থরূপ। ওঁকারের পরমার্থরূপকে শ্রুতিতে অমাত্র বা মাত্রাশূন্য বলা হইয়াছে। কারণ পরমার্থস্বরূপ বিষয়ে মাত্রা বিভাগ নাই। সুতরাং, অমাত্র কহে। এই রীতিতে দ্বিবিধ স্বরূপ ওঁ ও দ্বিবিধ স্বরূপ আত্মার অভেদ জানিবে।

---

* এই প্রাজ্ঞই সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্যামী, সকলের উৎপত্তিস্থান (যোনি), এবং সর্ব্বভূতের উদ্ভব ও লয়ের কারণ।

ব্যষ্টি ও সমষ্টি স্থূলপ্রপঞ্চ সহিত বিশ্ব ও বিরাট আত্মার হইতে অভিন্ন জানিবে। আত্মার পাদমধ্যে বিশ্ব আদি; ওকারের মাত্রা মধ্যে অকার আদি, সুতরাং উভয়কে এক জানিবে। সূক্ষ্ম প্রপঞ্চ সহিত হিরণ্যগর্ভরূপ তৈজসকে উকাররূপ জানিবে। তৈজস দ্বিতীয় পাদ, উকার ও দ্বিতীয় মাত্রা; সুতরাং উভয়কে এক জানিবে। কারণ, উপাধি সহিত ঈশ্বররূপ প্রাজ্ঞ'ক মকাররূপ জানিবে। ঈশ্বররূপ প্রাজ্ঞ তৃতীয় পাদ, মকারও তৃতীয় মাত্রা; সুতরাং উভয়কে এক জানিবে। এই পাদত্রয়ে অনুগত পরমার্থরূপ তুরীয়। সেই তুরীয় ওঁকারের মাত্রাত্রয় অনুগত, পরমার্থরূপ অমাত্র হইতে অভিন্ন। যেমন, বিশ্বাদিবিষয়ে তুরীয় অনুগত, সেইরূপ অকারাদি মাত্রাত্রয়ে অমাত্র অনুগত। সুতরাং, ওঁকারের অমাত্ররূপ ও তুরীয় এক বলিয়া জানিবে। এই রীতিতে আত্মার পাদ ও ওঁকারের মাত্রার একত্ব জানিয়া লয় চিন্তা করিবে।

সেই লয়চিন্তন কহিতেছি—বিশ্বরূপ অকার, তৈজসরূপ উকার হইতে ভিন্ন নহে, পরন্তু উকাররূপ। এই চিন্তাকেই এস্থলে লয়চিন্তা বলা হইতেছে। এইরূপই অন্তমাত্রা বিষয়ে জানিবে। উকারে অকারের যে লয় কথিত হইল, সেইরূপ তৈজসরূপ উকার প্রাজ্ঞরূপ মকার বিষয়েও লয় হয়। প্রাজ্ঞরূপ মকার, তুরীয়রূপ ওঁকারের পরমার্থরূপ অমাত্রে লীন হয়। কারণ স্থূলের উৎপত্তি ও লয় সূক্ষ্ম হইয়া থাকে সুতরাং তৈজসরূপ উকারে বিশ্বরূপ অকারের লয় সম্ভবে। সূক্ষ্মের উৎপত্তিও লয় কারণে হয়। সুতরাং, প্রাজ্ঞরূপ মকারে, তৈজসরূপ উকারের লয় সম্ভবে। মকার তুরীয়রূপ অমাত্রে লীন হয়। সেই তুরীয় ব্রহ্মস্বরূপ। শুদ্ধ ব্রহ্ম বিষয়ে, ঈশ্বর ও প্রাজ্ঞ এই উভয়ই কল্পিত। যাহা যে বিষয়ে কল্পিত, তাহা সে বিষয়ের স্বরূপ। সুতরাং, তুরীয়ে ঈশ্বরসহিত প্রাজ্ঞরূপ মকারের লয় সম্ভব। এই রীতিতে ওঁকারের পরমার্থস্বরূপ অমাত্রে সকলের লয় চিন্তা করিবে। "সেই আমি—সোঽহম্" একাগ্রচিত্ত হইয়া এইরূপ চিন্তা করিবে। স্থাবর জঙ্গমরূপ, এবং অসঙ্গ, অদ্বয়, অসংসারী, নিত্যমুক্ত, নির্ভয় ব্রহ্মরূপ যে ওঁকারের পরমার্থস্বরূপ "তাহাই আমি" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে জ্ঞানের উদয় হয়। ইহাই জ্ঞানদ্বারা মুক্তিফলদাতা ওঁকারের নির্গুণ উপাসনা। ইহাই সকলের শ্রেষ্ঠ।

## ওঁকার চিন্তনে পরমহংসের অধিকার।

পূর্ব্বরীতিতে যিনি ওঁকারের স্বরূপ জানেন, তিনি মুনি। যিনি না জানেন, তিনি মুনি নহেন। যিনি মনন করেন, তাঁহাকে মুনি কহে। ওঁকারের এইরূপ চিন্তন মননরূপ। মাণ্ডূক্য অনুসারে ওঁকারের চিন্তন সংক্ষেপে কহিলাম। নৃসিংহ তাপিনী আদি উপনিষদে ওঁকার চিন্তনের এই প্রকারই উক্ত হইয়াছে। এই ওঁকার চিন্তন পরমহংসগণের গোপ্যধন। ইহাতে বহির্ম্মুখ পুরুষের অধিকার নাই। অতি অন্তর্ম্মুখ পুরুষেরই অধিকার। ইহাতে গৃহস্থের অধিকার নাই, ধনপুত্রস্ত্রীসঙ্গাদিরহিত পরমহংসেরই অধিকার।

---

# সাধন—পন্থা।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

( ১৫ )

জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণ জগতের শিক্ষকরূপে অবস্থিত আছেন; তাঁহারা মহা সাধন পথের পথ-প্রদর্শক, এবং মানবের আদি ও প্রধান উপদেষ্টা।

ইহাতে এমন বুঝা উচিত নয় যে তাঁহারা আপামর সকল মানবকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। সমস্ত মানবের উন্নতি তাঁহাদিগের লক্ষ্য হইলেও তাহাদিগের সকলের সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎসম্বন্ধ হইতে পারে না। কেবল যাঁহারা সাধারণ মানব অপেক্ষা অধিকতর উন্নত হইয়াছেন, ও বৈধধর্ম্ম সাধন করিতে করিতে মানব সমাজের শীর্ষস্থানে উপনীত হইয়াছেন—তাহাদিগেরই ভার তাঁহারা স্বহস্তে গ্রহণ করেন এই শিষ্যবৃন্দকে তাঁহারা শিক্ষা দিতে থাকেন ও মাঝে মাঝে তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া লন। তাঁহাদিগের এই শিষ্য-সম্প্রদায়ই লক্ষ উপায়ে জগতের সাহায্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। যখন যা যেখানে যেইরূপ কার্য্য আবশ্যক তাঁহারা তাহাই করিতে থাকেন।

( ১৬ )

মনুষ্য জীবাদির প্রতি দেবতাদিগের ব্যবহার চিরকাল সমভাবে আছে।

তাঁহারা ভগবানের ইচ্ছা সিদ্ধ করিতে নিবিষ্টচিত্ত। তবে আমরা সাধারণতঃ তাঁহাদিগকে দেখিতে পাই না; তাঁহাদিগের অস্তিত্বে ও কার্য্যে যাহাদিগের প্রবল বিশ্বাস আছে কেবল তাহারাই তাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষগোচর করিতে পারে। আমরা নির্ব্বুদ্ধিতা, অহমিকা ও অজ্ঞানতা বশতঃ অনেক সময়ে তাঁহাদিগের কার্য্যে অন্তরায় হই, কিন্তু, তাহাতে যে দেব-উদ্দেশ্য অসিদ্ধ থাকে তাহা নয়। তাঁহারা মানবের বাধা ও প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন সেই সুদূর অতীতে বিশ্বাসপূর্ণ ভক্ত মানবেরা যেরূপ তাঁহাদিগকে নয়নগোচর করিয়া, তাঁহাদিগের শান্তিপূর্ণ ও পবিত্র মূর্ত্তি দেখিয়া বিমল সুখ পাইত কর্ম্মদোষে আমরা তাহা হইতে এখন বঞ্চিত, দেবতারা আমাদিগের নিত্য সহচারী ও প্রত্যেক জগৎ ব্যাপারে অপার্থিবের লীলামাধুর্য্য চলিতেছে—এ বিশ্বাস ও জ্ঞান পূর্ব্বের মত আর আমাদিগকে আশায় ও সাহসে পূর্ণ করে না। আমরা ভাবি সমস্ত কার্য্যের আমরাই কর্ত্তা; মানবের জীবনমৃত্যুর উপর মানবের শাসন অপ্রতিহত; দেশের অশান্তি ও রাষ্ট্রের উপপ্লব নিবারণ মানবকরায়ত্ত এই ভ্রমাত্মক ধারণাই আমাদিগকে নিরাশার বিপুল অন্ধকারে নিক্ষেপ করে শক্তিশালী অত্যাচারীর উৎপীড়নে আক্রান্ত হইয়া আমাদিগের ক্ষুদ্র শক্তির প্রতি দৃষ্টি করিয়াই ভাবি যে এ উৎপীড়ন প্রশমিত হইতে পারে না। আমরা একবারও ভাবিনা যে যত্তপি আমরা উপযুক্ত হই তাহা হইলে কোথা হইতে দৈব-শক্তি আসিয়া দুর্ব্বলকেও শক্তিশালী করিয়া দিবে, আসুরিক শক্তিকে বিধ্বস্ত করিবে। মানব হইতে ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গাদি কাহারও মৃত্যু দেবতা ব্যতীত অপরের দ্বারা সাধিত হইতে পারেনা; যখন তাহার বর্ত্তমান দেহের কার্য্য ফুরাইয়া আসে, অমনি একজন দেবতা আসিয়া তাহার দেহ হইতে তাহাকে মুক্ত করিয়া দেয়—আমরা দেখি সে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইল। দুর্ভিক্ষ মহামারী ইত্যাদি দেশের অকল্যাণের মূলেও দেবতার ক্রীড়া। দেশবাসীর সমবেত কর্ম্মদোষে প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ হয়, এবং তাহার ফলেই দেবতা দ্বারা দেশের এইরূপ অনিষ্ট সাধিত হয়। আমরা কোনও আর্ত্তকে বা পীড়িতকে শান্ত করিয়া মনে করি উহা আমাদিগের কার্য্য; কিন্তু কে ভাবে যে দেবতাই আমাদিগের দ্বারা তাঁহার কার্য্য সাধন করিয়া লইলেন, আমরা

কেবল নিমিত্তকারণ। এই রূপেই সর্ব্বস্থানেই তাঁহারা কার্য্য করিতেছেন। আমরা যাহা জড় প্রকৃতির ক্রীড়া দেখি সেখানেও দেবতার লীলা। প্রত্যেক ঘটনাই মায়াবগুণ্ঠন,—তাহার ভিতরে একজন দেবতা অন্তর্নিবিষ্ট। আমরা দেবতা দেখিনা—মায়া দেখি।

( ১৭ )

এটী যেন মনে থাকে, তোমার জীবনের সমস্ত অবস্থাতেই দেবতারা তোমার নিকটে অবস্থান করেন। এমন কিছু কর্ম্ম তোমার দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারেনা যাহা তাঁহাদিগের স্মৃতি হইতে কোন সময়ে মুছিয়া যাইতে পারে। বিপদে বা সম্পদে পড়িয়া তুমি যে আবেদন করনা কেন, তাহা তাঁহারা জানিতে পারেন।

তবে অনেক সময়ে আমাদিগের কাতর প্রার্থনা তাঁহারা শুনিতে পান না কেন? বিপদে নিরাশ হইয়া যখন মহা উদ্বেগে প্রাণের মর্ম্মতল হইতে ডাকি "হে দেব তুমি কোথায়, আমাকে উদ্ধার কর," কই তখন কেহত আসিয়া তাঁহার অভয় হস্ত বাড়াইয়া দেন না? যে বিপদের আশঙ্কা করিতেছিলাম তাহা আসে এবং চিরতরে হৃদয়কে শ্মশান করিয়া চলিয়া যায়। ইহার অর্থ কি? এই যে বিপদের কথা উল্লেখ করিলাম—এই যে দুঃখের আঘাতের কথা বলিলাম, তাহা আমার অবস্থার পক্ষে বিশেষ আবশ্যকীয়। তাঁহারা ইহার ভবিষ্যৎ ফল কত সুখময় বুঝিয়াছিলেন তাহাই আমাদিগের প্রার্থনায় কোনও মনোযোগ করেন নাই। চিকিৎসক রোগীর প্রাণ বাঁচাইতে তাহার গাত্রে অস্ত্রের যন্ত্রণাদায়ক আঘাত করেন; রোগীর ক্রন্দন বা কাতরনিবেদন গ্রাহ্য করেন না। কেন? তিনি জানেন যে এই অস্ত্রের আঘাতে বর্ত্তমানে তাহার কিছু যন্ত্রণা হইবে সত্য, কিন্তু তাহার ফলে রোগীর প্রাণ বাঁচিবে। চিকিৎসকের এই কর্ম্ম তাঁহার দয়া প্রণোদিত না, তাঁহার নিষ্ঠুরতা-জ্ঞাপক? যে সমস্ত অবশ্যম্ভাবী বিপদ ও দুঃখ আমাদিগের আসে, তাহা যদ্যপি আমরা বীরের মত সহ্য করিয়া ভাবি, যে "আমাদিগের কর্ম্ম-ঋণ পরিশোধ হইতেছে" এবং তাহাতে গুরুদেব ও ভগবানকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে পারি, তাহা হইলে দেখিব আমরা সাধন-পথের দিকে অতি দ্রুত অগ্রসর হইতেছি।

ভবিষ্যতে আমাদিগকে পূর্ণবিয়ব মানব হইতে হইবে, চিরকাল দুগ্ধপোষ্য শিশু হইয়া থাকিলে চলিবে না। ভগবানের পুত্র আমরা "মমৈবাংশ"— শ্রেষ্ঠ মানব জন্ম অবলম্বন করিয়া অবস্থিত আছি। মানবদেহই পুরুষ প্রকৃতির সমর-ক্ষেত্র। এই দেহ-মন্দিরেরই অপর নাম ব্রহ্মপুর। "দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্‌ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ"ঃ মুণ্ডক ২২।৭। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে, আমরা কি দেখিতে পাই? প্রথমে—ভূত সৃষ্টি হইল; তাহার পর দেবতা সৃষ্টি হইল, তাহার পর ভগবান তাঁহার মানস হইতে কতকগুলি দেহ সৃষ্টি করিয়া দেবতাদিগকে তাহা আশ্রয় করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা সেই সমস্ত দেহ অধিকার করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তাঁহারা বলিলেন আমরা এই দেহ আশ্রয় করিতে পারিব না। অবশেষে যখন মানবদেহ সৃষ্টি করিলেন দেবতারা সানন্দে বলিয়া উঠিলেন "কি সুন্দর আকৃতি, আমরা ইহাতে প্রবেশ করিব, আমরা ইহাতে বাস করিব।" এই শ্রেষ্ঠ মানবদেহ ধারণ করিয়া চিরকাল দুর্ব্বল শিশুস্বভাব আশ্রয় করিয়া থাকিলে চলিবে না। বীর্য্যবান শক্তিশালী হইয়া সমস্ত শক্তি লইয়া ভগবানের সেবা করাই আমাদিগের লক্ষ্য হওয়া উচিত। আমরাও সকল দেবতার কার্য্যে যেন সহায়তা করিতে পারি। আমাদিগের অভিব্যক্তি কোন দিকে? আমরাও তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া ভবিষ্যৎ ব্রহ্মাণ্ড শাসন করিতে পারিব বলিয়া। দুর্ব্বল ও ভীরুস্বভাব কি পূর্ণভাবে সেবা করিতে পারে? সেই জন্য শক্তি ও শক্তির প্রবর্ত্তক জ্ঞান-চর্চ্চার আবশ্যক, তাঁহার শক্তি দিয়া তাঁহারই সেবা—আমরা ত ক্রীড়নক ব্যতিত আর কিছুই নই ভাই। তাহা না করিয়া পার্থিব সুখে বা আত্মবঞ্চণা করিয়া বৃথা সময় অপব্যবহার করিয়া থাকি। কল্পের পর কল্প চলিয়া যাইবে, আমরা মোহবশে অচ্ছন্ন থাকিয়া বালকের মত নশ্বর ক্রীড়ায় আত্মহারা হইয়া থাকিব। নিজে ইচ্ছা না করিলে, তিনি জোর করিয়া আমাদিগকে উন্নত করিবেন না। করুণাময় তিনি কত সুযোগ আনিয়া দিতেছেন, হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিলেই আমাদিগের প্রাণ তাঁহার করুণা-সলিলে সিক্ত করিয়া সহজে পবিত্র জীবসেবায় আত্মোৎসর্গ করিতে পারিলেই উন্নতি আপনা হইতেই আসিবে। কিসে উন্নতি হইবে—কিসে

উন্নতি হইবে বলিয়া গুরুর উদ্দেশে ছুটাছুটি করিলে উন্নতি হয় না—ভ্রমাত্মক উন্নতির মোহে আচ্ছন্ন হইয়া থাকা হয় মাত্র। গুরু বাহিরে নাই—তাঁহার স্থান আত্মমন্দিরে। মন্দির উৎসর্গের দ্বারা পবিত্র হইলেই তাঁহার দর্শনলাভ হয়। বাহিরে গুরু অন্বেষণ বা বাহিরের শিক্ষায় আত্মবঞ্চণা হয় মাত্র। ভাই, সেবাই জীবনের সার কর। জ্ঞান চর্চা বা আত্মোন্নতির আবশ্যক তাঁহাকে সেবা করিতে পারিবে বলিয়া এটা যেন মনে থাকে। (ক্রমশঃ)

জনৈক বিদ্যার্থী।

---

# অলৌকিক ঘটনা।

সোরাপুর রাজ্য হাইদ্রাবাদের দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে ঐ রাজ্য নিজাম রাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বিদ্রোহীদলভুক্ত হইবার অপরাধে ঐ রাজ্যের রাজার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইয়াছিল। কিন্তু পরে প্রাণদণ্ডাজ্ঞার পরিবর্তে তাঁহার চিরনির্ব্বাসনের আজ্ঞা প্রদত্ত হয়। ইহাতে তিনি অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া গুলির দ্বারা আত্মহত্যা করেন। ঐ সোরাপুর রাজ্যের তৎকালিক কমিশনার কর্ণেল মেডস টেলর সাহেব একটী অদ্ভুত গল্প বলিয়াছিলেন। সেই গল্পটী নিম্নে যথাযথ বিবৃত হইল।

গল্পটী এই—সিপাহীবিদ্রোহের অব্যবহিত পূর্ব্বে ৪ সংখ্যক হাই-ল্যাণ্ডার সৈন্যদলের প্রধান কাপ্তেন এক দিন শিবির মধ্যে বসিয়া লিখিতে-ছিলেন, শিবিরের এক দিক অনাবৃত ছিল। অকস্মাৎ তাঁহার (কাপ্তেনের) দলভুক্ত জনৈক যুবক হাঁসপাতালের পোষাক পরিধান করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বলিল "মহাশয়, আমি ইচ্ছা করি আপনি আমার বাকী বেতন দেশে আমার মাতার নিকট পাঠাইয়া দিবেন। আমার মাতা অমুক (অপ্রকাশিত) স্থানে বাস করেন। অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনি তাঁহার ঠিকানা লিখিয়া লউন।" কাপ্তেন যন্ত্রবৎ ঠিকানাটী লিখিয়া লইলেন এবং বলিলেন—"ভাল, এই হইলেই চলিবে।" এই কথা শুনিয়া আগন্তুক যুবক চলিয়া গেল। কিন্তু সৈনিকগণ নিয়মমত সাহেব কাপ্তেনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে এবং সাক্ষাৎ করিয়া ফিরিয়া যাইবার সময় যেরূপ অভিবাদন করিতে হয় সে তাহা কিছুই করে নাই। কিছুক্ষণ পরে এই বিষয় কাপ্তেনের মনে উদয় হইল—তিনি ভাবিলেন, নিশ্চয় ঐ সৈনিক যে বেশে ও যে ভাবে আমার নিকট আসিয়াছিল তাহা সামরিক নিয়মের বিরুদ্ধ। তিনি বিস্মিত হইয়া সৈন্যদলের সার্জ্জেণ্টকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। সে আসিয়া উপস্থিত হইলে কাপ্তেন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন তুমি প্রাইভেট—অমুককে (নাম অপ্রকাশিত) নিয়মবিরুদ্ধ বেশে ও নিয়মবিরুদ্ধভাবে আমার নিকট আসিতে দিয়াছিলে?" প্রশ্ন শুনিয়া সার্জ্জেণ্ট বজ্রাহতের ন্যায় দণ্ডায়মান

সাহেব। কিছুক্ষণ পরে বলিল,—"আপনি কি শুনেন নাই যে, সে [illegible] হাঁসপাতালে মরিয়া গিয়াছে আর আজ সকালে তাহার সমাধি হইয়াছে। আপনি কি নিশ্চয় তাহাকে দেখিয়াছেন?"- উত্তর হইল—"নিশ্চয়ই"। এই দেখ আমি তাহার মাতার ঠিকানা লিখিয়া রাখিয়াছি—এই ঠিকানায় সে তাহার বাকী বেতন পাঠাইয়া দিতে বলিয়া গিয়াছে। ইহা শুনিয়া সার্জ্জেণ্ট বলিল ইহা বড় অদ্ভুত ব্যাপার। আজ তাহার তৈজস পত্রাদি নিলাম করিয়া বিক্রয় করা হইল, আমরা রেজিষ্টার বহি অনেক অনুসন্ধান করিলাম, কোন ঠিকানা দেখিতে পাইলাম না—কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না বিক্রয়ের টাকা কোথায় প্রেরিত হইবে। যাহা হউক, পরে প্রমাণিত হইল যে, মৃত ব্যক্তি কাপ্তেনকে যে ঠিকানা লিখাইয়া গিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ সত্য। ইহা শুনিয়া সৈন্যদলের প্রত্যেকেরই মনে প্রেত যোনি সম্বন্ধে একটা বিশেষ ধারণা জন্মিয়াছিল।

শ্রীমনোমোহন ঘোষ।

## স্বর্গীয় কৃষ্ণধন।

*নিদারুণ মর্ম্মবেদনার সহিত পাঠকবর্গকে জানাইতেছি যে পন্থার* অন্যতর সম্পাদক, পাঠকের চিরপ্রিয়, সুধাবর, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় ইহজগতে আর নাই। গত মাসে দ্বারবঙ্গে প্লেগে আক্রান্ত হইয়া তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে পন্থা যে কি ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে তাহা পাঠককে আর বুঝাইতে হইবে না। তাঁহার গভীর ভাবপূর্ণ অথচ সুললিত প্রবন্ধ সকল যিনি পাঠ করিয়াছেন তিনি তাঁহার প্রতিভার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই প্রতিভালোকে আলোকিত "পন্থা" আজ দশ বৎসর ধরিয়া বহুবাসনা-বিজিত বিষয়-কূপগত জীবকে সান্ত্বনা দান করিয়া আসিতেছিল। আর আমরা সে মধুময় ভাবোচ্ছ্বাসে আর্ত্তের হৃদয়ক্ষেত্র প্লাবিত করিতে পারিব না। যে মধুর বংশীরবে তাহাদিগের তৃষিত আত্মার চরিতার্থতা সম্পাদিত হইবে কৃষ্ণধন তাহার মূল তথ্য অবগত হইয়াছিলেন। তবে যে মঙ্গল ময়ের রাজ্যে চিরপ্রীতিময় স্থানের অন্বেষণেই আমরা এই পন্থা আশ্রয় করিয়াই চলিয়া আসিতেছি, আমাদের প্রিয় কৃষ্ণধন এই নশ্বর জগৎ ত্যাগ করিয়া সেই স্থানেই চলিয়া গিয়াছেন। তিনি তথায় বসিয়া আমাদের প্রিয় "পন্থায়" প্রীতি প্লাবিত করুন। সেই প্রীতি নিষেবিত হইয়া এই পন্থার পথিক, আশার আলোকে পুলকিত হউন।

ওঁ

# পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ।

১১শ ভাগ | চৈত্র, ১৩১৪ সাল। | ১২শ সংখ্যা।

## চৈতন্য কথা।

### পরিণামবাদ।

ব্রহ্মসূত্র। প্রথম অধ্যায়।

চতুর্থ পাদ—সপ্তম অধিকরণ সূত্র ২৩ ২৭।

ব্রহ্ম যে এই জগতের কেবলমাত্র নিমিত্ত কারণ তাহা নহে। তিনি এই জগতের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ।

রামানুজস্বামী বলেন, এই অধিকরণ দ্বারা সেশ্বর সাংখ্যবাদের খণ্ডণ করা হইয়াছে। সেশ্বর সাংখ্যবাদী ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁহাদের মতে ঈশ্বর ব্যতিরিক্ত "প্রধান" পদার্থ আছে। এবং ঈশ্বরাধিষ্ঠিত প্রধান হইতে জগতের সৃষ্টি হয়। সপ্তম অধিকরণ দ্বারা ঐ মতের নিরাকরণ হয়।

সূত্রাংশোক্ত সূত্রে স্পষ্টতঃ বলা হইয়াছে, এই জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম। শঙ্করাচার্য্য এস্থলে চুপ্। তিনি পরিণামের খণ্ডণ করিতে কিছুমাত্র প্রয়াস করিলেন না।

এই সূত্র অবলম্বন করিয়া রামানুজ বলেন—"সর্ব্বেষু বেদান্তেষু পরিণামোপদেশঃ"। চৈতন্যদেবেরও এই মত।

এই সূত্রের ভাষ্যে রামানুজস্বামী অতি সুন্দর, অতি অপূর্ব্ব পরিণামের হৃদয়গ্রাহী বিবরণ দিয়াছেন সেই বিবরণ পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"পরিণামে কি দোষ? পরব্রহ্মের পরিণাম বলিলে কি পরব্রহ্ম দোষযুক্ত হইলেন? আমি ত বলি তাঁহার নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ হইল।

দেখ, দেখ, পরিণামের কি স্বরূপ! অবাধ হেয় প্রত্যনীক, একতান কল্যাণ, স্বেতর সমস্ত বস্তু বিলক্ষণ, সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসঙ্কল্প অবাপ্ত সমস্তকাম অনবধিক অতিশয়ানন্দ, পরব্রহ্ম। তাঁহার লীলার উপকরণভূত সমস্ত চিৎ অচিৎ বস্তুজাত তাঁহার শরীর এবং তিনি সকলের আত্মা ব্রহ্মের শরীরভূত এই প্রপঞ্চ যখন প্রলয়কালে তন্মাত্র অহঙ্কারাদি কারণ পরম্পরায় যথাক্রমে লীন হয়, তখন তমঃ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। এই তমঃ অতি সূক্ষ্ম অচিৎ বস্তু। সেই তমঃ ক্রমশঃ এত আত্যন্তিক সূক্ষ্ম হয়, যে তখন তাহাকে পরব্রহ্মের শরীর বলিয়া পৃথক্ নির্দ্দেশ করা চলে না। তমঃ তখন পরব্রহ্মের সহিত একতাপন্ন হয়। তথাভূত তমঃশরীর ব্রহ্ম এইরূপ সঙ্কল্প করেন, যে আমি পূর্ব্বের ন্যায় বিভক্ত নাম রূপ হইব। চিৎ, অচিৎ রূপ আবার আমার মিশ্র প্রপঞ্চ শরীর হইবে। ক্রম অনুসারে তখন সকল পদার্থের উৎপত্তি হয়। এবং ব্রহ্ম তখন জগৎ শরীররূপ আপনার পরিণাম সাধন করেন।"

দু একটি কথার পরিবর্ত্তন করিয়া আমরা এই চিত্র চৈতন্যদেবের পক্ষ হইতে গ্রহণ করিতে পারি

"চিৎ"কে প্রপঞ্চ আমরা কিছুতেই বলিব না। চিৎ ও অচিৎকে আমরা শরীর না বলিয়া পরা প্রকৃতি ও অপরা প্রকৃতি বলিব। এবং তাঁহার সূক্ষ্মতম তমঃ পদার্থে আমরা শুদ্ধ সত্ত্ব দেখিতে পাই না। পরব্রহ্ম যখন স্বরূপে অবস্থিতি করেন, তখন এই শুদ্ধ সত্ত্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হন্ না। ভক্ত যখন

ত্রিগুণময়ী মায়ার সীমা অতিক্রম করেন তখন তিনি শুদ্ধ সত্ত্বময় হন্। শুদ্ধসত্ত্ব নিত্য, অবিকারী। যদি রামানুজের সূক্ষ্মতম "তমঃ" বিকারী হয়, তাহা হইলে সে তমঃ শুদ্ধ সত্ত্ব নহে। যদি রামানুজের তমঃ অনিত্য হয়, তাহা হইলে শুদ্ধ সত্ত্ব তমঃ নয়। তাহা হইলে চৈতন্যদেবের শুদ্ধ সত্ত্ব রামানুজের "তমঃ" হইতে অতীত পদার্থ। রামানুজের কল্পনায় 'শুদ্ধসত্ত্ব' নাই।

রামানুজ তমঃ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সুবালোপনিষদের বাক্য উদ্ধৃত করেন—"পৃথিবী অপ্সু প্রলীয়তে আপস্তেজসি লীয়ন্তে তেজো বায়ৌ লীয়তে বায়ুরাকাশে লীয়তে আকাশমিন্দ্রিয়েষু ইন্দ্রিয়াণি তন্মাত্রেষু তন্মাত্রাণি ভূতাদৌ লীয়ন্তে ভূতাদির্মহতি লীয়তে মহানব্যক্তে লীয়তে অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে অক্ষরং তমসি লীয়তে তমঃ পরে দেবে একীভবতি।"

বৃহদারণ্যক শ্রুতির আলোচনা করিয়াও রামানুজ বলেন অব্যক্ত অক্ষরে লীন হয়, অক্ষর তমঃ পদার্থে লীন হয়।

"যেকালে তমঃ 'অবিভাগাপত্তি' দশা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যখন পরব্রহ্মের সহিত একীভূত হয় তখনও চিৎ ও অচিৎ বস্তু সর্ব্বকর্ম্মসংস্কাররূপে অতি সূক্ষ্মভাবে অবস্থিতি করে।" রামানুজ।

"পরমাত্মা চিৎ ও অচিতের সংঘাতরূপ জগদাকারে পরিণত হন্। পরমাত্মার শরীরভূত চিৎ অংশে দুঃখ ও পরিচ্ছেদরূপ অপুরুষার্থ সকল অবস্থিতি করে। এবং বিকার সকল অচিৎ অংশগত। পরমাত্মার এইমাত্র কার্য্য যে তিনি চিৎ ও অচিৎ এ উভয়ের নিয়ন্তারূপে আত্মা। চিৎ ও অচিতের আত্মা হইলেও চিৎ ও অচিৎগত অপুরুষার্থ ও বিকার পরমাত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না। পরমাত্মা অপরিচ্ছিন্ন, জ্ঞানানন্দময় ও সর্ব্বদা একরূপ। জগতের পরিবর্ত্তন তাঁহার লীলা।" রামানুজ।

পরিণামের এই চিত্র অতি সুন্দর। অল্প পরিবর্ত্তনের সহিত এই চিত্র পৌরাণিক সাহিত্যের সাধারণ সম্পত্তি।

অপুরুষার্থময় চিৎ ভাগবত পুরাণে জীব-অদৃষ্ট বা কর্ম্ম। বিকারময় অচিৎ ঐ পুরাণে স্বভাব।

অদৃষ্ট, স্বভাব ও কাল লইয়া ভাগবত পুরাণের সৃষ্টি। পৌরাণিক কথায়

আমি ইহা দেখাইয়াছি। চৈতন্যদেবের শিক্ষা ভাগবত মূলক। তাঁহার পরিণামের চিত্রও ভাগবত মূলক।

তবে এই চিত্রে তাঁহার শুদ্ধসত্ত্ব নাই।

রামানুজ যাহা দেখাইতে পারেন নাই, ভাগবতে যাহা অনুভবে জানিতে হয়, বিষ্ণুপুরাণ যাহা ইঙ্গিতে দেখাইয়াছেন, চৈতন্যদেব সেই শুদ্ধসত্ত্বের তত্ত্ব বিষদরূপে আপনার ভক্তদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন।

এই শুদ্ধসত্ত্ব "তম" পদার্থেরও অতীত, নিত্য, শুদ্ধ, অধিকারী। সৃষ্টির প্রবাহে, প্রলয়ের নিরোধে সেই তত্ত্বের বিকার হয় না। তাই শুদ্ধসত্ত্বময় ভাগবতগণও নিত্যশুদ্ধ, অবিকারী।

আমরা ব্রহ্মসূত্রের বিচারে এক এক করিয়া দেখিব, ইহাতে শুদ্ধ সত্ত্বের কোন আভাস আছে কি না।

অষ্টম অধিকরণ সূত্র ২৮।

"এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতা."

পরমাণুবাদ আদি অন্য সকল মত, যাহাতে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ জগতের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, উপর উক্ত সূক্তি দ্বারা নিরাকৃত হইল।

প্রথম অধ্যায়ের এইখানে শেষ হইল।

এইবার দ্বিতীয় অধ্যায়ের পর্য্যালোচনা করিব।

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

---

## আদর্শ ও ধর্ম্ম।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর। )

আমরা শাস্ত্রের কোন স্থানে দেখি "স্বর্গকামো যজেত" অর্থাৎ স্বর্গকামী হইয়া যাগ যজ্ঞ করা কর্ত্তব্য। আবার স্থানান্তরে পাই—"ত্রৈগুণ্য বিষয়াঃ বেদাঃ নিস্ত্রৈগুণ্যঃ ভবার্জ্জুন,' অর্থাৎ বৈদিক যাগ যজ্ঞে মোক্ষ হয় না, অতএব উহা ত্যাগ কর। কোন স্থানে দেখি "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ," আবার হয়ত সেই পুস্তকেরই অন্য স্থানে পশুহত্যার বিরাট ব্যবস্থা দেখিতে পাই "যজ্ঞার্থং

পশবো সৃষ্টাঃ" অতএব এই যজ্ঞে এতগুলি পশুবধ করিতে হয় ইত্যাদি। অষ্টাঙ্গযোগ অভ্যাস করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে "যম" অভ্যাস করা চাই। এই যম কি? অহিংসা সত্য অস্তেয় ( অচৌর্য্য ), ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ। অহিংসা কি? বাক্য, মনঃ কিংবা শরীরের দ্বারা কোন জীবকে কষ্ট না দেওয়া। অর্থাৎ কোন জীবকে হত্যা করা দূরে থাক্, তাহাকে কষ্ট দেওয়াও অবিধি। আবার মনুসংহিতাতে দেখিতে পাই, শজারু, গোশাপ, গণ্ডার, উষ্ট্র প্রভৃতির মাংসও ভক্ষ্য। নারদভক্তিসূত্রে দেখি "স্ত্রীধননাস্তিকবৈরি চরিত্রং ন শ্রবণীয়ম্।" অর্থাৎ পাছে মনে কাম লোভ প্রভৃতির উদ্রেক হয় সেইজন্য স্ত্রী, ধনী ও শত্রু প্রভৃতির গল্পও শুনিবেন না। এবং জিতেন্দ্রিয়, ঊর্দ্ধরেতাঃ না হইলে উচ্চ সাধনা অসম্ভব একথা নানাস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। অথচ গার্হস্থ্য ও ধর্ম্ম এবং "ঋতুকালাভিগামীস্যাৎ স্বদারনিরতঃ সদা। পর্ব্ববর্জ্জং ব্রজেৎ চৈনাং তদ্‌ব্রতো রতিকাম্যয়া॥" অর্থাৎ যে ব্যক্তি কেবল নিজের স্ত্রীতে রত থাকে এবং পর্ব্বদিন বাদ দিয়া গমন করে সেই ধার্ম্মিক। আপাত দৃষ্টিতে শাস্ত্রের নানাস্থানে এইরূপ বিরোধ ও বিসম্বাদিতা দৃষ্ট হয়। কিন্তু যদি আমরা স্মরণ রাখি যে সকল মানব সমোন্নত নয় বলিয়াই শাস্ত্র বিভিন্ন অধিকারীর জন্য বিভিন্ন ধর্ম্ম নিরূপিত করিয়াছেন, তাহা হইলে আর বিরোধ থাকে না,—সকল গোলযোগ মিটিয়া যায়।

আর্য্যজাতির অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে যে জাতির আধিপত্য ছিল তাঁহাকে থিওসফিষ্টগণ Theosophists ) চতুর্থ জাতি বলিয়াছেন ইহারা জড়বাদিত্ব ( mateairlism ) এবং পার্থিব লালসার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। কি উপায়ে দেহের ও ইন্দ্রিয়ের সুখ পরিবর্দ্ধিত হয়, কি প্রকারে অপরের উপর প্রভুত্ব লাভ করিতে পারে, এই চিন্তা ও চেষ্টাতেই তাহারা অহরহ ব্যাপৃত থাকিত। নিজের দেহের সুখ হইলেই হইল, অপরের জন্য চিন্তা ক্ষণমাত্র তাহাদের মনে উদিত হইত না। পরের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াও যদি নিজ সুখের সম্ভাবনা থাকে, তাহারা তাহাতেই আনন্দ পাইত। তাহারা এইরূপ ঘোর স্বার্থপর, ইন্দ্রিয়াসক্ত ও অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিল যে পুরাণে তাহারা "অসুর," "রাক্ষস" ইত্যাদি শব্দে অভিহিত হইয়াছে। এই জাতির মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত ভাল তাহাদিগকে বাছিয়া লইয়া মনু

পঞ্চম জাতি বা আর্য্যজাতির প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিন্তু তখনও ইহাদের প্রবৃত্তি অসংযত, বাসনা বিশ্বগ্রাসিনী। ইন্ধন পাইয়া ইহা ক্রমশঃ বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল। যিনি লক্ষপতি তাঁহার কোটিপতি হইবার ইচ্ছা হইতেছিল, যিনি শত রমণীর সম্ভোগ করিতেছিলেন, সহস্র রমণীর জন্য তাঁহার বাসনানল জ্বলিতেছিল, যিনি একদেশ বা নগরের অধিপতি তিনি সাম্রাজ্যের আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া মনু ভাবিলেন "ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব পুনরেবাভিবর্দ্ধতে॥" উপভোগে বাসনা মিটিবেনা, সংযম চাই। কিন্তু কিরূপ সংযম? এ অবস্থায় তাহাদিগকে ব্রহ্মজ্ঞান বা পরাভক্তির উপদেশ দেওয়া বাতুলতা মাত্র। ইহা বুঝিয়াই ঋষিগণ বলিলেন "আচ্ছা, তোমরা সুন্দরী রমণী চাও। পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী হইতে লক্ষগুণ সুন্দরী রমণী পাইবে। ইহাদিগের নাম অপ্সরাঃ। সেইরূপ আহার বিহার, বসন ভূষণ, প্রভাব প্রতিপত্তি, যশঃ মান প্রভৃতি পৃথিবীতে যে পরিমাণে দেখিতে পাও, তাহা অপেক্ষা সহস্র সহস্র গুণ অধিক পাইবে, কিন্তু যজ্ঞ করিতে হইবে।"

এই যজ্ঞের উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়- ত্যাগশিক্ষা। ইহাই সংযমের সূত্রপাত। অমুক দিন উপবাস বা অর্দ্ধাশন করিতে হইবে, অমুক অমুক মাংস খাইতে পারিবে, পরিণীতা স্ত্রী ব্যতীত যে কোন রমণীকে উপভোগ করিতে পারিবে না ইত্যাদি বিধি নিষেধ নিবদ্ধ হইল। যে সকল ব্যক্তি যখন যাহা ইচ্ছা তখন তাহা খাইত, যে স্ত্রীকে ইচ্ছা করিত তাহার সহিতই রমণ করিত, তাহারা স্বর্গভোগ কামনায় অল্পে অল্পে দেহ-পীড়ন ও ইন্দ্রিয় সংযম অভ্যাস করিতে লাগিল। "ইহলোকে দান করিলে পরলোকে শতগুণ পাইব" ইহা ভাবিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু কিছু দান করিতে লাগিল। অমুক পর্ব্বে বা তিথিতে মৎস্য মাংস মৈথুন ত্যাগ করিলে, অমুক দিনে বা বারে অমুক দ্রব্য না খাইলে, অমুক পর্ব্বে সুপাত্রে দান করিলে প্রভূত পুণ্য সঞ্চিত হইবে এবং তৎফলে এতকাল স্বর্গবাস নিশ্চিত। "ভাল তাহাই যদি হয়, দেখা যাগ্‌না কেন, এতো সামান্য ত্যাগ স্বীকার মাত্র" এই ভাবিয়া তাহারা ঐরূপ করিতে লাগিল। এই প্রকারে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা সংযমের দ্বারা, ঘোর স্বার্থপরতা ত্যাগের দ্বারা ধীরে ধীরে দমিত হইতে

লাগিল। এই জন্যই বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা। গৃহস্থের প্রতি পঞ্চ যজ্ঞের বিধি আছে। "অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞঃ তু তর্পণং। হোমো দৈবো বলিঃ ভৌতঃ নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনং॥ এই পঞ্চ যজ্ঞের উদ্দেশ্য কি? সংযম ও ত্যাগ শিক্ষা। কিন্তু এখনও তাহার সকল কর্ম্মই সকাম, সে যাহা কিছু করে, সমস্তই স্বর্গভোগ কামনায়।

এইরূপে কর্ম্ম করিতে করিতে ক্রমশঃ তাহার সত্ত্বগুণের বিকাশ হয়। সে ভাবে "ইন্দ্রিয় সুখ ক্ষণস্থায়ী ও চপল। পার্থিব বিভব ও ঐশ্বর্য্য, ইহারাই বা কতদিন থাকিবে? মরিলেই সব ফুরাইবে। স্বর্গসুখ তীব্র ও দীর্ঘকালস্থায়ী বটে, কিন্তু তাহারও তো শেষ আছে, পুণ্যক্ষয়ে মর্ত্ত্যলোকে আসিতে হইবে। অতএব এই অনিত্য সুখের জন্য এত লালায়িত হই কেন? এই তুচ্ছ সুখের জন্য কত পরিশ্রম, কত আয়াস, কত ক্লেশই নিত্য সহিতেছি। কিন্তু ইহার ফল কি পাইতেছি? সুখ তো তদ্দণ্ডেই নিঃশেষিত হইতেছে, কিন্তু ইহা যে বাসনা-বহ্নিকে জ্বালাইয়া দিতেছে, তদ্দ্বারা সংসারে পুনঃ পুনঃ গতায়াত এবং তজ্জনিত দুঃখ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিতেছে।" এইরূপ অধিকারীকে লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ বলিয়াছেন "যে হি সংস্পর্শজাঃ ভোগাঃ দুঃখযোনয় এবতে। আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ।" সকাম কর্ম্ম করিতে করিতে যখন জীবের পূর্ব্বোক্তরূপে সত্ত্বগুণের বিকাশ হইতে থাকে, যখন জ্ঞান ও বৈরাগ্যের উন্মেষ হইতে আরম্ভ হয় তখনই সে গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্মযোগ বা জ্ঞানযোগ বা ভক্তিযোগ প্রভৃতি উচ্চ সাধনের উপযুক্ত অধিকারী হইতে পারে। বেদান্তের অধিকারী এইরূপে নিরূপিত হইয়াছেন,—অধিকারীতু বিধিবদধীতবেদবেদাঙ্গত্বেন আপাততোঽধিগতাখিলবেদার্থঃ অস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্যনিষিদ্ধবর্জ্জনপুরঃসরং নিত্যনৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তোপাসনানুষ্ঠানেন নির্গত নিখিল কল্মষতয়া নিতান্তনির্ম্মলস্বান্তঃ সাধনচতুষ্টয় সম্পন্নঃ প্রমাতা।

অর্থাৎ যিনি মোটামুটি বেদবেদাঙ্গ জানেন স্বর্গসাধনোপোযোগী কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, মহাপাতক প্রভৃতি ত্যাগ করিয়াছেন, নিত্য ও নৈমিত্তিক কার্য্য, প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনা দ্বারা যাঁহার চিত্ত শুদ্ধ ও নির্ম্মল হইয়াছে, যিনি বিবেক বৈরাগ্যাদি সম্পন্ন এবং যিনি তত্ত্বজ্ঞ তিনিই অধিকারী।

কি কামী, কি নিষ্কামী, কি কর্ম্মী, কি জ্ঞানী, কি ভক্ত—সকল শ্রেণীর ব্যক্তির জন্য হিন্দুধর্ম্মে বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা আছে। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের গৌরব। মানব জাতির শৈশবাবস্থা হইতে উন্নতির চরমসীমা পর্য্যন্ত যত প্রকার আদর্শ হইতে পারে, যতদিন মানব মানব থাকিবে (অর্থাৎ দেবতা কিংবা কোন উচ্চতর জীবে পরিণত না হইবে) ততদিন তাহার যত প্রকার ধর্ম্ম সম্ভব, হিন্দুধর্ম্মে তৎ সমুদায়ই আছে। এইজন্য হিন্দুধর্ম্মকে সমগ্র মনুষ্যজাতির ধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। ভগবান্ যীশু প্রেমের ও ক্ষমার যে উচ্চতম আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করা দূরের কথা কয়জন খ্রীষ্টান সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন? তাঁহার ত্যাগ, বৈরাগ্য, ভক্তি ও প্রেম উচ্চ অধিকারীর পথ নির্দ্দেশ করে এবং কেবল এক শ্রেণীর মানবের (ভক্ত দিগের) উপযোগী। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞান পিপাসু, কোন বিষয় না বুঝিয়া বিশ্বাস করিতে চান না, তাঁহারা বাইবেলে অবিশ্বাসী হইয়া ক্রমশঃ নাস্তিক হইয়া পড়িতেছেন। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে বাইবেলে সকল শ্রেণীর উপযোগী ধর্ম্ম নাই অথবা থাকিলেও তাহা এরূপ প্রচ্ছন্ন যে সাধারণের বোধগম্য হয় না।

সে যাহা হউক, আমরা দেখিলাম জীবের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আদর্শ যেমন উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে থাকে, তাহার ধর্ম্মেরও পরিবর্ত্তন হয়। ধর্ম্ম একটা নিত্য বস্তু নহে। যতদিন তাহার মায়িক সত্ত্বা (Phenomenal existenc) থাকে ততদিন তাহার আদর্শও থাকে ধর্ম্ম ও থাকে। যখন "সোঽহং" জ্ঞানের উদয়ে সমস্ত দ্বৈত তিরোহিত হইয়া যায়, তখন আদর্শও থাকে না, ধর্ম্মও থাকে না।

শ্রীমাখন লাল রায় চৌধুরি

# মানবের ইতিবৃত্ত।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

১৩। প্রথম মহাদেশ ( শ্বেতদ্বীপ বা জম্বুদ্বীপ )। প্রথম মৌলিকজাতি ("ছায়া" জাতি )।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পুরাণাদিতে 'দ্বীপ" শব্দ নানর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কোন কোন স্থানে এইশব্দ আমাদের বিশ্বের সমস্ত গ্রহকে বুঝায়। আবার কোন কোন স্থলে এই শব্দে পৃথিবীর সপ্ত মহাদেশকে বুঝায়। সপ্তদ্বীপ, অর্থাৎ ক্রমজাত ও ক্রমবিনাশ প্রাপ্ত সপ্ত মহাদেশ।

এক এক মৌলিক জাতির অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এক একটী মহাদেশ জাত হয়। আবার এই জাতির সঙ্গে সঙ্গে এই মহাদেশটী ও নানা নৈসর্গিক উৎপাতে ধ্বংস প্রাপ্ত ও পরিণামে মহাসমুদ্রগর্ভে বিলীন হইয়া যায়। পরে অপর মহাদেশ ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে অপর এক মৌলিক জাতির আবির্ভাব হয়

প্রথম মহাদেশের নাম শ্বেতদ্বীপ ( জম্বুদ্বীপ ) এবং প্রথম জাতির নাম "ছায়া" জাতি।

যখন পূর্ব্বোক্ত ভীষণ উৎপাত অবসান হইল, তখন পৃথিবী মানব জাতির বাসোপযোগী হইয়াছে কিনা তাহা উক্ত শ্রেণীর পিতৃগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। এত দিন কদাকার জীবের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহারা বিলুপ্ত হইল। প্রবল জলপ্লাবনে তাহারা ভূপৃষ্ঠ হইতে বিধৌত ও সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইল। পৃথিবী তখন জীবশূন্যাবস্থায় অসীম ঈষদুষ্ণ জলরাশিতে পরিপূর্ণ হইয়া রহিল। এই অনন্ত জলরাশির নিম্নে দৃঢ় মৃত্তিকা। তখন পৃথিবীর মাত্র একদিকে জলের উপরিভাগে স্থল দৃষ্টিগোচর হইল। ইহা সুমেরু পর্ব্বতের শৃঙ্গ। ইহা উত্তর মেরুর শিরোদেশের উষ্ণীষ স্বরূপ। ইহা অমর রাজ্যের আরম্ভ বা সূত্রপাত্র মাত্র। এই অমর রাজ্যকে পুণ্য পবিত্রধাম, দেবপুরি, শ্বেতদ্বীপ, অথবা মধ্যদেশ বলা হয়। কখন কখন ইহাকে জম্বুদ্বীপও বলা হইয়া থাকে। এই শ্লোকোক্ত

২

নামে সমগ্র পৃথিবীও আহৃত হয়। এই পবিত্র দেশে পার্শী জাতির ধর্ম্মবীর মহাত্মা যারাথুষ্ট্রা Zarathustra ) জন্মগ্রহণ করেন। ইহা প্রকৃত কথা। পার্শীগণ এই দেশকে আর্য্যান ভেইজো ( Airyana Vaejo ) বলেন। মেরু পর্ব্বত বাস্তবিকই পৃথিবীর মেরুদণ্ড স্বরূপ। যদিও ইহা উত্তর মেরুতে আবির্ভূত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার মূলদেশ প্রকৃত পক্ষে হিমালয় পর্ব্বতের নিহিত। এই হিমালয় পর্ব্বত পৃথিবীর মেখলা স্বরূপ। পৃথিবী তখন ঈষদুষ্ণ অম্বুরাশিতে আবৃত ছিল এই জলরাশির তরঙ্গায়িত বীচিমালা ভেদ করিয়া বর্ণিত স্থলভাগ আস্তে আস্তে মস্তকোত্তোলন করিল। সপ্তপর্ণবিশিষ্ট পদ্মের সপ্তপর্ণের ন্যায় সপ্ত অন্তর্দ্বীপ বিশিষ্ট কথিত দেশ আবির্ভূত হইল। এই সপ্ত অন্তর্দ্বীপের কেন্দ্র মেরু পর্ব্বত। এই মেরু পর্ব্বত সহ সপ্ত অন্তর্দ্বীপই অমর রাজ্য। এই অমর রাজ্যে প্রত্যেক মৌলিক মানব জাতিকেই পর্য্যায়ক্রমে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। অথবা জাত হওয়ার পরে তথায় নীত হইয়া থাকে। ধ্রুব নক্ষত্রের অধিপতির নাম ধ্রুব। এই ধ্রুবের অধীনে প্রত্যেক মৌলিক মানবজাতিই এই শ্বেতদ্বীপে জন্মলাভ করে। ব্রহ্মার একদিন অর্থাৎ প্রত্যূষ হইতে প্রদোষকাল ব্যাপিয়া এই ধ্রুব নক্ষত্র মানবজাতির তত্ত্বাবধান ব্যপদেশে তাহাদের উপর শুভদৃষ্টি করিয়া থাকেন। এই দেশ পারিপার্শ্ব লোকে পূর্ণ হয় ও তাহাতে কুসুমাকর মধুর বসন্ত ঋতু চির বিরাজমান থাকে। চার শ্রেণীর সোম পিতৃগণ মানব রূপ জন্মধারণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। বর্হিষদ পিতৃগণ এই অমর রাজ্যে বস বাস করার জন্য অবতরণ করিয়া সূক্ষ্ম ঈথার (আকাশ নির্ম্মিত দেহ হইতে এক একটী ছায়া বাহির করিলেন। এই ছায়াতে জীবন বীজ নিহিত রহিল, কাল সহকারে তাহা মানবদেহে পরিণত হইল। এই ছায়া দেহ অতি প্রকাণ্ড, সূক্ষ্ম, স্ত্রীপুরুষ চিহ্ন রহিত, ফাঁকা ( ঠোল ) ভূতরূপে নভোমণ্ডলে ও সমুদ্রোপরি ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

তাহারা শশীর ন্যায় ঈষৎ হরিদ্রাভ শুভ্রবর্ণ বিশিষ্ট, অতি প্রকাণ্ড, অস্পষ্ট অথচ পরিবর্ত্তনশীল আকার বিশিষ্ট, তাহাতে ভাবী মানবদেহের বীজ নিহিত ছিল। পূর্ব্বে পূর্ব্বে মন্বন্তরাদিতে এই বীজ পিতৃগণ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কথিত আছে পিতৃগণ সাতভাগে বিভক্ত। এক এক

বিভাগ শ্বেতদ্বীপের এক একটী অন্তরীপ করিয়া সপ্তান্তরীপে বাস করিতে লাগিলেন। তাহারা মনবজাতির স্থূল দেহ নির্ম্মাতা।

পিতৃগণের ছায়া দেহ হইতে এই যে পুরুভুজ সদৃশ ( Protista-like ) জীব সমূহ আবির্ভূত হইয়াছে, তাহারাই আদিম মানবজাতি। এই বিকটাকার, অতি প্রকাণ্ড ছায়া গুলিকে কেন মানুষ বলা হয়? তাহাদের আকার এত অস্পষ্ট যে কোন নির্দ্দিষ্ট আকার আছে বলিয়াই যেন অনুমান হয় না। তবে তাহাদিগকে মানুষ বলে কেন? তাহারা কি মানব নামের যোগ্য? মাতৃগর্ভে ভ্রূণকে মানব ভ্রূণ বলা হয় কেন? ভ্রূণ মানব না হইলেও ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতে ইহা ভবিষ্যতে মানবরূপে পরিণত হয়, এবং মানবরূপ ভিন্ন ইহা অন্য কোন রূপে পরিণত হইতে পারে না বলিয়াই ইহাকে মানব ভ্রূণ বলে। সেই প্রকার কথিত ছায়ারূপ মনুষ্যাকার বিশিষ্ট না হইলেও ইহাতে মানব জীব অধিষ্ঠিত, অর্থাৎ যে জীব ইহাতে অধিষ্ঠান করিতেছে তাহা আভ্যন্তরিক ভাবে মানব জাতির প্রকৃতি ও অবস্থালাভ করিয়াছে, এ জন্যই বাহ্যাকারের প্রতি দৃকপাত না করিয়া আভ্যন্তরিক জীবনের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বলা হয় যে ইহা মানব জাতি এবং ইহা ভবিষ্য মৌলিক জাতি সমূহের ভিত্তি স্বরূপ।

এই প্রকাণ্ড ছায়ারূপ গুলি সংজ্ঞাশূন্যাবস্থায় ইতস্ততঃ চলিয়া বেড়াইত। অতি ক্ষীণ, দুর্ব্বল ও অপরিস্ফুট ভাবে তাহাদের মাত্র শ্রবণ শক্তি ছিল। তাহারা কেবল অগ্নির অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিত। অপর কোন বস্তুর অস্তিত্ব টের পাইত না। তজ্জন্য তাহাদের চৈতন্য কোন রূপ কার্য্যকারী ছিল না।

তাহারা দাঁড়াইতে, হাটিতে ( ভ্রমণ করিতে ), দৌড়িতে, উপবেশন করিতে, এমন কি, আকাশে পর্য্যন্ত উড়িতে পারিত, তথাপি তাহারা সংজ্ঞা-হীন ছায়া মাত্র। বহিরঙ্গভাবে সূর্য্য এই মানব জাতির অধিষ্ঠাতা গ্রহ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গুহ্যগ্রহ ইউরেনাস্ (uranus)ই এই জাতির অধিষ্ঠাতা। বাহ্যজগতে সূর্য্য এই গ্রহের প্রতিনিধি।

খণ্ড খণ্ড রূপে বিভাগের দ্বারা ও বিকাশের দ্বারা তাহাদের বংশবৃদ্ধি হইত। বর্ত্তমানে স্ত্রীপুরুষের সংসর্গ ব্যতীত সন্তান জাত হয় না, কিন্তু এই

প্রথম মৌলিক জাতির সন্তান সন্ততি এই নিয়মে জাত হইত না। বর্ত্তমান যুগে ইহা ধারণার এবং কল্পনারও অতীত। পুরুভুজের সঙ্গে তাহাদের বেশ সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য আছে। পুরুভুজকে খণ্ড খণ্ড করিলে যেমন এক এক খণ্ড, একএকটী পৃথক পৃথক পুরুভুজে পরিণত হয়, ঠিক সেই রূপে এই জাতির লোক সংখ্যাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত। আবার এই খণ্ড গুলি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তাহারা আবার নানা খণ্ডে বিভক্ত হইয়া এক এক ক্ষুদ্র খণ্ড একএকটী জীবে পরিণত হইত। এইরূপে অসংখ্য জীবের সৃষ্টি হইত। এই প্রথম মানব জাতিতে উপবিভাগ নাই। তবে তাহাদের মধ্যে সপ্তাবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা কেহই মরিত না। অগ্নি কিম্বা জল কিছুই তাহাদিগকে বিনাশ করিতে পারিত না। অগ্নি তাহাদের বসবাসের স্বাভাবিক পদার্থ ছিল, তাহারা অগ্নিতে দগ্ধ হইত না, বা উত্তপ্ত হইত না। তাহারা জলের আস্তত্ব আদৌবই টের পাইত না। তাহাদের দেহ ১১৫ একশ পোনের হাত পরিমিত দীর্ঘ ছিল।

(ক্রমশঃ)

মঙ্গল সেবক।

---

# কস্তুরিপ্রকরণ।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

সিদ্ধাঞ্জনং জনিতযোগিজনপ্রভাবং
ভাবং বদন্তি বিদুষাং নিবহা নবীনং
সিদ্ধো ভবেন্মনসি সন্নিহিতে যদস্মিন্
পশ্যন্ জগন্তি মনুজো জগতা মদৃশ্যঃ। ৩১।

বিদুষাং ( পণ্ডিতানাং ) নিবহাঃ ( সমূহাঃ ) জনিত যোগিজন প্রভাবং ( জনিতঃ উৎপন্নঃ যোগিজনানাং প্রভাবঃ মাহাত্ম্যং যেন সঃ তং ) ভাবং নবীনং ( অভিনবং ) সিদ্ধাঞ্জনং ( সিদ্ধকজ্জলং ) বদন্তি ( কথয়ন্তি ) যৎ যস্মাৎ হেতোঃ) অস্মিন্ ভাবে মনসি ( চিত্তে ) সন্নিহিতে ( অবলম্বিতে সতি ) সিদ্ধঃ ( সিদ্ধি-

প্রাপ্তঃ ) মনুজঃ ( মনুষ্যঃ ) জগন্তি ( ভুবনানি ) পশ্যন্ ( অবলোকয়ন্ ) অপি জগতাং ( ভুবনানাং ) অদৃশ্যঃ ( অনবলোকনীয়ঃ ) ভবেৎ ( স্যাৎ )। অঞ্জনস্য অক্ষিভূষণং তথাপি অত্র শ্লোকে অন্যোষাং দৃষ্টিবিঘাতকত্বে নোক্তং অতএবাস্যাঞ্জনত্বং অন্যথা অঞ্জন তুল গুণত্বে নবীনপদমনর্থকং স্যাৎ। ৩১।

পণ্ডিতেরা যোগি ব্যক্তির প্রভাব প্রকাশক ভাবকে নূতনতর সিদ্ধাঞ্জন বলিয়া থাকেন। যেহেতু ঐ ভাব হৃদয়ে অবলম্বন করিলে মনুষ্য সিদ্ধিলাভ করিয়া জগৎ অবলোকন করিলেও জগতের অদৃশ্য হইয়া থাকেন। ৩১।

অথ ক্রোধপ্রক্রমণং—

স্কন্ধো যুদ্ধ মহীরুহস্য কুমতেঃ সৌধোনিবন্ধোহংসাং
যোধো দুর্ণয়ভূপতেঃ কৃত কৃপারোধো ? প্ররোধো হৃদাং।
ব্যাধো ধর্ম্মমৃগে বধো ধৃতিধিয়াং গন্ধো বিপদ্বীরুধা
মন্ধো দুর্গতি পদ্ধতৌ সমুচিতঃ ক্রোধো বিহাতুং সতাং। ৩২।

সতাং ( সজ্জনানাং ) যুদ্ধমহীরুহস্য ( সমরবৃক্ষস্য ) স্কন্ধঃ ( শাখা সন্ধিস্থানঃ ) যুদ্ধে ক্রোধস্য সঞ্চারিত্বাদিতি ভাবঃ। কুমতেঃ ( কুবুদ্ধেঃ ) সৌধঃ ( প্রাসাদঃ ) আবাসত্বাদিতি ভাবঃ। অংহসাং ( পাপানাং ) নিবন্ধঃ ( গ্রহঃ ) দুর্ণয়ভূপতেঃ ( দুর্ণয়ঃ দুর্নীতিঃ স এব ভূপতিঃ রাজা তস্য ) যোধঃ ( যোদ্ধা ) দুর্ণয় সাহায্য কারিত্বাদিতি ভাবঃ। কৃত কৃপারোধঃ ( কৃতঃ কৃপায়াঃ দয়ায়াঃ রোধঃ নিবারণং যেন সঃ হৃদাং ( হৃদয়ানাং ) অপ্রবোধঃ ( অপ্রবোধকারণ ) ধর্ম্মমৃগে ধর্ম্মএব মৃগ, তস্মিন্ ) ব্যাধঃ ( লুব্ধকঃ ) ধৃতিধিয়াং ( ধৈর্য্যবুদ্ধীনাং ) বধঃ ( নাশকারণং ) বিপদ্বীরুধাং ( বিপদঃ আপদ এব বীরুধঃ লতা তাসাং গন্ধঃ ( আমোদঃ ) দুর্গতিপদ্ধতৌদুর্গতিবিপৎ সা এব পদ্ধতি মার্গস্তস্যাং ) অন্ধঃ, ক্রোধঃ কোপঃ ) বিহাতুং ( ত্যক্তুং ) সমুচিতঃ যুক্তঃ এতাদৃগনিষ্ট হেতুঃ ক্রোধঃ অবশ্যং ত্যক্তব্য ইত্যাশয়ঃ। ৩২।

যুদ্ধবৃক্ষের স্কন্ধ স্বরূপ কুমতির সৌধ স্বরূপ পাপের গ্রহ স্বরূপ, দুর্ণয় রূপ রাজার যোদ্ধাস্বরূপ, ধর্ম্মরূপ মৃগের ব্যাধস্বরূপ ধৈর্য্যবুদ্ধির বিনাশক বিপদরূপলতার গন্ধ সদৃশ দুর্গতি মার্গে অন্ধতুল্য দয়াবোধকারী হৃদয়ের অজ্ঞান-ক্রোধ সদ্ব্যক্তিমাত্রেরই পরিত্যাগ করা উচিত। ৩২।

বায়ুর্যথা জলমুচাং সমিধাং যথাগ্নিঃ
সিংহো যথা করটীনাং তমসাং যথার্কঃ।
হস্তী যথাবনিরুহাং পয়সাং যথোষ্ণঃ
শক্তস্তথা প্রশমনায় শমো রুষাণাম্॥ ৩৩॥

বায়ুঃ (পবনঃ) যথা জলমুচাং (মেঘানাং) অগ্নিঃ (বহ্নিঃ) যথা সমিধাং (কাষ্ঠানাং) সিংহঃ (কেশরী) যথা করটীনাং (হস্তিনাং) অর্কঃ (সূর্য্যঃ) যথা তমসাং (অন্ধকারাণাং) হস্তী (করী) যথা অবনিরুহাং (বৃক্ষানাং) উষ্ণঃ যথা পয়সাং (জলানাং প্রশমনায় (শান্ত্যৈঃ শক্তঃ সমর্থঃ) ভবতীতি শেষঃ। তথা শমঃ (শান্তগুণঃ রুষানাং (ক্রোধানাং) প্রশমনায় শক্তো ভবতি। ৩৩।

বায়ু মেঘের অগ্নি কাষ্ঠের সিংহ হস্তী সমূহের সূর্য্য অন্ধকারের হস্তী বৃক্ষ সমূহের এবং তেজ যেমন জলের প্রশম করিতে সমর্থ সেইরূপ শমগুণ ক্রোধের প্রশম করিতে সমর্থ। ৩৩।

(ক্রমশঃ)

---

# বিচার-সাগর।

## ওঁকার ধ্যান-ফল।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পূর্ব্ব প্রকারে ব্রহ্মরূপে ওঁকার ধ্যান জন্য জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। যাহার হৃদয়ে তীব্র বৈরাগ্য হয় নাই, পরন্তু ইহলোক অথবা ব্রহ্মলোকের ভোগকামনা প্রবল, সেই ব্যক্তি যদি সহসা কামনা রোধ করিয়া ধনপুত্রাদি ত্যাগে পরমহংস গুরু উপদেশ গ্রহণে ওঁকাররূপ ব্রহ্মধ্যান করে, তাহার ভোগ কামনা জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়। সুতরাং তাহার জ্ঞান হয় না। ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া দেহত্যাগ অনন্তর, তাহার অন্য শরীর প্রাপ্তি হয়। যিনি ইহলোকের ভোগ কামনা রোধ করিয়া ধ্যানে প্রবৃত্ত হন তিনি ভাগ্যবান পবিত্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, পূর্ব্বকামনার সকল ফল ভোগ করেন। এবং

জন্মান্তরের ধ্যান সংস্কার হইতে পুনরায় বিচার অথবা ধ্যানে প্রবৃত্ত হন। তদ্দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হন।

যিনি ব্রহ্মলোকের ভোগ কামনা বোধ করিয়া ওঁকাররূপ ব্রহ্ম ধ্যানে প্রবৃত্ত হন, তিনি দেহত্যাগে ব্রহ্মলোকে গমন করেন, এবং তথায় মনুষ্য পিতৃ দেব-দুর্লভ আনন্দ উপভোগ করেন। হিরণ্যগর্ভের সত্যসঙ্কল্পাদি যত বিভূতি সকলই তিনি প্রাপ্ত হন।

## ব্রহ্মলোক-মার্গক্রম।

ব্রহ্মলোক মার্গের ক্রম এই: যিনি ব্রহ্ম উপাসনায় তৎপর, যদিও মরণ সময়ে তাঁহার ইন্দ্রিয় অন্তঃকরণ আদি মূর্চ্ছিত হয় কোথাও যাইবার সামর্থ্য থাকে না ও তাঁহার লিঙ্গশরীর লইয়া যাইবার নিমিত্ত যমদূত নিকটে আসে না, কিন্তু সে সময় তাঁহার শরীর হইতে অগ্নি অভিমানী দেবতা বহির্গত হইয়া তাঁহাকে স্বধামে লইয়া যান। অগ্নিলোক হইতে দিন অভিমানী দেবতা আপন লোকে লইয়া যান। তথা হইতে তাঁহাকে শুক্লপক্ষ অভিমানী দেবতা স্বলোক লইয়া যান। তথা হইতে ষট্-মাস উত্তরায়ণ অভিমানী দেবতা তাঁহাকে নিজ ধামে লইয়া যান। তথা হইতে সম্বৎসর অভিমানী দেবতা তাঁহাকে লইয়া যান। তৎপরে দেবলোক অভিমানী দেবতা তাঁহাকে লইয়া যান। তৎপরে, বায়ু অভিমানী দেবতা তাঁহাকে লইয়া যান। তৎপরে, সূর্য্যদেব তাঁহাকে লইয়া যান। তৎপরে চন্দ্রদেব তাঁহাকে লইয়া যান। তৎপরে বিদ্যুৎ অভিমানী দেবতা তাঁহাকে লইয়া যান। সেই বিদ্যুল্লোকে হিরণ্যগর্ভের আজ্ঞায় হিরণ্যগর্ভবাসী দিব্যপুরুষ তাঁহাকে লইতে আসেন। সেই হিরণ্যগর্ভবাসী ও বিদ্যুৎ অভিমানী দেবতা সহিত সেই ব্রহ্ম উপাসক বরুণ লোকে গমন করেন। তৎপরে বরুণ লোক হইতে ইন্দ্রলোকে গমন করেন। বরুণদেব ইন্দ্রলোক পর্য্যন্ত হিরণ্যগর্ভবাসীও সেই ব্রহ্ম উপাসকের সহিত গমন করেন। ইন্দ্রলোক হইতে ইন্দ্রদেব সমভিব্যাহারে তাঁহারা প্রজাপতিলোকে গমন করেন। প্রজাপতি ব্রহ্মলোকে যাইতে সমর্থ না হন। সেই প্রজাপতি লোক হইতে সেই দিব্যপুরুষ ও ব্রহ্ম-উপাসক ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করেন। হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মলোকের অধিপতি। সূক্ষ্ম-সমষ্টি অভিমানী চৈতন্যকে হিরণ্যগর্ভ কহে, তাঁহাকেই কার্য্যব্রহ্ম কহে। কার্য্যব্রহ্মের নিবাসস্থান ব্রহ্মলোক।

## সাযুজ্য মোক্ষ বর্ণন।

শুদ্ধ ব্রহ্ম উপাসকের শুদ্ধ ব্রহ্ম প্রাপ্তি হওয়া উচিত। তথাপি জ্ঞান দ্বারাই শুদ্ধ ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। কামনারূপ প্রতিবন্ধক হেতু যাহার জ্ঞান হয় না, সেই ব্যক্তি কার্য্যব্রহ্মের সাযুজ্য * মোক্ষ লাভ করে। ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত উপাসকের হিরণ্যগর্ভ সমান বিভূতি লাভ হয়। তিনি সত্যসঙ্কল্প হন। যখন যে শরীরের ইচ্ছা করেন তখনই সেই শরীর প্রাপ্ত হন, যখন যে ভোগ কামনা করেন, তখনই সেই ভোগ পান এক সময়ে সহস্র শরীরে ভোগ ইচ্ছা করিলে তাহাই প্রাপ্ত হন। যাহা কিছু সঙ্কল্প করেন, তাহাই সিদ্ধ হয়। জগৎ সৃষ্টি পালন সংহার ভিন্ন ঈশ্বর সমান অন্য সমস্ত বিভূতিই প্রাপ্ত হন ইহাকেই সাযুজ্য মোক্ষ কহে। এইরূপে হিরণ্যগর্ভ সমান হইয়া বহুকাল সঙ্কল্পসিদ্ধ দিব্য পদার্থসমূহ ভোগ করিতে থাকেন। পরে প্রলয়কালে হিরণ্যগর্ভলোকের নাশ হইলে জ্ঞান দ্বারা বিদেহ মোক্ষপ্রাপ্ত হন।

## ওঁকারের অহংগ্রহ ধ্যান হইতেই ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি।

অহংগ্রহ ওকাররূপে ব্রহ্ম উপাসনা ব্যতীত অন্যবিধ উপাসনা দ্বারা ব্রহ্ম লোক প্রাপ্তি হয় না। ইহা সূত্র ও বার্ত্তিককার চতুর্থ অধ্যায়ে প্রতিপাদন করিয়াছেন। সর্ব্বদেবশ্বরের শিবরূপ ও শালগ্রামের বিষ্ণুরূপ ধ্যান প্রতীক, অহংগ্রহ নহে। মনকে ব্রহ্মরূপ ও আদিত্যকে ব্রহ্মরূপ ধ্যান ও প্রতীক, অহংগ্রহ নহে। ঐরূপ ধ্যান হইতে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয় না সগুণ, অথবা নির্গুণ ব্রহ্মকে আপন হইতে অভেদ চিন্তনকে অহংগ্রহ ধ্যান কহে। সেই অহংগ্রহ ধ্যান হইতেই ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়।

## উত্তরায়ণ মার্গদ্বারা ব্রহ্মলোক প্রবেশ করিলে পুনরায় আর সংসারে ফিরিতে হয় না।

পূর্ব্বকথিত মার্গকে উত্তরায়ণ মার্গ কহে। তাহা দেবমার্গ নামেও উক্ত হয়। সেই উত্তরায়ণ বা দেবমার্গ দ্বারা যিনি ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহাকে

---

* সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য—এই চারি প্রকার মুক্তি উক্ত হয়। তন্মধ্যে সাযুজ্য মুক্তিই শ্রেষ্ঠ।

আর সংসারে ফিরিতে হয় না। জ্ঞান লাভ করিয়া তিনি বিদেহ মুক্তি প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মলোকে গুরু উপদেশ আদি সাধন বিনাই জ্ঞান হয়। কারণ, তথায় তম অথবা রজোগুণের লেশমাত্র নাই সেই পবিত্র ধাম কেবল সত্ত্বগুণ প্রধান। সুতরাং, তথায় জড়তা, আলস্য,কাম,ক্রোধ আদি তম ও রজোগুণের কার্য্য নাই। তথায় কেবল সত্ত্বগুণ সত্ত্বগুণে ভরপূর। সুতরাং সেই দিব্য-লোকে জ্ঞানরূপ প্রকাশ প্রধান

অসার নির্ব্বিকার ব্রহ্মরূপ আত্মা হিরণ্যগর্ভবাসার প্রতীতি হয়।

ব্রহ্মরূপে ওঁকার উপাসনায় ওঁকার মাত্রার অর্থ এইরূপে চিন্তা করা হয়ঃ -"স্থূল উপাধি সহিত বিরাট বিশ্বচৈতন্য অকার বাচ্য। সূক্ষ্ম উপাধি সহিত হিরণ্যগর্ভ তৈজস চৈতন্য উকার বাচ্য। কারণ উপাধিসহিত ঈশ্বর প্রাজ্ঞ চৈতন্য মকার বাচ্য।" ব্রহ্মলোকে এই চিন্তার স্মৃতি জাগরূক হয়। সত্ত্বগুণ প্রভাবে এইরূপ বিবেচনা হয় যে স্থূল উপাধিহেতু চৈতন্যে বিরাট ও বিশ্বভাব প্রতীত হয়। স্থূল সমষ্টির সম্বন্ধে বিরাটভাব ও স্থূল ব্যষ্টির সম্বন্ধে বিশ্বভাব প্রতীত হয়। স্থূল সমষ্টি বা স্থূল ব্যষ্টির সম্বন্ধ বিনা বিরাট বা বিশ্বভাব প্রতীত হয় না সেইরূপ সূক্ষ্ম উপাধিসহিত হিরণ্যগর্ভ তৈজস চৈতন্য উকার বাচ্য। তথায়, সূক্ষ্ম সমষ্টি উপাধির সম্বন্ধে চৈতন্যে হিরণ্যগর্ভত্ব ও ব্যষ্টি সূক্ষ্ম উপাধি সম্পর্কে চৈতন্যে তৈজসত্ব প্রতীত হয়। সূক্ষ্ম উপাধির সম্বন্ধ বিনা প্রতীত হয় না সেইরূপ ঈশ্বর প্রাজ্ঞ মকার বাচ্য। তথায় সমষ্টি অজ্ঞান উপাধির সম্পর্কে চৈতন্যে ঈশ্বরত্ব ও ব্যষ্টি অজ্ঞান উপাধির সম্বন্ধ বিনা হয় না। অন্যের সম্বন্ধে যে বস্তু যদ্বিষয়ে প্রতীত হয়, পরমার্থে সেই বস্তু তদ্বিষয়ে থাকে না অন্যের সম্বন্ধ বিনা যে যাহার রূপ প্রতীত হয়, সে তাহার পরমার্থ রূপ। যেমন, এক পুরুষেই পিতার সম্বন্ধে পুত্রত্ব, পিতামহের সম্বন্ধে পৌত্রত্ব প্রতীত হয়। পুত্রত্ব বা পৌত্রত্ব পরমার্থে সেই পুরুষে নহে। পুরুষের ইহাই পরমার্থ। সেইরূপ, স্থূল সূক্ষ্ম কারণ উপাধি সম্পর্কে যে বিরাট বিশ্বাদিরূপ প্রতীত হয়, তাহা মিথ্যা, চৈতন্য নহে সত্য। সেই চৈতন্য সর্ব্বভেদ রহিত। কারণ, ব্যষ্টি উপাধিভেদে বিরাট ও বিশ্বের ভেদ। যদিও সেই উপাধি উভয়েরই স্থূল বটে, তথাপি বিরাটের সমষ্টি উপাধি ও বিশ্বের ব্যষ্টি

উপাধি। সুতরাং, স্বরূপতঃ ভেদ নাই। সেইরূপ, সমষ্টি ব্যষ্টি উপাধি ভেদে হিরণ্যগর্ভ ও তৈজসের ভেদ, স্বরূপতঃ নহে। সেইরূপ সমষ্টি ব্যষ্টি উপাধিভেদে ঈশ্বর ও প্রাজ্ঞে প্রভেদ, স্বরূপতঃ নহে। এইরূপে প্রাজ্ঞ ঈশ্বরে অভেদ, তৈজস হিরণ্যগর্ভে অভেদ, বিশ্ব বিরাটে অভেদ। এই প্রকারে স্থূল সূক্ষ্ম কারণ উপাধি যুক্তের ভেদ নাই। কারণ, স্থূল সূক্ষ্ম কারণ উপাধি সম্পর্ক ব্যতীত চৈতন্য স্বরূপ কোন প্রকার ভেদ প্রতীত হয় না। অনাত্ম হইতেও চৈতন্যের ভেদ নাই। কারণ, অবিদ্যাকালেই দেহাদি অনাত্মা প্রতীত হয়, পরমার্থ নহে। দেহাদিরও চৈতন্য হইতে ভেদ সম্ভবে না। এইরূপে সর্ব্বভেদরহিত, অসঙ্গ, নির্ব্বিকার, নিত্যমুক্ত, ব্রহ্মরূপ আত্মা ওঁকার লক্ষ্য স্বয়ম প্রকাশরূপ বলিয়া ব্রহ্ম উপাসকের প্রতীত হয়। এই হেতু, হিরণ্যগর্ভবাসীর পুনরায় সংসার প্রাপ্তি হয় না।

## ওঁ এবং মহাবাক্যের অর্থের একতা।

যদিও মহাবাক্যের বিবেক বিনা জ্ঞান হয় না, তথাপি ওঁকারের বিবেকই মহাবাক্যের বিবেক। স্থূল উপাধি সহিত চৈতন্য অকার বাচ্য, স্থূল উপাধি ত্যাগে চৈতন্য মাত্র অকার লক্ষ্য। সেইরূপ সূক্ষ্ম উপাধি সহিত চৈতন্য উকার বাচ্য, সূক্ষ্ম উপাধি ত্যাগে চৈতন্যমাত্র উকার লক্ষ্য। কারণ উপাধি সহিত চৈতন্য মকার বাচ্য, কারণ উপাধিত্যাগে চৈতন্যমাত্র মকার লক্ষ্য। এই রীতিতে উপাধি সহিত বিশ্বাদি অকারাদি মাত্রাবাচ্য। এবং উপাধি রহিত চৈতন্য সর্ব্বমাত্রার লক্ষ্য। সেইরূপ, নাম রূপ সকল উপাধি রহিত চৈতন্য ওঁকার ওকার বর্ণের লক্ষ্য। এই ওঁকার ও মহাবাক্য সমূহের অর্থ একই। সুতরাং ওঁকারের বিবেকে অদ্বৈত জ্ঞান হয়।

আচার্য্যমুখে এই উপদেশ পাইয়া অদৃষ্টি নামক মধ্যম শিষ্য উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া জ্ঞান দ্বারা পরম পুরুষার্থ মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

নির্গুণ উপাসনায় যাহাদের অধিকার নাই, তাহাদের বক্তব্য কথিত হইতেছে।

নির্গুণ এ ধ্যানে যার নাই অধিকার।
সগুণ ঈশ্বরে চিত্ত লউক তাহার॥

সগুণ ধেয়ানে যেবা নহেরে সক্ষম।
ভজুক শ্রীরাম করি নিষ্কাম করম॥
কর্ম্মফল তেয়াগিতে নারে যেই জন।
করুক সকাম শুভ কর্ম্মের সাধন॥
সকাম করম যেবা না পারে সাধিতে।
বারম্বার সেই শঠ আছেরে মরিতে॥ ১৬৯॥

শুনিয়া ওঁকার অর্থ,　　পাইল পরম অর্থ,
চরিতার্থ হইল অদৃষ্টি।
যে পড়ে তরঙ্গ এই,　　পায়রে সুমতি সেই,
দয়াময় দাতুর সুদৃষ্টি॥ ১৭০॥

ইতি শ্রীগুরু বেদাদিব্যবহারিক প্রতিপাদন ও মধ্যম
অধিকারী সাধন বর্ণন নাম পঞ্চম তরঙ্গ
সমাপ্ত।

---

# পরাবিদ্যা সমিতির তৃতীয় উদ্দেশ্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এই আদর্শ গুলি মনে রাখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে সমিতির তৃতীয় উদ্দেশ্য কি ভাবে গ্রহণ করা সুসঙ্গত তাহা দেখা যাউক আমরা যদি সমিতির অতীত ইতিহাসের কথা মনে করি তবে দেখিতে পাই যে ইহা প্রথমতঃ সিদ্ধি জাত অলৌকিক ঘটনাবলির (psychic phenomena) আলোচনার্থে স্থাপিত হইয়াছিল—স্পষ্টতই বুঝা যায় যে স্থাপয়িতাগণ এই ভাবেই জড়বাদের (materialism) প্রবল স্রোতের গতিরোধ করা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ হইবে মনে করিয়াছিলেন। ইহার প্রথম অবস্থায় 'ভ্রাতৃভাব' বলিয়া কোন শব্দ ছিল না, গুপ্ত অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা বলির (hidden mysteries) মূলানুসন্ধান এবং এমন কি অব্যক্ত গুপ্ত শক্তির (occult powers) বিকাশ করাই ইহার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল, এবং আমরা—"পুরাতন রোজ নামচার পাতা"

(Old Diary Leaves) নামক পুস্তকে দেখিতে পাই যে ইহার প্রথম অবস্থায় কিরূপে কয়েক জন সভ্য তাঁহারা যে সমস্ত শক্তিলাভ করিবেন আশা করিয়াছিলেন তাহা লাভ করিতে না পারাতে এবং যে সমস্ত অলৌকিক ঘটনা দেখিবার জন্য উৎসুক ছিলেন তাহা দেখিতে বঞ্চিত হওয়াতে সমিতির উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া সভাপদ ত্যাগ করিয়াছিলেন, এই অবস্থায় বোধ হয় স্থাপয়িতাগণ ক্রমে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধনের পন্থা অনুভব করিতেছিলেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহাদের কিছু করণীয় বিষয় আছে, তাঁহাদের একটী লক্ষ্য আছে যে লক্ষ্যে তাঁহাদিগকে পৌঁছিতে হইবে কিন্তু যে উপায়ে তাহা সাধন করিতে হইবে তাহা তাঁহাদিগকে নিজেই স্থির করিতে হইবে এবং স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে যে তাঁহাদের প্রথম চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয় নাই, সুতরাং সমিতি স্থাপনের কয়েক বৎসর পরে যখন স্থাপয়িতাগণ ভাবিতে আসিলেন তখন ইহার উদ্দেশ্য পুনর্ব্বার স্থিরীকৃত হইল। এবং তখন যে অবস্থায় উদ্দেশ্য গুলি বিধিবদ্ধ করা হইয়াছিল এখনও সেই ভাবে রহিয়াছে, তবে ভাষা দুই এক স্থানে সামান্য একটু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে মাত্র। ইহা পরেও অলৌকিক ঘটনা এবং অলৌকিক শক্তি ও সিদ্ধি লাভের চেষ্টা (phenomena and psychic investigation) ম্যাডাম ব্লাভাট্‌স্কির মৃত্যু পর্য্যন্ত সমিতির সামান্য অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হয় নাই, তাঁহার মৃত্যুর পরেও সম্পূর্ণ রূপে এ সমস্ত বিষয়ের অভাব ঘটে নাই কিন্তু ইহার প্রাথমিক অবস্থায় সমিতি কেবল উক্ত বিধি শক্তি ও সিদ্ধি লইয়াই ব্যস্ত ছিল এবং নির্ব্বুদ্ধিতা এবং প্রতারণার জন্য সমিতি সম্বন্ধে অনেকে ভুল বুঝিত, অনেকে সমিতিকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত অনেকে ইহার কুৎসা রটনা করিতেও বিরত ছিল না। বর্ত্তমান সময়ে নানা সমিতির দ্বারা বাহ্য ভূতাতীত অলৌকিক বিষয়াবলি (super physical phenomena) সম্বন্ধে এত অধিক অনুসন্ধান করা হইয়াছে যে যাহারা সভ্য জগতের পরিবর্দ্ধিত চিন্তা সমূহ (advance of thought) এবং জ্ঞানোন্নতির কোন সংবাদ রাখেন তাঁহাদের কেহই ঐ সমস্ত বিষয় অপ্রকৃত ঘটনা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিবেন না। এই পরিবর্দ্ধন এত অধিক হইয়াছে যে শ্রীমতী বেসান্ত বলিয়াছেন যে ভুবর্লোক (astral world) সম্বন্ধীয়

জ্ঞানে পরাবিদ্যা সমিতি অন্যান্য সমিতি অপেক্ষা পশ্চাতে পড়িয়া যাইতেছে এবং ঐ সমস্ত সমিতি পরাবিদ্যা সমিতির অগ্রগামী হইতেছে। পরাবিদ্যা সমিতির তৃতীয় উদ্দেশ্য ইহার সভাগণ অপেক্ষা অপরে সুন্দরতর রূপে সাধিত করিবে ইহা উক্ত সমিতির পক্ষে প্রশংসার কথা নহে। সুতরাং এ বিষয়ে সতর্কভাবে ভাবনা এবং সৎ বিচার করা আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে

আমার বোধ হয় আমরা অলৌকিক শক্তি ও সিদ্ধিলাভের চেষ্টাকে (psychic investigation) তিন ভাবে দেখিতে পারি। ইহার প্রত্যেক ভাবেরই উপায় পৃথক এবং প্রত্যেক ভাবই এক একটি বিভিন্ন শ্রেণীর সাধকের পক্ষে প্রযুক্ত হইতে পারে। এক পক্ষে আমরা ইহাকে জ্ঞান লাভের উপায় স্বরূপ মনে করিতে পারি আর এক দিকে ইহাকে আমরা জীবন ও আচার ব্যবহারের পথ প্রদর্শক রূপে (as a guide in life and conduct) গ্রহণ করিতে পারি। আধ্যাত্মিক উন্নতির সহিত এবংবিধ অলৌকিক শক্তি ও সিদ্ধিলাভের (psychic development) সম্বন্ধ কি এবং পৃথক যে ভ্রাতৃভাব সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য রূপে কীর্তিত হইয়াছে সেই আদর্শের সহিত বা এ সমস্ত শক্তি কিরূপ ভাবে সম্বন্ধ তাহা আমাদের অবশ্য বিচার্য। শেষোক্ত বিষয়টীই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়

শ্রীমতী বেসান্ত আমাদিগকে বহুবার বুঝাইয়া দিয়াছেন যে ভূর্লোকিক এবং ভুবর্লৌকিক ঘটনাবলির (astral and physical phenomena) মধ্যে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই, প্রত্যেক লোকের ঘটনা আমাদিগকে সেই লোকের জ্ঞান প্রদান করে এবং সুতরাং উভয়কেই আমাদের তুল্যরূপে বিচার ও আলোচনা এবং বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত। আমার বিশ্বাস যে আমরা সকলেই একথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি, এবং ইহা স্বীকার করিলেই এই পরবর্তী সিদ্ধান্ত উপনীত হইতে হয় যে আমাদিগের একই ভাবে উভয়কে বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। অনুসন্ধানের সময় ভূলোকের প্রত্যেক শ্রেণীস্থ বিষয়াবলি পূর্ণ বিজ্ঞান সম্মত উপায়েই করা হয়। যাহারা যে বিভাগের অনুসন্ধানে তৎপর তাহারা সাধারণতঃ ঐ বিষয় ভাল জানেন (specialist) তাহাদের বিশিষ্ট বিভাগে যে সমস্ত বিষয় আবিষ্কৃত হইয়াছে

তাহা তাঁহারা শিক্ষা করিয়াছেন, এবং এইরূপে উক্ত কর্ম্মের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, এবং যখন কোন নূতন ঘটনা বা নূতন বিষয় তাঁহাদের সম্মুখে উপনীত হয় তাহারা সে সমস্ত বিষয়কে তাঁহাদের পূর্ব্বজ্ঞাত বিষয়াবলির সহিত গ্রথিত করিয়া তাহাদের উপযুক্ত স্থানে স্থাপিত করিতে পারেন, নূতন নিয়ম এবং শাক্তর অনুসন্ধান লইতে গেলেই কতকটা অনিশ্চয়তা এবং বিপদের আশঙ্কা থাকে এবং যাহারা এ কার্য্যে ব্রতী হইবেন তাঁহাদের ধীর অধ্যবসায় এবং বীর জনোচিত আত্মোৎসর্গের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হয়, কিন্তু সে বিষয়ে প্রথমতঃ যতটা জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে, তাহা না করিয়া কখনই এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না। দ্বিতীয়তঃ সিদ্ধান্ত স্থির হইল কি না তাহা নির্ণয় করিবার জন্য কতকগুলি নিশ্চয়াত্মক নির্ব্বাচিত পরীক্ষা Test conditions) থাকা চাই। এবং কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ সেই পরীক্ষাগুলি প্রয়োগ করা চাই। এইরূপ বহু পরীক্ষার পর যে সিদ্ধান্ত করা হয় তাহাও ভবিষ্যতে পরীক্ষণীয় রূপে গ্রহণ করা হয় এবং পরে যেমন নানাবিধ পরীক্ষা হইতে থাকে তাহা দ্বারা সে সিদ্ধান্ত অনেক সময়ে বহুল পরিমাণে রূপান্তরিত হইতে পারে। ধৈর্য্য এবং সতর্কতা অনুসন্ধানকারীর প্রধান চিহ্ন। তাহার সিদ্ধান্ত সমূহ তাহার আবিষ্কৃত বিষয়াবলি পূর্ণরূপে পরীক্ষিত এবং প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে তাহা জগতে প্রচার জন্য তিনি ব্যস্ত হন না। যদিও বা প্রচার করেন তবে সে সিদ্ধান্ত কেবল সম্ভাব্য মতরূপে (as possibilities and theories) অপর বৈজ্ঞানিক গণের দ্বারা আরও বিশদভাবে পরীক্ষিত করিবার জন্য স্থাপিত করেন। যিনি ওই প্রকৃতির গভীর রহস্যের অন্তঃস্থলে অধিকতর রূপে প্রবেশ করিতে চাহেন তাহাকে বহু বৎসর ধীরভাবে ক্রমাগত পরিশ্রম করিতে হয়, তাহাতে বড় ধৈর্য্যশীল হইতে হয়। তাহার অকুতসাহস এবং প্রভূত আত্মসংযম প্রয়োজন। ভুবর্লোকিক জগতের অনুসন্ধানকারির ও এই প্রকার গুণাবলি থাকা চাই, তাহার পক্ষেও এইরূপ উপায়াবলি অবলম্বনীয়। তাহাকেও অবশ্য নিশ্চয়াত্মক বিশেষ পরীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে তবে আমাদের ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে যে লোকে আমরা কার্য্য করিতেছি তদনুসারে পরীক্ষার প্রকৃতি ও

বিভিন্ন হইবে, কারণ অনেক পরীক্ষা যাহা এক লোকের এক বিষয়ের জ্ঞানের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী তাহাই অন্যস্থানে কোন ফলই উৎপাদন করে না। সুতরাং অনুসন্ধিৎসুর বিশিষ্ট জগতে তাহার নির্দ্দিষ্ট বিভাগে কিরূপ পরীক্ষা ফলবতী হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করাও তাহার অন্যতম কর্ত্তব্য। কিন্তু একবার স্থিরীকৃত হইলে সেই সমস্ত পরীক্ষা তাহার আবিষ্কৃত বিষয়াবলিতে অবশ্য প্রয়োগ করিতে হইবে। এ পর্য্যন্ত অন্য মনীষীগণ যাহা আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার সম্পূর্ণ জ্ঞান তাঁহাদের লাভ করা উচিত, এবং অবশ্য যতদূর এপর্য্যন্ত জানা গিয়াছে—তাহা হইতে তিনি যে সমস্ত নিয়মদ্বারা ভুবর্লোকের ব্যাপারাবলি পরিচালিত হয় তাহার অনেকটা উপলব্ধি করিতে পারেন। অপরিজ্ঞাত নিয়মাবলি আবিষ্কারের সহিত যে সমস্ত অজ্ঞাত বিপদ বিজড়িত আছে তাহার সম্মুখীন হইবার উপযুক্ত সাহস, সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বে পুনঃপুনঃ সে বিষয় অধ্যবসায় সহকারে পরীক্ষা করিবার উপযুক্ত ধীরতা, তাহার সিদ্ধান্ত অপরের সম্মুখে অক্ষুব্ধচিত্তে পরীক্ষার্থ স্থাপিত করিবার উপযুক্ত দীনতা, বৎসরের পর বৎসর অতীত হইয়া গেলেও যদি বাহ্য দৃশ্যতঃ কোন ফললাভ না হয় তথাপি অটল উৎসাহ এবং অক্লান্ত পরিশ্রমসহকারে কার্য্য চালাইবার উপযুক্ত অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণাবলি তাহার ভূষণ হওয়া চাই। বৈজ্ঞানিকগণের যে সমস্ত আবিষ্ক্রিয়া আজ জড়জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে তাহা এই সমস্ত গুণাবলির প্রভাবেই সাধিত হইয়াছে। ভুবর্লৌকিক অনুসন্ধানাবলিদ্বারা যদি আমাদের ভাবময় এবং মনোময় জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিতে হয় তাহা হইলে এই সমস্ত গুণাবলিরই প্রয়োজন। এই সমস্ত বিষয় বুঝিলে সকলেই স্বীকার করিবেন যে উন্নতিলাভের ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা এবং অতীত যুগে জগতে জড়বিজ্ঞানের উন্নতির যেরূপ আবশ্যকতা ছিল—অথবা এখনও যেরূপ আবশ্যকতা রহিয়াছে বর্ত্তমানে উচ্চতর লোক সমূহের আমাদের জ্ঞানের বিস্তৃতি এবং উন্নতিরও তদ্রূপ আবশ্যকতা আছে।

কিন্তু এইরূপ অনুসন্ধান যে কেবলমাত্র পরাবিদ্যা সমিতির বিশিষ্ট কার্য্য ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য নয়। আমাদিগকে বলা হইয়াছে যে সমিতি একটী বীজকেন্দ্র (nucleus) বীজকেন্দ্র সমস্ত জীবনীশক্তির শরীর গঠন বা ইন্দ্রিয়

পরিস্ফুরণের এবং পরিবর্দ্ধনের মূলকারণ (source) বটে, কিন্তু আমার বিশ্বাস ইহাকে মুখ্যভাবে কার্য্যকরি শক্তি বা কর্ত্তা (the direct active agent) বলা যাইতে পারে না। ইহা হইতে জীবনীশক্তি স্রোত প্রবাহিত হইয়া যাহা দ্বারা বীজকোষ (cell) গঠিত হয় এবং যাহাতে উক্ত কোষের ক্রিয়াবলি মুখ্যভাবে (directly) নিষ্পন্ন হয় সেই জীবাণুকে (Protoplasm) সঞ্জিবীত করে। উক্ত হইয়াছে যে বর্ত্তমানে অন্যান্য সমিতিসমূহ প্রকৃতির এপর্য্যন্ত অজ্ঞাত নিয়মাবলির অনুসন্ধান এবং মানুষের অন্তঃস্থিত অব্যক্ত শক্তির (latent powers) বিকাশ পরাবিদ্যাসমিতি অপেক্ষা সুন্দররূপে করিতেছে। আমার নিকট কিন্তু বিষয়টী বড় দুঃখজনক বলিয়া মনে হয় না। আমাদের চারিদিকে এ বিষয়ে যে সমস্ত কর্ম্মস্রোত দেখিতে পাই আমাদের সমিতি ইহার প্রথমাবস্থায় যে জীবনীশক্তি (life impulse) প্রবাহিত করিয়াছিল ইহা অন্ততঃ আংশিকরূপে তাহারই ফল নহে কি? এবং এই কার্য্যে প্রণোদিত করিবার জন্য যে শক্তি দিয়াছে তাহাতেই বীজ-কেন্দ্ররূপে ইহার যে ক্রিয়া (function) তাহা সম্পন্ন হয় নাই কি? ইহা কি হইতে পারে না যে ইহার এ সম্বন্ধে বর্ত্তমানে একটু বিভিন্নকার্য্য উপস্থিত হইয়াছে? এই অনুসন্ধান নিজে না করিয়া বীজ কেন্দ্ররূপে ইহার যে কর্ত্তব্য তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিলে মানবসমাজের (humanity) সেবা কি সুন্দরতররূপে সাধিত হয় না? এবং তাহার সাহায্যে বর্ত্তমান অনুসন্ধিৎসু যে পন্থাবলম্বন করিলে সুবিধা হইবে যেভাবে তাহাদের অনুসন্ধান মানবসমাজের বিশেষ উপকার সাধন করিবে, সেইভাবে তাহাদের চেষ্টার পরিচালনের জন্য অন্য একভাবে সে জীবনীশক্তিস্রোত প্রবাহিত করিলে অন্যায় হয় কি? আমার বিশ্বাস অন্যায় হয় না। পরন্তু এরূপ করাই সঙ্গত এবং আমাদের মধ্যে অবশ্য কোন কোন সভ্য ভূয়ালৌকিক বিষয়ের অনুসন্ধান করিবেন সত্য কিন্তু সমিতি তৃতীয় সম্বন্ধে সমিতিরূপে ইহার যে বিশিষ্ট কর্ত্তব্য তাহা এইরূপে যে ভাবে উন্নতিস্রোত বহিতেছে সেই স্রোতের দিকনির্ণয় করিলেই বোধ হয় সম্পন্ন করা হইবে। একটু পৃথকভাবে বিষয়টী বিচার করিয়া দেখা যাউক, অলৌকিক ও অত্যাশ্চর্য্য বিষয়াবলির আলোচনার (Psychic investigation) সমস্ত উপকরণ প্রস্তুত থাকিলেও আমাদের মনে

রাখিতে হইবে যে ইহা প্রকৃত জ্ঞানের পন্থা নয়। কারণ ইহার কার্য্যের গতি বাহির হইতে ভিতরে, ভিতর হইতে বাহিরে নয়। আমাদের অনেকের মনে আছে শ্রীমতী বেসান্ত বহুবার পুরাকালীন এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের উপায় সমালোচনাকালে বলিয়াছেন যে পুরাকালে বৈজ্ঞানিক হইতে গেলে যে সমস্ত অবশ্য প্রতিপাল্য গুণের প্রয়োজন হইত সাধুত্বই তাহার প্রধান, কিন্তু বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকগণ কেবলমাত্র মানসিক শিক্ষাতেই (Intellectual training) প্রথম ও প্রধানরূপে স্থাপিত করিতে চাহেন এবং প্রকৃত বিজ্ঞানলাভ করিতে হইলে যোগ শিক্ষা করিয়া সাধু এবং গুপ্তভাবের সাধক (Saints and mystics) হইতে হয় একথা শুনিলে নিশ্চয়ই তাঁহারা উপহাস করিবেন তথাপি আমাদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাস করেন যে ইহাই প্রকৃত পন্থা, তাঁহারা মনে করেন যে আমাদের বর্ত্তমান উপায় আমাদিগকে বহুবিধ জিনিষের বাহ্যিক জ্ঞান দিতে পারে বটে কিন্তু আত্মার স্বরূপ জ্ঞান—যে জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান—সে জ্ঞানের দিকে লইয়া যাইতে পারে না। এ কথার যেন কেহ ভুল না বুঝেন। জ্ঞান-মাত্রই নিঃসন্দেহে মঙ্গলকর এবং এক হিসাবে উচ্চতর জগতসমূহের জ্ঞান—যদিও তাহা বাহিরের উপাধির জ্ঞানমাত্র—আমাদিগকে আত্মজ্ঞানের দিকে অগ্রসর হইতে একটু সহায়তা করে। কারণ জড়ের দিকে অবরোহণকালে আত্মা এক এক করিয়া ক্রমেই স্থূলতর উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন, তাই বহু বস্তুর মধ্যে আপাততঃ প্রতীয়মান ভেদ ক্রমেই স্পষ্টতর হইয়াছে, এবং আত্মার একত্ব ক্রমেই অধিকতররূপে আবৃত হইয়া পড়িয়াছে। আরোহণমার্গে আমরা আশা করিতে পারি যে প্রত্যেক উচ্চ জগতে আত্মার সে একতা ক্রমেই একটু অধিকতররূপে পরিস্ফুট দেখা যাইবে, এবং বস্তুতঃ ইহা সত্য। একটী উদাহরণ গ্রহণ করা যাউক, বাহ্য জড়জগতে বস্তুসমূহ পরস্পরের উপর নির্ভর করিতেছে এবং তাহাদের কার্য্যদ্বারা পরস্পরের উপর ক্ষমতা বিস্তার (Influence) করিতেছে, এই নির্ভরতা এবং এই ক্ষমতাবিস্তার সমস্ত বাহ্যরূপের অন্তরালে (underlying all forms) যে একত্ব আছে তাহার ব্যঞ্জিত করে। ভুবর্লোকে এমন কি কার্য্যাপেক্ষা ভাবনা এবং বাসনা হইতে (From thoughts and emotions) সর্ব্বদা কিরূপ অধিক ক্ষমতা বিস্তৃত

হয়, দেখিতে পাই, —দেখিতে পাই জড়জগতে যাহারা হয়ত পরস্পর একত্র হয় নাই এমন কি হয়ত পরস্পরের অস্তিত্ব পর্যন্ত পরস্পরে অবগত নহে তাহারাও এ লোকে পরস্পরের উপর ক্ষমতা বিস্তার করিতে পারে, সুতরাং আমরা জড়বিষয় হইতে ভুবর্লৌকিক বিষয়ে একত্বের ব্যঞ্জনা স্পষ্টতর দেখিতে পাই, এবং যেহেতু বাহিরের ব্যক্তভাব অথবা বিষয়াবলি আত্মারই একভাবের প্রকাশ ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে এই বাহিরের ব্যক্ত বিষয়াবলি আলোচনা দ্বারা আমরা আত্মার স্বরূপ কিছু স্পষ্টতর জ্ঞানলাভ করিতে পারিব।

'পথের আলোক' (Light on the Path) নামক পুস্তকে "অকুতোসাহস-ভরে বাহিরে অগ্রসর হইয়া পথের সন্ধান কর—' এই যে বাক্য আছে ইহাই বোধ হয় তাহার আংশিক অর্থ কিন্তু এই বাক্যের সহিত আর একটী বাক্য গ্রথিত আছে সেটী এই যে "ভিতরে প্রবেশ করিয়া পথের সন্ধান কর" বাস্তবিক পক্ষে আত্মার একত্ব একটী সত্য বলিয়া মানসিক ধারণা (intellectual recognition) এবং সেই একত্বের অন্তরে অপরোক্ষানুভূতি-এ দুয়ের মধ্যে বহু প্রভেদ। অলৌকিক ঘটনাবলি এবং উপাধির আলোচনা দ্বারা প্রথমোক্ত ধারণা মাত্রই লাভ করা যাইতে পারে। তাই উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে "বেদাধ্যয়ন দ্বারা আত্মাকে লাভ করা যায় না, বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে ধরা যায় না, বহু শ্রুতি দ্বারা ও তাঁহাকে পাওয়া যায় না কেবলমাত্র যে জন তাঁহাকে জানিতে চান তিনিই তাঁহাকে প্রাপ্ত হন, তাঁহার নিকট আত্মা তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ ব্যক্ত করেন," ইহাই শ্রীশঙ্করাচার্য্যের টীকায় এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। "বাসনা হইতে মুক্ত হইয়া কেবল মাত্র আত্মাকেই জানিতে চাহিলে আত্মাদ্বারাই আত্মাকে লাভ করা যায়।

সুতরাং অলৌকিক এবং আশ্চর্য্য নিয়মাবলির আলোচনায় (psychic investigation) উপকার আছে তাহা পূর্ণরূপে স্বীকার করিলেও আমরা কোন ক্রমেই প্রকৃত মাত্রা ছাড়াইয়া ইহার আবশ্যকতা সম্বন্ধে অত্যুক্তি করিতে পারি না। আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে ইহা কেবলমাত্র নিম্নতর জ্ঞান প্রদান করিবে, যদি আমাদিগের সেই প্রকৃত উচ্চ জ্ঞান লাভ করিতে হয় তবে আধ্যাত্মিকতা কি তাহা প্রথমতঃ বুঝিতে হইবে এবং বুঝিয়া তদনুসারে জীবনের গতি পরিচালিত করিতে হইবে। এবং তাহা হইলে বীজ

কেন্দ্র রূপে সমিতির যে সমস্ত কর্ত্তব্য আছে তাহার মধ্যে এ বিষয়ে এইরূপ সতর্ক করিবার জন্য এই সুরের ধ্বনি উঠান কি একটা কর্ত্তব্য নয়? অনুসন্ধিৎসুর মনে কি জাগাইয়া তোলা কর্ত্তব্য নয় যে অনুসন্ধান যদিও চিত্তাকর্ষক, যদিও নিম্নতর বাহ্যবের বিষয় জ্ঞানের জন্য প্রয়োজন বটে তথাপি ইহা উচ্চ জ্ঞান নয়—প্রকৃত বিজ্ঞান নয়—কেবল মাত্র এই জ্ঞানে আমাদিগকে আত্মানুভূতির দিকে একটুও অগ্রসর করাইবে না?

ক্রমশঃ

কুমারী লিলিয়ান এডগার।

---

# রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামী।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

## সনাতন গোস্বামীর প্রভুর সহিত মিলন।

সনাতন গোস্বামী বারাণসীতে উপনীত হইয়া শুনিলেন, প্রভু শ্রীবৃন্দাবন হইতে বারাণসীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন এবং চন্দ্রশেখরের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। শুনিয়াই তিনি চন্দ্রশেখরের ভবনে গমন করিলেন। তিনি দ্বারদেশে কাহাকেও না দেখিয়া দ্বারেই নিরবে বসিয়া রহিলেন। সর্ব্বজ্ঞ প্রভু সনাতনের আগমন জানিতে পারিয়া চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, "দ্বারে একজন বৈষ্ণব আসিয়াছেন, তুমি তাঁহাকে আমার নিকট লইয়া আইস।" চন্দ্রশেখর দ্বারদেশে আসিয়া সনাতন গোস্বামীকে দেখিলেন, কিন্তু তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়া বোধ হইল না। প্রভু বলিলেন, "দ্বারদেশে কেহই নাই?" চন্দ্রশেখর বলিলেন, "একজন দরবেশ বসিয়া আছে।" প্রভু বলিলেন "তাঁহাকেই লইয়া আইস।" চন্দ্রশেখর পুনর্ব্বার যাইয়া সনাতন গোস্বামীকে প্রভুর নিকট লইয়া আসিলেন। সনাতন গোস্বামীকে চন্দ্রশেখরের সহিত আসিতে দেখিবামাত্র প্রভু স্বয়ং উঠিয়া আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। উভয়ের স্পর্শে উভয়েই প্রেমাবিষ্ট হইলেন। সনাতন গোস্বামী "প্রভু আমাকে স্পর্শ করিও না, আমাকে স্পর্শ করিও না" বলিতে লাগিলেন। প্রভু

শুনিলেন না। দুইজনে গলাগলি করিয়া অনেকক্ষণ রোদন করিলেন। তদ্দর্শনে চন্দ্রশেখরের চমৎকার বোধ হইল। প্রভু সনাতন গোস্বামীকে লইয়া বারাণ্ডার উপর নিজের পার্শ্বে বসাইলেন। পরে তাঁহার কারামুক্তির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সনাতন গোস্বামী আদ্যোপান্ত সমস্তই নিবেদন করিলেন। অনন্তর প্রভু বলিলেন, "প্রয়াগে তোমার দুই ভাইয়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহারা শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলেন, আমিও বারাণসীতে চলিয়া আসিলাম।" এই কথার পর প্রভু চন্দ্রশেখর ও তপন মিশ্রকে সনাতনের পরিচয় দিলেন। তপন মিশ্র শুনিয়া সনাতন গোস্বামীকে নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রভু চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, "সনাতনকে ক্ষৌর করাইয়া বৈষ্ণবের বেশ করিয়া দাও।" চন্দ্রশেখর প্রভুর আদেশ অনুসারে সনাতন গোস্বামীকে ক্ষৌর ও গঙ্গাস্নান করাইয়া একখানি নূতন বস্ত্র প্রদান করিলেন। সনাতন গোস্বামী ঐ নূতন বস্ত্র গ্রহণ না করিয়া একখানি পুরাতন বস্ত্র প্রার্থনা করিলেন। প্রভু শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। চন্দ্রশেখর সনাতন গোস্বামীকে তাঁহার ইচ্ছামত একখানি পুরাতন বস্ত্রই প্রদান করিলেন। সনাতন গোস্বামী ঐ বস্ত্রখানি দুইখণ্ড করিয়া একখণ্ড কৌপীন ও অপর খণ্ড বহির্বাস করিলেন। ঐ দিবস সনাতন গোস্বামী তপনমিশ্রের গৃহেই প্রভুর শেষান্ন প্রাপ্ত হইলেন।

পরদিন প্রভু সনাতন গোস্বামীকে মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র সনাতন গোস্বামীকে পাইয়া সানন্দে নিজ গৃহে লইয়া ভিক্ষা করাইলেন। তিনি আরও বলিলেন, "সনাতন, তুমি যত দিন এই কাশীধামে থাকিবে, ততদিন আমার গৃহে ভিক্ষা লইবে।" সনাতন গোস্বামী বলিলেন, "আমি মাধুকরী করিব, স্থূল ভিক্ষা লইব না।" সনাতন গোস্বামীর বৈরাগ্য দেখিয়া প্রভু অপার আনন্দ লাভ করিলেন। কিন্তু সনাতন গোস্বামীর গায়ের কম্বলখানি প্রভুর ভাল লাগিল না; বার বার কম্বলখানির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। মুখে কোন কথাই বলিলেন না। সনাতন গোস্বামী তাহা বুঝিতে পারিয়া কম্বলখানি ত্যাগ করাই মনস্থ করিলেন। তিনি মধ্যাহ্ন সময়ে গঙ্গাতীরে যাইয়া দেখিলেন, এক বৈষ্ণব একখানি কাঁথা শুকাইতেছেন। সনাতন গোস্বামী তাঁহার নিকট যাইয়া

বলিলেন, "আপান আমার এই কম্বলখানি লইয়া আপনার ঐ কাঁথাখানি আমাকে প্রদান করুন।" বৈষ্ণব ভাবিলেন, সনাতন গোস্বামী তাঁহাকে পরিহাস করিতেছেন। এই ভাবিয়া তিনি সনাতন গোস্বামীকে বলিলেন "আপনি প্রবীণ লোক হইয়া আমাকে পরিহাস করিতেছেন কেন?" সনাতন গোস্বামী বলিলেন, "আমি সত্যই বলিতেছি, আপনাকে পরিহাস করি নাই।" তখন সেই বৈষ্ণব নিজের কাঁথাখানি দিয়া সনাতন গোস্বামীর কম্বলখানি লইলেন। সনাতন গোস্বামীও ঐ কাঁথাখানি গায়ে দিয়া প্রভুর নিকট আগমন করিলেন প্রভু দেখিয়া বলিলেন, "সনাতন, তোমার কম্বল কোথা গেল" সনাতন গোস্বামী আদ্যোপান্ত সমস্তই নিবেদন করিলেন। প্রভু শুনিয়া বলিলেন "কৃষ্ণ তোমার বিষয়রোগ খণ্ডাইয়া উহার শেষ রাখিবেন কেন? তিন মুদ্রার কম্বল গায়ে দিয়া মাধুকরী করিতে দেখিলে, লোকে তোমাকে উপহাস করিত, অতএব প্রভু তোমার কম্বল রাখিলেন না।" এই কথা বলিয়া প্রভু প্রসন্ন হইয়া সনাতন গোস্বামীর প্রতি কৃপা শক্তি সঞ্চার করিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

---

# সাধন-পন্থা।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

মানবকে জ্ঞান-বিতরণ করিতে মহাপুরুষগণ কখনও কুণ্ঠিত নন। তবে যাহাদিগের উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগের ধর্ম্ম ও জ্ঞান প্রচার, তাহাদিগের তাহা গ্রহণ-লিপ্সু হওয়া চাই; তাহা না হইলে তাঁহাদিগের কার্য্যে ব্যাঘাত হয়। আমরা কিন্তু, অন্যরূপ ভাবি, আমরা মনে করি এই অমূল্য জ্ঞান-ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিতে তাঁহারা একান্ত অনিচ্ছুক, তাহাতে তাঁহারা অয়ে অয়ে

কৃপণের মত দান করেন। এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক; আমরা সেই জগৎ-শিক্ষকদিগের দেবতা-হৃদয়ের প্রসারতা বুঝিতে পারিনা বা যে সমস্ত ভক্ত তাঁহাদিগের অনন্ত প্রেমের কণিকা প্রাপ্ত হইয়া সেই প্রেম-বারতা জগতে প্রচার করেন তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যও বুঝিনা। মানবের দুঃখে ও দৈন্যে ঔদাসীন্য বশতঃ তাঁহারা যে জ্ঞান-মন্দাকিনী প্রতিরোধ করিয়া বসিয়া আছেন, তাহা নয়, আমরা আমাদিগের হৃদয়-দ্বার আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি, তাহাতেই তাহা আসিতেছেনা আমরা মোহে মহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া আছি বলিয়া তাঁহাদিগের করুণা-বারতা আমাদিগের কর্ণে প্রবেশ করে না। আমরা বার বার বলিয়াছি গুরুর অভাব নাই, অনন্ত করুণার উৎস, তাঁহাদিগের করুণারও অভাব নাই, অভাব কেবল গ্রহণেচ্ছু শিষ্যের।

১৯

লোকে প্রায় বলিয়া থাকে, এখন আর কোনও অবতার আবির্ভূত হন না কেন? অবতারের যেন আবির্ভাব না হইল, পুরাকালের মহা মহা ঋষিগণই বা কোথায়, যাঁহাদিগের অমৃতময় উপদেশে মানবের প্রাণ শান্তি-স্রোতে ভাসিয়া যাইত, কই, তাঁহাদিগকে ত আর দৃষ্টিগোচর করা যায় না? তাঁহারা কেন আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া আছেন? যে উপদেশ বন্যায় ভারত ভাসিয়া যাইত এখন সে উপদেশ কোথায়? তবে কি শাস্ত্রবাক্য সব কাল্পনিক?

শাস্ত্রবাক্য কাল্পনিক নয়, আর ঋষিগণও আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যান নাই। কে তাঁহাদিগের উপদেশ লইতে যথার্থ অভিলাষী সেইরূপ শিষ্যের অনুসন্ধান তাঁহারা অহরহঃ করিতেছেন।

কোটী মানবের মধ্যে একজনেরও হৃদয় দ্বার উন্মুক্ত হইলে, তাঁহাদিগের দৃষ্টি স্বতঃই আকর্ষিত হয়। একজন মানবেরও অন্তরে যদ্যপি উপদেশ লিপ্সা জাগিয়া উঠে—যদ্যপি তাহার প্রাণ বলিয়া উঠে "গুরুদেব, তুমি কোথায়, আমাকে পথ দেখাইয়া দাও"—অমনি তাঁহাদিগের উচ্চশিক্ষা দৈবশক্তিতে তাহার প্রাণকে ভরিয়া দেয়—তাহার হৃদয় স্বর্গীয় জ্ঞানে প্লাবিত হয়।

তবে যে আমাদিগের তাহা আসিতেছে না তাহার কারণ আমরা আমাদিগের হৃদয় দ্বার শত বাসনার দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। ধন-

লিপ্সা, যশ-লিপ্সা, মুক্তির কামনা, ইন্দ্রিয় ভোগেচ্ছা কত মূর্ত্তি ধরিয়া লৌহের অর্গলের মত সেই দ্বার চিরতরে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

যতদিন এইরূপে তাহা বদ্ধ থাকিবে, ততদিন তাঁহাদিগের অস্তিত্ব বুঝিতে পারিবে না, কিন্তু একবার দ্বার উন্মুক্ত হইলেই, ওই অর্গল গুলি সরাইয়া ফেলিতে পারিলেই দেখিবে, কোথা হইতে তোমার হৃদয় তাঁহাদিগের প্রেমের উৎসে ও জ্ঞানের বিমল ধারায় ভরিয়া গিয়াছে। এত দিন সেই স্রোত তোমার চারিভিতে, তোমার অগোচরে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইত, বাসনায় আত্মহারা ছিলে বলিয়া তাহা তুমি বুঝিতে পারিতে না, আজ নেশা ছুটিতেই—তাহাতেই তাহার দৈব বিভায় প্রাণ ভরিয়া যাইল।

২০

তোমার আর যখন বালকের ক্ষুদ্র খেলা ভাল লাগিবে না, যখন তুমি বাসনার মদিরায় তৃপ্তি পাইবে না, তখন কোনও না কোন সাধক আসিয়া শান্তির নিদান সাধন উপায় তোমায় বলিয়া দিবে। যদ্যপি একান্ত তাহা না হয়, অন্ততঃ এমন পুস্তক তোমার করতলগত হইবে যাহা পাঠে তোমার প্রাণের তৃষা মিটিবে, তুমি দেখিতে পাইবে তোমার অনেক সমস্যার মীমাংসা হইয়া যাইল। হয়ত সাধারণ পুস্তকাগারে ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে এক খানি পুস্তক তোমার নয়ন আকর্ষণ করিল—তুমি জান না তাহা কেন হইল। অথবা কোন ও লোক আসিয়া তোমায় পুস্তক বিশেষ পাঠ করিতে অনুরোধ করিল। যে কোনও প্রকারে হউক, তুমি দেখিবে বর্ত্তমান অবস্থার পক্ষে বিশেষ উপযোগী একখানি পুস্তক পাঠের সুযোগ হইল। এইরূপ হয় কেন? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে অভ্যুন্নত মহাপুরুষগণ মানবকে কিসে শিক্ষা দিতে পারা যায় এই রূপ সুযোগ সদাই অন্বেষণ করিতেছেন। যখন তাঁহারা দেখিতে পান এক জন সাধারণ উপায়ে ধীরে ধীরে উন্নত হইতে হইতে এই রূপ অবস্থায় আসিয়াছে যে তাহাকে বিশেষ কিছু শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক, তাহাকে ঠিক তাহাই শিক্ষা দিতে পারে এমন তাঁহাদিগের কোনও শিষ্যকে সেই কার্য্যে আদিষ্ট করেন; কিন্তু যদ্যপি তাদৃশ শিষ্য সে স্থানে না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কাজেই তাহাদিগকে পূর্ব্বকথিতরূপে পুস্তকের সাহায্য লইতে হয়। যে রূপেই হউক ঠিক যে শিক্ষা তাহার বিশেষ উপকারী তাহা

কোনও না কোন উপায়ে—তত্ত্বজিজ্ঞাসুর সমীপে আসিয়া পড়ে এবং সেই সমস্ত শিক্ষা ও জীবন-নীতি ধ্যান ও ধারণার দ্বারা যখন সে প্রাণের সহিত গ্রথিত করিয়া লয় এবং তদনুযায়ী যথার্থ জীবন যাপন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন অন্য উপায়ে আবার তাহার শিক্ষা হইতে থাকে।

প্রতিদিন ধ্যান করিতে করিতে সে বুঝিতে পারে যে তাহার অন্তরে কোথা হইতে নূতন সম্বিতের আভাস আসিতেছে, তাহার নব চিৎকেন্দ্র বিকাশ হইতেছে। এইরূপে ক্রমে তাহার চৈতন্য সেই উচ্চ সঞ্চিত কেন্দ্রে ন্যস্ত হয়—সে চিদাভাসের বিমল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। সে বেশ বুঝিতে পারে যেমন স্থূলদেহ মনও সেইরূপ তাহার আজ্ঞাবহ ভৃত্যমাত্র। সে দেখিতে পায় মনের সাহায্যে যাহা এত দিন অননুভূত তাহা এখন তাহার বোধগম্য হইতেছে। এখন তাহার অন্তরে মাঝে মাঝে চিন্তার তরঙ্গ আসিতে থাকে, যাহা তাহার মনকে অনুশাসিত করে। কোথা হইতে এই স্রোত যে আসিল মনের দ্বারা তাহা বুঝা যায় না, কিন্তু মন বুঝে এই ভাব-স্রোত কাল্পনিক নয়, মনে যখন তাহারা প্রতিফলিত হয়, মন নিশ্চিত বুঝে সেই গুলি প্রকৃত—সে গুলি অলীক নয়। তখন তাহার মনে মনে এই রূপ প্রশ্ন স্বতঃই উঠিতে থাকে—আমি ত কই এ সম্বন্ধে কোনও তর্ক করি নাই; কোনও ত যুক্তি-বাদের দ্বারা এই সমস্ত তথ্যে উপনীত হই নাই, কোনও যুক্তির সাহায্যে যে এই সমস্ত সত্য ধারণা হইল তাহাত নয়, এই বিষয়ে যে কখন ও কোন চিন্তা করিয়াছি তাহাত মনে হয় না। এই সমস্ত ত আপনা হইতে হঠাৎ আবির্ভূত হইল। মনের ও অন্তর প্রদেশে আমার যে উচ্চ-প্রকৃতি আছে এইগুলি সেইখান হইতে আসিয়াছে। মন স্থির হইলে চিদাভাসের বিমল জ্যোতি তাহাতে প্রতিফলিত হয়, ইহা তাহাই। যেমন হ্রদ নিস্তরঙ্গ হইলে তাহাতে সূর্য্য ও বৃক্ষ পুষ্পের প্রতিবিম্ব পূর্ণ ভাবে পতিত হইতে পারে ও তাহা তরঙ্গাকুলিত হইলে কেবল তাহাদিগের বিচ্ছিন্ন মূর্ত্তি দেখা যায়; ঠিক সেই রূপ যখন মন চিন্তাবিতাড়িত না হয় তখনই এই সমস্ত উচ্চভাব মনে প্রতিবিম্বিত হয়। চিন্তা দ্বারা আকুলিত থাকিলে পূর্ণ সত্য পরিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশ পায়।

ধ্যান কালে মন যখন স্থির ও স্বচ্ছ হয় তখনই উচ্চপ্রকৃতি প্রকাশ পায়।

ইহার পর মানবের উচ্চতর অবস্থা আসে। এখনও তাহার নিম্ন চিৎ-কেন্দ্র বলীয়ান,—কেবল ধ্যানের উচ্চ অবস্থায় চিদাভাষের রশ্মি মানস-সংসীতে প্রতিবিম্বিত হয়। ক্রমে সে উপলব্ধি করিতে অভ্যাস করে যে তাহার উচ্চ প্রকৃতিই স্থূলতর জগতে কার্য্য করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্যই সে এতদিন নিম্নতরচিৎকেন্দ্রে, তাহার নিম্নতর প্রকৃতির সাহায্যে কার্য্য করিয়া আসিয়াছে। এখন সে তাহার অন্য প্রকৃতি বুঝিয়াছে। তাহাতেই তাহার আলোকে সদাই বিভাসিত থাকিতে তাহার এখন চেষ্টা, মনকে সম্পূর্ণরূপে একাগ্র রাখিয়া তাহাকে চিন্তা বিক্ষুব্ধ হইতে না দিয়া—তাহাকে নিস্তরঙ্গ হ্রদের মত অবিচলিত রাখিতে তাহার দিবানিশার উদ্যম। এইরূপে সাধন করিতে করিতে অকস্মাৎ একদিন সে অনুভব করে যে সে তাহার দেহ ছাড়িয়া বাহির হইয়াছে। সম্বিৎ-ময় সে দেখিতে পায়—যে তাহার দেহ যাহা এতদিন আত্মা বলিয়া ভ্রম হইত, এখন তাহা দূরে পড়িয়া আছে—সে চিদাভাসের বিমল আলোকে বিরাজিত।

এই রূপে মনকে স্ববশে আনিতে পারিলে তুমি দিব্য জ্যোতির্ম্ময় দেহ ধারণ করিয়া স্থূলদেহ হইতে বহির্গমন করিতে সক্ষম হইবে। উচ্চ চিৎ-কেন্দ্র যখন তোমার সর্ব্বকর্ম্মের শক্তি হইবে, তখন যে দেহ ধারণ করিয়া তুমি তোমার স্থূলদেহ হইতে মুক্ত হইবে সেই দেহ অতিশয় উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ম্ময়, তাহাকে "আলোক-দেহ" বলা যাইতে পারে।

যাহারাই আত্মানুভব করিয়াছেন তাঁহাদিগেরই এই অবস্থা আসিয়াছে। তুমি যে দেহ হইতে স্বতন্ত্র তাহা যথার্থ অনুভব করিতে হইলে তোমার পূর্ব্বোক্ত অভিজ্ঞতা একান্ত আবশ্যক। তর্কের দ্বারা বা কেবল বিচারের দ্বারা বা লোকের কথায় প্রাণের বিশ্বাস জন্মায় না।

আমি দেহ নই, দেহ হইতে আমি স্বতন্ত্র; স্থূলজগতে কার্য্য করিতে আমি স্থূলদেহ গ্রহণ করিয়া আছি এই জ্ঞান কেবল যিনি স্থূলদেহ হইতে এই প্রকারে মুক্ত হইতে পারেন তাঁহারই হইতে পারে। তিনি দেখেন স্থূলদেহ পড়িয়া আছে তিনি অন্যত্র বিরাজিত। কেবল তাঁহারই নিকট স্থূলদেহ বিশ্লেষণীয় পরিচ্ছদস্বরূপ এই জ্ঞান যথার্থ—অপরের তাহা অর্থহীন কথার কথা মাত্র।

আমি সম্বিৎ-রূপী ; দেহ আমার পরিচ্ছদ মাত্র—এ জ্ঞান কখন হয় ? যখন আমি এই শরীর হইতে উৎক্রমণের পর পরম জ্যোতিঃপ্রাপ্ত হইয়া শুদ্ধ চিৎভাবে অবস্থিত হইতে পারিব তখনই "দেহ আমি নয়" এই স্থির বিশ্বাস হইতে পাবে।

যাহাকে আমরা জীবন বলি, বাস্তবিক তাহা জীবন নহে। দেহরূপ কারাগারের প্রাণরূপী আমার স্বেচ্ছায় বন্দীভাব। স্থূল জগতের অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্যই আমি ইচ্ছা করিয়া কিছু দিনের জন্য—এই স্থূল আবরণে আপনাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। এই আমার আবদ্ধ অবস্থাকে মহা ভ্রম বশতঃ আমরা জীবদ্দশা বলিয়া ভাবি।

ধ্যান অবস্থায় কেবল আমাদিগের প্রকৃত প্রাণের অনুভূতি হয়। তখন সাধারণ ভাষায় আমরা যাহাকে প্রাণ বলি তাহা স্বপ্ন বা মায়া বলিয়া প্রতীত হয়। সে প্রাণ উজ্জ্বল, প্রকৃত অনন্ত ও মুক্ত আব এই প্রাণ নিস্তেজ, তাহার তুলনায় যেন জড়তাময়, সীমাবদ্ধ, স্বপ্নময়, ও দেহ কারাগারে আবদ্ধ বলিয়া মনে হয়। আমাদিগের স্থূল দেহের জীবন, তখন কেবল কতকগুলি কর্ত্তব্যের সমষ্টি বলিয়া মনে হয়। তখন মনে হয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে কত না ঋণ করিয়া আসিয়াছি, যে সমস্ত ঋণ শুধিবাব জন্যই আমার পার্থিব জীবন ধারণ, তখন মনে হয় আমিই জীবন, আমিই শক্তিমান, পৃথিবী আমার কর্ম্মভূমি, স্বর্গই আমার যথার্থ জন্মভূমি, সেই প্রকৃতি-সিদ্ধ নিজ বাসস্থান হইতে কর্ম্মের দ্বারা অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্যই ক্ষণিকের তরে এখানে আসিয়াছি।

ক্রমশ

জনৈক বিদ্যার্থী

# আদর্শাবলী।

( পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর )

ইহা হইতেই, জনসমাজের সর্ব্বত্র রোগীদিগের শুশ্রূষার উপযোগী চিকিৎসালয়, দীনহীন বালকবালিকাদের জন্য অনাথনিবাস ও নিঃসহায় বার্দ্ধক্যাপন্ন ব্যক্তিগণের জন্য আশ্রয়স্থান নির্ম্মিত হইয়াছিল; ইহা হইতেই, রোগীদিগের শুশ্রূষা, মূর্খব্যক্তিদিগকে শিক্ষাদান ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিগণের সহায়তা করিবার জন্য শত সহস্র সম্ভ্রান্ত ও ভদ্রবংশোদ্ভব নরনারীগণ আসিয়া দরিদ্র ও অধম শ্রেণীস্থ লোকদিগের মধ্যে বাস করিয়াছিলেন; ইহা হইতেই, দরিদ্রগণের ভ্রাতা ও ভগ্নী নামধারী নরনারী সম্প্রদায়সকল কাঙ্গালদিগের মলীমস জীর্ণকুটীরে প্রবেশ করিয়া স্বহস্তে তাহাদের সেবা করিয়াছিলেন। চণ্ডাল, নিকৃষ্ট ও পতিত লোকদিগের শুশ্রূষা স্বহস্তে করণার্থে তাহাদের মধ্যে অবস্থানকারী, এবং বিরক্তি ও অভিমান শূন্য হইয়া তাহাদের সেবানিরত ব্রাহ্মণগণের বিষয় ভাবিয়া দেখিলে তোমরা, উপযুক্ত কার্য্য সকল ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগের কতদূর পরিচায়ক, তাহা অনুমান করিতে পার। খ্রীষ্টের প্রতি কৃতজ্ঞতা হইতে মানবহৃদয়ে এতাদৃশ আত্মোৎসর্গ ও করুণার বিকাশ হইয়াছিল।

স্বৈর, স্বাধীন, ব্যষ্টিভাবাপন্ন ও স্বত্বসমন্বিত মানবের আদর্শ হইতে সাধারণ-হিতৈষীতা, স্বদেশানুরাগ প্রভৃতি আর ও কতকগুলি গুণের আবির্ভাব হইয়াছিল। নগরবাসী ব্যক্তি তাহার আমারত্ব জ্ঞান তাহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতে প্রসারিত করিয়া "আমার নগর", "আমার দেশ" প্রভৃতি বৃহত্তর বিষয়ে অধিকার ঐ জ্ঞানের অন্তর্ভূত করিয়া লইল। উদ্যান ও পুস্তকালয়াদি নির্ম্মাণ ও সাধারণের সর্ব্বপ্রকার উপকার সাধন দ্বারা তাঁহার স্বনগরের উন্নতিবিধানার্থে উদ্যমশীলতা প্রযুক্ত এবং "এইটী আমার নগর" এই চিন্তায় আপনাকে গৌরবান্বিত বিবেচনা করাতে তিনি একজন নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইলেন। তাঁহার দেশের মঙ্গল, তাঁহার দেশের নিরাপদতা ও তাঁহার দেশের গৌরবের অনুধ্যান হেতু এবং "এইটী আমার দেশ" এই চিন্তায় আপনাকে গৌরবান্বিত বিবেচনা করণহেতু তিনি একজন উত্তম দেশহিতপরায়ণ ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইলেন। স্বদেশকে এইরূপ আপনার বস্তু বলিয়া বোধ

করাতে, জন্মভূমীর সহিত এইরূপ অভেদসম্বন্ধজ্ঞান থাকাতে ইংলণ্ড উহার সাম্রাজ্যের বন্ধনীগুলির দৃঢ়তা অব্যাহত রাখিয়া এই বিশাল ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্রই উহার উপনিবেশ সকল সংস্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছে, এবং সুদূর নবজীলণ্ড ও পশ্চিম কানাড়াস্থ যে ঔপনিবেশিক ব্যক্তিগণ কদাপিও ইংলণ্ডের মৃত্তিকায় পদার্পণ করে নাই, তাহারাও উত্তর সাগরস্থ ঐ ক্ষুদ্র দ্বীপ খণ্ডকে আপনার বস্তু বলিয়া ভাবিতে গৌরব অনুভব করে, এবং তাহাদের সন্তান সন্ততিদিগের সহিত অশ্রুসিক্ত নয়নে "দেশের" কথা কহিয়া থাকে।

ব্যক্তিগত মর্য্যাদা, আত্মসম্মান, ন্যায় ও সম্ভ্রম জ্ঞান এবং ইহাদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত যাবতীয় গুণেরও এই সমর্থ এবং স্বাধীন মানবের আদর্শ হইতে উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা সাহসে, সহিষ্ণুতায় ও অন্যায় অত্যাচারাদি প্রতি-রোধেচ্ছায় অনুপ্রাণিত করে। ইহা যুদ্ধবৃত্তিব্যঞ্জক আদর্শ, এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, উদ্যমশীল, স্বভাবতঃ কর্ম্মনেতৃত্বে বরণীয় ব্যক্তিগণের শূর ও বীরোচিত চরিত্র গঠনোপযোগী বলিয়া ইহা হইতে সামরিক ধর্ম্মসকল প্রসূত হইয়া থাকে। ইহা হইতে ঋষি বা দার্শনিক সকলের উদ্ভব না হইয়া বরং কর্ম্মনিরত মনুষ্য-বর্গেরই উৎপত্তি হয়।

ঐ সকল গুণের অপকর্ষবশতঃ যে সমস্ত দোষ জন্মিয়া থাকে তাহারাই এই পরিণতিপ্রণালীর গতি অনুসারে অপরিহার্য্যরূপে অবশ্য প্রতীয়মান হইবে। এই নিমিত্তই তোমরা ইংরাজকে গর্ব্বিত, ধৃষ্ট, পরাবজ্ঞাকারী এবং অপরের মনোভাব ও মতামতাদি তুচ্ছ করিয়া ঔদ্ধত্য সহকারে স্বকার্য্যপ্রণালী সংস্থা-পনে তৎপর বলিয়া প্রায়ই দেখিতে পাও। "আমার অপরের মতাপেক্ষার প্রয়োজন নাই", "আমার জাতিই অন্যান্য সকল জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম", "আমার কার্য্যপ্রণালীই সর্ব্ব প্রকার কার্য্যপ্রণালী অপেক্ষা সুন্দরতম", "আমার সভ্যতা ব্যতীত আর সকল সভ্যতাই বর্ব্বরতা"। অপরাপর সকল দেশকেই হেয়জ্ঞান করিবার ও সর্ব্বত্রই তাঁহাদের স্বীয় কার্য্যপ্রণালী অনুসারে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করাইবার অভ্যাসবশতঃ ইংরাজেরা একটী জাতিস্বরূপে অত্যন্ত বিরাগভাজন হইয়াছেন। ইংরাজ প্রায়ই ভ্রম বশীভূত হইয়া পারুষ্যকে সততা এবং অসদাচারণকে স্বাধীনতা বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। তাঁহার পরাক্রম হইতেও ভবিষ্যতে সুফল উৎপন্ন হইবার তুল্যরূপ সম্ভাবনা

আছে, এবং ঐ পরাক্রম শোধিত ও পরিমার্জ্জিত হইলে উহা পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিবে।

এক্ষণে প্রাচ্য আদর্শ ও তাহার ফলাফলের বিষয় বিবেচনা করা যাউক, এবং "প্রাচ্য" শব্দ স্থানে আমি "ভারতবর্ষীয়" শব্দ বুঝিব, কেননা এই শেষোক্তের সহিতই আমাদের অধিকতম সম্বন্ধ।

এই প্রাচ্য আদর্শ যে ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য এই একটি মাত্র বাক্যে সন্নিবেশিত আছে, তদ্বিষয়ে সংশয়ের কোনও সম্ভাবনা নাই। ধর্ম্ম হইতেই এই আদর্শের উৎপত্তি, এবং একত্ব ঐ ধর্ম্মের প্রধান ও প্রথম শিক্ষা। সত্ত্বা এক মাত্র, যাহাতে সকল জীবই মূলতঃ সংলগ্ন। দৃশ্যগত বৈচিত্র্য যতই হউক না কেন, আকারগত বৈষম্য যতই হউক না কেন, তাহারা একই কাণ্ডদেশ হইতে উদ্ভূত শাখাসমূহ মাত্র। "সকল জীবেরই আত্মা হইতে উৎপত্তি"। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত স্বভাবতঃই উপলব্ধ হইয়াছিল যে প্রত্যেক মনুষ্য একটী সমষ্টির অংশ মাত্র; তিনি ব্যষ্টি নহেন, তিনি স্বতন্ত্র নহেন, তিনি পরম্পর শৃঙ্খলরূপে গ্রথিত এবং অন্যান্যাশ্রয়ী অবান্তর পরিচ্ছেদসমূহ সমন্বিত একটী প্রকাণ্ড পর্য্যায়ের অংশ। তিনি আজন্ম স্বৈর নহেন; অবশ্য পালনীয় বিস্তর বিষয় পরিবেষ্টিত হইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার জীবনধারণই তাঁহার ঋণসমূহকে নিয়ত পরিবর্দ্ধিত করিতেছে। ঐ সমষ্টির এবং উহার প্রত্যেক অংশের সুখস্বচ্ছন্দতা ঐ অংশসকলের সামঞ্জস্য ও সমুচিত অপণ্ডতার উপর নির্ভর করে। মনুষ্যজাতি, সমুদায় প্রাণী ও যাবতীয় স্থাবর পদার্থ লইয়া একটী সমষ্টি হইয়াছে, এবং ঐ সমষ্টি রচনায় প্রত্যেক উপাদানটাই ঐ সমষ্টির অধীন ও ঐ সমষ্টির প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই উহার অস্তিত্ব। কোন মনুষ্যেরই অস্তিত্ব তাহার নিজের নিমিত্ত এবং তাহার ব্যক্তিগত পৃথক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নহে; সকলের নিমিত্তই এবং সাধারণ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই তাঁহার অস্তিত্ব। অঙ্গুলির অস্তিত্ব উহার নিজের জন্য নহে এবং অন্যনিরপেক্ষও নহে, উহা শরীরের অংশ, এবং শরীরের মধ্যেই ও শরীরের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই উহার অস্তিত্ব, সমস্ত শরীরের হিত-সাধনার্থে খাদ্য গ্রহণ জন্য, মনোভাব ব্যক্ত করণার্থে লেখনী ধারণ জন্য, জীবাত্মার ইচ্ছা সম্পাদনার্থে কোন যন্ত্র চালনার জন্য উহার পরিণতি

হইয়াছে। অঙ্গুলি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হইতে গেলে উহা একটী অদ্ভুত ও অসঙ্গত ব্যাপার হইয়া পড়ে। মনুষ্যের পক্ষেও এইরূপ; তিনি একটী বিশাল দেহের একটী যন্ত্র, এবং ঐ দেহের প্রয়োজনসিদ্ধির জন্যই তাঁহার অস্তিত্ব। অন্যরূপ বিবেচনা অজ্ঞতার পরিচয়, পার্থক্যের ইন্দ্রজাল; ইহা ব্যষ্টিভাবের বিকৃতাবস্থ, বাতুলতা। এই নিমিত্ত, যে ব্যক্তি তাঁহার অবশ্য পালনীয় বিষয় সকল উপলব্ধি পূর্ব্বক আপনাকে একটী স্বতন্ত্র জীব না ভাবিয়া একটী বিশাল পূর্ণত্বের অংশরূপে জীবন যাপন করেন, সেই কর্ত্তব্যপরায়ণ মানবই হিন্দুর আদর্শ।

হিন্দু কোন লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া "তাহার স্বত্ব কি কি?" এইরূপ পশ্ন জিজ্ঞাসা করেন নাই এবং ঐ প্রশ্নের উত্তরকে ভিত্তিস্বরূপ করিয়া উহার উপর সামাজিক যুক্তিরূপ উপাদানে কোন সমাজ নির্ম্মাণ করেন নাই। "তাহার কর্ত্তব্য কি কি?" ইহাই তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; এবং, সমাজধর্ম্মের যুক্তিসঙ্গত অভিব্যক্তি স্বরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিই যাহাতে তাহার স্বীয় কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করে তাহা সুরক্ষিত করিবার উদ্দেশে তাঁহার ঋষিগণ কর্ত্তৃক যে সমাজ সংগঠন কল্পনা বিবৃত হইয়াছিল তাহাই তিনি পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন। সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণের গুণানুসারে সামাজিক কার্য্যাবলীর সুশৃঙ্খল বিভাগই, চতুর্ব্বর্ণের সংস্থান ও প্রত্যেক বর্ণের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণই তাঁহার দ্বারা ঐ সমাজ প্রণালীর ভিত্তি বলিয়া প্রত্যভিজ্ঞাত হইয়াছিল। শিক্ষাদান করা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম; সংরক্ষণ ও শৃঙ্খলা অব্যাহত রাখা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম; অর্থাদি সংগ্রহ ও উহার যথাবিহিত বিভাগ করণ বৈশ্যের ধর্ম্ম; সেবাকরা শূদ্রের ধর্ম্ম। প্রত্যেক বর্ণের স্বত্বাদি সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ হয় নাই, কারণ চতুর্দ্দিকস্থ সকল ব্যক্তিই তাহাদের স্ব স্ব কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করিলেই প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার নিজ স্বত্বাংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্বত্ব এবং কর্ত্তব্য এই দুইয়ের মধ্যে মূলগত কোন প্রভেদ নাই; উহারা একই বস্তু, কিন্তু ঐ বস্তু ভিন্ন ভিন্ন দুইটী স্থান হইতে পরিদৃষ্ট; একজন বলেন—"ইহা আমার; আমার স্বত্ব স্বরূপ ইহা আমার প্রাপ্তব্য"; অপর জন বলেন—"ইহা তোমার; আমার কর্ত্তব্যস্বরূপ ইহা আমি তোমাকে প্রদান করি"। কিন্তু দুই পক্ষের অবস্থিতির ভাব সম্পূর্ণ বিভিন্ন, এবং সেই

হেতু ফলও বিভিন্ন; কারণ প্রথম ব্যক্তি আততায়ী, বিরোধী, পার্থক্য-প্রবণ; অপর জন নম্র, শান্তিপ্রিয় ও ঐক্যপ্রবণ।

ধর্ম্মের আদর্শ হইতে জাত গুণসমূহ এই অবশ্য পালনীয় বিষয়াদির জ্ঞানের উপর সংস্থিত এবং কর্ত্তব্য পরায়ণতারূপ মূল হইতে শাখা ভাবে উদ্ভূত। মনুষ্য অপরের নিকট হইতে প্রাপ্য বস্তুর প্রার্থনার কথা বিস্মৃত হয়, এবং অপরের তাহার নিকট হইতে কি প্রাপ্য তাহারই বিষয় কেবল বিবেচনা করে। সে অপরের সম্বন্ধে তাহার সংস্থিতি কিরূপ তাহাই দেখে এবং ঐ অন্যসম্বন্ধসাপেক্ষ অবস্থায় পালনীয় যাবতীয় কর্ম্মগুলির সম্যক অনুষ্ঠান করিতে যত্নবান হয়।

ক্রমশ

শ্রীসাধুসেবক শর্ম্মা।

---

# অলৌকিক ঘটনা।

লণ্ডন মিশনারী সোসাইটী নামক একটী খৃষ্টীয় ধর্ম্ম সমাজ আছে ইহা বোধ হয় পন্থার পাঠকদিগের মধ্যে কাহারও অবিদিত নাই। রেভারেণ্ড এ, এফ্, ল্যাক্রয় নামক জনৈক সাহেব এই সমাজের একজন ধর্ম্ম প্রচারক ছিলেন তিনি ভারতীয় ভাষায় সুচারুরূপে ধর্ম্ম প্রচার করিতে পারিতেন বলিয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্মমণ্ডলী মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার জামাতা ডাক্তার জে, মুলেন্সও ঐ সমাজভুক্ত ছিলেন এবং তাঁহার (ল্যাক্রয়ের) একটী জীবনী লিখিয়াছিলেন। সেই জীবনীর মধ্যে ডাক্তার মুলেন্স যে একটী অলৌকিক ঘটনার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন তাহা পন্থার পাঠকদিগের অবগতির জন্য যথাযথ লিখিত হইল। এই ঘটনার সময়ে উক্ত সমাজের অনেকের মনে ধারণা হইয়াছিল যে, মৃত্যুর পর মনুষ্য যে সূক্ষ্মদেহ ধারণ করিয়া স্থূলদেহধারী মনুষ্যকে আবশ্যক মত দেখা দেয় ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ প্রয়োগের আবশ্যক নাই।

ঘটনাটী এই—উক্ত সমাজভুক্ত একজন ধর্ম্মপ্রচারকের মৃত্যু হইলে তৎপদে দ্বিতীয় এক ব্যক্তি নিযুক্ত হয়েন। কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া তিনি দেখিলেন

হিসাব পত্রে বিষম গোলযোগ—মৃত ব্যক্তি তাঁহাকে বড়ই বিপদে ফেলিয়া গিয়াছেন। তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াও সাত শত টাকা তিনি কিছুতেই মিলাইতে পারিলেন না। হতাশ হইয়া একদিন অপরাহ্নে আফিস ঘরে একখানি সোফার উপর শয়ন করিয়া তিনি ভাবিতেছেন— "সাত শত টাকা কি হইল। মৃত ব্যক্তির চরিত্র অতি সৎ ছিল, তিনি যে নিজের কোন বিষয়ে ঐ টাকা ব্যয় করিবেন ইহা ত কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। এখন কি করা যায়—" এমন সময় তিনি স্পষ্টরূপে দেখিলেন কেরাণীর পরিচ্ছদধারী একটী মনুষ্য মূর্ত্তি যেন ভূগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া আফিসের যে টেবিলের উপর খাতাপত্র ছিল সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং একখানি কাগজ বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিল এবং তাহার ঐ বিস্মিতভাবাপন্ন উত্তরাধিকারীর প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল। শায়িত ব্যক্তির মনে বড়ই সন্দেহ উপস্থিত হইল, তিনি সেখান হইতে গাত্রোত্থান করিয়া কাগজখানি খুলিয়া দেখিলেন—যাহা দেখিলেন তাহাতে তিনি আরও অধিকতর বিস্মিত হইলেন। তিনি দেখিলেন যে ঐ সাত শত টাকা মাদ্রাজের কোন এক ভদ্র লোককে ঋণ দেওয়া হইয়াছে। পরে ঐ ভদ্র লোককে পত্র লেখা হইলে তিনি ঋণ স্বীকার করিলেন এবং সুদ সমেত সমস্ত প্রাপ্য টাকা শীঘ্রই পরিশোধ করিলেন।

আমাদিগের এদেশেও এরূপ ঘটনা প্রায় ঘটিয়া থাকে, কিন্তু শৈশবাবস্থা হইতেই আমাদিগকে জুজুর ভয়, ভূতের ভয় দেখাইয়া আমাদিগের হৃদয়ে যে ভীতির সঞ্চার করিয়া দেওয়া হয় তাহা জীবনে কখন আমরা ভুলিতে পারি না, সুতরাং কোন আত্মীয় মৃত ব্যক্তির আকৃতি দেখিলে অর্থাৎ কোন কার্য্য বশতঃ আমাদিগকে দেখা দিতে আসিলে, আমরা ভূতের ভয়ে আঁতকাইয়া উঠি এবং সেই মূর্ত্তিও তাহার কার্য্যসিদ্ধির ব্যাঘাত দেখিয়া তদ্দণ্ডেই অন্তর্হিত হইয়া যায়।

শ্রীমনোমোহন ঘোষ।